শরদিন্দু অম্নিবাস

শরদিন্দু অম্নিবাস

নবম খণ্ড

উপন্যাস নাটক চিত্রনাট্য

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৯

প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রথম সংস্করণ : ১৩৬৩

নিবেদন

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনাবলী কয়েক খণ্ডে শরদিন্দু অম্নিবাস নামে প্রকাশিত হচ্ছে।

লেখকের গোয়েন্দা কাহিনী, ঐতিহাসিক উপন্যাস, কিশোরদের জন্য লেখা গল্প, লেখকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলির সমুদয় ছোট গল্প এবং কয়েকটি সামাজিক উপন্যাস, নাটক ও চিত্রনাট্য যথাক্রমে শরদিন্দু অম্নিবাস প্রথম—অষ্টম খণ্ডে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।

নবম খণ্ডে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচটি গ্রন্থ সংকলিত হল—ঝিন্দের বন্দী (উপন্যাস), লাল পাঞ্জা (নাটক), এবং কালিদাস, বিজয়লক্ষ্মী ও কানামাছি (চিত্রনাট্য)।

—প্রকাশক

সূচী

ঝিন্দের বন্দী

প্রথম পরিচ্ছেদ

রায়-দেওয়ান

কলিকাতার পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে কোনো একটা নামজাদা রাস্তার উপর পদার্পণ করিলেই জমিদার রায়-বংশের যে প্রকাণ্ড বাড়িখানা চোখে পড়ে, সেটা প্রায় বিঘা দশেক জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। আগাগোড়া পাথরে তৈয়ারি দুই-মহল বাড়ি, সম্মুখে মোটা মোটা থামের সিং-দরজা। সিং-দরজার ভিতর দিয়া লাল কঙ্করের চওড়া রাস্তা বাড়ির সম্মুখের গাড়িবারান্দা ঘুরিয়া আবার ফটকের কাছে আসিয়া মিলিয়াছে। বাড়ির দক্ষিণ দিকে কিছু দূরে জমিদারী শেরেস্তার একটানা ছোট ছোট কুঠুরি ও গাড়ি-মোটর রাখিবার গ্যারাজ ইত্যাদি। বাঁ-দিকে টেনিস খেলিবার ছাঁটা ঘাসের মাঠ ও ব্যায়ামের নানাবিধ সরঞ্জাম। চারিদিকে দেশী বিলাতী ফুলের বাগান এবং সর্বশেষে বসতবাটি ঘিরিয়া ঢালাই লোহার উচ্চ গরাদযুক্ত পাঁচিল।

এই বাড়ির বর্তমান মালিক দুই ভাই, শিবশঙ্কর ও গৌরীশঙ্কর রায়। জ্যেষ্ঠ শিবশঙ্করের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর, ইনি বিবাহিত। প্রত্নতত্ত্বের দিকে খুব ঝোঁক—সর্বদাই লাইব্রেরীতে বসিয়া পুরাতত্ত্ববিষয়ক বই পড়েন, কিম্বা নিজের বংশের পুরাতন পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। সম্প্রতি সিরাজদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা অবরোধ সম্বন্ধে কয়েকটা নূতন কথা আবিষ্কার করিয়া গুণীসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

ছোট ভাই গৌরীশঙ্করের মনের গতি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী হইলেও খেলাধুলা, ব্যায়াম, জিমন্যাস্টিকের দিকেই তাঁহার আকর্ষণ বেশী, দাদার মত বই মুখে দিয়া পড়িয়া থাকিতে কিম্বা পুরাতন দলিল ঘাঁটিয়া পিতৃপিতামহের দুষ্কৃতির নজির বাহির করিতে তিনি ব্যগ্র নন। গৌরীশঙ্কর অদ্যাপি অবিবাহিত, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশী নয়—অতিশয় সুপুরুষ। রায়-বংশ ডাকসাইটে সুপুরুষ বলিয়া পরিচিত; গৌরীশঙ্কর যে তাহার ব্যতিক্রম নয় তাহা তাঁহার গৌরবর্ণ দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই আর সন্দেহ থাকে না।

কিন্তু ইঁহাদের কথা পরে হইবে। প্রথমে এই রায়-বংশের গোড়ার কথাটা বলিয়া লওয়া যাউক।

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে এই বংশের ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ কালীশঙ্কর রায় হঠাৎ একদিন পাঁচখানা বজ্‌রা সহযোগে আদিগঙ্গার ঘাটে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং কালীঘাটে মহাসমারোহে ষোপচারে পূজা দিলেন। অতঃপর অল্পকালের মধ্যে তিনি দক্ষিণ অঞ্চলে এক মস্ত জমিদারী কিনিয়া ফেলিলেন এবং কলিকাতার সন্নিকটে মাঠের মাঝখানে এক ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া রায়-দেওয়ান কালীশঙ্কর রায় উপাধি ধারণ করিয়া মহা ধুমধামের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কোথা হইতে আসিলেন কেহ জানিল না; কিন্তু সেজন্য সমাজে তাঁহার গতি প্রতিহত হইল না। যাহার টাকা আছে তাহার দ্বারা সকলই সম্ভব; বিশেষ কালীশঙ্কর বহু দেশ পর্যটন করিয়া প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। শীঘ্রই তিনি তৎকালিক কলিকাতার বরেণ্য সমাজের অগ্রগণ্য হইয়া উঠিলেন। কলিকাতার শতাব্দীপূর্বের ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, রায়-দেওয়ান কালীশঙ্করের নাম সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অপর্যাপ্ত ভাবে ছড়ানো আছে।

কিন্তু এতবড় লোকের বংশরক্ষার দিকেও নজর রাখিতে হয়। বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়া গেলেও কালীশঙ্কর অতিশয় সুপুরুষ ও মজবুত লোক ছিলেন; সুতরাং তিনি

অবিলম্বে সদ্বংশজাতা একটি স্ত্রী গ্রহণ করিয়া একযোগে সংসার ধর্ম ও পারলৌকিক ইষ্টের দিকে মনোনিবেশ করিলেন।

রায়-দেওয়ানকে কিন্তু স্ত্রী ও সাংসারিক সুখৈশ্বর্য বেশীদিন ভোগ করিতে হইল না।

বছর পাঁচেক পরে একদিন রাত্রিকালে কোন ধনী বন্ধুর বাড়ি হইতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ফিরিবার পথে নিজের সিং-দরজার প্রায় সম্মুখে রায়-দেওয়ান খুন হইলেন। তিনি পাল্কি চড়িয়া আসিতেছিলেন, সঙ্গে হুঁকা-বরদার ও দুইজন মশাল্‌চি ছিল। নির্জন রাত্রি, হঠাৎ চারজন অস্ত্রধারী দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পাল্কির বেহারা উড়িয়াগণ পাল্কি ফেলিয়া দৌড় মারিল। হুঁকা-বরদার ও মশালচিদ্বয়ও বোধ করি উড়িয়াদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা পরে তাহা স্বীকার করিল না। বরঞ্চ প্রভুর রক্ষার জন্য আততায়ীর সহিত কিরূপ অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহার প্রমাণস্বরূপ নিজ নিজ দেহে বহু দাগ ও ক্ষতচিহ্ন দেখাইল। যে যাহা হউক, দেউড়ি হইতে লোকজন আসিয়া যখন রায়-দেওয়ানকে পাল্কি হইতে বাহির করিল, তখন তাঁহার দেহে প্রাণ নাই, শুধু একটা ছোরার সোনালী মুঠ বুকের উপর উঁচু হইয়া আছে।

কলিকাতায় কোম্পানীর শাসন তখন খুব দৃঢ় হয় নাই। এরকম খুনজখম লুটতরাজ প্রায়ই শুনা যাইত। কলিকাতা শহর তখন অর্ধেক জঙ্গল বলিলেই চলে; দিনের বেলা চৌরঙ্গীর আশেপাশে বাঘের ডাক শুনা যাইত। সুতরাং কাহারা রায়-দেওয়ানকে খুন করিল এবং কেনই বা করিল তাহার কোন কিনারা হইল না। উপরন্তু রায়-দেওয়ানের অঙ্গস্থিত হীরার আংটি, সোনার চেন কিছুই খোয়া যায় নাই দেখিয়া আততায়ীদের এই অহেতুক জীবহিংসায় সকলের মনেই একটা ধাঁধার ভাব রহিয়া গেল।

শুধু অনেক অনুসন্ধানের পর হুঁকা-বরদারের নিকট হইতে এইটুকু জানা গেল যে, হত্যাকারীরা এদেশীয় লোক নয়; তবে তাহারা যে কোন্ দেশের লোক তাহাও সে বলিতে পারিল না। কারণ হত্যা করিবার পূর্বে যে ভাষায় তাহারা রায়-দেওয়ানকে সম্বোধন করিয়াছিল, তাহা তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

এ ছাড়া প্রমাণের মধ্যে সেই সোনার মুঠ-যুক্ত বাঁকা ইস্পাতের ছুরিখানা। ছুরিখানার গঠন এতই অদ্ভুত যে তাহা বাংলা দেশে তৈয়ার বলিয়া মনে হয় না। তাহার সোনার মুঠের উপর যে দুই-চারিটা অক্ষর খোদাই করা ছিল, আজ পর্যন্ত কেহই তাহার পাঠোদ্ধার করিতে পারে নাই।

এই সমস্ত প্রমাণ সাক্ষীসাবুদ একত্র করিয়া কেবল এইটুকুই অনুমান করা গেল যে, দেশ-বিদেশে পরিক্রমণের সময় কালীশঙ্কর হয়তো কোনো শক্তিশালী লোকের শত্রুতা করিয়াছিলেন—তাহারি অনুচরেরা খুঁজিতে খুঁজিতে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। এছাড়া এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কোন দিক দিয়া আর কিছু জানা গেল না।

ইহাই বলিতে গেলে রায়-বংশের আদিপর্ব। তারপর কি করিয়া কালীশঙ্করের স্ত্রী একমাত্র শিশুপুত্র কোলে লইয়া দোর্দণ্ডপ্রতাপে জমিদারী শাসন করিয়া অচিরাৎ 'রায়-বাঘিনী' উপাধি অর্জন করিলেন এবং তখন হইতে আজ পর্যন্ত রায়-পরিবার কি করিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য, প্রভুত্ব ও বংশগরিমা রক্ষা করিয়া আসিতেছে, সে সব কথা লিখিয়া গ্রন্থ ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না। রায়-বংশের ইতিহাস এইখানেই চাপা থাকুক। পরে প্রয়োজন হইলে এই ছেঁড়া পুঁথির পাতা আবার খুলিলেই চলিবে।

সন্ধ্যার পর শিবশঙ্কর তাঁহার বৃহৎ লাইব্রেরী ঘরে বিদ্যুৎবাতি জ্বালিয়া একাকী বসিয়া একখানা মোটা চামড়া বাঁধানো পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। ঘরের দেয়ালগুলা অধিকাংশই মেঝে হইতে ছাদ পর্যন্ত পুস্তকের আলমারি দিয়া ঢাকা। মেঝেয় পুরু কার্পেট পাতা—চলিতে ফিরিতে শব্দ হয় না। ঘরের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড একটা সেক্রেটারিয়েট্ টেব্‌ল, তাহার চারিপাশে কতকগুলি গদি মাড়া চেয়ার। ঘরে প্রবেশ করিতেই সম্মুখের দেয়ালে একখানা তৈলচিত্র টাঙানো দেখা যায়—এটি বংশের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান কালী-

শঙ্করের প্রতিকৃতি। প্রমাণ মানুষের ছবি—মাথায় পাগড়ি ও গায়ে ঘুণ্টিদার মেরজাই পরা; মুখচোখ বুদ্ধির প্রভায় যেন জ্বলজ্বল করিতেছে। দেড়শত বৎসরের পুরাতন হইলেও ছবিখানি এখনো বেশ ভাল অবস্থায় আছে—দাগ ধরিয়া বা পোকায় কাটিয়া নষ্ট হয় নাই।

শিবশংকর একমনে পড়িতেছেন, এমন সময় তাঁহার স্ত্রী অচলা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিলেন। কিছুক্ষণ স্বামীর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বেশ একটু শব্দ করিয়া পাশের একখানা চেয়ারে বসিলেন। প্রকাণ্ড পুরীর মধ্যে ঊনিশ বছরের বধূটি একেবারে একা—বাড়িতে দাসী চাকরানী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোক নাই। তাই দিনের বেলাটা কাজে কর্মে যদি বা কোনমতে কাটিয়া যায়, সন্ধ্যার পর স্বামী লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলে আর যেন সময় কাটিতে চাহে না। দেবর গৌরীশংকরও কয়েকদিন ধরিয়া কি একটা খেলায় এমন মাতিয়াছেন যে, দু'দণ্ড বসিয়া গল্প করা তো দূরের কথা, তাঁহার দর্শন পাওয়াই ভার হইয়া উঠিয়াছে।

শব্দ শুনিয়া শিবশংকর বই হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন এবং স্ত্রীর দিকে ফিকা রকম একটু হাসিয়া আবার পুস্তকে মনোনিবেশের উদ্যোগ করিলেন।

অচলা নিজের চেয়ারখানা স্বামীর দিকে একটু টানিয়া আনিয়া বলিল—'বই রাখো। এস না একটু গল্প করি।'

শিবশংকর চমকিত হইয়া বলিলেন—'অ্যাঁ। ওঃ—হ্যাঁ, বেশ তো। তা গৌরী কোথায়?'

অচলা হাসিয়া বলিল—'ঠাকুরপো এখনো ক্লাব থেকে ফেরেনি। ভারি মুষড়ে গেলে—না? ঠাকুরপো থাকলে আমাকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বই পড়তে পারতে।'

শিবশংকরও হাসিয়া ফেলিলেন—'না না, তা নয়। তাকে ক'দিন দেখিনি কিনা—তাই ভাবছিলুম, সেবারকার মত লক্ষ্ণৌ কি লাহোর পাড়ি দিল বুঝি।'

অচলা বলিল—'তোমাকে না ব'লে তোমার অনুমতি না নিয়ে তো ঠাকুরপো কোথাও যায় না।'

'তা বটে!'—শিবশংকর একটু হাসিলেন—'আজকাল বুঝি তলোয়ার খেলায় মেতেছে? গোয়ালিয়র না যোধপুর থেকে একজন বড় তলোয়ার খেলোয়াড় এসেছে, তারই কাছে দেশী তলোয়ার খেলা শেখা হচ্ছে। এই তো মাস কয়েক আগে কোন্ একটা ইটালিয়নকে মাইনে দিয়ে রেখে ফেন্সিং শিখছিল। তার আগে কিছুদিন বক্সিং-এর পালা গেছে। এবার গোয়ালিয়র ঘাড় থেকে নামলে আবার কি চাপে দেখ।'

অচলা বলল—'সত্যি বাপু, সময়ে বিয়ে না দিলে আজকালকার ছেলেরা কেমন এক-রকম হয়ে যায়। তুমিও তো কিছু করবে না, কেবল বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে ব'সে থাকবে। ঠাকুরপোর বৌ এলে আমার কত সুবিধে হয় ভাব দেখি? একলাটি এত বড় সংসারে কি মন লাগে?'

শিবশংকর মৃদুহাস্যে বলিলেন—'সেইটেই তাহলে আসল কথা! কিন্তু কি করি বল, বিয়ের কথা তুললেই সে হেসে উড়িয়ে দেয়।'

অচলা বলিল—'তাই ব'লে সারা জন্ম কি কুস্তি ক'রে আর তলোয়ার খেলে কাটাবে নাকি? বিয়ে-থা সংসার-ধর্ম করতে হবে না?'

বাহিরের গাড়িবারান্দায় মোটরের গুঞ্জন শব্দ শোনা গেল। শিবশংকর বলিলেন—'প্রশ্নটা ওকেই করে দেখ। ওই বুঝি সে এল!'

হাফ-প্যাণ্ট-পরা কামিজের গলা খোলা গৌরীশংকর সেই ঘরেই আসিয়া প্রবেশ করিল। অচলাকে দেখিয়া বলিল—'ইস, অচলবৌদি একেবারে দাদার ব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়েছ যে। এবারে দেখছি দাদাকে লাইব্রেরীর দোরে শাস্ত্রী বসাতে হবে।'

অচলা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল—'তুমি আমাকে অচলবৌদি বলবে কেন বল তো? শুধু বৌদি বলতে পার না?'

গৌরী বলিল—'বৌদি হিসাবে তুমি যে একেবারেই অচল এইটি পাঁচজনকে জানানোই

আমার উদ্দেশ্য—এ ছাড়া অন্য অভিপ্রায় নেই।'

শিবশঙ্কর বলিলেন—'আজকাল তো তবু খাতির করে অচলবৌদি বল্‌ছে, বছর চারেক আগে পর্যন্ত যে শুধু অচল ব'লেই ডাকত!'

বস্তুত অচলা এ সংসারে আসিয়া অবধি এই দুইটি কিশোর-কিশোরীর মধ্যে দেবর-ভ্রাতৃজায়ার সরস সম্পর্কের সহিত ভাই-বোনের মধুর স্নেহ মিশিয়াছিল। অচলা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—'বেশ তো, আমি যদি এতই অচল হয়ে থাকি, একটি সচল বৌদি ঘরে নিয়ে এস, আমি না হয় এক কোণে পড়ে থাকব।'

গৌরী হাসিয়া বলিল—'ওরে বাস রে, তাহলে কি আর রক্ষে থাকবে! দাদাকে এবং সেই সঙ্গে আমাদের সকলকে সেই কোণেই আশ্রয় নিতে হবে যে।'

অচলা হাসিয়া ফেলিল, বলিল—'সে যেন হল। কিন্তু আজ তিন জন ঘটক এসেছিল যে!'

গৌরী বলিল—'আবার ঘটক! দারোয়ানগুলোকে তাড়াতে হল দেখছি। তাদের পৈ পৈ করে বলে দিয়েছি, ঘটক দেখলেই অর্ধচন্দ্র দেবে, তা হতভাগারা কথা শোনে না!'

এই সময় বেয়ারা দরজার বাহির হইতে জানাইল, একটি ভদ্রলোক মুলাকাৎ করিতে চাহেন, হুকুম পাইলে সে তাঁহাকে এখানে লইয়া আসে।

গৌরী বলিল—'এই সেরেছে—ঘটক নিশ্চয়। আমাকে পালাতে হল; দাদা, তুমি লোকটাকে ভালয় ভালয় বিদেয় করে দাও।'

'খবরদার বলছি, ঘটক তাড়াতে পারবে না। বাড়িতে সোমত্ত আইবুড় ছেলে, ঘটক আসবে না তো কি?' বলিয়া অচলা হাসিতে হাসিতে ভিতরের দরজা দিয়া প্রস্থান করিল।

গৌরীও অচলার অনুগমন করিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া শিবশঙ্কর বলিলেন—'পালাস্‌ নে, ব'স। হুকুম শুনলি তো?'

গৌরী টেব্‌লের একটা কোণে বসিয়া বলিল—'নাঃ, এরা আর বাড়িতে টিঁকতে দিলে না। এবার লম্বা পাড়ি জমাতে হবে দেখছি—একেবারে কাশ্মীর, না হয় আরাকান।'

শিবশঙ্কর আগন্তুককে ডাকিয়া আনিবার জন্য বেয়ারাকে হুকুম দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধনঞ্জয়

কিছুক্ষণ পরে যে লোকটি পরদা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল তাহাকে কিন্তু বাংলা দেশের ঘটক সম্প্রদায়-ভুক্ত করা একেবারেই অসম্ভব। লোকটি বাঙালী নয়, তবে কোন্‌ জাতীয় তাহা চেহারা বা বেশভূষা দেখিয়া অনুমান করা কঠিন। মাথায় মাড়োয়ারী ধরনের খুনখারাবী রঙের পাগড়ি, গায়ে দামী সিল্কের সেকেলে ধরনের পুরা আস্তিন আঙ্‌রাখা, পরিধানে বারাণসী চেলী, পায়ে লাল মখমলের উপর সাচ্চার কাজ করা নাগ্‌রা। গলায়

সরু সোনার শিক্‌লি দিয়া আট্‌কানো একটা মোহর—তাহার মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড পান্না ঝকঝক করিতেছে। দুই কানে দুইটি সুপারির মত রুবি হইতে আলো ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।

লোকটির বয়স বোধ হয় পঞ্চাশের কাছাকাছি, গোঁফ কাঁচাপাকা। গায়ের বর্ণ নিকষের মত কালো। কিন্তু কি অপূর্ব দেহের ও মুখের গঠন! যেন হাতুড়ি দিয়া লোহা পিটিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। ঘন ভ্রূর নীচে চক্ষু দু'টা ইস্পাতের ছুরির মত ধারালো।

লোকটি ঘরে ঢুকিয়াই দ্বারের কাছে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; তাহার দৃষ্টি দেয়ালে টাঙানো কালীশঙ্করের তৈল-চিত্রটার উপর নিবদ্ধ হইল। কিছুক্ষণ নিষ্পলকনেত্রে সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া সে ধীরে ধীরে চক্ষু ফিরাইয়া বিশুদ্ধ বজ্রবুলিতে জিজ্ঞাসা করিল—'এ ছবি এখানে কি করে এল?'

আগন্তুকের অদ্ভুত বেশভূষা দেখিয়া দুই ভাই অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, এইবার গৌরী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লোকটি কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—'মাপ করবেন। আমার ব্যবহারে আপনারা কিছু আশ্চর্য হয়েছেন। আমি এখনি নিজের পরিচয় দেব; কিন্তু তার আগে ইনি কে জানতে পারি কি?'

গৌরী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'উনি আমাদের পূর্বপুরুষ দেওয়ান কালীশঙ্কর রায়।'

'কালীশঙ্কর রাও!'—লোকটির দুই চোখ উত্তেজনায় জ্বলিয়া উঠিল; সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যেন নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইল; তারপর বলিল—'বস্‌তে পারি কি?'

গৌরী স্বহস্তে একখানা চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল—'বসুন।'

লোকটি উপবেশন করিয়া বলিল—'বাবুসাহেব, সমস্তই নিয়তির খেলা। তা না হলে—নিতান্ত অপরিচিত আমি, আজ দেওয়ান কালীশঙ্কর রাওয়ের বংশধরদের সঙ্গে কথা কইছি কি করে?'

গৌরী হাসিতে হাসিতে বলিল—'এ আর আশ্চর্য কি? কালীশঙ্কর রায়ের বংশধরদের সঙ্গে অনেকেই তো কথা কয়ে থাকেন।'

লোকটি বলিল—'তা নয়। আপনি এখন আমার কথা বুঝবেন না।—আচ্ছা, আপনারা কখনো ঝিন্দ্‌ দেশের নাম শুনেছেন কি?'

গৌরী স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'ঝিন্দ্‌! ঝিন্দ্‌! নামটা চেনা-চেনা ঠেকছে—'

শিবশঙ্কর বলিলেন—'ঝিন্দ্‌ মধ্যভারতের একটা ছোট্ট স্বাধীন রাজ্য। দাঁড়ান্‌ বলছি।' তিনি উঠিয়া একটা আলমারি হইতে একখণ্ড মোটা বই বাহির করিয়া সেটার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একস্থানে আসিয়া থামিলেন। বলিলেন—'এই যে ঝিন্দ্‌-ঝড়োয়া। মধ্যভারতেরই বটে। স্বাধীন—ইংরাজের মিত্ররাজ্য। ঝিন্দ্‌ এবং ঝড়োয়া দুটি পাশাপাশি যুগ্ম রাজ্য। পার্বত্য দেশ—একটি নদী আছে, নাম কিস্তা (সম্ভবত কৃষ্ণতোয়ার অপভ্রংশ), ঝিন্দের আয়তন—১৫৫৪ বর্গ মাইল, রাজধানী—সিংগড়। ঝড়োয়ার আয়তন—১৪৮৫ বর্গ মাইল; রাজধানী—বেতপুর। সর্বসুদ্ধ জনসংখ্যা—১১৮৯৫৩; প্রধান উপজীব্য—শিল্প; খনিজ সম্পত্তি প্রচুর। দুই রাজ্যেই হিন্দু রাজা।'

আগন্তুক বলিল—'হ্যাঁ, ঐ ঝিন্দ্‌-ঝড়োয়া। এইবার আমার পরিচয় দিই—আমি ঝিন্দের একজন ফৌজী-সর্দার—আমার নাম সর্দার ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী। ঝিন্দের রাজার আমরা বংশানুক্রমিক পার্শ্বচর।'

শিবশঙ্কর শিষ্টতা দেখাইয়া বলিলেন—'আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে খুবই আনন্দিত হলাম। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ঝিন্দের ফৌজী-সর্দারের কি প্রয়োজন থাকতে পারে, সেইটেই ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী বলিলেন—'বাবুসাব, কিছুক্ষণ আগে ঐ ছবিটি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় আপনারা কিছু আশ্চর্য হয়েছিলেন। কিন্তু আমি আপনাদের এমন একটা কাহিনী বলতে

পারি যা শুনে আপনারা আরো আশ্চর্য হয়ে যাবেন। আপনাদের এই পূর্বপুরুষটির যে অদ্ভুত জীবন বৃত্তান্ত আমি জানি, তার শতাংশের একাংশও আপনারা জানেন না। কিন্তু সে-কথা এখন নয়; যদি কখনো সময় পাই বলব। এখন আমার প্রয়োজনের কথাটাই বলি।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী আবার আরম্ভ করিলেন—'আপনারা যে দুই ভাই তা আমি ইতিপূর্বেই আপনাদের বেয়ারার কাছে জেনেছি, তাই যে-কথা আজ শুধু একজনকে বলব বলেই এসেছিলাম তা আপনাদের দু'জনকেই বলছি। আশা করি, আমাদের কথাবার্তা অন্য কেউ শুনতে পাবে না।'

ধনঞ্জয় ক্ষেত্রীর কথার ভঙ্গীতে দুইজনেই গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; গৌরী উঠিয়া গিয়া ঘরের দ্বারগুলা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল। বলিল—'এবার বলুন; আর কারুর শোনবার সম্ভাবনা নেই।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'আর এক কথা। আপনারা আমার প্রস্তাবে রাজী হন বা না হন, আমার কথা ঘুণাক্ষরে কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না, এই প্রতিশ্রুতি না পেলে আমি কিছু বলতে পারব না।'

দুইজনেই প্রতিশ্রুত হইলেন।

ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন—'দেখুন, ঝিন্দ্-ঝড়োয়া রাজ্য দু'টি বরোদা বা হায়দ্রাবাদের মত বড় রাজ্য নয়। ইতিহাসে এবং ভূগোলে তাদের নাম ছোট ক'রেই লেখা আছে—তাই বৃটিশ ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যেও অনেকে ঝিন্দ্-ঝড়োয়ার নাম জানে না। কিন্তু ছোট হলেও তারা একেবারে নগণ্য নয়। সেখানে বৃটিশ গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি আছে, ভারত সম্রাটের দরবারে এই দুই রাজ্যের রাজার একটা নির্দিষ্ট আসন আছে।

'আপনারা ঝিন্দ্-ঝড়োয়ার সম্বন্ধে কিছু জানেন না বলেই এর পূর্বতন ইতিহাস কিছু বলা দরকার। ভারতবর্ষের হূণ অভিযানের কথা আপনারা পড়েছেন। সেই সময় মথুরার যুবরাজ স্মরজিৎ সিংহ এবং তাঁর ভগিনীপতি বেত্রবর্মা হূণ কর্তৃক রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। দক্ষিণাপথে সপরিবারে পালাতে পালাতে তাঁরা এক দুর্গম পর্বতবেষ্টিত উপত্যকায় এসে উপস্থিত হলেন। স্থানটি প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনে এমনভাবে সুরক্ষিত যে স্মরজিৎ সিংহ তাঁর দক্ষিণ যাত্রা এখানেই নিরুদ্ধ করলেন এবং সেখানকার আটবিক বন্য জাতিকে বাহুবলে পরাস্ত করে এই ঝিন্দ্-রাজ্য স্থাপন করলেন। অতঃপর ভগিনীপতি বেত্রবর্মার সঙ্গে মনের মিল না হওয়াতে দু'জনে রাজ্য সমান ভাগ করে নিলেন। পৃথক হয়ে বেত্রবর্মা তাঁর রাজ্যের নাম রাখলেন ঝড়োয়া। দুই রাজ্যের মাঝখানে পার্বত্য নদী কৃষ্ণতোয়া সীমানা রক্ষা করছে।

'সেই অবধি এই দুই রাজবংশ ঝিন্দ্ ও ঝড়োয়ায় রাজত্ব করে আসছে। ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে নিয়তির শত শত ঝড় বয়ে গেছে—পাঠান, মোগল, ইরাণী, মারাঠী, ইংরেজ হিন্দুস্থানকে নিয়ে টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি করেছে, কিন্তু ঝিন্দ্-ঝড়োয়া তার দুর্ভেদ্য গিরিসঙ্কটের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে, কখনো তার গায়ে একটা আঁচড় লাগেনি। একে অনুর্বর পাহাড়ে দেশ, তার ওপর বাহিরের কলহে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, তাই কোনোদিন কোনো শক্তিশালী জাতির লোলুপ দৃষ্টি তার ওপর পড়েনি।

'এই তো গেল অতীতের কাহিনী। বর্তমানের কথা সংক্ষেপে বলছি। বর্তমানে অবস্থা হচ্ছে এই যে, ঝিন্দের মহারাজ ভাস্কর সিংহ আজ ছ'মাস হল গতাসু হয়েছেন। মহারাজ ভাস্কর সিংহের দুই পুত্র—কুমার শঙ্কর সিংহ ও কুমার উদিত সিংহ। কুমার শঙ্কর স্বর্গীয়া পাটরানী রুক্মা দেবীর গর্ভজাত, আর কুমার উদিত স্বর্গীয়া দ্বিতীয়া মহিষী লখিমা দেবীর গর্ভজাত। দু'জনের বয়স সমান, শুধু কুমার শঙ্কর উদিতের চেয়ে ঘণ্টাখানেকের বড়। সুতরাং তিনিই সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী।

'এইখানেই গণ্ডগোলের আরম্ভ। বাপের মৃত্যুর পর উদিত সিং ছোট হয়েও গদীতে

বসবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ঝিন্দের সিংহাসন যে ন্যায়ত তাঁরই, এ কথা প্রমাণ করবার জন্য তিনি তাঁর জন্মকালীন ধাত্রী, ডাক্তার প্রভৃতিকে সাক্ষী করে দাঁড় করালেন ; কিন্তু দেশের লোক তাঁকে চায় না, তারা চায় কুমার শঙ্কর সিংকে। তার একটা কারণ, মাতাল লম্পট হলেও কুমার শঙ্করের প্রাণটা ভারি দরাজ, আর উদিত সিং দুর্দান্ত অত্যাচারী। এত বড় ক্রূরপ্রকৃতি স্বার্থপর ভোগবিলাসী লোক খুব কম দেখা যায়।

'দেশে নিজের পরিপোষক না পেয়ে উদিত সিং গোপনে গোপনে ইংরাজ গভর্নমেণ্টকে নিজের দাবী জানিয়ে দরখাস্ত করলেন। কিন্তু ভারত সরকারও সেদিকে কর্ণপাত করলেন না; দেশের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে তাঁরা কোনো রকম হস্তক্ষেপ করবেন না বলে জানালেন। ওদিকে সুবিধা করতে না পেরে কুমার উদিত অন্য রাস্তা ধরলেন।

'এদিকে কুমার শঙ্করের অভিষেকের আয়োজন হতে লাগল। সমস্ত ঠিক, স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরের কাছ থেকে রাজকীয় অভিনন্দন পত্র পর্যন্ত এসে উপস্থিত—এমন সময় এক অচিন্তনীয় ব্যাপার ঘটল; যখন অভিষেকের আর দশদিন মাত্র বাকি, তখন কুমার শঙ্কর সিং নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। সেইসঙ্গে একজন আর্মাণী ব্যবসাদারের সুন্দরী স্ত্রীকেও খুঁজে পাওয়া গেল না। চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল।

'অভিষেক পিছিয়ে গেল। তারপর মাসখানেক পরে যুবরাজ রাজ্যে ফিরে এলেন।

'আবার অভিষেকের দিন স্থির হল এবং এবারও নির্দিষ্ট দিনের এক সপ্তাহ আগে কুমার হঠাৎ গা-ঢাকা দিলেন। এবার তাঁর সঙ্গিনী একটি বিবাহিতা কাশ্মীরী সুন্দরী।

'বারবার দুবার এই রকম বিশ্রী কাণ্ড দেখে দেশসুদ্ধ লোক কুমার শঙ্করের ওপর চটে গেল। ইংরাজ গভর্নমেণ্টও জানালেন যে, ভবিষ্যতে যদি ফের এইরূপ হাস্যকর অভিনয় হয়, তাহলে তাঁরা কুমার উদিতের দাবী গ্রাহ্য করে তাঁকেই সিংহাসনে বসাবেন।

'আপনারা বুঝতেই পারছেন যে, এ সমস্ত কুমার উদিতের কারসাজি। সোজাপথে বিফল হয়ে তিনি চেষ্টা করছেন—বড় রাজকুমারকে দায়িত্বশূন্য অপদার্থ প্রতিপন্ন করে নিজের দাবী পাকা করতে। সত্য বলতে কি, কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্যও হয়েছেন। এরই মধ্যে দেশে একদল লোক দাঁড়িয়েছে, যারা উদিত রাজা হলেই বেশী খুশি হয়।

'আমাদের মত যারা ন্যায্য অধিকারীকে সিংহাসনে বসাতে চায়, তাদের অবস্থা একবার ভেবে দেখুন। একদিকে উচ্ছৃঙ্খল রাজকুমার—সরল, সাহসী, কাণ্ডজ্ঞানহীন, কিছুতেই পরোয়া নেই—অপরদিকে কূটচক্রী রাজ্যলোলুপ তাঁর ছোট ভাই। বাবুসাব, আমি ঝিন্দের রাজপরিবারের বংশগত ভৃত্য, বৃদ্ধ মহারাজ ভাস্কর সিং মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আমার হাত ধরে বলে গিয়েছিলেন, যেন কুমার শঙ্করকে গদীতে বসাই। মুমূর্ষু রাজার সে হুকুম আমি ভুলিনি। আমিও প্রতিজ্ঞা করলাম, যেমন করে পারি শঙ্কর সিংকে সিংহাসনে বসাব।

'তাই, বৃদ্ধ দেওয়ান বজ্রপাণির সঙ্গে পরামর্শ করে শেষ বার রাজ্যাভিষেকের দিন স্থির করলাম। আগামী ২৩শে আশ্বিন হচ্ছে সেইদিন, অর্থাৎ আজ থেকে সাত দিন মাত্র বাকি। দিন স্থির করে যুবরাজের মহালের চারিদিকে পাহারা বসালাম। জেলখানার কয়েদীকেও বোধ হয় এত সতর্কভাবে পাহারা দিতে হয় না। মহালের মধ্যে তিনি যখন যেখানে যান সঙ্গে লোক থাকে, বাইরে যেতে চাইলে দশজন সওয়ার নিয়ে আমি সঙ্গে থাকি।

'যুবরাজ প্রথমটা কিছু বলতে পারলেন না, কিন্তু ক্রমে আমাকে ডেকে নানারকম ভর্ৎসনা তিরস্কার আরম্ভ করে দিলেন। আমি অটল হয়ে রইলাম, বললাম—যুবরাজ, তোমাকে সিংহাসনে বসিয়ে তবে মুক্তি দেব, তার আগে নয়।—তিনি আমাকে অনেক আশ্বাস দিলেন যে, এবার কিছুতেই রাজ্য ছেড়ে যাবেন না। কিন্তু আমি তাঁর দুর্বল চিত্ত জানতাম, কিছুতেই রাজী হলাম না।

'এই সময় কুমার উদিত একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন; দুইভায়ে বাহিরে বেশ সৌহার্দ্য ছিল— তার কারণ আপনারা বুঝতেই পারছেন ; সুন্দরী স্ত্রীলোকের লোভ দেখিয়ে উদিত বড় ভাইকে বশ করে রেখেছিলেন। স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যেই যে উদিত

তাঁকে ব্যভিচারের পথে নিয়ে যাচ্ছে, একথা গৌরার শঙ্কর সিং বুঝেও বুঝতেন না।

'উদিতকে আসতে দেখে আমি ভারি ভয় পেয়ে গেলাম। দুইভায়ে কি কথা হল জানি না; কিন্তু উদিত চলে যাবার পরই আমি প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিলাম এবং স্বয়ং রাজকুমারের ঘরের দরজায় পাহারা দেব স্থির করলাম।

'কিন্তু কিছুতেই তাঁকে ধরে রাখা গেল না—পরদিন সকালে দেখলাম পাখি উড়েছে। কিস্তার জলে নৌকার বন্দোবস্ত ছিল, কুমার শোবার ঘরের জানালা থেকে জলে লাফিয়ে পড়ে, সেই নৌকায় চড়ে অন্তর্হিত হয়েছেন।

'এবার আর ব্যাপারটা জানাজানি হতে দিলাম না। পাহারা যেমন ছিল তেমনই রইল। মহালে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না—এই হুকুম জারি করে দিয়ে আমি যুবরাজকে খুঁজতে বেরুলাম। দু'দিন সন্ধান করবার পর খবর পেলাম যে, তিনি কলকাতায় এসেছেন।

'তখন আমার অধীনস্থ একজন বিশ্বস্ত সেনানী সর্দার রুদ্ররূপকে আমার জায়গায় বসিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। রাজ্যে রটিয়ে দেওয়া হল যে, কুমারের শরীর অত্যন্ত খারাপ, তাই তিনি কারুর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না।

'আজ দু'দিন হল আমি কলকাতায় এসেছি। এসে পর্যন্ত চারিদিকে কুমারের খোঁজ করে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পাচ্ছি না। এতবড় শহরে একজন লোককে খুঁজে বার করা সহজ কথা নয়, এদিকে অভিষেকের দিনও ক্রমে এগিয়ে আসছে।

'কুমার শঙ্কর খুব মিশুক লোক, তাই এ শহরে যত বড় বড় ক্লাব আছে, সেইসব ক্লাবে কুমারের খোঁজ নিলাম, তারপর বড় বড় হোটেলে তল্লাস করলাম কিন্তু কোথাও কোনো ফল পেলাম না। বুক দমে গেল। তবে কি মিথ্যা খবর পেয়ে এতদূর ছুটে এলাম! যুবরাজ কি এখানে আসেননি?

'আজ বৈকাল বেলা নিতান্ত হতাশ হয়েই একটা ট্যাক্সিতে চড়ে আপনাদের এই লেকের চারধারে ঘুরছিলাম আর ভাবছিলাম, এখন কি করা যায়? এমন সময়ে হঠাৎ আমার নজর পড়ল, একটি যুবাপুরুষ একখানা প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে মোটর থেকে নামছেন।'

এই পর্যন্ত বলিয়া ধনঞ্জয় চুপ করিলেন, তারপর গৌরীশঙ্করের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন—'সে যুবাপুরুষটি আপনি?'

শ্রোতৃযুগল এতক্ষণ তন্ময় হইয়া গল্প শুনিতেছিলেন, চমক ভাঙিয়া গৌরী বলিল—'ক্লাবের সামনে আমাকে নামতে দেখে থাকবেন।'

ধনঞ্জয় ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—'হ্যাঁ, ক্লাবের সামনেই বটে। আপনাকে দেখে আমি প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম, তারপর এক লাফে ট্যাক্সি থেকে নেমে আপনার অনুসরণ করলাম।

'আপনি তখন ক্লাবের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। আমি দারোয়ানকে বললাম—'কুমার শঙ্কর সিংহের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই—তাঁকে খবর দাও।'

'দারোয়ান বললে—শঙ্কর সিং বলে কাউকে সে চেনে না। আমি একটা তাড়া দিয়ে বললাম—'এইমাত্র যিনি এ বাড়িতে ঢুকলেন তিনিই শঙ্কর সিং—শীঘ্র আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল।'

'দারোয়ানটা হেসে বললে—'আপনি ভুল করছেন; যিনি এইমাত্র এলেন তাঁর নাম জমিদার বাবু গৌরীশঙ্কর রায়।'

'আমি বললাম—'কখনই না। তিনি শঙ্কর সিং—আমি স্বচক্ষে তাঁকে এখানে ঢুকতে দেখেছি।'

'দারোয়ান বললে—'হুজুর, বিশ্বাস না হয় সেক্রেটারী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন।' বলে আমাকে সেক্রেটারীর ঘরে নিয়ে গেল।

'সেক্রেটারীবাবুটি অতি ভদ্রলোক। তিনি আমার কথা শুনে বললেন—'শঙ্কর সিং বলে ক্লাবের কোনো সভ্য নেই, তবে কোনো সভ্যের বন্ধু হিসাবে ক্লাবে এসে থাকতে পারেন। বিশেষত আজ ক্লাবে তলোয়ার খেলার একটা প্রদর্শনী আছে—তাই বাইরের

লোকও অনেক এসেছেন।' এই বলে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবের ভিতরে গেলেন। একটি হলে অনেক লোক জমা হয়েছিল এবং তারই মাঝখানে তলোয়ার খেলা চলছিল। সেক্রেটারীবাবু আমাকে বললেন—'দেখুন দেখি, আপনার শঙ্কর সিং এখানে আছেন কি না।'

'প্রথম দৃষ্টিতেই চিনতে পেরেছিলাম, যে দু'জন লোক তলোয়ার খেলছেন, শঙ্কর সিং তাদের একজন। আমি আঙ্গুল দেখিয়ে বললাম—'ঐ শঙ্কর সিং।'

'সেক্রেটারিবাবু হেসে উঠলেন—'আপনি ভুল করেছেন। উনি গৌরীশঙ্কর রায়, আমাদের ক্লাবের একজন সভ্য।'

'আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। এও কি সম্ভব! পৃথিবীতে দু'জন লোকের কি এক রকম চেহারা হয়? না—এরা সকলে মিলে আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করছে?'

গৌরীশঙ্কর আস্তে আস্তে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ধনঞ্জয় তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন—'ব্যাপারটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন? অমন অদ্ভুত সাদৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি, এ যে হতে পারে তা কখনো কল্পনা করিনি। আপনার শরীরে এমন কোনো স্থান নেই যা অবিকল শঙ্কর সিংয়ের মত নয়। এমন কি আপনার গলার আওয়াজ পর্যন্ত হুবহু তাঁর মত। সৃষ্টির এ যেন এক অদ্ভুত প্রহেলিকা! অন্তত তখন আমার তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু আপনাদের এই ঘরে ঢুকে আমার মনে হচ্ছে যেন সে প্রহেলিকার উত্তর পেয়েছি।' বলিয়া তিনি দেয়ালে লম্বিত কালীশঙ্করের ছবিখানার দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলেন।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর দুই ভায়ের বুক হইতে বহুক্ষণের নিরুদ্ধ নিশ্বাস সশব্দে বাহির হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অনুমতি

'তারপর?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'যখন সত্যই বুঝতে পারলাম ইনি শঙ্কর সিং নয়, তখন মন নিরাশায় ভরে গেল। শঙ্কর সিংকে ধরেছি মনে করে যেমন আনন্দ হয়েছিল, ঠিক অনুরূপ বিষাদে বুক অন্ধকার হয়ে গেল। সাতদিনের মধ্যে সারা ভারতবর্ষ খুঁজে একটি লোককে ধরবার চেষ্টা যে আমার কত বড় পাগলামি তা বুঝতে পারলাম। সত্যিই তো! শঙ্কর সিং যদি কলকাতায় না এসে দিল্লী কিম্বা বোম্বাই গিয়ে থাকেন? যদি তিনি অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত কোনো স্থানে লুকিয়ে থাকেন—তাহলে তাঁকে ধরব কি করে? তিনি যে কলকাতায় এসেছেন এ খবর মিথ্যাও তো হতে পারে!

'কিন্তু এ কয়দিনের মধ্যে যদি কুমারকে খুঁজে না পাই তাহলে উপায়? হঠাৎ একটা চিন্তা আমার মাথায় খেলে গেল। কুমারকে যতদিন না পাই ততদিন আর কোনো লোককে শঙ্কর সিং সাজিয়ে কি কাজ চলে না? এই যে বাঙ্গালী যুবাপুরুষটি তলোয়ার খেলছেন এ'কে যদি—বিদ্যুৎ চমকের মত এই চিন্তা আমার মাথায় জ্বলে উঠল।

'স্থির হয়ে ভাববার জন্য আমি সেক্রেটারী সাহেবের ঘরে এসে বসলাম। তিনি আমার বিচলিত অবস্থা দেখে যত্ন করে বসালেন এবং নানাপ্রকার আলাপে আমাকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বাস্তবিক এই বাবুটির মত প্রকৃত সজ্জন আমি খুব কম দেখেছি।

'আমার মাথায় কিন্তু এই সর্বগ্রাসী চিন্তা আগুনের মত জ্বলতেই লাগল। কি উপায়! কি উপায়! শেষে উদিত সিংয়ের কূটবুদ্ধিই জয়ী হবে! আর আমি রাজার কাজে চুল পাকিয়ে শেষে এই চব্বিশ বছরের ছোঁড়ার কাছে বাজিমাৎ হয়ে মুখে কালি মেখে দেশে ফিরে যাব! দেশে ফিরে গিয়ে মুখ দেখাব কি করে? আর সব সহ্য হবে, কিন্তু উদিত সিং আর ময়ূরবাহনের বাঁকা বিদ্রূপভরা হাসি আমার সহ্য হবে না।

'ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, আমি সেক্রেটারীবাবুর ঘরে বসে ভাবতেই লাগলাম। তিনিও আমায় নিজের চিন্তায় মগ্ন দেখে কাজকর্মে মন দিলেন। তারপর যখন ভেবে আর কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না, এমন সময় ইনি তলোয়ার খেলা শেষ করে অন্যান্য কয়েক-জন লোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

'আর ভাবতে পারলাম না। মনে করলাম, নিয়তির মনে যা আছে তা যখন হবেই এবং ঝিন্দ্ রাজ্যটাকে বাজি ধরে যখন জুয়া খেলতেই বসেছি, তখন একবার ভাল করেই জুয়া খেলব। সর্বস্ব হারানোই যদি ভাগ্যে থাকে তবে খেলার উত্তেজনা থেকে বঞ্চিত হই কেন? না খেললেও তো সেই হারতেই হবে!—সেক্রেটারীবাবুর কাছ থেকে ওঁর ঠিকানা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

'তারপর এখানে এসে যখন এই ছবিখানার ওপর চোখ পড়ল তখন বুঝলাম যে আমি নিয়তির হাতের খেলার পুতুল মাত্র; আমি যদি না আসতাম নিয়তি কান ধরে আমাকে এখানে টেনে আনত। বাবুজি, এ দুনিয়াটা একটা সতরঞ্চের ছক, দেড় শতাব্দী আগে সুদূর মধ্যভারতের এক খেলোয়াড় যে চাল দিয়েছিলেন, আজ তার পাল্টা চাল দেবার জন্যে আপনার ডাক পড়েছে। এ ডাক অমান্য করবার উপায় নেই—এ খেলা খেলতেই হবে। এই নিয়তির বিধান।'

ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী মৌন হইলেন। প্রায় পাঁচমিনিট কাল ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ গৌরীশঙ্কর উচ্চ হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—'আমি রাজী। রাজা হবার সুযোগ জীবনে একবার বই দুবার আসে না, অতএব এ সুযোগ ছাড়া যেতে পারে না। ভগবান যখন রাজকুমারের মত চেহারাটা ভুল করে দিয়ে ফেলেছেন, তখন দিনকতক রাজত্ব করে নেওয়া যাক। দাদা, কি বল?'

শিবশঙ্কর বলিলেন—'না ভেবে-চিন্তে কোনো কথা বলা ঠিক নয়। রাজা হবার বিপদও তো আছে। এই রকম একটা অদ্ভুত প্রস্তাবে খামকা রাজী না হয়ে অগ্রপশ্চাৎ ভেবে দেখা উচিত।'

গৌরী হাসিয়া বলিল—'দাদা, কথাটা নেহাৎ লোলচর্ম বৃদ্ধের মত হল। মূর্তিমান রোমান্স আমাদের বাড়ি বয়ে এসে চেয়ারে আমাদের মুখ চেয়ে বসে আছেন, আর আমরা কিনা অগ্রপশ্চাৎ ভেবে সময় নষ্ট করব?

—'যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে।

তুই যে পারিস কাঁটাগাছের উচ্চ ডালের পরে পুচ্ছ নাচাতে!"

শিবশঙ্কর ঈষৎ অধীর কণ্ঠে বলিলেন—'পুচ্ছ নাচাতে পারলেও সে-কাজটা সব সময় শোভন এবং রুচিসঙ্গত নয়। গৌরী, তুই চুপ করে বস, আমি এ'কে গোটাকয়েক কথা জিজ্ঞাসা করি।' ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'দেখুন, আমার ভাই রাজা-রাজড়ার চালচলন রীতিনীতি কিছু জানেন না, সুতরাং রাজা সাজতে গেলে তাঁর ধরা পড়বার

সম্ভাবনা খুব বেশী।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'সম্ভাবনা একেবারে নেই তা বলতে পারি না; তবে আমি যতক্ষণ সঙ্গে থাকবো ততক্ষণ নেই।'

শিবশঙ্কর বলিলেন—'দ্বিতীয়ত ঝিন্দ্ দেশের প্রচলিত ভাষা ওঁর জানা নেই। এ একটা মস্ত আপত্তি।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'আমরা উপস্থিত যে ভাষায় কথা কইছি, তাই ঝিন্দের প্রচলিত ভাষা; এ ভাষায় আপনার ভাই তো চমৎকার কথা বলেন।'

শিবশঙ্কর বলিলেন—'তা যেন হল। কিন্তু ধরুন, কোনো কারণে আমার ভাই যদি জাল-রাজা বলে ধরা পড়েন, তখন তো তাঁর বিপদ হতে পারে।'

ধনঞ্জয় ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন—'বিপদের আশঙ্কা আছে অবশ্যই। কিন্তু বাবু-সাব, বিপদের ভয়ে যদি চুপ করে বসে থাকতে হয় তাহলে তো কোন কাজই করা চলে না।'

শিবশঙ্কর পুনশ্চ বলিলেন—'প্রাণের আশঙ্কাও থাকতে পারে?'

ধনঞ্জয় ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে কহিলেন—'তা থাকতে পারে বই কি।'

'আমি আমার ভাইকে যেতে দিতে পারি না।'

ধনঞ্জয় আস্তে আস্তে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ওষ্ঠাধর বিদ্রূপের হাসিতে বাঁকা হইয়া উঠিল; বলিলেন—'তবে কি বুঝব বাঙ্গালী জাতটা সত্যই ভীরু! এ নিন্দা আমি অনেকের মুখে শুনেছি বটে কিন্তু এতদিন বিশ্বাস করিনি।'

শিবশঙ্করের মুখ লাল হইয়া উঠিল, বলিলেন—'সখ করে পরের বিপদ ঘাড়ে না নেওয়া ভীরুতা নয়।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'সব বিপদ থেকে নিজের প্রাণটুকু সাবধানে বাঁচিয়ে চলা সুবুদ্ধির কাজ হতে পারে, সাহসের কাজ নয় বাবুজি।'

শিবশঙ্কর বলিলেন—'আমি তর্ক করতে চাই না। আপনার এ প্রস্তাবে আমার মত নেই।'

ধনঞ্জয় গৌরীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনারও কি এই মত?'

গৌরী মিনতির চক্ষে একবার দাদার দিকে চাহিল—কোনো উত্তর দিল না।

ধনঞ্জয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'অন্য কোনো প্রদেশের—মারাঠী কি গুজরাটী যুবককে যদি এ প্রস্তাব করতাম, সে এক মুহূর্ত বিলম্ব করত না। আর আপনারা দেওয়ান কালীশঙ্করের বংশধর! যাক—আমার আর কিছু বলবার নেই।'

শিবশঙ্কর উঠিয়া ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিলেন। তারপর ফিরিয়া আসিয়া ধনঞ্জয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—'আমাদের পূর্বপুরুষ কালীশঙ্করের সম্বন্ধে আপনি অনেক কথা জানেন এই ইঙ্গিত কয়েকবার করেছেন। শেষ বয়সে তিনি খুন হয়েছিলেন এ খবর আপনার জানা আছে কি?'

'খুন হয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে আপনারই দেশের কোনো লোক তাঁকে খুন করিয়েছিল।'

'তার কোনো প্রমাণ আছে কি?'

'প্রমাণ কিছু নেই। শুধু একখানা ছোরা আছে—যা দিয়ে তাঁকে খুন করা হয়েছিল।'

'শুধু একখানা ছোরা?'

'হ্যাঁ।'

'ছোরাখানা একবার দেখতে পারি কি?'

চাবি দিয়া টেবিলের দেরাজ খুলিয়া শিবশঙ্কর একটা গহনার বাক্সের মত চ্যাপ্টা ধরনের মখমলের বাক্স বাহির করিলেন। তারপর সেটা খুলিয়া মখমলের খাঁজকাটা আসনের উপর হইতে সাবধানে ছুরিখানা তুলিয়া ধনঞ্জয়ের হাতে দিলেন। ঝক্‌ঝকে ধারালো প্রায় পনের ইঞ্চি লম্বা ভোজালীর মত ঈষৎ বাঁকা বিচিত্র গঠনের ছুরি—কোথাও মলিনতা বা

মরিচার একটু চিহ্ন নাই। সোনার মুঠ এবং ইস্পাতের ফলা যেন বিদ্যুতের আলোয় হাসিয়া উঠিল।

ধনঞ্জয় গভীর মনঃসংযোগে ছোরাখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার লোহার মত মুখ যেন আরো কঠিন হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে গলাটা পরিষ্কার করিয়া তিনি নিম্নস্বরে বলিলেন—'এতদিনে কালীশঙ্করের জীবনের ইতিহাস আমার কাছে সম্পূর্ণ হল। এই উপসংহারটুকুই আমি জানতাম না বাবুজি।'

তারপর ছোরাখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—'এ ছোরা কার জানেন? ঝিন্দ্ রাজবংশের। বংশের আদিপুরুষ স্মরজিৎ সিংহের আমল থেকে এ ছুরি রাজবংশের দণ্ড মুকুটের মত মহামূল্য সম্পত্তি বলে চলে আসছিল। তারপর হঠাৎ শতবর্ষ পূর্বে ছুরিখানা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এ ছুরি যে আপনার বংশে এসে আশ্রয় নিয়েছে তা বোধ হয় একজন ছাড়া আর কেউ জানত না। ছুরির মুঠের উপর কতকগুলি অক্ষর খোদাই করা আছে—পড়তে পারেন কি?'

শিবশঙ্কর বলিলেন—'না, আমি অনেক চেষ্টা করেও পড়তে পারিনি।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'এ অক্ষরগুলি প্রাচীন সৌরসেনী ভাষায় লেখা। এর অর্থ হচ্ছে—যে আমার বংশে কলঙ্কারোপ করবে এই ছুরি তার জন্য।'

শিবশঙ্কর ছুরিখানা নিজের হাতে লইয়া লেখাগুলি পরীক্ষা করিতে করিতে অন্যমনস্কে বলিলেন—'হতেও পারে—হতেও পারে। তারপর?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'তারপর আর কিছু নেই। এই ছুরি একদিন যে রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছিল, সেই রক্ত আপনাদের শরীরে বইছে। সেই রক্ত আজ আপনাদের ডাকছে ঝিন্দে যাবার জন্য। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না? আশ্চর্য!'

গৌরীশঙ্কর বলিয়া উঠিল—'আমি শুনতে পাচ্ছি।—দাদা, অনুমতি দাও আমি যাব।'

শিবশঙ্কর অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলেন—'কিন্তু—কিন্তু—অজানা দেশ—কতরকম বিপদ—'

গৌরী বলিল—'আমি ছেলেমানুষ নই। তুমি মন খুলে অনুমতি দাও, কোনো বিপদ হবে না।'

শিবশঙ্কর বলিলেন—'তা না হয়—কিন্তু—'

ধনঞ্জয়ের মুখের বাঁকা বিদ্রূপ আরও ক্ষুরধার হইয়া উঠিল। গৌরী ছুরিখানা টেব্‌লের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল—'দাদা, ফের যদি সর্দার আমাদের ভীরু বলবার অবকাশ পায়, তাহলে এই ছুরি দিয়ে আমি একটা বিশ্রী কাণ্ড করে ফেলব। বারবার ভীরু অপবাদ আমার সহ্য হবে না।'

শিবশঙ্কর চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—'আচ্ছা যা—আমি অনুমতি দিলাম!' তারপর ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'দেখুন, আমরা এই বাঙালী জাতটা, যতক্ষণ মাথা ঠাণ্ডা থাকে ততক্ষণ সহজে ঘর থেকে বার হই না—পাছে রাস্তায় কুকুরে কামড়ায় কিম্বা গাড়ি চাপা পড়ি; কিন্তু একবার রক্ত গরম হলে আর রক্ষে নেই, তখন একলাফে একেবারে দুঃসাহসিকতার চরম সীমায় পৌঁছে যাই।' ছুরিখানা গৌরীর হাত হইতে লইয়া বলিলেন—'এর ওপর ঝিন্দের রাজার আর কোনো অধিকার নেই। রক্তের দাম দিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষ একে কিনে নিয়েছেন; এ ছুরি আমাদের বংশের। সুতরাং আমি এ ছুরি হাতে নিয়ে বলতে পারি—যে আমার বংশে কলঙ্কারোপ করবে, এ ছুরি তার জন্য। সাবধান সর্দার ধনঞ্জয়! ভীরু বলে যেন আমার বংশে কলঙ্কারোপ করবেন না।' বলিয়া সহাস্যে ধনঞ্জয়ের মুখের দিকে চাহিলেন।

ধনঞ্জয় দ্রুত আসিয়া দুই হাতে দুই ভায়ের হাত ধরিলেন, উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিলেন—'আমি জানতাম—আমি জানতাম বাবুজি। কালীশঙ্কর রাওয়ের বংশধর কখনো ভীরু হতে পারে না।'

রাত্রে আহারাদির পর দুই ভাই এবং অচলা পুনরায় লাইব্রেরী ঘরে আসিয়া বসিলেন। গৌরী এবং শিবশঙ্কর দুইজনেই অন্যমনস্ক—অনেকক্ষণ কোনো কথা হইল না। শেষে অচলা বলিল—'কি হল তোমাদের? মুখে একটি কথা নেই—এত ভাবছ কি?'

শিবশঙ্কর চেয়ারে নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিলেন—'গৌরী কাল বিদেশে যাচ্ছে।'

অচলা বলিল—'কৈ আগে তো কিছু শুনিনি, কখন ঠিক করলে?'

গৌরী বলিল—'আজই। আবার কিছুদিন ঘুরে আসা যাক্ বৌদি।'

অচলা বলিল—'সত্যিই ঘটকের ভয়ে পালাচ্ছ নাকি ঠাকুরপো?'

গৌরী হাসিয়া বলিল—'না গো না। এবার দেখো না, তুমি যা চাও তাই একটা ধরে নিয়ে আসব। আর তা যদি নিতান্তই না পারি, অন্তত নিজে সশরীরে ফিরে আসবই।'

অচলা শঙ্কিত হইয়া বলিল—'ও কি কথা ঠাকুরপো! কোথায় যাচ্ছ ঠিক করে বল।'

গৌরী বলিল—'বলবার উপায় নেই বৌদি—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ফিরে এসে যদি পারি বলব। ততদিন আমাদের ঘরের অচলা লক্ষ্মীটির মত ধৈর্য ধরে থেকো।'

অচলার চোখে জল আসিয়া পড়িল, সে চোখ মুছিয়া বলিল—'কি কাজে যাচ্ছ তুমিই জান; আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে তোমাদের কথা শুনে।'

গৌরী বলিল—'এই দেখ! একেবারে কান্না? এই জন্যই শাস্ত্রে বলেছে—'নারী নদীবৎ' —স্রেফ জল। তোমাদের নিংড়োলে কতখানি করে জল বেরোয় বল তো বৌদি?'

অচলা উত্তর দিল না। গৌরীর জোর করিয়া পরিহাসের চেষ্টা অন্য দুইজনের আশঙ্কা-ভারাক্রান্ত মনে কোথাও আশ্রয় না পাইয়া যেন ঘরের আবহাওয়াকে আরও মুহ্যমান করিয়া তুলিল।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শিবশঙ্কর বলিলেন—'রাত হল, গৌরী, শুগে যা। কালীশঙ্করের ইতহাস যদি কিছু পাস্—নোট করে নিস্।—আর এই ছুরিখানাও তুই সঙ্গে রাখ।' বলিয়া দেরাজ হইতে আবার ছোরাটা বাহির করিয়া গৌরীর হাতে দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আলু পৌঁছিল

ছোট লাইনের রেলপথ বৃটিশ রাজ্যের সদর স্টেশন ছাড়িয়া প্রায় ত্রিশ মাইল পার্বত্য চড়াই ঘুরিতে ঘুরিতে উঠিয়া যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখান হইতে ঝিন্দ্ রাজ্যের আরম্ভ। এই ছোট লাইনের ছোট ছোট গাড়িগুলি পাহাড়ী পথে কখনো হাঁপাইতে হাঁপাইতে, কখনো বাঁশীর আর্তস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বহির্জগতের যাত্রীগুলিকে ঝিন্দের তোরণদ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া যায়। এই ত্রিশ মাইলের মধ্যে কেবল আর

একটি স্টেশন আছে—সেটি ঝড়োয়া স্টেশন। ঝিন্দ্-ঝড়োয়ার গিরিসংকটে প্রবেশের উহা দ্বিতীয় দ্বার। এই দুই স্টেশনে নামিয়া যাত্রীদের হাঁটা পথ ধরিতে হয়। ঝিন্দ্-ঝড়োয়া রাজ্যের মধ্যে এখনো রেল প্রবেশ করে নাই।

উত্তুঙ্গ পাহাড়ের কোলের কাছে ছোট সুদৃশ্য ঝিন্দ্ স্টেশনটি নিতান্তই খেলাঘরের স্টেশন বলিয়া মনে হয়। কারণ এইখান হইতে অভ্রভেদী পর্বতের শ্রেণী শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ তুলিয়া আকাশের একটা দিক একেবারে আড়াল করিয়া দিয়াছে। উহারই অভ্যন্তরে, মালার ভিতর নারিকেলের শস্যের ন্যায় ঝিন্দ্-ঝড়োয়া রাজ্য লুকাইয়া আছে। স্টেশনের সম্মুখ হইতে একটা অনতিপ্রশস্ত পথ পাহাড়ের উপর উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাড়োয়ারীর পাগড়ির মত সরু পথ পর্বতের বিরাট মস্তক বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। সে পথে ঘোড়া কিম্বা মানুষ-টানা রিক্শ চলিতে পারে, কিন্তু অন্য কোনো প্রকার যান-বাহনের চলাচল অসম্ভব।

স্টেশনের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র টেলিগ্রাফ অফিস, সেখান হইতে টেলিগ্রাফ তারের একটা প্রান্ত পাহাড়ের ভিতর দিয়া ঝিন্দের দিকে গিয়াছে। স্টেশনের কাছে দুইটি দোকান, একটি সরাইখানা—শহর বাজার কিছুই নাই। দিনে রাত্রে দুইবার ট্রেন আসে, সেই সময় যা-কিছু যাত্রীর ভিড়। অন্য সময় স্থানটি নিঝুমভাবে নিশ্চিন্ত মনে ঝিমাইতে থাকে।

দ্বিপ্রহরের কিছু পরে ঝিন্দ্ স্টেশনের স্টেশনমাস্টার প্ল্যাটফর্মের উপর রৌদ্রে চারপাই বিছাইয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিলেন, দূর হইতে ট্রেনের বাঁশীর শব্দে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি তখন ধীরে-সুস্থে গাত্রোত্থান করিয়া কুলী ডাকিয়া সিগ্নাল ফেলিবার হুকুম দিলেন; আর একজন কুলীকে চারপাইখানা সরাইয়া ফেলিতে বলিলেন। তারপর চোখে চশমা ও মাথায় টুপি আঁটিয়া গম্ভীরভাবে কঙ্করাকীর্ণ প্ল্যাটফর্মের উপর পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

লোহালক্কড়ের ঝন্ ঝন্ ঝড়্ ঝড়্ শব্দে, ইঞ্জিনের পরিশ্রান্ত ফোঁস ফোঁস আওয়াজ এবং বাঁশীর গগনভেদী চীৎকারে শব্দজগতে বিষম হুলস্থূল বাধাইয়া ট্রেন আসিয়া পড়িল। গাড়ি থামিলেই গুটিকয়েক আরোহী মন্থরভাবে মোটঘাট লইয়া গাড়ি হইতে অবতরণ করিল। অধিকাংশই মোসাফির, তাহার মধ্যে দু'একজন ভদ্রলোকশ্রেণীভুক্ত—দেখিলে মনে হয় ঝিন্দে বেড়াইতে আসিয়াছে। সম্প্রতি রাজ-অভিষেক উপলক্ষে আবার একটা কিছু কাণ্ড ঘটিতে পারে এই আশায় সংবাদপত্রের একজন রিপোর্টারও সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য এই ট্রেনে আসিয়াছে।

স্টেশনমাস্টার মহাশয় অবিচলিত গাম্ভীর্যের সহিত যাত্রীদের টিকিট গ্রহণ করিলেন, তারপর প্ল্যাটফর্মের ফটক বন্ধ করিয়া নিজের ঘরে আসিয়া বসিলেন। স্টেশনমাস্টারের নাম স্বরূপদাস; লোকটির বয়স হইয়াছে; গত বিশ বৎসর তিনি এই ঝিন্দের সিংহদ্বারে প্রহরীর কাজ করিতেছেন। বাহিরের লোক যে কেবল তাঁহার কৃপায় ঝিন্দে প্রবেশ-লাভ করিতে পারে একথা সর্বদা তাঁহার মনে জাগরূক থাকে। তাই নিজের পদমর্যাদা স্মরণ করিয়া আগন্তুক যাত্রীদের সম্মুখে তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া থাকেন। স্পর্ধারত কেহ যাত্রী কখনো কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সগর্ব বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া উত্তর না দিয়াই অবজ্ঞাভরে আবার নিজের কাজে মনঃসংযোগ করেন।

ঘরে বসিয়া স্বরূপদাস দৈনিক হিসাব প্রায় শেষ করিয়াছেন এমন সময় দ্বারের নিকট হইতে শব্দ আসিল—'স্টেশনমাস্টার, এখনি আমার দুটো ভালো ঘোড়া চাই।'

ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া মুখ তুলিতেই স্টেশনমাস্টার একেবারে কাঠ হইয়া গেলেন। দেখিলেন দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া—সর্দার ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী। প্রকাণ্ড পাগড়ি তাঁহার সুকৃষ্ণ মুখের উপর ছায়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু কানের রুবি দুইটা খরগোসের চোখের মত জ্বলিতেছে। স্বরূপদাস দাঁড়াইয়া উঠিয়া ফৌজী প্রথায় সেলাম করিল। মুখ দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না।

ধনঞ্জয় ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিলেন—'শুনতে পাচ্ছ? এখনি দুটো ভাল ঘোড়া আমার

চাই। ঝিন্দে যেতে হবে।'

'যো হুকুম!' বলিয়া আর একবার সেলাম করিয়া প্রায় দৌড়িতে দৌড়িতে স্বরূপদাস বাহির হইয়া গেল।

মিনিট দশেক পরে ফিরিয়া আসিয়া সে খবর দিল যে, সৌভাগ্যবশত দুইটা ঘোড়া পাওয়া গিয়াছে—জিন্ চড়াইয়া মোসাফিরখানার ফটকের কাছে প্রস্তুত রাখা হইয়াছে, এখন সর্দার মর্জি করিলেই হয়।

সর্দার একখানা দশটাকার নোট তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—'গোলমাল ক'রো না। তোমার ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ কর। উঁকি মেরো না—বুঝলে? যাও।'

নোটখানা কুড়াইয়া লইয়া স্বরূপদাস সবিনয়ে নিজের ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সর্দার ধনঞ্জয় এখন একবার প্ল্যাটফর্মের চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন—কেহ কোথাও নাই। কুলি দুইটা চলিয়া গিয়াছে—পরদিন সকালের আগে ট্রেন ছাড়িবে না, কাজেই তাহাদের ছুটি। আগত ট্রেনের গার্ড, ড্রাইভার, ফায়ারম্যানেরা বোধ করি ক্লান্তি বিনোদনের জন্য সরাইখানায় ঢুকিয়াছে। পরিত্যক্ত গাড়িখানা নিষ্প্রাণভাবে লাইনের উপর পড়িয়া আছে। সর্দার ধনঞ্জয় একখানা প্রথম শ্রেণীর গাড়ির সম্মুখে গিয়া ডাকিলেন—'বেরিয়ে আসুন—রাস্তা সাফ।'

একজন সাহেববেশধারী লোক গাড়ি হইতে নামিলেন। মাথায় ফেল্টের টুপি মুখের ঊর্ধ্বাংশ প্রায় ঢাকিয়া দিয়াছে, ওভারকোটের উল্টানো কলারের আড়ালে মুখের অধোভাগ ঢাকা। এই দু'য়ের মধ্য হইতে কেবল নাকের ডগাটুকু জাগিয়া আছে।

দুইজনে নীরবে স্টেশনের ফটক পর্যন্ত গেলেন। তারপর ধনঞ্জয় বলিলেন—'একটু দাঁড়ান—আমি আসছি!'

ফিরিয়া স্টেশনমাস্টারের ঘর পর্যন্ত আসিয়া ধনঞ্জয় দ্বার ঠেলিয়া দেখিলেন বন্ধ। জিজ্ঞাসা করিলেন—'মাস্টার ঘরে আছ?'

ভিতর হইতে শব্দ হইল—'হুজুর!'

'উঁকি মারোনি তো?'

'জী নাহি।'

'আবার হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, যদি কিছু বুঝে থাকো কারুর কাছে উচ্চারণ ক'রো না। উচ্চারণ করলে গর্দানা নিয়ে মুস্কিলে পড়বে। বুঝেছ?'

ভীতকণ্ঠে জবাব আসিল—'হুজুর।'

মৃদু হাসিয়া ধনঞ্জয় ফিরিয়া গেলেন। সরাইখানার সম্মুখে দুইজনে দুই ঘোড়ায় চড়িয়া পার্বত্য পথ ধরিয়া উঠিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর ধনঞ্জয় সঙ্গীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'এতদূর পর্যন্ত তো নিরাপদে আসা গেছে—মাঝে আঠারো মাইল বাকী—আজ রাত্রে যদি আপনাকে রাজমহলের মধ্যে পুরতে পারি—তারপরে ব্যস্। স্টেশনমাস্টারকে খুব ধমকে দিয়েছি—সে যদি বা কিছু সন্দেহ করে থাকে—ভয়ে প্রকাশ করবে না।'

ধনঞ্জয় যদি সঞ্জয়ের মত দূরদর্শী হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, তাঁহারা পর্বতের আড়ালে অন্তর্হিত হইলে পর স্টেশনমাস্টার আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইল। তারপর সাবধানে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা দৌড়িতে আরম্ভ করিল। টেলিগ্রাফ অফিসে পৌঁছিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—'বৃজ্‌লাল, জলদি, জলদি, একটা ফর্ম দাও তো। জরুরী তার পাঠাতে হবে।'

বৃজ্‌লাল একহাতে কল নাড়িতে নাড়িতে অন্য হাতে একটা ফর্ম দিল। মাস্টার কিছুক্ষণ ভাবিয়া তাহাতে লিখিল—

আলু পৌঁছিয়াছে, সঙ্গে একটি অন্য মাল আছে চেনা গেল না। ঘোড়ার পিঠে ঝিন্দ্ রওনা হইল।

এই লিখিয়া নিজের নাম সহি করিয়া টেলিগ্রামটি রাজধানীর এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী

পুরুষোত্তমদাসের নামে পাঠাইয়া দিল।

তারপর নিজের গর্দানার কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কালো ঘোড়ার সওয়ার

আলু এবং অজ্ঞাত মালটি উপরে উঠিতেছেন।

যত উপরে উঠিতেছেন, শীতের সায়াহ্নে পারিপার্শ্বিক দৃশ্য ততই সুন্দর ও বিচিত্র হইয়া উঠিতেছে। পথের একধারে খাড়া পাহাড় ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে, অন্যধারে তেমনি খাড়া খাদ কোন্ অতলে নামিয়া গিয়াছে। মধ্যে সংকীর্ণ ঢালু পথ দেওয়ালের গায়ে কার্নিশের মত যেন কোনক্রমে নিজেকে পাহাড়ের অঙ্গে জুড়িয়া রাখিয়াছে। পথ কোথাও সিধা নয়, কেবলি ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, কোথাও সাপের মত কুণ্ডলী পাকাইতেছে। চারিদিকে দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী দুইজন চলিতে লাগিলেন।

পাহাড়ের গা কোথাও বনজঙ্গলে ঢাকা, কোথাও বা কর্কশ উলঙ্গ। পথের যে-ধারটায় পাহাড়, সেই ধারে স্থানে স্থানে পাথর ফাটিয়া জল বাহির হইতেছে। কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ জল—রাস্তার উপর দিয়া বহিয়া গিয়া নীচের খাদে ঝরিয়া পড়িতেছে। কোথাও বন্য ফলের গাছ সারা অঙ্গে রাঙা রাঙা ফল লইয়া পথের উপর প্রায় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ঘোড়ার রেকাবে উঁচু হইয়া দাঁড়াইলে হাত বাড়াইয়া ফল পাড়া যায়! একবার ঊর্ধ্বে গাছপালার মধ্যে একটা ময়ূরের গায়ে সূর্যকিরণ পড়িয়া ঝকমক করিয়া উঠিল। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে সচকিত হইয়া ময়ূরটা ঘাড় বাঁকাইয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল, তারপর সজোরে দুইবার কেকাধ্বনি করিয়া দ্রুতপদে পাহাড়ের ফাঁকে গিয়া লুকাইল। তাহার উচ্চ কেকারবের প্রতিধ্বনি পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া বারবার ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

আর একবার একটা মোড় ফিরিতেই ভীষণ গম্‌গম্ শব্দে চমকিত হইয়া গৌরীশঙ্কর দেখিল, দূরে পাহাড়ের একটা রন্ধ্র বহিয়া প্রকাণ্ড একটা ঝর্ণা নির্ঝরশীকরে চারিদিক বাষ্পাচ্ছন্ন করিয়া গভীর খাদে গিয়া পড়িতেছে। অস্তমান সূর্যকিরণে সেটাকে সোনালী জরি-মোড়া অপ্সরীর দোদুল্যমান বেণীর মত দেখাইতেছে।

মাথার টুপিটা খুলিয়া ফেলিয়া উৎফুল্লনেত্রে ঝর্ণা দেখিতে দেখিতে গৌরী বলিল—'সর্দার, তোমাদের রাজ্য রাজা হবার মত দেশ বটে। কুমারসম্ভব পড়েছ?—

ভাগীরথীনির্ঝরশীকরাণাং
বোঢ়া মুহুঃকম্পিতদেবদারুঃ
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ
রাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ!'

গদ্যপ্রকৃতি ধনঞ্জয় বলিলেন—'টুপিটা একেবারে খুলে ফেললেন যে! শেষে তীরে এসে তরী ডোবাবেন? টুপি পরুন।'

গৌরী সহাস্যে বলিল—'তা না হয় পরছি। কিন্তু লোক কৈ? এতটা রাস্তা এলুম কোথাও একটা জনমানব নেই। একটু জোরে ঘোড়া চালালে হয় না?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'না, ট্রেনের যাত্রীরা সব এগিয়ে আছে, তারা এগিয়েই থাক। অন্ধকার হোক—তখন জোরে চালালেই হবে।'

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'আগাগোড়াই কি চড়াই উঠ্‌তে হবে? তোমাদের রাজ্যটা কি পাহাড়ের টঙের ওপর?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'না, আরো মাইল সাত-আট উঠ্‌তে হবে। 'শিরপেঁচ' সরাইয়ের পর থেকে উৎরাই আরম্ভ। তবে যতটা উঠ্‌তে হবে ততটা নামতে হবে না। ঝিন্দ্‌-ঝড়োয়ার গড়ন অনেকটা কানা-উঁচু কাঠের পরাতের মত। আমরা এখন বাইরে থেকে পিঁপড়ের মত তার কানা বেয়ে উঠ্‌ছি, 'শিরপেঁচ' সরাই পার হয়ে আবার কানা বেয়ে নেমে তবে ঝিন্দের সরজমিনে গিয়ে পোঁছুতে হবে।'

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা, ও ঝর্ণাটার নাম কি? এতবড় ঝর্ণা আমি আর কোথাও দেখিনি।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'ওটা সামান্য পাহাড়ে ঝর্ণা নয়, আমাদের দেশের যে প্রধান নদী, সেই কিস্তা এখানে ঝর্ণা হয়ে রাজ্য থেকে ঝরে পড়েছে। কিস্তার উৎপত্তি রাজ্যের অন্য প্রান্তে, সেখান থেকে বেরিয়ে রাজ্যের বুক চিরে এসে এইখানেই চঞ্চলা অপ্সরীদের মত সে পাহাড়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।'

গৌরী হাসিয়া বলিল—'বাহবা সর্দার, তোমার প্রাণেও পদ্য এসে পড়েছে দেখছি। তবে আর ভাবনা নেই। আচ্ছা, ঝিন্দ্‌ সী-লেভ্‌ল থেকে কত উঁচু বলতে পারো?'

'চার হাজার ফুটের কিছু কম, তবে চারধারের পাহাড়গুলো আরো উঁচু। ঐ দেখুন না।'—ধনঞ্জয়ের অঙ্গুলি নির্দেশ অনুসরণ করিয়া গৌরী দেখিল, আরো কিছুদূর উপর হইতে পাইনের গাছ আরম্ভ হইয়াছে। সরু লম্বা গাছগুলি যেন সারবন্দী হইয়া অদৃশ্য রেখার ঊর্ধ্বে জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ক্রমে সূর্য বাঁ-দিকের নিম্নভূমির পরপারে অস্ত যাইবার উপক্রম করিল। খাদের অন্ধকারের ভিতর হইতে শৃগালের ডাক শুনা যাইতে লাগিল। উপরে তখনো দিন রহিয়াছে কিন্তু নিম্নের উপত্যকায় রাত্রি নামিয়াছে। দুইজনে নিঃশব্দে চলিতে লাগিলেন।

সহসা সম্মুখে দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনি হইল। ধনঞ্জয় চকিত হইয়া ঘোড়ার উপর সোজা হইয়া বসিলেন, গৌরী টুপিটা তাড়াতাড়ি চোখের উপর টানিয়া দিল। সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ গজ আগে রাস্তার একটা মোড় ছিল, দেখিলে মনে হয় যেন পথ ঐ পর্যন্ত গিয়া হঠাৎ অতলস্পর্শ খাদের সম্মুখে থামিয়া গিয়াছে। ক্ষুরধ্বনি দ্রুত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেই বাঁকের মুখ তীরবেগে ঘুরিয়া একজন অশ্বারোহী দেখা দিল। সূর্য তখনো অস্ত যায় নাই, তাহার শেষ রশ্মি সওয়ারের উপর পড়িল। কুচকুচে কালো ঘোড়া—মুখ ও লাগাম ফেনায় সাদা হইয়া গিয়াছে—আর তাহার পিঠে ঝুঁকিয়া বসিয়া আরোহী নির্দয়-ভাবে তাহার উপর কশা চালাইতেছে।

ধনঞ্জয়ের দাঁতের ভিতর হইতে চাপা আওয়াজ বাহির হইল—'ময়ূরবাহন! কি আপদ! পথ ছেড়ে দিন, পথ ছেড়ে দিন, বেরিয়ে যাক।' বলিয়া বাঁ-হাতে নিজের মুখের উপর রুমাল চাপিয়া ধরিলেন।

রাস্তা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে কালো ঘোড়ার সওয়ার প্রচন্ডবেগে তাহাদের উপর আসিয়া পড়িল। বোধ করি আর এক মুহূর্তে সে ঝড়ের মত বাহির হইয়া যাইত কিন্তু হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পথের ধারে দুইটি অশ্বারোহীর উপর পড়িতেই সে দু'হাতে রাশ টানিয়া ধরিল—ঘোড়াটা সম্মুখের দুই পা তুলিয়া সম্পূর্ণ একটা পাক খাইয়া এই দুর্বার গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে ময়ূরবাহনের উচ্চকণ্ঠের হাস্যধ্বনি

পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি তুলিল। হাসি থামিলে সে বলিল—'আরে কে ও? সর্দার ধনঞ্জয় নাকি? 'বনে বনে ঢুঁঢ়ি এ বধূয়া কাঁহা গ'য়ি'—তোমার বিরহে আমরা সবাই ভয়ঙ্কর হেদিয়ে উঠেছিলাম যে সর্দার! এতদিন ছিলে কোথায়?'

'সে খবরে তোমার দরকার নেই।' বলিয়া ধনঞ্জয় চলিবার উপক্রম করিলেন; কিন্তু তাঁহার ঘোড়া পা বাড়াইবার পূর্বেই ময়ূরবাহনের ঘোড়া আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

'বলি চল্‌লে যে! একটু দাঁড়াও না ছাই। সফর থেকে আসছ, দুটো কথাও কি বন্ধুলোকের সঙ্গে কইতে নেই?—সঙ্গে ওটি কে?' ময়ূরবাহন কথা কহিতেছিল বটে কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গৌরীশঙ্করের উপর নিবদ্ধ ছিল—'কৌতূহল ভীষণ বেড়ে যাচ্ছে। আপাদমস্তক ঢাকা ছদ্মবেশী মানুষটি কে? কোন্ জাতীয়? বলি স্ত্রীজাতীয় নয় তো? —অ্যাঁ সর্দার! বৃদ্ধ বয়সে তোমার এ কি রোগ? হায় হায়! অসৎ সঙ্গে পড়ে মানুষের কি সর্বনাশই নয়। শঙ্কর সিং শেষে তোমার চরিত্রেও ঘুণ ধরিয়ে দিলে!' বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিতভাবে ঘাড় নাড়িল।

'পথ ছাড়ো।' বলিয়া ধনঞ্জয় অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ময়ূরবাহন নড়িল না, রক্তের মত রাঙা দুই ঠোঁটের ভিতর হইতে দাঁত বাহির করিয়া বলিল—'তা কি হয় সর্দার! তুমি একটা আদমের কালের বুড়ো, এই ছুকরিকে নিয়ে পালাবে—আর আমি জোয়ান মর্দ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে তাই দেখব? এ হতেই পারে না—বিলকুল নামঞ্জুর!'

'পথ ছাড়বে না?'

'ছাড়বো বই কি, কিন্তু তার আগে তোমার পিয়ারীকে একবার দর্শন—' বলিয়া গৌরীর দিকে অগ্রসর হইল।

'ব্যস্! খবরদার!' ময়ূরবাহন ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল ধনঞ্জয়ের হাতে একটা ভীষণ-দর্শন কালো রিভলবার নিশ্চলভাবে তাহার বুকের দিকে লক্ষ্য করিয়া আছে।

ময়ূরবাহন দাঁড়াইয়া পড়িল, তাহার মুখখানা ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া হাসিয়া উঠিল, সহজ স্বরে বলিল—'খামোশ্। আজ জিতে গেলে সর্দার। তোমার পিয়ারী নাজ্‌নির চাঁদমুখ দেখবার বড়ই আগ্রহ হয়েছিল—তা থাক, আর এক সময়ে হবে।—ভাল কথা, তোমার শঙ্কর সিং ভাল আছে তো? অভিষেক ঠিক সময়ে হচ্ছে তো? এবার কিন্তু অভিষেক পিছিয়ে গেলে আমরা সবাই ভারি দুঃখিত হব তা বলে দিচ্ছি। খুব সাবধানে তাকে আটকে রেখো——আবার না পালায়। আচ্ছা, এক কাজ করলে তো পারো। শঙ্কর সিং যখন পরের এঁটো খেতে এত ভালবাসে তখন কতকগুলি বিয়াহি আওরাৎ ধরে এনে তার মহলে পুরে রেখে দাও না! তাহলে শঙ্কর সিং আর কোথাও যাবে না। আর ভেবে দেখ, রাজা হলেই তো আবার ঝড়োয়ার কুমারীকে বিয়ে করতে হবে; ও সোঁদা ফুল শঙ্কর সিংয়ের ভাল লাগবে না, তার চেয়ে—'

ধনঞ্জয়ের দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল—'চোপরও অসভ্য কুত্তা! ফের যদি ও নাম মুখে এনেছিস, গুলি করে তোর খুলি উড়িয়ে দেব।'

'ফুঃ!' তাচ্ছিল্যভরে ময়ূরবাহন ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া লইল, তারপর ঘাড় বাঁকাইয়া ধনঞ্জয়ের দিকে 'বেনিয়া বান্দার বাচ্চা!' এই কথাগুলো নিক্ষেপ করিয়া ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারিয়া বৈশাখী ঘূর্ণির মত নিম্নাভিমুখে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে কালো ঘোড়ার সওয়ার মিলাইয়া গেলে ধনঞ্জয় রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিলেন। বিকৃতকণ্ঠে কহিলেন—'বেয়াদব শয়তান!'

গৌরী টুপি খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'লোকটা কে সর্দার?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'উদিত সিংয়ের ইয়ার, আর তার শনি। উদিতের চেয়েও বদমায়েস যদি কেউ থাকে তো ঐ ময়ূরবাহন।'

গৌরী বলিল—'কিন্তু যাই বল, চেহারাখানা সত্যিই ময়ূরবাহনের মত। কি নাক কি মুখ কি চোখ! আর অদ্ভুত ঘোড়সওয়ার!'

ধনঞ্জয় কতকটা নিজ মনেই বলিলেন—'ইচ্ছে হয়েছিল শেষ করে দিই। কেন যে দিলাম না তাও জানি না। যাক, আর দেরি করে কাজ নেই—রাত্রি হয়ে গেছে। এখনো প্রায় অর্ধেক পথ বাকি। দুপুর রাত্রির মধ্যে সিংগড়ে পৌঁছুনো চাই।'

কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'ঝড়োয়ার কুমারীর সঙ্গে বিয়ের কথা কি বলছিল?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'ঝড়োয়ায় উপস্থিত রাজা নেই—মৃত রাজার একমাত্র মেয়েই রাজ্যের অধিকারিণী। মহারাজ ভাস্কর সিং মৃত্যুর আগে কুমার শঙ্করের সঙ্গে কস্তুরীবাঈয়ের বিবাহ স্থির করে গিয়েছিলেন। কথা আছে যে, অভিষেকের দিন কস্তুরীবাঈয়ের সঙ্গে শঙ্কর সিংয়ের তিলক হবে।'

গৌরী বিস্মিত হইয়া বলিল—'নাবালক রানী—ঝড়োয়ার রাজ্য চলছে কি করে?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'মন্ত্রী আছে, দেওয়ান আছে, আইন আছে—রাজার অভাবে কি রাজ্যের কাজ আটকায়?'

'তা বটে! আচ্ছা, এই কস্তুরীবাঈয়ের বয়স কত হবে?'

'রানীর বয়স? বছর উনিশ-কুড়ি হবে।' বলিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ধনঞ্জয় ঘোড়া চালাইলেন।

আরো দুই-একটা প্রশ্ন মনে উদিত হইলেও গৌরী আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

ফটকের ঘড়িতে মধ্যরাত্রির ঘণ্টা পড়িতেছে এমন সময় দুইজন ক্লান্ত অশ্বারোহী রাজপ্রাসাদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

প্রহরী কর্কশকণ্ঠে হাঁকিল—'হুকুম্‌ দার?'

ধনঞ্জয় মৃদুস্বরে কহিলেন—'আমি সর্দার ধনঞ্জয়। রুদ্ররূপকে খবর দাও। জল্‌দি।'

অল্পক্ষণ পরেই রুদ্ররূপ আসিয়া ফৌজী-সেলাম করিযা দাঁড়াইল। ধনঞ্জয় ঘোড়া হইতে নামিয়া কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোনো গোলমাল হয়নি?'

'না। উদিত রোজ একবার করে মহলে ঢোকবার চেষ্টা করেছে, আমি ঢুকতে দিইনি।'

'বেশ। কুমারের কোনো খবর নেই?'

'কিছু না।'

'অভিষেকের আয়োজন সব ঠিক?'

'সমস্ত। ভার্গবজি আপনার জন্য বড় ভাবিত হয়ে পড়েছিলেন।'

'আচ্ছা, আর ভাবনার কোনো কারণ নেই। এখন আমাদের ভিতরে নিয়ে চল। আর পাহারা সরিয়ে নাও—কাল থেকে পাহারার দরকার নেই। শুধু তুমি তায়নাৎ থাকো।'

'যো হুকুম' বলিয়া রুদ্ররূপ আলো আনিবার আদেশ দিতেছিল, ধনঞ্জয় মানা করিলেন —'আলোর দরকার নেই—অন্ধকারেই নিয়ে চল।'

তখন রুদ্ররূপের অনুগামী হইয়া দুইজনে অন্ধকারে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দুই ভাই

পরদিন প্রাতঃকালে গৌরী তখনো অনভ্যস্ত রাজপালঙ্ক ছাড়িয়া উঠে নাই—সর্দার ধনঞ্জয় ভারী মখমলের পর্দা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন—'ঘুম ভেঙেছে?'

গৌরী চোখ মুছিতে মুছিতে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বলিল—'ভেঙেছে। তুমি উঠ্‌লে কখন?'

ধনঞ্জয় হাসিয়া বলিলেন—'আমি ঘুমইনি।—দেওয়ান দেখা করতে আসছেন। তাঁকে সব কথা বলেছি।'

গৌরীর বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল। এইবার তবে রাজা অভিনয় আরম্ভ হইল! সে একবার চক্ষু বুজিয়া মনকে স্থির ও সংযত করিয়া লইবার চেষ্টা করিল। সুদূর কলিকাতায় দাদা ও বৌদিদির মুখ একবার মনে পড়িল।

ধনঞ্জয় তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া সাহস দিয়া বলিলেন—'কোনো ভয় নেই—আমি আছি।'

ঘরের বাহিরে খড়মের শব্দ হইল, পরক্ষণেই দেওয়ান বজ্রপাণি ভার্গব প্রবেশ করিলেন।

বিশেষত্ববর্জিত শীর্ণ চেহারা—বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি, দেখিলে পুরোহিত ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হয়।

বজ্রপাণি তীক্ষ্নদৃষ্টিতে শয্যায় উপবিষ্ট গৌরীকে একবার দেখিয়া লইয়া হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'আজ কুমার কেমন আছেন? জ্বর বোধ করি নেই?'

ধনঞ্জয় সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন—'আজ কুমার ভালই আছেন। ডাক্তার গঙ্গানাথের ঔষধে উপকার হয়েছে বলতে হবে। আজ বোধ হয় বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।'

বজ্রপাণি বলিলেন—'সেটা উচিত হবে কিনা গঙ্গানাথকে আগে জিজ্ঞাসা করা দরকার।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'সে তো নিশ্চয়ই। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা না করে কোনো কাজই হতে পারে না; বিশেষত অভিষেকের যখন আর মাত্র অল্পদিন বাকি তখন সাবধানে থাকতে হবে তো!'

গৌরী নির্বাকভাবে একবার ইহার মুখের দিকে, একবার উহার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। কিন্তু কাহারও মুখে তিলমাত্র ভাবান্তর দেখা গেল না। যেন সত্যকার কুমারের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুইজন পরম হিতৈষীর মধ্যে চিন্তাযুক্ত গবেষণা হইতেছে।

বজ্রপাণি বলিলেন—'কুমার তাহলে এখন শয্যাত্যাগ করুন—আমার পূজা এখনো শেষ হয়নি।' বলিয়া এই বৃদ্ধ রূপদক্ষ পুনশ্চ গৌরীকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'ব্যাপার কি? আমার আবার অসুখ হল কবে?'

ধনঞ্জয় গম্ভীরভাবে বলিলেন—'আপনি আজ পঁচিশ দিন অসুখে ভুগছেন—মাঝে অবস্থা বড়ই খারাপ হয়েছিল, এখন একটু ভাল আছেন! রাজবৈদ্য এসে পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে, আপনার বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করবার মত অবস্থা হয়েছে কিনা।'

গৌরী খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া বলিল—'বুঝেছি। কিন্তু অসুখটা কি হয়েছিল সেটা অন্তত আমার তো জানা দরকার।'

ধনঞ্জয় মৃদু হাসিলেন—'অত্যন্ত মদ খাওয়ার দরুন আপনার লিভার পাকবার উপক্রম করেছিল।'

গৌরী বিছানায় শুইয়া পড়িয়া আরো খানিকটা হাসিল। এতক্ষণে সে আবার সুস্থ

অনুভব করিতে লাগিল; কহিল—'এ একরকম মন্দ ব্যাপার নয়! একেই বলে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'হাসি নয়, কথাগুলো মনে রাখবেন—শেষে বেফাঁস কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে না যায়! নিন্, এবার বিছানা ছেড়ে উঠুন।'

গৌরী শয্যাত্যাগের উপক্রম করিতেছে, এমন সময় একটি বার-তের বছরের মেয়ে ভিতরের একটা দরজা দিয়া প্রবেশ করিল। ফুটন্ত গোলাপের মত সুন্দর হাসি-হাসি মুখখানি, রাঙা ঠোঁট দুটির ফাঁক দিয়া মুক্তার মত দাঁতগুলি একটুমাত্র দেখা যাইতেছে—গৌরী অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল। মেয়েটি পালঙ্কের কাছে আসিয়া মৃদু সুমিষ্টস্বরে বলিল—'কুমার, স্নানের আয়োজন হয়েছে।'

গৌরী সবিস্ময়ে ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'এটি কে?'

ধনঞ্জয় মেয়েটির পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—'তুমি বাইরে অপেক্ষা করগে, কুমার যাচ্ছেন।'

মেয়েটি একবার ঘাড় নীচু করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। তখন ধনঞ্জয় বলিলেন—'এটি আপনার খাস পরিচারিকা।'

'সে কি রকম?'

'রাজ-অন্তঃপুরে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই; রাজবংশীয় পুরুষ ছাড়া আমরা কয়েক-জন মাত্র প্রবেশ করতে পারি। অন্দরমহলে চাকর-বাকর সব স্ত্রীলোক; আপনি যতক্ষণ অন্তঃপুরে থাকবেন, ততক্ষণ স্ত্রীলোকেরাই আপনার পরিচর্যা করবে।'

গৌরী অত্যন্ত বিব্রত হইয়া বলিল—'এ আবার কি হাঙ্গামা। এ যে আমার একেবারে অভ্যাস নেই সর্দার!'

'তা বললে আর উপায় কি? রাজবংশের যখন এই কায়দা তখন মেনে চলতেই হবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গৌরী বলিল—'কিন্তু এই মেয়েটিকে তো দাসী চাকরানী বলে মনে হল না। মনে হল ভদ্রঘরের মেয়ে।'

'শুধু ভদ্রঘরের নয়, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। ওর বাবা ত্রিবিক্রম সিং ঝিন্দের একজন বনেদী বড়লোক।'

বিস্ফারিত চক্ষে গৌরী বলিল—'তবে?'

ধনঞ্জয় হাসিয়া বলিলেন—'এটা একটা মস্ত মর্যাদা। রাজ্যের যে-কেউ নিজের অনূঢ়া মেয়ে বা বোনকে রাজ-অন্তঃপুরে রাজার পরিচারিকা করে রাখতে পেলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন। আমার যদি মেয়ে থাকত আমিও রাখতাম। অবশ্য পরিচারিকা নামে মাত্র—রানীদের কাছে থেকে সহবত শিক্ষাই প্রধান উদ্দেশ্য।'

'এরকম পরিচারিকা আমার কয়টি আছে?'

'উপস্থিত এই একটি, আর যারা আছে তারা মাইনে করা সত্যিকারের বাঁদী।'

অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিয়া গৌরী বলিল—'কিছু মনে ক'রো না সর্দার। কিন্তু এই রকম প্রথায় বনেদী ঘরের মেয়েদের কিছু অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই কি?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'সম্ভাবনা নেই এমন কথা বলা যায় না, তবে বাস্তবে কখনো কোনো অনিষ্ট হয়নি। এরা বনেদী ঘরের মেয়ে বলেই একরকম নিরাপদ।'

গৌরী বলিল—'কিন্তু শঙ্কর সিংয়ের মত চরিত্রের লোক—'

'শঙ্কর সিংয়ের একটা মহৎ গুণ ছিল—তিনি নিজের অন্তঃপুরের কোনো স্ত্রীলোকের দিকে চোখ তুলে চাইতেন না।'

গৌরীর মন বারবার এই সুন্দরী মেয়েটির দিকেই ফিরিয়া যাইতেছিল; সে জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা, এ মেয়েটি কতদিন এই অন্তঃপুরে আছে?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'তা প্রায় দু'বছর। ও-ই এখন বলতে গেলে অন্দর মহলের মালিক—রানী তো কেউ এখন নেই। গত মাস-দুই ও এখানে ছিল না, ওর বাপ ওকে বিয়ে দেবার

জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেল, তাই আজ সকালেই আবার ফিরে এসেছে।'

গৌরী গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'চমৎকার মেয়েটি কিন্তু!'

ধনঞ্জয় হাসিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ, তবে এখনো বড্ড ছেলেমানুষ। ত্রিবিক্রম কেন যে সাত-তাড়াতাড়ি ওর বিয়ে দেবার জন্যে লেগেছেন তা তিনিই জানেন।'

গৌরী বলিল—'কেন মেয়েটির বিয়ের বয়স তো হয়েছে!'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'এদেশে মেয়ে পূর্ণ যৌবনবতী না হলে বিয়ে হয় না। পর্দাপ্রথা তো নেই, সাধারণত মেয়েরা নিজেরাই মনের মত বর খুঁজে নেয়। অবশ্য বাপ-মা'র অনুমতি পেলে তবে বিয়ে হয়।'

গৌরী মনে মনে বলিল—'বাংলাদেশের চেয়ে ভাল বলতে হবে।'

এই সময় সেই মেয়েটি দরজা হইতে আবার মুখ বাড়াইয়া বলিল—'কুমার, আপনার স্নানের জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে।'

গৌরী হাসিয়া তাহাকে কাছে ডাকিল, সকৌতুকে চিবুক ধরিয়া তাহার মুখটি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তোমার নাম কি?'

সঙ্কোচশূন্য দুইচক্ষু গৌরীর মুখের পানে তুলিয়া মেয়েটি বলিল—'আমি চম্পা।'

কিছুক্ষণ গভীর স্নেহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া গৌরী বলিল—'সত্যি। তুমি চম্পা—সূর্যের সৌরভ।'

স্নানান্তে যে ঘরটায় গিয়া গৌরী আহারে বসিল, সে ঘরের জানালার নীচেই কিস্তার কালো জল ছলছল শব্দে প্রাসাদমূল চুম্বন করিয়া চলিয়াছে। জানালার বাহিরের রৌদ্র প্রতিভাত ছবির দিকে তাকাইয়া গৌরী একটা নিশ্বাস ফেলিল। বাংলাদেশে এমন দৃশ্য দেখা যায় না। দূরে পরিষ্কার আকাশের পটে কালো পাহাড়ের রেখা, নিকটে আলো-ঝলমল খরস্রোতা পার্বত্য নদী—নদীর দুইকূলে দুইটি সমৃদ্ধ নগর। প্রায় আধ মাইল দূরে একটি সরু ক্ষীণদর্শন সেতু দুই নগরকে স্থলপথে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। সেতুর উপর দিয়া জরীর ঝালর টাঙানো তাঞ্জাম, দ্রুতগতি টাঙা, রঙবেরঙের পোশাক পরিহিত পদাতিক যাতায়াত করিতেছে। নদীবক্ষে অজস্র ছোট ছোট নৌকা ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছে।

বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে গৌরী বলিল—'এ কোন্ অমরাবতীতে আমাকে নিয়ে এলে সর্দার! মনে হচ্ছে যেন সেই সেকালের প্রাচীন সুন্দর ভারতবর্ষে আবার ফিরে এসেছি।'

ধনঞ্জয় ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—'অমরাবতী যদি ভাল করে দেখতে চান তো আমার সঙ্গে আসুন, এখনো ডাক্তার আসতে দেরি আছে।'

গৌরীকে লইয়া ধনঞ্জয় প্রাসাদের ছাদে উঠিলেন। প্রকাণ্ড সমচতুষ্কোণ মাঠের মত ছাদ, কোমর পর্যন্ত উঁচু পাথরে কাজ-করা। প্যারাপেট দিয়া ঘেরা। চারিকোণে চারিটি গোল মিনার বা স্তম্ভ, সরু সিঁড়ি দিয়া তাহার চূড়ায় উঠিতে হয়। দুইজনে নদীর দিকের একটা মিনারে উঠিলেন; তখন সমগ্র ঝিন্দ্-ঝড়োয়া দেশটি যেন চোখের নীচে বিছাইয়া পড়িল।

কিস্তা নদী এইস্থানে প্রায় তিনশ' গজ চওড়া, যত পূর্বদিকে গিয়াছে তত বেশী চওড়া হইয়াছে। গৌরী পরপারের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—'ওটি কি?'

'ওটি ঝড়োয়ার রাজপ্রাসাদ।'

শ্বেতপ্রস্তরের প্রকাণ্ড রাজভবন, ঝিন্দ্-রাজপ্রাসাদের যমজ বলিলেই হয়। চারিকোণে তেমনি চারিটি উচ্চ বুরুজ মাথা তুলিয়া আছে। এদিকটা প্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগ; প্রাসাদের কোল হইতে শতহস্ত প্রশস্ত সোপানসারি নদীর কিনারা পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে।

ঘাটের দৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, ওদিকের রাজভবনেও আসন্ন উৎসবের হাওয়া লাগিয়াছে। অনেক স্ত্রীলোক—সকলেই রাজপুরীর পুরন্ধ্রী—জলে নামিয়া স্নান করিতেছে; তাহারা

কেহ রানীর সখী, কেহ ধাত্রী, কেহ পরিচারিকা, কেহ বা বর্ষীয়সী আত্মীয়া। যাহারা অল্পবয়সী তাহারা বুক পর্যন্ত জলে নামিয়া নিজেদের মধ্যে জল ছিটাইতেছে; অপেক্ষাকৃত প্রবীণারা তাহাদের ধমক দিতে গিয়া মুখে জলের ছিটা খাইয়া হাসিয়া ফেলিতেছে। তদপেক্ষাও যাহারা প্রাচীনা—যাহারা এ সংসারের অনেক খেলাই দেখিয়াছে—তাহারা ঘাটের পৈঠায় বসিয়া ঝামা দিয়া পা ঘষিতেছে এবং চাহিয়া চাহিয়া ইহাদের রঙ্গরস দেখিতেছে। মাঝে মাঝে সুমিষ্ট কলহাস্যের উচ্ছ্বাস উঠিতেছে।

সেদিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া গৌরী চারিদিক ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। এটা কি, ওটা কি, জিজ্ঞাসা করিতে করিতে শেষে বহু দূরে পূর্বদিকে যেখানে নদী শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেই দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিল—'একটা পুরোনো কেল্লা বলে মনে হচ্ছে, ঐ যে দূরে—ও জিনিসটা কি?'

'কেল্লাই বটে—ওর নাম হচ্ছে শক্তিগড়, প্রায় তিনশ' বছর আগে ঝিন্দের শক্তি সিং তৈরি করেছিলেন। এখন শক্তিগড় আর তার সংলগ্ন জমিদারী উদিত সিংয়ের খাস সম্পত্তি। স্বর্গীয় মহারাজ ভাস্কর সিং বাবুয়ান হিসেবে ঐ সম্পত্তি ছোট ছেলেকে দিয়ে গেছেন।'

'বাবুয়ান কাকে বলে?'

'রাজার ছোট ছেলেরা, যাঁদের গদিতে বসবার অধিকার নেই, তাঁরা উচিত মর্যাদার সঙ্গে থাকবার জন্য কিছু কিছু সম্পত্তি পেয়ে থাকেন—তাকেই বাবুয়ান বলে।'

'উদিত বুঝি ঐখানেই থাকে?'

'হ্যাঁ, তা ছাড়া সিংগড়েও তার একটা বাগানবাড়ি আছে—সেখানেও মাঝে মাঝে এসে থাকে।'

'দেখছি ছোট ছেলেরাও একেবারে বঞ্চিত হন না!'

'মোটেই না। তাঁদের অবস্থা অনেক সময় বড় ছেলের চেয়ে বেশী আরামের। রাজা হবার ঝঞ্ঝাট নেই, অথচ মর্যাদা প্রায় সমান। সাধারণত দরবারের বড় বড় সম্মানের পদ তাঁরাই অধিকার করে থাকেন।'

'হুঁ, উদিত কোন্ পদ অধিকার করে আছেন?'

ধনঞ্জয় হাসিয়া বলিলেন—'তিনি রাজ্যের সবচেয়ে বড় পদটা অধিকার করবার মতলবে ফিরছেন—তার চেয়ে ছোট পদে তাঁর রুচি নেই। কিন্তু সে পদের আশা তাঁকে ছাড়তে হবে, অন্তত যতদিন ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী বেঁচে আছে।'

গৌরী বলিল—'তা তো বুঝতে পারছি—কিন্তু শঙ্কর সিংয়ের কোনো খবরই কি পাওয়া গেল না?'

'কিছু না। তিনি একেবারে সাফ লোপাট হয়ে গেছেন। আমার সন্দেহ হচ্ছে এর মধ্যে একটা ভীষণ শয়তানী লুকোনো আছে। হয়তো আর কিছু না পেয়ে উদিত তাকে গুমখুন করেছে। উদিত আর ঐ ময়ূরবাহনটার অসাধ্য কাজ নেই।'

গৌরীর বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিতে লাগিল—'যদি তাই হয়, তাহলে উপায়?'

ধনঞ্জয়ের মুখ লোহার মত শক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'যদি তাই হয়, তাহলেও উদিতকে গদিতে বসতে দেব না। সিংহাসনে উদিতের চেয়ে আপনার দাবী কোনো অংশে কম নয়।'

গৌরী স্তম্ভিত হইয়া বলিল—'সে কি! আমার আবার দাবী কোথায়?'

'ও কথা থাক।' বলিয়া ধনঞ্জয় নীচে নামিতে লাগিলেন।

নামিয়া আসিয়া দুইজনে একটি বৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই ঘরটি প্রাসাদের সদর ও অন্দরের মধ্যবর্তী—এইখানে বসিয়া রাজা দর্শনপ্রার্থীদের দেখা দিয়া থাকেন। বিশালায়তন ঘরের চারিদিকে বহু জানালা ও দ্বার; মেঝেয় চার ইঞ্চি পুরু পারসী কার্পেট পাতা; রেশমের গদি-আঁটা কৌচ ঘরের মধ্যে ইতস্তত সাজানো আছে। রাজার বসিবার জন্য ঘরের মধ্যস্থলে একটি সোনার কাজ-করা মখমল-ঢাকা আবলুশের চেয়ার। দেয়ালের গায়ে সূক্ষ্ম পর্দায় আবৃত বড় বড় ভিনীসিয় আয়না।

গৌরী আসনে বসিবার অল্পক্ষণ পরে নকিব দ্বারের নিকট হইতে ডাক্তারের আগমন জানাইল। ডাক্তার আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। বয়সে প্রৌঢ়—গঙ্গানাথ দ্বারের নিকট হইতে রাজাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া হাস্যমুখে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিলেন। দুই-একটা মামুলি কুশল প্রশ্নের পর গৌরীর কব্জিটা আঙুলে টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন—'বাঃ, নাড়ী তো দিব্য চলছে দেখছি, আমার চিকিৎসার গুণ আছে বলতে হবে।' বলিয়া নিজের গূঢ় কৌতুকে হাসিতে লাগিলেন। গৌরী ও ধনঞ্জয় মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

ডাক্তার বলিলেন—'এবার জিভ্ দেখি—' গৌরী জিভ্ বাহির করিল।—'চমৎকার! চমৎকার! লিভারটাও একবার দেখা দরকার।' লিভার পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারের মুখে সন্দেহের ছাপ পড়িল—'আপনার এত ভাল স্বাস্থ্য আমি অনেক দিন দেখিনি।' একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন—'ও জিনিসটা কি সত্যিই ছেড়েছেন নাকি?'

গৌরী মুখখানা ম্রিয়মাণ করিয়া বলিল—'হ্যাঁ ডাক্তার, ও বিষ আর আমার সহ্য হচ্ছিল না।'

ডাক্তার সানন্দে দুই করতল ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন—'বেশ বেশ, আমি বরাবরই বলে আসছি ও না ছাড়লে আপনার শরীর শোধরাবে না—কিন্তু এতটা উন্নতি আমি প্রত্যাশা করিনি; এ হাওয়া বদ্‌লানোর গুণ!'

ধনঞ্জয় মৃদুস্বরে বলিলেন—'তাতে আর সন্দেহ কি?' ডাক্তারকে একটু দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়া ধনঞ্জয় চুপি চুপি বলিলেন—'কথাটা যেন প্রকাশ না হয় ডাক্তার, তুমি তো সব জানোই। এবার কুমারকে বাংলাদেশ থেকে ধরে এনেছি।'

ডাক্তার অবাক হইয়া বলিলেন—'কি, বাংলাদেশে গিয়ে উনি এত ভাল ছিলেন? সেখানে যে ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া!'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'ভাল যে ছিলেন তা তো দেখতেই পাচ্ছ। যা হোক, উনি এতদিন তোমার চিকিৎসাধীনে এখানেই ছিলেন—একথা যেন ভুলো না।'

'তা কি ভুলি?' বলিয়া ডাক্তার গৌরীকে তাহার পুনঃপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যের জন্য বহু অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া এবং নিজের চিকিৎসার আশ্চর্য গুণ সম্বন্ধে পুনশ্চ রসিকতা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

গৌরী ধনঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিল—'ডাক্তার সব কথা বুঝি জানে না?'

ধনঞ্জয় মৃদুহাস্যে বলিলেন—'না, গঙ্গানাথ খুব উঁচুদরের ডাক্তার, কিন্তু বড় বেশী কথা কয়। যেটুকু না বললে নয় সেইটুকুই ওকে বলা হয়েছে।' তারপর গৌরীর পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—'সাবাস! ডাক্তারে যখন জাল ধরতে পারেনি, তখন আর ভয় নেই।'

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'আসল কথাটা কে কে জানে?'

'আমি, দেওয়ান বজ্রপাণি ও রুদ্ররূপ।'—ধনঞ্জয়ের মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে রুদ্ররূপ উত্তেজিতভাবে ঘরে প্রবেশ করিয়া চাপা গলায় বলিল—'হুঁশিয়ার, কুমার উদিত আসছেন—' বলিয়া আবার পর্দার আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

'বেশী কথা বলবেন না, যা বলবার আমিই বলব—' গৌরীর কানে কানে এই কথা বলিয়া ধনঞ্জয় জানালার কাছে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। গৌরীর বুকে হাতুড়ির ঘা পড়িল। এইবার সত্যকার পরীক্ষা।

নকিব নাম ডাকিবার পূর্বেই উদিত দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দুই হাতে পর্দা সরাইয়া দাঁড়াইল; কিছুক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে গৌরীর দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর ফাঁদে পড়িবার ভয়ে সন্দিগ্ধ শ্বাপদ যেমন এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে সন্তর্পণে অগ্রসর হয়, তেমনিভাবে উদিত ঘরের মধ্যে অগ্রসর হইল। অবিশ্বাস, বিস্ময় ও উত্তেজনায় তাহার সুশ্রী মুখখানা বিকৃত দেখাইতে লাগিল।

নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না এমনিভাবে সে গৌরীর মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল। সংশয়পূর্ণ বিস্ময়ে তাহার মুখখানা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। গৌরীও দুই চক্ষে বিদ্রোহ ভরিয়া উদিতের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কাহারও মুখে

কথা নাই। কিছুক্ষণ এমনি নীরবে কাটিয়া গেল।

ধনঞ্জয়ের অনুচ্চ কণ্ঠের হাসি এই নিস্তব্ধতার জাল ছিঁড়িয়া দিল। তিনি বলিলেন—'একেই বলে ভালবাসা! আপনি আরোগ্য হয়ে উঠেছেন দেখে কুমার উদিতের হৃদয় এতই পূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, তাঁর মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছে না। অভিবাদন করতেও সাফ্ ভুলে গেছেন।—ব'স্তে আজ্ঞা হোক কুমার!'

ধনঞ্জয়ের দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উদিত গৌরীর সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া তাহার ডান হাতখানা লইয়া নিজের কপালে ঠেকাইল। অস্পষ্ট কণ্ঠে মামুলি দুই-একটা আনন্দসূচক শিষ্ট কথা বলিয়া অভিভূতের মত কৌচে গিয়া বসিল।

গৌরী ইতিমধ্যে নিজেকে বেশ সামলাইয়া লইয়াছিল; তাহার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি ভর করিল। সে বলিল—'ধনঞ্জয়, ভাই আমার সাত-সকালে ব্যস্ত হয়ে আমার খোঁজ নিতে এসেছেন—শীঘ্র ওঁর জন্যে গরম সরবতের ব্যবস্থা কর।—কি করব আমার উপায় নেই, ডাক্তারের মানা, নইলে আমিও এই সঙ্গে এক চুমুক খেতুম।'

উদিতের মনে হইল যেন তাহার মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে। সে বুদ্ধিভ্রষ্টের মত কেবল গৌরীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, একটা কথাও বলিতে পারিল না।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'উদিত, তুমি কি একলা এসেছ ভাই? সঙ্গে কি কেউ নেই?'

উদিত জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল—'ময়ূরবাহন এসেছে—বাইরে আছে।'

গৌরী আগ্রহ দেখাইয়া বলিল—'বাইরে কেন? এখানে নিয়ে এলেই তো পারতে—ময়ূরবাহন বুঝি এল না? বড় লাজুক কিনা—আর, লজ্জা হবারই কথা—কত মদ যে আমাকে গিলিয়েছে তার কি ঠিকানা আছে! ভাগ্যে সময়ে সামলে নিয়েছি, নইলে তুমিই তো সিংহাসনে বসতে উদিত! লিভার পেকে উঠলে আর কি প্রাণে বাঁচতাম!'

উদিত নিজের চোখের উপর দিয়া ডান হাতখানা একবার চালাইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'এবার আমি উঠি। আমি একবার—আমাকে একবার শক্তিগড়ে যেতে হবে—'

ধনঞ্জয়ের চোখে নষ্টামি নৃত্য করিয়া উঠিল, তিনি মহা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—'তা কি কখনো হয়! কাল বাদে পরশু অভিষেক, আপনার সঙ্গে কত পরামর্শ রয়েছে, আর আপনি এখনি চলে যাবেন? লোকে দেখলেই বা মনে করবে কি? ভাববে আপনার বুঝি দাদার অভিষেকে মত নেই।—তাছাড়া আপনার সরবৎ এল বলে, না খেয়ে গেলে রাজাকে অপমান করা হবে যে! বসুন—বসুন। অভিষেক সভা সাজানো হচ্ছে—সেদিকে গিয়েছিলেন নাকি?'

নিরুপায় উদিত ধনঞ্জয়ের দিকে একটা বিষদৃষ্টি হানিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

ধনঞ্জয় বলিতে লাগিলেন—'অভিষেকের কি বিধিব্যবস্থা হয়েছে আপনি তো সবই জানেন—আপনাকে আর বেশী কি বলব? সকালবেলা পঞ্চতীর্থের জলে স্নান করে রাজবংশীয় সমস্ত জহরৎ পরে রাজা অভিষেক সভায় গিয়ে হোমে বসবেন। সেখানে তিন ঘণ্টা লাগবে। হোম শেষ করে পুরোহিতের আঙ্গুলের রক্ত-টীকা পরে রাজা বাইরে আসবেন। তখন অভিষেক সম্পন্ন করে শোভাযাত্রা আরম্ভ হবে। রাজা প্রথম হাতীর ওপর সোনার হাওদায় থাকবেন—তার পরের হাতীতে রুপার হাওদায় আপনি থাকবেন। সবসুদ্ধ দেড়শ' হাতী আর ছয়শ' ঘোড়া শোভাযাত্রায় থাকবে। নগর পরিভ্রমণ করে ফিরে আসবার পর দরবার বসবে। দরবারে প্রথমেই ঝড়োয়ার রাজকুমারীর সঙ্গে রাজার তিলক হবে—ঝড়োয়ার মন্ত্রী অনঙ্গদেব অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে স্বয়ং তিলক দিতে আসবেন। তিলক শেষ হলে ভারত-সম্রাটের অভিনন্দন পত্র ও আর আর রাজ-রাজড়াদের অভিনন্দন পাঠ করা হবে। তারপর মহারাজ সভা ভঙ্গ করে বিশ্রামের জন্য অন্দরে প্রবেশ করবেন।

'এদিকে রাজ্যময় উৎসবের আয়োজন হয়েছে সে তো আপনি স্বচক্ষেই দেখেছেন। শহরের প্রত্যেক বাড়িটি ফুল পতাকা পূর্ণকুম্ভ দিয়ে সাজানো হবে, যারা তা পারবে না সরকারী খরচে তাদের বাড়ি সাজিয়ে দেওয়া হবে। সমস্ত দিন খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-

আহ্লাদ, মল্লযুদ্ধ, বাঈজীর নাচ, হাতীর লড়াই চলবে। সন্ধ্যার পর নদীতে নৌবিহার হবে। শহরে নাচ-গান, দেয়ালী-বাজি সমস্ত রাত চলবে। সাত দিন ধরে শহর এমনি সরগরম হয়ে থাকবে।'

উদিতের মুখ উত্তরোত্তর কালীবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সে হয়তো আর সহ্য করিতে না পারিয়া একটা বেফাঁস কিছু করিয়া ফেলিত কিন্তু এই সময় ভৃত্য সোনার থালার উপর কাচের পূর্ণ পানপাত্র বহন করিয়া উপস্থিত হইল।

পানপাত্র উদিতের হাতে দিয়া গৌরী বলিল—'এই নাও উদিত, খাও। আমারও লোভ হচ্ছে—কিন্তু আমি খাব না। সংযমী হওয়াই মনুষ্যত্ব।' উদিত এক চুমুকে পাত্র শেষ করিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

মদের প্রভাবে তাহার হতবুদ্ধি ভাব অনেকটা কাটিয়া গেল। সে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—'আপনার অসুখের সময় আমাকে মহলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি কেন?'

গৌরী নিরুপায়ভাবে হাত নাড়িয়া বলিল—'ডাক্তারের মানা উদিত, ডাক্তারের মানা। গঙ্গানাথ কি রকম দুর্দান্ত লোক জান তো? একেবারে হুকুম জারি করে দিলে কারুর সঙ্গে দেখা করতে পাব না।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'কিন্তু এমনি ভ্রাতৃভক্তি কুমার উদিতের—উনি প্রত্যহ একবার করে আপনার খোঁজ নিয়ে গেছেন।'

স্নেহবিগলিতকণ্ঠে গৌরী বলিল—'ভাইয়ের চেয়ে আপনার আর কে আছে বল? কিন্তু তবু এমন পাজি দেশের লোক, উদিতের নামেও মিথ্যে দুর্নাম দেয়—বলে ও নাকি আমার বদলে সিংহাসনে বসতে চায়। বল তো উদিত—কত বড় মিথ্যে কথা!'

হঠাৎ চাপা গলায় উদিত গর্জন করিয়া উঠিল—'তুমি কে?'

অতি বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া গৌরী বলিল—'আমি কে? উদিত, উদিত, তুমি কি বলছ? আজকাল কি সকালবেলা মদ খাওয়া তুমি ছেড়ে দিয়েছ! আমাকে চিনতে পারছ না! ধনঞ্জয়, দেখছ উদিতের মুখ কি রকম লাল হয়ে উঠেছে! এখনি গঙ্গানাথকে ডাকা দরকার!'

রুদ্ররূপকে ডাকিয়া ধনঞ্জয় হুকুম দিলেন—'কুমার উদিত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, শীঘ্র গঙ্গানাথকে ডেকে পাঠাও।'

অসীম বলে নিজেকে সংযত করিয়া উদিত দাঁতের ভিতর হইতে বলিল—'থাক, ডাক্তারের দরকার নেই। আচ্ছা চললাম, আবার দেখা হবে।' বলিয়া রাজার দিকে একবার মাথা ঝুঁকাইয়া উদিত সিং দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

ধনঞ্জয় রুদ্ররূপকে কাছে ডাকিয়া কানে কানে কি বলিলেন; রুদ্ররূপ প্রস্থান করিলে গৌরীর নিকট আসিয়া বসিয়া বলিলেন—'গোড়াতেই উদিতকে এতটা ঘাঁটানো ঠিক হয়নি। একটু চেপে চললেই হত। তা যাক, যা হবার তা তো হয়েই গেছে।'

গৌরী বলিল—'শত্রুতা করতে হলে ভাল করে করাই ঠিক, আধমনা হয়ে শত্রুতা করা বোকামি। কিন্তু কি ব্যাপার বল তো? উদিত বুঝতে পেরেছে?'

ধনঞ্জয় ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—'না, বুঝতে পারেনি ঠিক, কিন্তু বেজায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। এর ভেতর কিছু কথা আছে, ভ্যাবাচাকা খেলে কেন?'

গৌরী বলিল—'শঙ্কর সিংকে খুন করেনি তো?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'না, খুন বোধ হয় করেনি। খুন করলে আপনাকে দেখবামাত্র জাল রাজা বলে বুঝতে পারত। তাই তো! উদিত অমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল কেন?' বলিয়া ধনঞ্জয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিলেন।

তারপর দেশের বহু গণ্যমান্য লোককে দর্শন দিবার পর সভা ভঙ্গ হইল। কোনো কিছু ঘটিল না, সকলেই রাজার রোগমুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া একে একে প্রস্থান করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় নদীর দিকের একটা খোলা বারান্দায় সিল্কের নরম গালিচা পাতা হইয়াছিল; তাহার উপর মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়া গৌরী সোনার আলবোলায় তামাক টানিতেছিল। ধনঞ্জয় তাহার সম্মুখে পা মুড়িয়া বসিয়াছিলেন।

আকাশে আধখানা চাঁদ সবেমাত্র নিজের রশ্মিজাল পরিস্ফুট করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নদীর জল-ছোঁয়া ঠাণ্ডা বাতাস যদিও মাঝে মাঝে শরীরে একটু কাঁপন ধরাইয়া দিতেছে, তবু এ মনোরম স্থানটি ছাড়িয়া গৌরী উঠিতে পারিতেছিল না। নদীর পরপারে ঝড়োয়ার রাজবাড়িতে আলো জ্বলিয়া উঠিল, একে একে সব বাতায়নগুলি আলোকিত হইল—নদীর জলে সেই ছায়া কাঁপিতে লাগিল। দুইজনে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

একবার খড়ম পায়ে দিয়া বৃদ্ধ বজ্রপাণি দুই-একটা প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞাসা করিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে গৌরী বলিল, 'আচ্ছা, বুড়ো মন্ত্রী এত কাজ করছেন, আর তুমি তো দিব্যি আমার কাছে বসে আড্ডা দিচ্ছ?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'আড্ডা দিচ্ছি এবং আরো দু'দিন দেব। অভিষেক না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে চোখের আড়াল করছি না। শংকর সিং তো গেছে, শেষে আপনাকেও খোয়াব নাকি?'

'আমারও খোয়া যাবার ভয় আছে নাকি?'

'বিলক্ষণ আছে। আসলই যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন নকল হারাতে কতক্ষণ?'

গৌরী গম্ভীর হইয়া বলিল—'সত্যি? শংকর সিংয়ের কি কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছে না?'

'কিছু না, যেন কর্পূরের মত উবে গেছেন। অন্য অন্য বারেও খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হয়েছে বটে, কিন্তু এরকমটা কোনো বার হয়নি। সন্দেহ হচ্ছে সত্যি সত্যিই গুমখুন করলে না তো? তা যদি করে থাকে—'

রুদ্ররূপ প্রবেশ করিল। চাঁদের আলো ছিল বলিয়া অন্য আলো ইচ্ছা করিয়াই রাখা হয় নাই, ধনঞ্জয় ঠাহর করিয়া বলিলেন—'রুদ্ররূপ নাকি? এসো, কোনো খবর পেলে?'

রুদ্ররূপ উভয়কে অভিবাদন করিয়া গালিচার উপর পা মুড়িয়া বসিল। চম্পা রুদ্ররূপকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, তাহাকে অদূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ধনঞ্জয় বলিলেন—'চম্পা, রাজার জন্যে পান আনতে বল তো মা!'

চম্পা প্রস্থান করিল। তখন রুদ্ররূপ বলিল—'কুমার উদিত আর ময়ূরবাহন এখান থেকে বেরিয়ে সটান ঘোড়া ছুটিয়ে শক্তিগড়ে গিয়েছেন, পথে কোথাও থামেননি। এইমাত্র খবর নিয়ে লোক ফিরে এসেছে।'

ধনঞ্জয় হঠাৎ কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন—'ওঃ! ওঃ! কি আহাম্মক আমি—কি নালায়েক আমি! এটা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি!'

গৌরী আশ্চর্য হইয়া বলিল—'কি বুঝতে পারনি?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'ইচ্ছে করে আমায় ভুল খবর দিয়ে বাইরে পাঠিয়েছিল। ঐ শয়তান স্টেশনমাস্টারটা উদিতের দলে—ও-ই আমাকে বলেছিল যে কুমার শংকরকে ছদ্মবেশে মেয়েমানুষ সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে চড়তে দেখেছে। এখন সব বুঝতে পারছি।'

'কিন্তু আমি যে এখনো কিছুই বুঝলাম না।'

'বুঝলেন না? শংকর সিংকে শক্তিগড়ে বন্ধ করে রেখেছে। দেশে থাকলে পাছে আমি জানতে পারি তাই মিথ্যে খবর দিয়ে আমাকে সরিয়েছিল। এ ঐ হাড়-বজ্জাত ময়ূর-বাহনটার বুদ্ধি।'

অনেকক্ষণ সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে রুদ্ররূপ দ্বিধা-জড়িত স্বরে বলিল—'কিন্তু তা যদি হয় তাহলে শক্তিগড়ে তল্লাস করলেই তো—'

'শক্তিগড় উদিতের নিজের জমিদারী—সেখানে সে আমাদের ঢুকতে দেবে না।'

'ফৌজ নিয়ে যদি—'

'পাগল! জোর করে যদি শক্তিগড়ে ঢুকি তাতে বিপরীত ফল হবে। উদিত সিং বমাল সমেত ধরা দেবে ভেবেছ? তার আগে শঙ্কর সিংহকে কেটে কিস্তার জলে ভাসিয়ে দেবে।'

আবার দীর্ঘকাল সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ধনঞ্জয় বলিলেন—'না, এখন আর কিছু হবে না—সময় নেই। অভিষেক হয়ে যাক—তারপর—। রুদ্ররূপ, তুমি এখানে থাকো, আমি একবার মন্ত্রীর কাছে চললাম। যতক্ষণ না ফিরি এ'কে ছেড়ো না।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নৌ-বিহার

রাজ-অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

দিনের অনুষ্ঠান ও তাহার আনুষঙ্গিক সমারোহ শেষ হইয়া যাইবার পর রাত্রির আমোদ-প্রমোদের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। কিস্তার জল হাজার হাজার সুসজ্জিত নৌকায় ভরিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক নৌকাটি সারি সারি বেলোয়ারি ঝাড়ের রঙীন আলোয় ঝকমক করিতেছে। কোনো নৌকায় সারঙ্গী তবলা সহযোগে কলকণ্ঠী ললনার গান চলিতেছে। কোনো নৌকার ছাদ হইতে আতসবাজি আকাশে উঠিয়া নানা বর্ণের উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ডে ফাটিয়া পড়িতেছে। কোনো নৌকা হাঙ্গরমুখ, কোনো নৌকা ময়ূরপঙ্খী। কোনোটি পালের ভারে মন্থর মরাল-গতিতে চলিতেছে, কোনোটি মাল্লার দাঁড়ের আঘাতে জল মথিত করিয়া ঘুরিতেছে। প্রায় সকল নৌকাই দুই রাজপ্রাসাদের মধ্যবর্তী স্থানটুকুর মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি হইয়া চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে, যেন এই সম্মোহন বৃত্ত ছাড়িয়া বাহির হইতে পারিতেছে না। দুই তীরে দুই রাজসৌধ সর্বাঙ্গে আলোকমালা পরিধান করিয়া যেন ঔজ্জ্বল্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরস্পরকে সকৌতুকে আহ্বান করিতেছে।

একটি বজরাকে সকলেই সসম্ভ্রমে দূরে দূরে রাখিয়াছে; একটি করিয়া লাল ও একটি করিয়া সবুজ আলোর ঝালর দেখিয়া বুঝা যায় এটি রাজ-বজরা। নৌকাটি ফুলপাতা, জরি, মখমল ও জহরৎ দিয়া সুন্দরভাবে সাজানো। তাহার পশ্চাতে রূপার ডাণ্ডার মাথায় ঝিন্দের রাজপতাকা উড়িতেছে।

নৌকার ছাদের উপর মখমলের চাঁদোয়ার নীচে তাকিয়া ঠেস দিয়া নবাভিষিক্ত রাজা বসিয়া আছেন, সঙ্গে মন্ত্রী বজ্রপাণি, সর্দার ধনঞ্জয় এবং রুদ্ররূপ। বাহিরের লোক এখানে কেহই নাই—মাঝি-মাল্লারা সব নীচে। কিন্তু তবু সকলেই নীরব—কিছু অন্যমনস্ক। মাঝে মাঝে দুই-একটা কথা হইতেছে।

বজ্রপাণি বলিলেন—'আমি শুধু উদিতের মুখখানার কথা ভাবছি। যখন ইংলণ্ডেশ্বরের অভিনন্দন পড়া হচ্ছে, তখন তার মুখ দেখেছিলে? আমার ভয় হচ্ছিল একটা বিশ্রী

কাণ্ড বুঝি বাধিয়ে বসে।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'হুঁ, আর ঐ ময়ূরবাহনটা। তিলকের সময় এমনভাবে চেঁচিয়ে হেসে উঠল, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল সভা থেকে গলা টিপে বার করে দিই। শুধু একটা কেলেঙ্কারি হবে এই ভয়ে পারলাম না।'

ভার্গব বলিলেন—'ওরা এম্‌নি ছাড়বে না, শীঘ্রই একটা কিছু করবে। আমাদের খুব সতর্ক থাকা দরকার।'

উদিত ও ময়ূরবাহন মিলিয়া যে একটা কিছু করিবেই, সে-সম্বন্ধে তিনজনের মনে কোনো সন্দেহই ছিল না ; কিন্তু কি করিবে, কোন্‌ দিক হইতে আক্রমণ করিবে—সেইটাই কেহ ধারণা করিতে পারিতেছিলেন না।

গৌরী সেই প্রশ্নই করিল—'কি করতে পারে ওরা?'

বজ্রপাণি মাথা চুলকাইয়া বলিলেন—'সেটা জানা থাকলে আগে থাকতে তার প্রতিকার করা যেত। এখন সতর্কভাবে প্রতীক্ষা করা ছাড়া অন্য পথ নেই।'

কিছুক্ষণ সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। রাজ-বজরার ত্রিশ গজের মধ্যে অন্য কোনো নৌকা ছিল না, কিন্তু মধুপাত্রের চারিপাশে মক্ষিকার মত সকল নৌকাই রাজ-নৌকাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছিল। অলক্ষিতে ব্যবধান সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছিল। একটা নৌকা হইতে সারঙ্গী সহযোগে নারীকণ্ঠের গীত স্পষ্ট কানে আসিতেছিল, এমন কি দাঁড়টানার ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দের ফাঁকে ফাঁকে নর্তকীর পায়জামিয়ার নিক্কণও শুনা যাইতেছিল।

চতুঃপ্রহরব্যাপী উৎসবের পর নানাবিধ ভাবনা ও উত্তেজনার ফলে গৌরী ঈষৎ ক্লান্তি অনুভব করিতেছিল—সে তাকিয়ার উপর মাথা রাখিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। ঝাড়োয়ার আলোকদীপ্ত প্রাসাদের মাথায় নবমীর চাঁদ স্থির হইয়া আছে—সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া গৌরী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা দেওয়ানজি, যাঁর সঙ্গে আজ আমার পাকা দেখা অর্থাৎ তিলক হল, তিনি দেখতে কেমন?'

ভার্গব গম্ভীরমুখে বলিলেন—'রানীর মত। এর বেশী আমাদের বলতে নেই, তিনি একদিন আমাদের মা হবেন।'

গৌরী হাসিয়া বলিল—'তা যেন বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এই যে তাঁর তিলক হল আমার সঙ্গে, অথচ বিয়ে হবে আর একজনের সঙ্গে—এতে আপনাদের শাস্ত্রমতে কোনো দোষ হবে না?'

বজ্রপাণি নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। ধনঞ্জয়ের মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল ; এই চিন্তাটাই তাঁহাকে সবচেয়ে বেশী ক্লেশ দিতেছিল। ঝিন্দের পাটরানী যে ধর্মত একজনের বাগ্‌দত্তা হইয়া পরে রাজার মহিষী হইবেন, সমস্ত ষড়যন্ত্রের মধ্যে এই ব্যাপারটাই ধনঞ্জয়ের সবচেয়ে অরুচিকর ঠেকিতেছিল। কঠিনপ্রাণ যোদ্ধার মত তিনি ভালর সঙ্গে মন্দটাও গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্তে সুখ ছিল না।

তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—'তিনি এসব কিছু জান্‌তে পারবেন না।'

গৌরী বলিল—'তা ঠিক, মনের অগোচরে পাপ নেই। তা সে যাক, বিয়েটা কতদিন পরে হবে, কিছু ঠিক হয়েছে কি?'

বজ্রপাণি বলিলেন—'তার এখনো দু'মাস দেরি আছে।'

গৌরী প্রশ্ন করিল—'কিন্তু এই দু'মাসে শঙ্কর সিংকে যদি উদ্ধার না করা যায়, তাহলে বিয়েটাও কি বকলমে আমাকে করতে হবে নাকি?' বলিয়া সকৌতুকে গৌরী তিনজনের মুখের পানে চাহিল।

সহসা এ কথার কেহ উত্তর দিতে পারিল না। ধনঞ্জয় ভ্রূকুটি করিয়া কার্পেটের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। রুদ্ররূপ উদাসীনভাবে চাঁদের দিকে চাহিয়া রহিল। ভার্গব একটিপ নস্য লইয়া কি একটা বলিবার উপক্রম করিলেন, এমন সময় বজরার ভিতর হইতে একজন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—'সামাল, হুঁশিয়ার!'

তারপর মুহূর্তমধ্যে একটা কাণ্ড হইয়া গেল। গৌরী সচকিতে উঠিয়া বসিয়া নীচের

দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিল, একখানা সরু ছুঁচোলো নৌকা সমস্ত আলো নিভাইয়া দিয়া অন্ধকারে টর্পেডোর মত তাহার বজরার মধ্যস্থল লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে—ধাক্কা লাগিতে আর দেরি নাই, মধ্যে মাত্র বিশ হাতের তফাৎ। নৌকার ক্রূর অভিসন্ধি বুঝিয়া লইতে গৌরীর তিলার্ধ সময় লাগিল না; সে একলাফে উঠিয়া বজরার ধারে চাঁদির রেলিং ধরিয়া হাঁকিল—'খবরদার! তফাৎ যাও।'

উত্তরে অন্ধকার নৌকার ভিতর হইতে একটা উচ্চকণ্ঠের হাসির আওয়াজ আসিল। পরমুহূর্তেই বজরা ও নৌকার ভীষণ সংঘাতে সমস্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। বজরার সমস্ত ঝাড়লণ্ঠনগুলো ঠোকাঠুকি হইয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দে ভাঙিয়া নিভিয়া গেল এবং বজরাখানা ভয়ংকর একটা টাল খাইয়া প্রায় কাত হইয়া পড়িল। সেই অন্ধকারের মধ্যে গৌরী অনুভব করিল—জ্যা-মুক্ত তীরের মত সে শূন্যে উড়িতে উড়িতে চলিয়াছে।

শুনা যায়, আকস্মিক বিপৎপাতে মানুষের উপস্থিত-বুদ্ধি লোপ পাইয়া কেবল প্রাণ-রক্ষার চেষ্টাই জাগ্রত থাকে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এইরূপ উড্ডীয়মান অবস্থাতেও গৌরী যে-কথাটা ভাবিতেছিল, আসন্ন জীবন-মৃত্যু সংকটের সহিত তাহার কোনো যোগ নাই। সে ভাবিতেছিল, ঐ যে হাসিটা খট্টাসের ডাকের মত এখনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল ঐ হাসি সে পূর্বে কোথায় শুনিয়াছে?

এই ভাবিতে ভাবিতে বজরা হইতে বিশ হাত দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়াই গৌরী কিস্তার জলে তলাইয়া গেল। হঠাৎ কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে এই অতর্কিতে অবগাহনের ফলে গৌরীর মন হইতে অন্য সমস্ত চিন্তা দূর হইয়া মনে হইল, এইবার তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু সে ভাল সাঁতার জানিত বলিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করিল না, কোনো রকমে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে জল কাটিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। পতনের বেগে সে বহুদূর নীচে নামিয়া গিয়াছিল, তাই উঠিতে দেরি হইল। প্রায় আধ মিনিট পরে ভাসিয়া উঠিয়া দীর্ঘ এক নিশ্বাস টানিয়া চোখ মেলিল।

চোখ মেলিয়াই কিন্তু আবার তাহাকে ডুব মারিতে হইল। ইতিমধ্যে রাজ-বজরায় দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখিয়া চারিদিক হইতে নৌকাসকল ভিড় করিয়া আসিয়াছিল—বজরা ঘিরিয়া ভীষণ চেঁচামেচি ও হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছিল। গৌরী মাথা তুলিয়াই দেখিল—একখানা প্রকাণ্ড নৌকা তাহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। সে সজোরে নিশ্বাস টানিয়া আবার ডুব দিল।

ডুব-সাঁতার দিয়া খানিকটা দূরে গিয়া আবার সে ভাসিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু মাথা তুলিতে পারিল না, একখানা নৌকার তলায় মাথা ঠুকিয়া গেল। গৌরীর মনে হইল, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই, বায়ুর অভাবে ফুসফুস এখনি ফাটিয়া যাইবে। পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়িয়া সে আরো কিছুদূর গিয়া মাথা তুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এবারও নৌকার তলায় মাথা লাগিয়া তাহাকে মাথা জাগাইতে দিল না।

গৌরী তখন নৌকার তলদেশ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল—কোথাও না কোথাও নৌকার তলা শেষ হইয়াছে নিশ্চয়, সেইখানে গিয়া মাথা জাগাইবে এই তাহার অভিপ্রায়। কিন্তু এদিকে ফুসফুসের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে—সংজ্ঞাও প্রায় লুপ্ত। সেই অর্ধচেতনার মধ্যে মনে হইতেছে, বুঝি নৌকার কিনারা আর মিলিবে না।

কতক্ষণ এইভাবে চলিবার পর হঠাৎ কিনারা মিলিল। দুইটা নৌকা ঠেকাঠেকি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের হালের দিকে সামান্য একটু ত্রিকোণ স্থান। সেই সংকীর্ণ স্থান-টুকুতে গলা পর্যন্ত জাগাইয়া, প্রায় এক মিনিট ধরিয়া দীর্ঘ কম্পমান কয়েকটা নিশ্বাস টানিবার পর গৌরীর মাথাটা কিছু পরিষ্কার হইল। কিন্তু বিপদ তখনো শেষ হয় নাই। গৌরী চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, যতদূর দেখা যায়, অগণ্য অসংখ্য নৌকা ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং প্রত্যেক নৌকার আরোহী একযোগে অর্থহীন চীৎকার করিতেছে। গৌরীও চীৎকার করিয়া তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই বিষম গণ্ডগোলের মধ্যে তাহার ক্ষীণকণ্ঠ কেহ শুনিতে পাইল না।

গৌরী একবার ভাবিল, নৌকার পার্শ্ব ধরিয়া ঝুলিয়া থাকি—কখনো না কখনো উদ্ধার পাইব। কিন্তু তাহাতেও ভয় আছে; নৌকাগুলো স্রোতের বেগে দুলিতেছে, পরস্পর ঘর্ষিত হইতেছে। যদি কোনোক্রমে মাথাটা দুই নৌকার জাঁতাকলে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে গুঁড়াইয়া একেবারে ছাতু হইয়া যাইবে। সুতরাং ঝুলিয়া থাকাও দীর্ঘকালের জন্য নিরাপদ নয়।

মিনিট পাঁচেক পরে অনেকটা সুস্থ হইয়া গৌরী স্থির করিল—এই নৌকার ভিড়ের বাহিরে যাইতে হইবে। নৌকার ভিড় রাজ-বজরার নিকটেই বেশী, অতএব বজরা হইতে যতদূর যাওয়া যায়, ততই নিরাপদ। গৌরী তখন ভাল করিয়া একবার দিক্-নির্ণয় করিয়া লইয়া আবার ডুব মারিল। নৌকাগুলোর হাল যেদিকে সেইদিকেই মুক্তির পথ, এই বুঝিয়া সে প্রাণপণে ডুব-সাঁতার কাটিয়া চলিল।

প্রায় বিশ গজ সাঁতার দিয়া সে আবার ভাসিয়া উঠিল। হাঁ, অনেকটা ফাঁকা আছে। নৌকার ভিড় আছে বটে, কিন্তু অতটা ঘনীভূত নয়। আপাতত ডুব-সাঁতার দিবার আর কোনো প্রয়োজন নাই।

সকল নৌকাতেই আলো আছে—কিন্তু সে আলো শোভার জন্য, মজ্জমানকে পথ দেখাইবার জন্য নয়। কিস্তার জল অন্ধকার। গৌরী দুই-একটা নৌকার আরোহীদের ডাকিবার চেষ্টা করিয়া ক্লান্তিবশত বিরত হইল। কেহ তাহার ডাক শুনিতে পায় না, সকলেরই বাহ্যেন্দ্রিয় দূরে বজরাটার উপর নিবদ্ধ।

গৌরী তখন তীরের দিকে চক্ষু ফিরাইল। দূরে—কত দূরে তাহা ঠিক আন্দাজ হয় না—নদীর কূল হইতে উচ্চ প্রাসাদের মূল পর্যন্ত সারি সারি শুভ্র সোপান উঠিয়া গিয়াছে—যেন কোন স্বপ্নদৃষ্ট দৈত্যপুরী। ঠাণ্ডা জলে এতক্ষণ থাকিয়া গৌরীর সমস্ত অঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছিল, সে ঐ দৈত্যপুরী লক্ষ্য করিয়া ক্লান্তভাবে সাঁতার কাটিতে লাগিল।

ঘাটের আরো কাছে যখন পৌঁছিল তখন চাঁদের ফিকা আলোয় তাহার মনে হইল, যেন ঘাটের শেষ পৈঠার উপর সারি সারি কাহারা দাঁড়াইয়া আছে। গৌরীর হাত-পা তখন শিথিল হইয়া আসিতেছে, চক্ষুর দৃষ্টি ধোঁয়া ধোঁয়া হইয়া গিয়াছে—ঘাটে পৌঁছিতে আর কত দেরি!

না, আর চলে না, দেহ অসাড় হইয়া গিয়াছে। ঘাটের উপর হইতে কে যেন চীৎকার করিয়া কি বলিল। কি বলিল?—'একটু—আর একটু বাকি। এইটুকু সাঁতার কেটে এস!' কাহার গলা? অচলবৌদির না? তবে এটুকু যেমন করিয়া হউক যাইতেই হইবে।

প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় গৌরী জল হইতে সোপানের উপর উঠিল। তারপর একজনের কুঙ্কুম-চর্চিত পায়ের নিকট মাথা রাখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

'—রমণীগণ মুকুটমণি—'

মূর্ছা ভাঙিতেই গৌরী সটান উঠিয়া বসিয়া চোখ রগ্‌ড়াইয়া বলিল—'মনে পড়েছে—ময়ূরবাহনের হাসি।' তারপর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল।

দেখিল, সে মেঝের উপর বসিয়া আছে এবং তাহাকে ঘিরিয়া একপাল সুন্দরী উৎসুক কৌতূহলীনেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। যে তরুণীটির কোলে মাথা রাখিয়া সে এতক্ষণ শুইয়া ছিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আর একজনকে মৃদুস্বরে বলিল—'খবর দে।'

গৌরী বলিল—'ব্যাপার কি? এ আমি কোথায়?'

ক্রোড়দায়িনী তরুণী চপল হাসিয়া বলিল—'আপনি স্বর্গে এসেছেন। কিস্তার জলে ডুবে গিয়েছিলেন মনে নেই?'

গৌরী বলিল—'তা হবে। আপনারা সব কারা?'

তরুণী বলিল—'আমরা সব অপ্সরী।' একটি ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা রক্তাধরা অষ্টাদশী মোহিনীকে দেখাইয়া বলিল—'ইনি হচ্ছেন উর্বশী।' আর একটিকে দেখাইয়া—'ইনি মেনকা। আর আমি—আমি রম্ভা।'

গৌরী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল—'কাঁচা না পাকা?'

যুবতী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—'আপনিই বিচার করে বলুন দেখি?' বলিয়া গৌরীর সম্মুখে বসিয়া নিজের সহাস্য মুখখানি গৌরীর চোখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

গৌরীও জহুরীর মত ভাল করিয়া পরখ করিয়া বলিল—'হুঁ, নেহাৎ কাঁচা বলা চলে না, দিব্যি রঙ ধরেছে।'

এমন সময় সুন্দরীচক্রের বাহির হইতে একজন বলিল—'আঃ—লছমি, কি বেহায়াপনা করছিস? তোরা সব সরে যা।'

সকলে সরিয়া গেলে একটি তন্বী বাঁ হাতের উপর শুষ্ক জামা কাপড় ও তোয়ালে লইয়া গৌরীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল—'এখন বেশ সুস্থ বোধ করছেন?'

গৌরী তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—'আপনি কি তিলোত্তমা?'

তন্বী বলিল—'না, আমি কৃষ্ণা। কিন্তু পরিচয় পরে হবে; এখন উঠুন, ভিজে কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে ফেলুন।'

এতক্ষণে নিজের দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গৌরী লজ্জায় একেবারে শিহরিয়া উঠিল। মুক্তার বুঁটিদার ঢিল-হাতার রেশমী পাঞ্জাবি জলে ভিজিয়া গায়ের সহিত একেবারে সাঁটিয়া গিয়াছে, নিম্নাঙ্গের পট্টবস্ত্রও তথৈবচ। সে জড়সড় হইয়া বলিল—'এ'দের সরে যেতে বলুন।'

কৃষ্ণা সকলের দিকে ফিরিয়া বলিল—'তোরা বেরো এখান থেকে।'

সকলে প্রস্থান করিল, বেহায়া তরুণীটি যাইতে যাইতে বলিল—'আচ্ছা, আমরা আসছি আবার, পেয়েছি যখন সহজে ছাড়ছি না।'

কৃষ্ণা কাপড়গুলা গৌরীর কাছে রাখিয়া বলিল—'আমাদের মহলে পুরুষের পাট নেই, তাই পুরুষের কাপড় জোগাড় করা গেল না। এগুলো সব কস্তুরীর। পরে দেখুন, স্বস্তি যদি বা না পান, সুখ পাবেন নিশ্চয়!' বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া প্রস্থান করিল।

কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে তাহা বুঝিতে গৌরীর বাকি ছিল না। সে মনে মনে ভারি একটা কৌতুকপূর্ণ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। ঝড়োয়ার পুর-ললনাদের এই অসংকোচ রঙ্গ-তামাসা তাহার মনকে যেন এক নূতন রসে অভিষিক্ত করিয়া দিল। সে ভাবিল যুবক-

যুবতীদের মধ্যে এমন সুন্দর এমন অবাধ স্বচ্ছন্দ মেলামেশা ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই। গৌরী বিবাহিত হইলে বুঝিতে পারিত, বিবাহের রাত্রে নূতন বরকে লইয়া ঠিক অনুরূপ ব্যাপার বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ঘটিয়া থাকে এবং নূতন জামাইয়ের সম্মুখে ঘোমটা ও পর্দা বাঙালীর অন্তঃপুর হইতেও নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

কাপড় তুলিয়া লইয়া গৌরী দেখিল—সেখানা ছয়-ইঞ্চি চওড়া পাড়যুক্ত ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি। মনে মনে হাসিয়া গৌরী সেখানা পরিধান করিল। কিন্তু জামা পরিতে গিয়াই লজ্জায় তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। ছি ছি, কৃষ্ণা যে বলিয়াছিল 'স্বস্তি না পান সুখ পাবেন'—তার অর্থ এই! গৌরী তাড়াতাড়ি সেটাকে তোয়ালে ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিল। মনে মনে একটু রাগও হইল। কৃষ্ণা বাহিরে বেশ ভালমানুষটি, লছমির মত চপলা নয়, কিন্তু ভিতরে তাহার এত কুবুদ্ধি! দাঁড়াও, তাহাকে জব্দ করিতে হইবে।

উত্তরীয়খানা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইতেই কৃষ্ণা পুনঃপ্রবেশ করিল, বলিল—'হয়েছে? এবার আসুন আমার সঙ্গে।'

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'কোথায় যেতে হবে?'

কৃষ্ণা বলিল—'আমি যেখানে নিয়ে যাব। অত কৌতূহল কেন?'

গৌরী বলিল—'বেশ চল। তোমার শাস্তি কিন্তু তোলা রইল।'

নিরীহভাবে কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল—'শাস্তি কিসের?'

গৌরীও পাল্টা জবাব দিল—'অত কৌতূহল কেন? শাস্তি যখন পাবে তার কারণও জানতে পারবে।'

কৃষ্ণা গৌরীকে মর্মরের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে লইয়া চলিল, সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিল—'কি হয়েছিল বলুন তো? আমরা সবাই ঘাটে দাঁড়িয়ে জল-বিহার দেখছিলাম, এমন সময় একটা ভারি গণ্ডগোল শুনতে পেলাম। তার কিছুক্ষণ পরেই আপনি ভাসতে ভাসতে আমাদের ঘাটে এসে হাজির হলেন।'

গৌরী বলিল—'কি যে হয়েছিল সেটা আমি এখনো ভাল রকম বুঝতে পারিনি। বাটুল থেকে যেমন গুলি বেরিয়ে যায় তেমনি ছিটকে কিস্তার জলে পড়েছিলুম, এইটুকুই মনে আছে।'

দ্বিতলে উঠিয়া একটা দরজার সম্মুখে কৃষ্ণা দাঁড়াইল, এক হাতে পর্দা সরাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—'ভিতরে যান!'

গৌরীর মনে হইল সে যেন তাহার জীবনের এক মহারহস্যের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সে কৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল—'আর তুমি?'

অল্প হাসিয়া কৃষ্ণা বলিল—'আমিও আছি। আপনি আগে যান।'

একটু ইতস্তত করিয়া গৌরী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রথমটা গৌরী ঘরের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ঘরটি প্রকাণ্ড, চমৎকারভাবে সাজানো, কিন্তু আসবাবের বাহুল্য নাই। ছাদ হইতে চারিটি বহু শাখাযুক্ত ঝাড় সোনালী জিঞ্জিরে ঘরের চারি কোণে ঝুলিতেছে। তাহাদের শাখায় শাখায় অসংখ্য দীপ। ঘরের কোণে কোণে আবলুস কাঠের তেপায়ার উপর প্রায় দুই ফুট উচ্চ পিতলের নারীমূর্তি। মূর্তিগুলি অর্ধনগ্ন, একহাতে স্খলিত-বস্ত্র বুকের কাছে ধরিয়া আছে—অপর হস্তটি ঊর্ধ্বোত্থিত; সেই হস্তে ধৃত অর্ধস্ফুট কমলাকৃতি পাত্র হইতে মৃদু মৃদু সুগন্ধি ধূম উত্থিত হইতেছে। ঘরের মেঝেয় কোনো আস্তরণ নাই; পঙ্খের কাজের উপর নানা বর্ণের ঝিনুক বসাইয়া অপূর্ব কারুকার্য করা হইয়াছে। তিনদিকের দেয়ালে দশফুট উচ্চ দরজা ভারী মখমলের পর্দা দিয়া ঢাকা, চতুর্থ দিকে একটি বাতায়ন। বাতায়ন দিয়া কিস্তার দৃশ্য চোখে পড়ে।

ঘরে কেহ নাই দেখিয়া গৌরী বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিল। পিছন ফিরিতেই দেখিল, যে-দরজা দিয়া সে প্রবেশ করিয়াছে তাহার বাহিরে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণা হাসিতেছে এবং ঘরের ভিতরে সেই দরজারই অনতিদূরে আর একটি নারীমূর্তি দাঁড়াইয়া আছে।

সেই মূর্তিটির দিকে চাহিয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য গৌরীর হৃৎস্পন্দন যেন রুদ্ধ হইয়া গেল।

ফলফুল লতাপাতার সহিত তুলনা করিয়া সে-রূপের বর্ণনা করা অসম্ভব। চুলচেরা বিশ্লেষণ করিতে যাওয়াও মূঢ়তা, কারণ বিশ্লেষণে শরীরটাই ধরা পড়ে—রূপ ধরা পড়ে না। গৌরী নিস্পন্দবক্ষে সেই অপরূপ মূর্তির দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার মনে হইল সে যেন অজন্তার একটি জীবন্ত চিত্র দেখিতেছে। তেমনি অপূর্ব ভঙ্গিতে কাপড়খানি পরা, চোলিটি তেমনি মধুর শাসনে ঊর্ধ্বাঙ্গের চপল লাবণ্য সংযত করিয়া রাখিয়াছে, উত্তরীয়খানি তেমনি স্বচ্ছভাবে দেহটিকে যেন চন্দ্রকিরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, চোলি ও নীবির মধ্যবর্তী স্থানটুকু তেমনি নির্লজ্জভাবে অনাবৃত; মাথায় তেমনি বিচিত্র সুন্দর কবরীবন্ধ, হস্তে তেমনি অপরিস্ফুট লীলাকমল। গৌরী নিশ্বাস ফেলিতে ভুলিয়া গেল।

জীবন্ত ছবিটির চোখ দুইটি একবার কাঁপিয়া খুলিয়া গিয়া আবার তৎক্ষণাৎ নত হইয়া পড়িল।

একটি ছোট্ট হাসির শব্দে গৌরী চমকিয়া চেতনা ফিরিয়া পাইল। সহসা তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল, সে কোথায় আসিয়াছে, এ কোন্ নন্দনবনে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে?

কৃষ্ণা হাসিতে হাসিতে আসিয়া ছবির হাত ধরিয়া বলিল—'দুজনেই যে চুপচাপ, চিনতে পারছ না নাকি? তা হবে, চোখের দেখা তো ইতিমধ্যে হয়নি, সেই যা আট বছর বয়সে একবার হয়েছিল। আচ্ছা, আমিই না হয় নূতন করে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি—ইনি হচ্ছেন দেবপাদ মহারাজ শঙ্কর সিং—তোমার বর, আর—ইনি দেবী কস্তুরীবাঈ—আপনার রানী। আর কি—পরিচয় হয়ে গেল—এবার তাহলে আমি যাই।'

কস্তুরীবাঈয়ের রজনীগন্ধার কলির মত আঙুলগুলি কৃষ্ণার হাত চাপিয়া ধরিল। কৃষ্ণা তখন কানে কানে বলিল—'আচ্ছা, আমি যাব না, রইলাম। কিন্তু তোমার প্রভু সাঁতার কেটে আজকের দিনে দেখা দিতে এসেছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা কর।' বলিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাকে গৌরীর সম্মুখে লইয়া আসিল।

গৌরী অপরাধীর মত দ্রুত-স্পন্দিত বক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইল সে ছদ্মবেশে চোরের মত পরস্ব অপহরণ করিতেছে। এই প্রীতির রত্নাগারে প্রবেশ করিবার তাহার অধিকার নাই।

কস্তুরী গৌরীর পায়ের কাছে নত হইয়া প্রণাম করিল। গৌরী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—'থাক থাক—হয়েছে।'

কৃষ্ণা বিদ্যুৎচপল চক্ষে চাহিয়া বলিল—'আপনি জল থেকে উঠেই ওঁর রাঙা পা-দুখানির ওপর মুখ রেখে শুয়ে পড়েছিলেন, তাই উনি সেটা ফেরত দিলেন।'

গৌরী দেখিল, কস্তুরীর গাল দুইটি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, সেও দেখাদেখি অত্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। তারপর লজ্জা দমন করিয়া সহজভাবে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'কি শুভক্ষণে জলে পড়ে গিয়েছিলাম, তা এখন বুঝতে পারছি।'

কৃষ্ণা কস্তুরীর গা ঠেলিয়া বলিল—নাও জবাব দাও। আমি বার বার তোমার হয়ে কথা কইতে পারি না।'

কস্তুরীর ঠোঁট দুইটি একটু কাঁপিয়া উঠিল, সে নত-নয়নে ধীরে ধীরে বলিল—'আপনার যে আঘাত লাগেনি এই আমাদের সৌভাগ্য।'

গলাটি একটু ভাঙা-ভাঙা, কথাগুলি বাধ-বাধ; কিন্তু গৌরীর মনে হইল এমন মিষ্ট কণ্ঠস্বর বুঝি আর কাহারো নাই। আরো শুনিবার আশায় সে সতৃষ্ণভাবে কস্তুরীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

দুইজনেই কিছুক্ষণ নীরব; কস্তুরী নতমুখী, নখ দিয়া পদ্মের পাতা ছিঁড়িতেছে। কৃষ্ণা হাসিয়া উঠিল—'সব কথা ফুরিয়ে গেল? আর কথা খুঁজে পাচ্ছ না?—বেশ, তাহলে এবার একটু জলযোগ হোক—আসুন।'

ঘরের মধ্যস্থলে মেঝের উপর কার্পেটের আসন বিছাইয়া জলযোগের আয়োজন সজ্জিত করা ছিল; মেঝের কারুকার্যের জন্য এতক্ষণ তাহা গৌরীর চোখে পড়ে নাই। সোনার থালায় ফলমূল ও মিষ্টান্ন সাজানো ছিল; গৌরী দেখিয়া আপত্তি করিয়া বলিল—'এত রাত্রে আবার এ সব কেন?'

কৃষ্ণা বলিল—'রাত এমন কিছু বেশী হয়নি। বসুন, রাত্রির আহারটা না হয় এখানেই সম্পন্ন হল, ক্ষতি কি? আজকের দিনে আপনাকে সামনে বসিয়ে খাইয়ে সখীর কত তৃপ্তি হবে—সেটাও ভেবে দেখুন।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গৌরী আসনে বসিল, কস্তুরী কৃষ্ণার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল—'তুমি খাওয়াও—আমি চললাম।'

কৃষ্ণা বলিল—'তা কি হয়? তুমি বসে না খাওয়ালে উনি খেতে পারবেন কেন?' গলা খাটো করিয়া বলিল—'তাছাড়া মহামান্য অতিথির অমর্যাদা হবে যে!'

দুই সখীতে মেঝের উপর বসিল। গৌরী নীরবে আহার সম্পন্ন করিয়া জলের পাত্রটা তুলিয়া লইয়া দেখিল তাহাতে লাল রঙের পানীয় রহিয়াছে। এই কয়দিন ঝিন্দে থাকিয়া সে জানিতে পারিয়াছিল যে এখানে সংযত-মাত্রায় সুরাপান করা দোষের নয়, এমন কি ছেলে-বুড়ো স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তাহা অসঙ্কোচে করিয়া থাকে। সুতরাং এ পাত্রের লাল-পানি যে কোন্ দ্রব্য তাহাতে তাহার সন্দেহ রহিল না; সে পাত্রটি নামাইয়া রাখিয়া বলিল—'আমাকে একটু সাদা জল দিন—মদ আমি খাই না।'

কৃষ্ণা বিস্ফারিতনেত্রে চাহিল; গৌরী নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া চট্ করিয়া সামলাইয়া বলিল—'অর্থাৎ ছেড়ে দিয়েছি, আর খাই না।' ঝিন্দের শঙ্কর সিং যে ঐ রক্তবর্ণ তরল পদার্থটি কিছু অধিক মাত্রায় সেবন করিয়া থাকেন একথা ঝড়োয়ার রাজপ্রাসাদে অবশ্য অবিদিত থাকিবার কথা নয়।

কস্তুরীর মুখ সহসা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে চোখ দুটি একবার গৌরীর মুখের পানে তুলিয়াই আবার নত করিয়া ফেলিল। কিন্তু এই পলকের দৃষ্টিপাতেই তাহার মনের প্রীতি-প্রফুল্ল কথাটি প্রকাশ হইয়া পড়িল। গৌরীর সারাদেহে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

কৃষ্ণা দ্রুত-পদে জল আনিতে উঠিয়া গেল, গৌরী ও কস্তুরী মুখোমুখি বসিয়া রহিল। দুইজনেই সংকুচিত; গোপনে কস্তুরীর দেহ আলোড়িত করিয়া লজ্জার একটা ঝড় বহিয়া গেল। ওড়নাখানা সে গায়ে ভাল করিয়া জড়াইয়া বসিল।

দুইজনে মুখোমুখি কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায়? এদিকে কৃষ্ণাও বোধ করি দুষ্টামি করিয়া ফিরিতে দেরি করিতেছে। গৌরী কণ্ঠের জড়তা দূর করিয়া আস্তে আস্তে বলিল—'মদ আমি ছেড়ে দিয়েছি, প্রতিজ্ঞা করেছি জীবনে আর ও জিনিস ছোঁব না।'

কথাটা বলিয়াই সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কেন সে অকারণে এই মিথ্যা কথাটা বলিতে গেল? মদ সে ধরিলই বা কবে, ছাড়িলই বা কবে? শঙ্কর সিং-এর ভূমিকা অভিনয় করিবার হয়তো প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাই বলিয়া অপ্রয়োজন মিথ্যাচারে কি আবশ্যক? সে নিজের উপর ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হইয়া উঠিল।

কিন্তু যে বস্তুটির লোভে সে নিজের অজ্ঞাতসারে ও-কথা বলিয়াছিল তাহা পাইতে বিলম্ব হইল না! আবার তেমনি একটি চকিত সলজ্জ চাহনি সুস্মিত সপ্রশংস প্রসন্নতার রসে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া দিয়া গেল।

কি আশ্চর্য চক্ষু! কি অপূর্ব সম্মোহন দৃষ্টি! গৌরী মাথা হেঁট করিয়া ভাবিতে লাগিল—এমন সুন্দর লজ্জা সে আর কোথায় দেখিয়াছে? ইহারা পুরুষের সম্মুখে অসঙ্কোচে বাহির হয়, ঘোমটার বালাই নাই, অথচ ভাব-ভঙ্গিতে কোথাও এতটুকু সম্ভ্রম-শালীনতার অভাব নাই। বাঙালীর মেয়েরা কি ইহাদের চেয়ে অধিক লজ্জাশীলা?

জলের গেলাস লইয়া কৃষ্ণা ফিরিয়া আসিল, বলিল—'ওদের আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না, ওরা আসছে সদলবলে এই ঘরে চড়াও করতে।'

জল পান করিয়া গৌরী আসনে উঠিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণা পানের বাটা কস্তুরীর হাতে দিয়া বলিল—'নাও, বরকে পান দাও।'

একটু হাসিয়া একটু লাল হইয়া কস্তুরী পানের বাটা দুই হাতে ধরিয়া গৌরীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। গৌরী সোনালী তবকমোড়া পান তুলিয়া লইয়া মুখে পুরিল।

এমন সময় আর কোনো বাধা না মানিয়া সখীর দল একঝাঁক প্রজাপতির মত ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তাহাদের কিঙ্কিনী পাঁয়জোরের শব্দে ঘর মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলে আসিয়া গৌরীকে ঘিরিয়া ধরিল; লছমি কপট অভিমানের সুরে বলিল—'সখীকে পেয়ে আমাদের ভুলে গেলেন?'

সখি-ব্যূহের বাহিরে কস্তুরী কৃষ্ণার গলা জড়াইয়া কানে কানে বলিল—'তোরা এখন যা হয় কর, আমি পালাই।' বলিয়া অলক্ষ্যে ঘর ছাড়িয়া প্রস্থান করিল।

কিছুক্ষণ লছমির সহিত রঙ্গ-তামাসার পর গৌরী কৃষ্ণাকে ডাকিয়া বলিল—'একটা বড় ভুল হয়ে গেছে, সিংগড়ে খবর পাঠানো হয়নি। তারা হয়তো ভাবছে আমি—'

কৃষ্ণা বলিল—'খবর অনেক আগে পাঠানো হয়েছে। আপনার স্মরণশক্তির যে রকম অবস্থা, প্রজাদের পক্ষে মোটেই শুভ নয়।'

গৌরী বলিল—'প্রজাপতিদের মধ্যে পড়ে প্রজাদের কথা ভুলে যাওয়া আর বিচিত্র কি?'

কৃষ্ণা বলিল—'আমরা কি প্রজাপতি—'

গৌরী হাসিয়া বলিল—'সবাই নয়। তুমি ভিমরুল।'

ভ্রূভঙ্গ করিয়া কৃষ্ণা বলিল—'কেন—আমি ভিমরুল কেন?'

গৌরী বলিল—'মধুর দিকেও তোমার লোভ আছে, আবার হুল ফোটাতেও ছাড় না।'

বাঁকা হাসিয়া কৃষ্ণা বলিল—'কখন হুল ফোটালাম?'

গৌরী একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—কস্তুরী নাই। ভর্ৎসনাপূর্ণ চক্ষু কৃষ্ণার দিকে ফিরাইয়া বলিল—'তোমার শাস্তি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম অল্প শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব, কিন্তু তা আর হতে দিলে না।'

কৃষ্ণা বলিল—'সে কি? আপনার জন্য এত করলাম, তবু শাস্তি বেড়ে গেল?'

ঘাড় নাড়িয়া গৌরী বলিল—'হ্যাঁ!'

'কি করলে শাস্তি থেকে রেহাই পাব বলুন তো?'

গৌরী উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় এক প্রৌঢ়া পরিচারিকা আসিয়া কৃষ্ণার কানে কানে কি বলিল। কৃষ্ণা পরিহাস ত্যাগ করিয়া বলিল—'সর্দার ধনঞ্জয় এসেছেন, বাহির-মহলে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

এত শীঘ্র! গৌরীর মুখখানা একটু ম্লান হইয়া গেল; সে আর একজনের চরিত্র অভিনয় করিতেছে তাহা স্মরণ হইল। তবু হাসামুখে সকলের দিকে ফিরিয়া বলিল—'আজ তাহলে চললাম। স্বর্গে আসবার ইচ্ছা হলে আবার কিস্তার জলে ডুব দেওয়া যাবে—কি বল রম্ভাবাঈ?'

বোধ হয় আগে হইতে মন্ত্রণা ছিল, সকলে একসঙ্গে হাত পাতিয়া বলিল—'আমাদের বকশিশ?'

'কি বকশিশ চাও?'

'আপনি যা দেবেন।'

'আচ্ছা বেশ। আমার সঙ্গে তো এখন কিছু নেই, এমন কি এই কাপড়টা পর্যন্ত ধার করা। আমি তোমাদের বকশিশ পাঠিয়ে দেব। ভাল কথা, তোমাদের বিয়ে হয়েছে?'

লছমি বলিল—'না, আমরা সবাই কুমারী। শুধু কৃষ্ণার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।'

গৌরী বলিল—'আচ্ছা বেশ, তাহলে কৃষ্ণা ছাড়া আর সকলকে একটি করে বকশিশ পাঠিয়ে দেব।'

কৌতূহলী লছমি জিজ্ঞাসা করিল—'কি বকশিশ দেবেন?'

'একটি করে বর।' বলিয়া হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণাকে সঙ্গে করিয়া প্রস্থান করিল।

অন্দর ও সদরের সন্ধিস্থলে কৃষ্ণা বিদায় লইল, বলিল—'আমার শাস্তি কিসে লাঘব হবে, তা তো বললেন না?'

'আজ নয়—যদি সুবিধা হয় আর একদিন বলব।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া প্রতিহারীর অনুসরণ করিয়া গৌরী সদর মহলে প্রবেশ করিল।

মজলিশ-ঘরে ঝড়োয়ার মন্ত্রী অনঙ্গদেও এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ধনঞ্জয় ও রুদ্ররূপকে সসম্মানে মধ্যে বসাইয়া আদর আপ্যায়ন করিতেছিলেন—স্বভাবতঃই নদীবক্ষে দুর্ঘটনার কথা হইতেছিল, ধনঞ্জয় একটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক আখ্যায়িকা রচনা করিয়া বুঝাইতেছিলেন যে, ব্যাপারটা নিতান্তই দৈব-দুর্ঘটনা—এমন সময় গৌরী আসিতেই সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া দাঁড়াইলেন। ধনঞ্জয় দ্রুতপদে কাছে আসিয়া সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন—মহারাজ, অক্ষত আছেন? কোনো প্রকার অসুস্থতা বোধ করছেন না?'

গৌরী হাসিয়া বলিল—'কিছু না, বরঞ্চ ভালই বোধ করছি। কিন্তু তোমার চেহারাখানা তো ভাল ঠেকছে না সর্দার?—চোট পেয়েছ?'

ধনঞ্জয় হাসিলেন; হাসিটা কিন্তু আমোদের নয়। বলিলেন—'বিশেষ কিছু নয়, শরীরে চোট সামান্যই লেগেছে। কিন্তু সে যাক।' অনঙ্গদেওয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'এখন অনুমতি করুন, রাজাকে নিয়ে আমরা সিংগড়ে ফিরি। সেখানে সকলেই অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন।'

মন্ত্রী অনঙ্গদেও ঝড়োয়ার পক্ষ হইতে রাজার বিপন্মুক্তিতে আনন্দ ও অভিনন্দন প্রকাশ করিয়া শেষে বলিলেন—'কিন্তু আজ রাত্রিটা মহারাজ এই পুরে বিশ্রাম করলে হ'ত না? মহারাজের শুভাগমন এতই আকস্মিক যে, আমরা তাঁর যোগ্য সংবর্ধনা করবার অবকাশ পেলাম না—'

ধনঞ্জয় দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—'তা সম্ভব নয়। আজ রাত্রে মহারাজকে রাজধানীতে ফিরতেই হবে। পরে মহারাজকে সংবর্ধনা করবার আপনারা অনেক সুযোগ পাবেন, আজ অনুমতি দিন।'

অনঙ্গদেও সহাস্যে বলিলেন—'উনি এখন আমাদেরও মহারাজ, ওঁর ইচ্ছাই আমাদের কাছে আদেশ।' তাঁহার সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে গৌরী ঘাড় নাড়িল—'ভাল, পঞ্চাশজন সওয়ার সঙ্গে দিই?'

একটু চিন্তা করিয়া ধনঞ্জয় বলিলেন—'তা দিন। মহারাজ জীবিত আছেন সংবাদ পেয়েই আমি রুদ্ররূপকে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এসেছি। পার্শ্বচর আনবার কথা মনেই হয়নি।'

অল্পকাল মধ্যেই সম্মুখে ও পশ্চাতে পঞ্চাশজন বল্লমধারী ঘোড়সওয়ার লইয়া তিনজন অশ্বারোহণে বাহির হইয়া পড়িলেন।

পথে কোনো কথা হইল না। গৌরী ঘোড়ার উপর বসিয়া হেঁটমুখে নিজের চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিল। কিস্তার সেতু পার হইয়া সিংগড়ে পদার্পণ করিবার পর, ধনঞ্জয় একবার মাত্র কথা কহিলেন, তীক্ষ্ণ চক্ষু তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন—'রানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল?'

গৌরী নিদ্রোত্থিতের মত মুখ তুলিয়া বলিল—'হয়েছিল।'

ধনঞ্জয় আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখ ভীষণ অন্ধকার ও ভ্রুকুটি-কুটিল হইয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণা

সিংগড়ের প্রাসাদের একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে গোপন মন্ত্রণাসভা বসিয়াছিল। গৌরী, ধনঞ্জয় ও বজ্রপাণি গালিচার উপর আসীন ছিলেন, রুদ্ররূপ দ্বারে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল। রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে ; নগরের আমোদ-প্রমোদ রাজার মৃত্যু-সংবাদে থামিয়া গিয়াছিল, আবার দ্বিগুণ উৎসাহে আরম্ভ হইয়াছে। দূর হইতে তাহার কলরব কানে আসিতেছে।

বজ্রপাণি ললাটের একটা কাল্‌-শিরার উপর সন্তর্পণে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—'বিপদ এই যে, এ নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে রাজ্যসুদ্ধ এমন একটা সোরগোল পড়ে যাবে—যা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। ময়ূর নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য যদি ভিতরের কথাটা ফাঁস করে দেয় তাহলে আমাদের অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে উঠবে। শঙ্কর সিং-এর বদলে অন্য একজনকে রাজা খাড়া করেছি, এমন কি অভিষেক পর্যন্ত করিয়েছি. এই অভিযোগ যদি সে প্রকাশ্য দরবারে আনে—তার সদুত্তর আমাদের পক্ষ থেকে কি আছে?'

ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ অভিযোগ লোকে বিশ্বাস করবে?'

বজ্রপাণি বলিলেন—'বিশ্বাস না করুক, একটা সন্দেহ তো জন্মাতে পারে। ময়ূরবাহন যে-প্রকৃতির লোক, তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত সে উদিতকেও ফাঁসিয়ে দিতে পারে, বলতে পারে আসল রাজাকে উদিত শক্তিগড়ে বন্দী করে রেখেছে।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'ওকথা যদি বলে—তাহলে সে নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়বে, শঙ্করকে গুম করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়বে।'

বজ্রপাণি বলিলেন—'কিন্তু তাতে আমাদের কোনো লাভ হবে কি? বরং শঙ্কর সিং যদি-বা এখনো বেঁচে থাকেন, তাঁর প্রাণ সংশয় হয়ে উঠবে।'

গৌরী অজ্ঞাতসারে একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ বজ্রপাণি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ যে ময়ূরবাহনের কাজ তাতে আপনার কোনো সন্দেহ নেই?'

গৌরী বলিল—'বিন্দুমাত্র না। সে হাসি ময়ূরবাহনের, একথা আমি হলফ নিয়ে বলতে পারি।'

'আপনি তাকে চোখে দেখেননি?'

'না।'

'এক হাসি ছাড়া আপনার আর কোনো প্রমাণই নেই?'

'না—কিন্তু—'

বজ্রপাণি হাত তুলিয়া বলিলেন—'জানি। এ যে ময়ূরবাহনের কাজ তাতে আমারও কোনো সংশয় নেই। সে ছাড়া এমন কাজ করবার দুঃসাহস উদিত সিং-এরও নেই। কিন্তু কথা তো তা নয়। ময়ূরবাহনকে শাস্তি দিতে গেলে তার অপরাধ সকলের সামনে সাবুদ করতে হবে। ময়ূরবাহন কি নিজের দোষ স্বীকার করবে ভেবেছেন? বরঞ্চ পঁচিশটা সাক্ষী এনে প্রমাণ করে দেবে যে, ও-সময় সে আর এক জায়গায় ছিল। তখন তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রমাণ কি? শুধু ঐ হাসি ছাড়া আর কিছু আছে কি?'

ধনঞ্জয় অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন—'কিন্তু এত প্রমাণ খুঁজে বেড়াবারই বা দরকার কি? রাজার হুকুমে যদি আমরা তাকে ধরে এনে কয়েদ করে রাখি কিম্বা যদি কোতল করি, তাহলেই বা কে কি বলতে পারে? প্রজার দণ্ডমুণ্ডের উপর রাজার সম্পূর্ণ অধিকার আছে—অন্তত আমাদের দেশে আছে। রাজা আইন মেনে চলতে বাধ্য নয়।'

বজ্রপাণি ক্লান্ত হাসিয়া বলিলেন—'তুমি বুঝছ না ধনঞ্জয়, রাজার দণ্ডমুণ্ডের অধিকার

আছে সে আমিও জানি। কিন্তু ময়ূরবাহন একজন সামান্য মজুর বা দোকানদার নয়, সে দেশের একজন গণ্যমান্য লোক, তার একজন মস্ত মুরুব্বি আছে। রাজা সিংহাসনে বসেই যদি তাকে ধরে এনে বিনা-বিচারে কোতল করেন, তাহলে রাজ্যে কি ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি হবে—সেটা ভেবে দেখ। উদিত এই নিয়ে দেশের লোককে ক্ষেপিয়ে তুলবে, ইংরেজ গভর্নমেণ্টকে এর মধ্যে টেনে আনবে। তার ওপর জাল-রাজার কথাটা যদি কোনোক্রমে বেরিয়ে পড়ে তখন ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে একবার বুঝে দেখ।'

কিছুক্ষণ সকলে নতমুখে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, বৃদ্ধ মন্ত্রীর অকাট্য যুক্তিজাল ভেদ করিয়া ময়ূরবাহনকে শাস্তি দিবার কোনো পন্থাই খুঁজিয়া পাইলেন না।

ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কি করতে বলেন?'

দীর্ঘকাল নীরব থাকিয়া শেষে বজ্রপাণি বলিলেন—'আজ রাগের মাথায় মরিয়া হয়ে ওরা এই দুঃসাহসিকতার কাজ করে ফেলেছে, তাদের নৌকাখানা ডুবে না যেতেও পারত—মাঝি-মাল্লারা ধরা পড়তে পারত, এমন কি স্বয়ং ময়ূরবাহন হাতে হাতে গ্রেপ্তার হতে পারত। সুতরাং এরকম কাজ আর তারা সহজে করবে বলে মনে হয় না।—এক ভয় গুপ্ত-হত্যা—এঁকে গুপ্তভাবে খুন করবার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু সেজন্য আমি ভয় করি না। সতর্ক থাকলে ওদিক থেকে কোনো আশঙ্কা নেই।'

গৌরী নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিল—'রাজা হবার সুখ তো অনেক দেখতে পাচ্ছি।'

বজ্রপাণি বলিলেন—'আমার মতে এখন কিছুদিন চুপচাপ বসে থাকাই একমাত্র যুক্তি। শঙ্কর সিং যে শক্তিগড়ে আছেন এটা আমাদের অনুমান মাত্র—সে-সম্বন্ধে আগে নিঃসংশয় হয়ে তারপর তাঁকে উদ্ধার করবার মতলব ঠিক করা যাক। ইতিমধ্যে ময়ূরবাহনকে যদি কোনো রকমে ফাঁদে ফেলতে পারি—' কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি অন্যমনস্কভাবে কপালের স্ফীত স্থানটায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'কিন্তু ইতিমধ্যে শঙ্কর সিংকে উদিত যদি খুন করে?'

মাথা নাড়িয়া ধনঞ্জয় বলিলেন—'তা করবে না। আপনি যে জাল-রাজা তার একমাত্র প্রমাণ তাহলে লুপ্ত হয়ে যাবে। উদিত নিজের ভাইকে খুন করে আপনাকে গদিতে বসাবে—এতবড় পাগল সে নয়।'

এই সময় বাহিরে পদধ্বনি শুনা গেল। রুদ্ররূপ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল; দ্বারের বাহিরে কিছুক্ষণ নিম্নস্বরে কথোপকথন হইল, তারপর রুদ্ররূপ ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'মাঝিমাল্লার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। নৌকার জন্য ডুবুরি নামানো হয়েছিল কিন্তু নৌকা পাওয়া গেল না; খুব সম্ভব কিস্তার স্রোতের টানের তলায় তলায় ভেসে গেছে।'

সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া সংবাদ শুনিলেন। কিয়ৎকাল পরে ধনঞ্জয় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'হুঁ। ময়ূরবাহনের কপাল ভাল।'

প্রাসাদের দেউড়িতে মধ্যরাত্রির ঘণ্টা বাজিল। কিন্তু কাহারো কানে তাহা পৌঁছিল না, সকলে নিজ নিজ চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন।

বাহিরে আবার পদশব্দ হইল। এবার পদশব্দ অপেক্ষাকৃত লঘু, অন্দর মহলের দিক হইতে আসিল। রুদ্ররূপ আবার বাহিরে গেল, অল্পকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া গৌরীর কানে কানে কি বলিল।

গৌরী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—'কি! চম্পা আমার জন্যে জেগে বসে আছে! সত্যিই তো, আমি না ঘুমুলে যে সে বেচারীর ঘুমোবার হুকুম নেই! কচি মেয়েটার ওপর কি অত্যাচার দেখ দেখি! না, কালই আমি ওকে ওর বাপের কাছে পাঠিয়ে দেব।—এখন তোমরা মন্ত্রণা শেষ কর সর্দার, আমি চললাম।' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ধনঞ্জয়ও উঠিয়া অর্ধপথে একটা হাই নিরুদ্ধ করিয়া বলিলেন—'চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই। আজ রাতটাও আমাকে বসেই কাটাতে হবে।'

গৌরী বাধা দিয়া বলিল—'না না—সর্দার, তুমি ভারি ক্লান্ত হয়েছ, যাও, নিজের

বাড়িতে একটু বিশ্রাম করে নাও গে। তোমার বদলে রুদ্ররূপ আমার কাছে থাকবে'খন।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'তা হয় না—আমাকেই থাকতে হবে।'

গৌরী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'আমি হুকুম দিচ্ছি সর্দার, তুমি এই মুহূর্তে বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কর গে, বেলা আটটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠবে না। যাও—রাজার আদেশ—দ্বিরুক্তি করো না।'

গৌরী পরিহাসের ভঙ্গিতেই কথাটা বলিল বটে, কিন্তু এই পরিহাসের অন্তরালে যে সত্যকার একটা জোর আছে তাহা ধনঞ্জয়ও অনুভব করিলেন। এই বাঙালী যুবকটিকে তাঁহারা রাজা সাজাইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার যে একটা অত্যন্ত জোরালো স্বাধীন ইচ্ছা আছে, সকল সময় ইহাকে লইয়া পুতুল-খেলা চলিবে না—তাহার প্রথম ইঙ্গিত পাইয়া ধনঞ্জয় ও ভার্গব দুইজনেই সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিলেন।

ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসুভাবে ভার্গবের দিকে ফিরিতেই তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন—'উনি ঠিক বলেছেন। তুমি যাও, তোমার বিশ্রাম করা নিতান্ত দরকার। রুদ্ররূপ আজ ওঁর প্রহরীর কাজ করুক।'

ধনঞ্জয় গৌরীর দিকে ফিরিয়া ফৌজী স্যালুট্ করিয়া বলিলেন—'যো হুকুম!'

তাহার চোখের দৃষ্টিতে যদি বা একটু শ্লেষের আভাস প্রকাশ পাইল, কণ্ঠস্বরে তাহার লেশমাত্র ধরা পড়িল না।

গৌরী একটু হাসিল, তারপর রুদ্ররূপের স্কন্ধে হাত রাখিয়া ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সিংগড়ের রাজপ্রাসাদে যখন এইরূপ মন্ত্রণা শেষ হইতেছিল, বেতপুরের রাজ-অন্তঃপুরেও একটি শয়নকক্ষে তখন সখীতে-সখীতে গোপন মন্ত্রণা চলিতেছিল। মন্ত্রণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। শয়নকক্ষের নিভৃত নির্জনতায় দুইটি অন্তরঙ্গ সখীতে যে-সকল মনের কথা হয়, তাহা সাধারণের শ্রোতব্য নয়। শুধু সত্যের অনুরোধেই তাহা প্রকাশ করিতে হইতেছে।

কস্তুরীর শয়নকক্ষ হইতে অনেক রাত্রে নিদ্রালু সখীরা একে একে প্রস্থান করিলে পর কৃষ্ণা বলিল—'এবার ঘুমোও। আলো নিবিয়ে দিই?'

শয়নঘরে দুইটি পালঙ্ক; একটিতে কস্তুরী শয়ন করে, অন্যটিতে প্রিয়সখী কৃষ্ণা। কস্তুরী শুইয়া পড়িয়াছিল, কৃষ্ণা তখনো চুলের বিনুনি খুলিতে খুলিতে ঘরে অলস-ভাবে ঘুরিতেছিল।

কস্তুরী বলিল—'আর একটু থাক! তোর বুঝি ঘুম পাচ্ছে?'

কৃষ্ণা একটা হাই গোপন করিয়া বলিল—'হ্যাঁ।' মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তোমার বুঝি আজ আর চোখে ঘুম নেই?'

কস্তুরী কৃষ্ণার দিকে চাহিয়া একটু সলজ্জ হাসিল।

কৃষ্ণা নিজের পালঙ্কে গিয়া বসিল, বলিল—'কি ভাবা হচ্ছে জানতে পারি কি?'

'কিছু না। তুই খানিক আমার কাছে এসে শো।'

কৃষ্ণা চোখে দুষ্টামি ভরিয়া বলিল—'এরি মধ্যে একলা শুতে ভাল লাগছে না?'

'দূর হ' পোড়ারমুখি!'

'দূর তো হবই। তখন কি আর আমাকে ঘরে ঢুকতে দেবে?'

'তুই না হয় তখন বিজয়লালের ঘরে যাস।'

'তাই যাব। তুমি চলে গেলে আর কি আমি এ মহলে থাকব ভেবেছ?' হঠাৎ কৃষ্ণার দুইচক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কস্তুরী দুই হাত বাড়াইয়া বলিল—'আয় কৃষ্ণা।—আচ্ছা, আলোটা নিবিয়েই দে।'

আলো নিবাইয়া কৃষ্ণা কস্তুরীর পাশে আসিয়া শয়ন করিল। দুই সখী কিছুক্ষণ

নীরব হইয়া রহিল। তারপর কৃষ্ণা বলিল—'আচ্ছা, বিয়ের পরও তো তুমি এ বাড়িতে থাকতে পার। তখন তো দুই রাজ্যই এক হয়ে যাবে। তিনি কি তোমাকে এখানে থাকতে দেবেন না?'

কস্তুরী জবাব দিল না: কৃষ্ণা আবার নিজমনেই বলিল—'না,, তা কি করে দেবেন? তাঁকে তো সিংগড়েই থাকতে হবে, আর তোমাকে ছেড়েও তিনি থাকতে পারবেন না। এ বাড়ি তখন শূন্য পড়ে থাকবে।'

কৃষ্ণার গলা জড়াইয়া কস্তুরী বলিল—'তখন তুই এ মহলে থাকিস। আমি রোজ কিস্তা পার হয়ে তোকে দেখে যাব।'

কৃষ্ণা বলিল—'তা কি করে হবে? তোমার মালিক যেমন তোমাকে নিজের রাজ্যে নিয়ে যাবেন, আমার মালিকও তো আমাকে নিজের ভাঙা কুঁড়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে পুরবে।'

কস্তুরী বলিল—'সেই ভাঙা কুঁড়ে ঘরে যাবার জন্যে তোর প্রাণ কি করছে তা যদি না জানতাম, তাহলে কি তোকে আমি ছেড়ে দিতাম কৃষ্ণা? আমার সঙ্গে নিয়ে যেতাম।'

দুই সখীতে অনেকক্ষণ নীরবে শুইয়া রহিল। শেষে একটা প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস দমন করিয়া কৃষ্ণা বলিল—'ও-কথা থাক—ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়।—আজ কেমন দেখলে বল।'

'কাকে?'

'আহা, বুঝতে পারেননি যেন।'

কস্তুরী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'আগে তুই বল, তোর কেমন লাগল।'

'আমার আর কেমন লাগা-লাগি কি? ভাল লাগলেও তুমি তো আর প্রাণ ধরে কাউকে ভাগ দিতে পারবে না।'

'ভাগ চাস?'

'চাইলেও অন্যায় হয় না।'

'কেন?'

'আমার প্রিয়সখীকে তিনি যে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তার বদলে আমায় কি দিয়েছেন? খালি শাস্তি দেবেন বলে ভয় দেখিয়েছেন।'

কস্তুরী ধরা-ধরা গলায় বলিল—'তোর সখীকে তোর কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না কৃষ্ণা। এ জন্মে নয়।'

'এ জন্মে নয়? ঠিক?'

'ঠিক।'

'আচ্ছা, আমিও তবে আর কিছু চাই না। আমার সখী আর আমার—' কানে কানে—'বিজয়লালের কুঁড়ে ঘর যতদিন আমার আছে ততদিন আমি তাদের বদলে স্বর্গও চাইনে।'

'এবার তবে বল্, তোর কেমন লাগল।'

কৃষ্ণা অনেকক্ষণ উত্তর দিল না; তারপর আস্তে আস্তে যেন চিন্তা করিতে করিতে বলিল—'দেখ, ওঁর নামে অনেক কথাই আমাদের কানে এসেছে। কথাগুলো এতদিন অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ হয়নি—রাজপুত্রেরা বেশীর ভাগই তো ঐ রকম হয়ে থাকেন। কিন্তু আজ তাঁকে দেখে মনে হল, তাঁর সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম তার অধিকাংশই মিথ্যে কথা।'

কস্তুরী বলিয়া উঠিল—'সব মিথ্যে কথা কৃষ্ণা— একটা কথাও সত্যি নয়!'

কৃষ্ণা বলিল—'হ্যাঁ।—দেখ, এক বিষয়ে আমরা গেরস্তর মেয়েরা রানীদের চেয়ে সুখী—আমরা স্বামীকে পুরোপুরি পাই। তাই, তোমার কথা ভেবে মনকে চোখ ঠারছিলাম বটে, কিন্তু প্রাণে আমার সুখ ছিল না। আজ একটিবার মাত্র ওঁকে দেখে আমার প্রাণে শান্তি ফিরে এসেছে; বুঝেছি, আমার এই অনাঘ্রাত ফুলটি সত্যিই মহেশ্বরের পায়ে পড়বে।'

কস্তুরী নীরবে উদ্বেলিত হৃদয়ে এই অমৃততুল্য কথা শুনিতে লাগিল। তাহার মনে হইল কৃষ্ণাকে এত মিষ্টি কথা বলিতে সে আর কখনো শুনে নাই। মাটির ঠাকুরকে অভ্যাসমত পূজা করিতে বসিয়া যাহারা অপ্রত্যাশিতভাবে জীবন্ত হৃদয়দেবতাকে সম্মুখে পায় তাহাদের মনের ভাব বুঝি এমনিই হয়।

কৃষ্ণা বলিতে লাগিল—'পুরুষ মানুষ মন্দ কি ভাল, তার চোখের চাউনি দেখে ধরা যায়। আজ উনি তোমার দিকে চাইলেন, মনে হল যেন চোখ দিয়ে তোমার আরতি করলেন।—যার মনে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে লোভ আছে সে অমন করে চাইতে পারে না। সত্যি বলছি, ওঁর সম্বন্ধে কোনো কুৎসাই আর আমার বিশ্বাস হয় না।'

অর্ধ-রুদ্ধকণ্ঠে কস্তুরী বলিল—'আমারও না। যতদিন দেখিনি ততদিন মনে হত হয়তো সত্যি। কিন্তু এখন—'

'এখন আমার সখীর জীবন-যৌবন সফল হল। কবি গেয়েছেন জান তো?—'তব যৌবন যব সুপুরুষ সঙ্গ!''

অতঃপর দুইজনে বহুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। শেষে কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল—'কি ভাবছ?'

কস্তুরী থামিয়া থামিয়া বলিল—'ভাবছি—একটা কথা।'

'কি কথা?'

'বলব না।'

'লক্ষ্মীটি বল। আমার কাছে মনের কথা লুকোলে কিন্তু ভারি রাগ করব।'

কৃষ্ণার বুকে মুখ গুঁজিয়া মৃদু অস্ফুটস্বরে কস্তুরী বলিল—'ভাবছি, আবার কবে দেখতে পাব।'

কৃষ্ণা কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল—'এখনো যে তিন ঘণ্টা হয়নি—এরি মধ্যে আর না দেখে থাকতে পারছ না?'

কস্তুরী বলিল—'তুই যে বিজয়লালকে রোজ দেখিস, একদিন যদি ঘোড়ায় চড়ে তোর জানলার সামনে এসে না দাঁড়ায় তাহলে সারাদিন ছটফট করে বেড়াস! সে বুঝি কিছু নয়?'

'আমার কথা ছেড়ে দাও, আমার বদ্ অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু তোমার এরি মধ্যে এই! এখনি দেখেছ—আবার এখনি দেখবার জন্য পাগল! তুমি যে শকুন্তলাকেও হার মানালে!'

'কতটুকুই বা দেখেছি?'

'কেন, আর একটু বেশী করে দেখে নিলেই পারতে? তখন তো কেবলই পালাই পালাই করছিলে!'

'ভারি যে লজ্জা করছিল।'

'তা আমি কি করব—এখন লজ্জার ফল ভোগ কর।'

'কৃষ্ণা—সত্যি বল, আবার কবে দেখা হবে?'

'বিয়ের রাত্রে।'

কস্তুরী চুপ করিয়া রহিল; কৃষ্ণা তাহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল—'অতখানি বুঝি সবুর সইবে না? তার আগেই দেখতে হবে?—বেশ, মন্ত্রীমশায়কে বলি তিনি রাজাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠান।'

'দূর। সে কি ভাল হবে?'

'কেন মন্দই বা কি হবে? তিনি আজ যেভাবে এসেছিলেন তাতে আমরা তাঁকে সমুচিত সংবর্ধনা করতে পারিনি। তাই তাঁকে যদি এবার নিমন্ত্রণ করে আনা হয় তাতে দোষ কি হবে?'

কস্তুরী নীরব রহিল দেখিয়া কৃষ্ণা বুঝিল, ইহাও তাহার মনঃপূত নয়, বলিল—'এতেও মন উঠছে না? তবে কি চাই, খুলে বল না।'

কস্তুরী বলিল—'আর আমি বল্‌তে পারি না। বুঝেছিস তো।'

'কি?'

'তুই একবার দেখা।'

কৃষ্ণা হাসিল—'অর্থাৎ লুকিয়ে লুকিয়ে—কেউ জানবে না—এই তো?'

কস্তুরী মৌন। কৃষ্ণা তখন বলিল—'আচ্ছা, তা আর শক্ত কি? শুধু একবারটি দেখা নিয়ে তো কথা? উনি কিস্তায় জলবিহার করতে বেরুবেন তার বন্দোবস্ত করছি—তুমি ঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখো। তাহ'লে হবে তো?'

'কৃষ্ণা, তুই বড্ড জ্বালাস!'

'হুঁ, তার মানে শুধু দেখলে মন ভরবে না, দেখা দেওয়াও চাই। কেমন?'

কস্তুরী কৃষ্ণাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুপ করিয়া রহিল. কৃষ্ণা বলিল—'বুঝেছি। কিন্তু কাজটি তো সহজ নয়। একটু ভাবতে হবে।'

'তা ভাব না—কে বারণ করেছে?'

'কিন্তু আজ নয়, ওদিকে সকাল হতে চলল—হুঁশ আছে? এবার ঘুমিয়ে পড়।'

কৃষ্ণা উঠিয়া পড়িল, নিজের শয্যায় গিয়া শুইবার উপক্রম করিয়া বলিল—'কিন্তু আমার একার বুদ্ধিতে বোধ হয় কুলোবে না—আর একজনের সাহায্য চাই।'

'কার?'

'আমার একজন মন্ত্রী আছে—তার।'

কস্তুরী হাসিয়া বলিল—'তা বেশ তো, কাল বাড়ি যা না। অনেক দিন তো যাসনি।'

কৃষ্ণা বলিল—'উঃ কি দরদ! অনুমতি দিতে একটুও দেরি হল না।' বলিয়া কৃষ্ণা শুইয়া পড়িল।

একটা কৌতূহল কস্তুরীর মনটাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল, সে জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা কৃষ্ণা, তুই বিজয়লালকে খুব ভালবাসিস?'

'কেন বল দেখি?'

'সব সময় তার কথা ভাবিস?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, দেখা হলে কি করিস?'

'হাসি, কথা কই, গল্প করি!'

'আর— '

'আর কিচ্ছু না—ঐ পর্যন্ত।' একটু থামিয়া বলিল—'একদিন শুধু পান দিতে গিয়ে হাতে হাত ঠেকে গিয়েছিল।'

'সেটি বুঝি মনে গেঁথে রেখেছিস?'

কৃষ্ণা চোখ বুজিয়া আবার সেই স্পর্শটা নূতন করিয়া অনুভব করিয়া লইল, বলিল—'ইচ্ছে করে মনে গেঁথে রেখেছি তা নয়— ভুলতে পারা যায় না।'

কস্তুরী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল—'আচ্ছা, এবার ঘুমো।'

দু'জনেই ঘুমাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঘুম সহসা আসিল না। দীর্ঘকাল এইভাবে কাটিবার পর কৃষ্ণা একবার জিজ্ঞাসা করিল,—'ঘুমোলে?'

'না। কেন?'

'একটা কথা ভাবছি।'

'কি কথা?'

'তোমাদের দেখা-সাক্ষাৎ আমি ঘটাতে পারি, কিন্তু লোকে জানতে পারলে তোমার নিন্দে হবে।'

এইবার কস্তুরীর কণ্ঠে রানীর সতেজ অভিমান প্রকাশ পাইল, সে বলিল—'আমার মালিকের সঙ্গে যদি আমি দেখা করি—কার কি বলবার আছে? আর, আমার কাজের

সমালোচনাই বা করে কে?'

এই অসহিষ্ণুতায় কৃষ্ণা অন্ধকারে মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল—'তা ঠিক!—কাল তাহলে আমি বাপের বাড়ি যাব?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, আজ তবে আর কথা নয়।'

দুই সখী পাশ ফিরিয়া শুইল।

দশম পরিচ্ছেদ

বিষ্কম্ভক

পরদিন প্রভাতে ঈষৎ জ্বরভাব লইয়া গৌরী শয্যাত্যাগ করিল। তাহার শরীরে রোগ প্রতিরোধ করিবার প্রভূত শক্তি সঞ্চিত ছিল, তাই ক্লান্ত দেহের উপর জলমজ্জনেও তাহাকে বিশেষ কাবু করিতে পারে নাই—নচেৎ নিউমোনিয়া কি ঐ জাতীয় কোনো রোগ পাকাইয়া তোলা অসম্ভব ছিল না।

উপরন্তু কাল রাত্রে ঘুমও ভাল হয় নাই। রুদ্ররূপকে শয়নঘরের দ্বারের কাছে পাহারায় রাখিয়া যে শয্যা আশ্রয় করিয়াছিল বটে—কিন্তু নানা চিন্তায় রাত্রি তিনটা পর্যন্ত নিদ্রা তাহার চোখে দেখা দেয় নাই। যতই তাহার মন কস্তুরীবাঈকে কেন্দ্র করিয়া মাধুর্যের রসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিতেছিল, মাধুর্যের আবেশে একথাও সে কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই যে,—সে অনধিকারী, এই সাহচর্যের অমৃত মনে মনে আস্বাদন করিবারও তাহার সত্যকার দাবী নাই। কে সে? আজ যদি শংকর সিংকে উদ্ধার করা যায়, কাল গৌরীশংকর রায় নামধারী যুবককে ছদ্মবেশে মুখ লুকাইয়া এদেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। আর তাহাই তো ঘটিবে—আজ হোক, কাল হোক, শংকর সিং ফিরিয়া আসিয়া নিজের ন্যায্য স্থান অধিকার করিবে, কস্তুরীবাঈয়ের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। তখন এই অখ্যাতনামা বাঙালী যুবককে কে স্মরণ রাখিবে? দু' একটা ধন্যবাদের বাঁধাবুলি বলিয়া তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া দিবে। কস্তুরী কিছু জানিতেও পারিবে না।

কিন্তু শংকর সিং যদি ফিরিয়া না আসে? যদি উদিত তাহাকে সত্যই খুন করিয়া থাকে?—গৌরী জোর করিয়া এ চিন্তা মন হইতে দূরে ঠেলিয়া দিল। সে সম্ভাবনার কথা ভাবিতেও তাহার বুক দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কস্তুরীকেও সে মন হইতে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। না— পরের বাগ্‌দত্তা স্ত্রীর কথা সে ভাবিবে না, এবং ভবিষ্যতে—যদিও সে সম্ভাবনা খুবই কম—যাহাতে দেখা না হয় সেদিকে সতর্ক থাকিবে।

এইরূপ স্থির করিয়া সে শেষরাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

প্রাতে উঠিয়া সে দেখিল চম্পা দ্বারের কাছে হাজির আছে। আশ্চর্য হইয়া বলিল—'চম্পা, তুমি কি রাত্রে ঘুমোও না?'

চম্পা সরল চোখদুটি তুলিয়া বলিল—'ঘুমিয়েছিলাম তো!'

গৌরী বলিল—'কিন্তু এত সকালে উঠলে কি করে?'

চম্পা গম্ভীরভাবে বলিল—'আমি না উঠলে যে মহলের আর কেউ ওঠে না, সবাই কাজে গাফ্লৎ করে। তাই সবার আগে আমায় উঠতে হয়।'

গৌরী হাসিল। বৃহৎ রাজ-সংসারের সহস্র কর্মভারে অবনত এই ছোট্ট মেয়েটি তাহার স্নেহ জয় করিয়া লইয়াছিল। তাহার মনে হইল চম্পা যেন এই ঝিন্দ্ রাজবংশের রাজলক্ষ্মী। এত সহজ সরল অথচ এমন গৃহিণীর মত কর্মপটু মেয়ে সে আর কখনো দেখে নাই! চম্পাকে প্রাসাদের দাসী চাকরানী অত্যন্ত সম্ভ্রম ও ভয় করিয়া চলে তাহা সে দেখিয়াছিল। মাঝে যে-কয়মাস চম্পা ছিল না, সে-কয়মাস রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে একপ্রকার অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল; চম্পার পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আবার সেখানে শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিয়াছে।

গৌরীর অসুস্থতার কথা শুনিয়া চম্পা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—'ডাক্তারকে ডেকে পাঠাই। এখনো তো সর্দারজি আসেননি, রুদ্ররূপকেই পাঠাই।'

'রুদ্ররূপ কোথায়?'

চম্পা হাসিয়া বলিল—'আপনার দোরের বাইরে নাক ডাকিয়ে পাহারা দিচ্ছে।'

'আহা, বেচারা বোধহয় শেষরাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছে, তাকে এখন ডেকো না। আমার ডাক্তারের দরকার নেই, তুমি শুধু একবাটি গরম দুধ আমাকে পাঠিয়ে দাও।'

'তা আনছি। কিন্তু ডাক্তারেরও আসা দরকার।'—বলিয়া চম্পা প্রস্থান করিল।

অল্পকাল পরেই রুদ্ররূপ ঘরে ঢুকিয়া স্যালুট্ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার গায়ে তখনো গত রাত্রির যোদ্ধৃবেশ, কোমরে লম্বিত তলোয়ার, মাথার পাগড়ি অটুট—কিন্তু চোখে ঘুম জড়াইয়া রহিয়াছে। গৌরী হাসিয়া বলিল—'চম্পা ঘুমতে দিলে না?'

রুদ্ররূপ লজ্জিতভাবে বলিল—'সকালবেলা একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল।'

'তা হোক—বোসো—' গৌরী নিজে একটা কৌচে বসিয়াছিল, পাশের স্থানটা দেখাইয়া দিল।

রুদ্ররূপ বলিল—'কিন্তু চম্পাদেঈ যে ডাক্তার ডাকতে বললেন!'

'তা বলুক—তুমি বোসো।'

রাজার পাশে একাসনে বসিতে রুদ্ররূপ রাজী হইল না। সে ঘরের এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু নিম্ন আসন কিছু চোখে পড়িল না। তাহাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া গৌরী বলিল—'আমার পাশে এসে বোসো, এখন তো বাইরের কেউ নেই।'

রুদ্ররূপ তখন সঙ্কুচিত হইয়া কৌচের একপাশে বসিল। কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর বাহিরে চম্পার পদধ্বনি শুনা গেল। রুদ্ররূপ অমনি তড়াক করিয়া উঠিয়া ফৌজী-প্রথায় শক্ত হইয়া গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকাইয়া যষ্টিবৎ দাঁড়াইল। রাজার পাশে একাসনে বসিবার বেয়াদবি যদি চম্পার চোখে পড়ে তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিবে না।

রেকাবের উপর দুধের বাটি লইয়া চম্পা প্রবেশ করিল। রুদ্ররূপকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—'তুমি এখনো যাওনি যে?'

রুদ্ররূপ চম্‌কাইয়া উঠিয়া আমতা-আমতা করিয়া বলিল—'কুমার বললেন যে ডাক্তারের দরকার নেই।'

চম্পা মুখ রাঙা করিয়া বলিল—'রাজার মত নিতে আমি তোমায় বলেছিলাম?'

রুদ্ররূপ অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিল। চম্পা দ্বারের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিল—'যাও এখনি।'

করুণ নেত্রে রুদ্ররূপ গৌরীর দিকে চাহিল। গৌরী হাসিতে লাগিল, বলিল—'যাও, রুদ্ররূপ। এ মহলে চম্পার হুকুমই সকলকে মেনে চলতে হয়—এমন কি আমাকেও।'

'যো হুকুম' বলিয়া রুদ্ররূপ দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

দুধের বাটিতে এক চুমুক দিয়া গৌরী সকৌতুকে বলিল—'এখানে সবাই তোমাকে ভয়ঙ্কর ভয় করে—না চম্পা?'

চম্পা সহজভাবে সায় দিয়া বলিল—'হ্যাঁ।'

'বিশেষত রুদ্ররূপ।'

'ও ভারি বোকা—তাই ওকে কেবলি বকতে হয়।'

গৌরী হাসিয়া উঠিল। দুধের বাটি শূন্য করিয়া চম্পার হাতে ফেরত দিয়া বলিল—'যাও, গিন্নি ঠাকরুণ, এখন সংসারের কাজকর্ম কর গে।'

রুদ্ররূপ অবিলম্বে ডাক্তার লইয়া ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার গঙ্গানাথ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—'বিশেষ কিছু নয়, একটু ঠান্ডা লেগেছে। আজ আর কোনো পরিশ্রম করবেন না—ঘরেই থাকুন।' ব্র্যাণ্ডি ও কুইনিনের ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে রুদ্ররূপকে জোর করিয়া ছুটি দিয়া গৌরী একাকী হেলান দিয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল। কলিকাতা ছাড়িবার পর আজ অসুস্থদেহে তাহার বাড়ির কথা মনে পড়িল। এ কয়দিন অভিষেকের আয়োজন ও হুড়াহুড়িতে কাহারো নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না—দাদাকে পৌঁছানোর সংবাদ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিল, তাহাও ঘটিয়া উঠে নাই। দাদা বৌদিদি নিশ্চয় উদ্বেগে কালযাপন করিতেছেন। আর বিলম্ব করিলে হয়তো দাদা নিজেই টেলিগ্রাম করিয়া সংবাদ জানিতে চাহিবেন। অভিষেক হইয়া গিয়াছে—এ খবর অবশ্য তিনি সংবাদপত্র জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু গৌরীই যে রাজা তিনি বুঝিবেন কি করিয়া? হয়তো নানা দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। গৌরীও ভাবিতে ভাবিতে নিজের অবহেলার জন্য অনুতপ্ত ও বিচলিত হইয়া উঠিল।

ঠিক নয়টার সময় ধনঞ্জয় দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই গৌরী বলিয়া উঠিল—'সর্দার, একটা বড় ভুল হয়ে গেছে, দাদাকে খবর দিতে হবে।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'বেশ তো, একখানা চিঠি লিখে দিন না।'

গৌরী মাথা নাড়িয়া বলিল—'না, চিঠি পৌঁছুতে তিন-চার দিন দেরি হবে। তার চেয়ে তাঁকে একটা টেলিগ্রাম করে দাও।'

ধনঞ্জয় চিন্তা করিয়া বলিলেন—'সে কথাও মন্দ নয়। কিন্তু আপনার নামে টেলিগ্রাম পাঠালে চলবে না। চারিদিকে শত্রু—এমনভাবে 'তার' লিখতে হবে যাতে আপনার দাদা ছাড়া তার প্রকৃত মর্ম কেউ না বুঝতে পারে।'

গৌরী বলিল—'বেশ, তোমার নামেই 'তার' পাঠানো হোক। খবরটা দাদার কাছে পৌঁছুলেই হল। এস, একটা খসড়া তৈরি করি।'

দুইজনে মিলিয়া টেলিগ্রামের খসড়া তৈয়ারি করিলেন, তাহাতে লিখিত হইল—

এখানকার সংবাদ ভাল। শুভকার্য হইয়া গিয়াছে—কোনো বিঘ্ন হয় নাই। ভ্রাতার জন্য চিন্তা নাই। আপনাকে মাঝে মাঝে সংবাদ দিব। আপনি আপাতত চিঠিপত্র লিখিবেন না।—ধনঞ্জয়।

ধনঞ্জয় টেলিগ্রামের মুসাবিদা লইয়া প্রস্থান করিলে গৌরী অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতে লাগিল।

পরদিন অপরাহ্ণে গৌরী কিস্তার ধারের মুক্ত বারান্দায় গিয়া বসিয়াছিল। কাছে কেবল রুদ্ররূপ ছিল। আজ গৌরী বেশ ভালই ছিল, এমন কি এইখানে বসিয়া কিছু রাজকার্য সম্পন্ন করিয়াছিল। বজ্রপাণি কয়েকখানা জরুরী সনন্দ ও পরোয়ানা তাহার দ্বারা মোহর করাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। যদিও এসকল দলিলে মোহরের সঙ্গে রাজার সহি-দস্তখৎ দেওয়া বিধি, তবু আপাতত শুধু মোহরেই কাজ চালাইতে হইয়াছিল। শঙ্কর সিং-এর দস্তখৎ গৌরী এখনো ভাল আয়ত্ত করিতে পারে নাই।

ধনঞ্জয়ও এতক্ষণ গৌরীর কাছেই ছিলেন, এইমাত্র একটা কাজে বাহিরে ডাক পড়িয়াছে তাই উঠিয়া গিয়াছেন।

দু'জনে নীরবেই বসিয়াছিল। রুদ্ররূপ একটু অন্যমনস্কভাবে কিস্তার নৌকা চলাচল দেখিতেছিল ও কোমরবন্ধে আবদ্ধ তলোয়ারখানা আঙুল দিয়া নাড়িতেছিল। তাহার পাতলা সুশ্রী ধারালো মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া গৌরী হঠাৎ প্রশ্ন করিল —'রুদ্ররূপ, ঝিন্দে সবচেয়ে ভাল তলোয়ার খেলোয়াড় কে বলতে পার?'

রুদ্ররূপ চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল; একটু চিন্তা করিয়া বলিল—'ঝিন্দের সবচেয়ে বড় তলোয়ার-বাজ বোধহয় সর্দার ধনঞ্জয়—না ময়ূরবাহন।'

'বল কি?' গৌরী বিস্মিতভাবে চাহিল।

রুদ্ররূপ ঘাড় নাড়িল—'হ্যাঁ—সর্দারজিও খুব ভাল খেলোয়াড়—বিশ বছর আগে হলে বোধহয় ময়ূরবাহনকে হারাতে পারতেন কিন্তু এখন—'

'আর তুমি?'

'আমিও জানি। কিন্তু ময়ূরবাহন কিম্বা সর্দার আমাকে বাঁ হাতে সাবাড় করে দিতে পারেন।'

গৌরী ঈষৎ বিস্মিত চোখে এই সরল নিরভিমান যোদ্ধার দিকে চাহিয়া রহিল—তারপর বলিল—'আচ্ছা, তুমি ময়ূরবাহনের সঙ্গে লড়তে পার?'

রুদ্ররূপ একটু হাসিয়া বলিল—'হুকুম পেলেই পারি। লড়াই করব বলেই তো আপনার রুটি খাচ্ছি।'

'মৃত্যু নিশ্চয় জেনেও?'

'হ্যাঁ। মৃত্যুকে আমার ভয় হয় না রাজা।'

রুদ্ররূপের কাঁধে হাত রাখিয়া গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'কিসে তোমার ভয় হয় ঠিক করে বল তো রুদ্ররূপ?'

রুদ্ররূপ চিন্তা করিয়া বলিল—'কি জানি। আপনাকে সম্মান করি—আপনি রাজা, সর্দারকেও সম্মান করি; কিন্তু ভয় কাউকে করি বলে তো মনে হয় না।'

গৌরী পুনরায় তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—'কিন্তু আমি জানি তুমি একজনকে ভয় কর।'

রুদ্ররূপ চকিত হইয়া চাহিল—'কাকে?'

'চম্পাকে।'

রুদ্ররূপের মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিল, সে নতনেত্রে চুপ করিয়া রহিল।

গৌরী তরলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি চম্পাকে ভালবাস—না?'

রুদ্ররূপ তেমনি হেঁটমুখে বসিয়া রহিল—উত্তর করিল না।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'ওকে বিয়ে কর না কেন?'

রুদ্ররূপ মুখ তুলিল, চোখ দুটি অত্যন্ত করুণ; আস্তে আস্তে বলিল—'আমি বড় গরীব, চম্পার বাবা আমার সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন না।'

গৌরী চমকিয়া উঠিল, রাজার পার্শ্বচর যে গরীব হইতে পারে একথা সে ভাবিতেই পারে নাই। বলিল—'গরীব?'

'হ্যাঁ। আমরা পুরুষানুক্রমে সিপাহী, আমাদের টাকা-কড়ি নেই।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'ত্রিবিক্রম সিং একজন প্রকাণ্ড বড়মানুষ—রাজ্যের প্রধান শেঠ। তিনি আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন কেন?'

'তুমি কখনো প্রস্তাব করে দেখেছ?'

'না।'

একটু চিন্তা করিয়া গৌরী প্রশ্ন করিল—'চম্পা তোমার মনের কথা জানে?'

'না। সে এখনো ছেলেমানুষ; তাকে—' রুদ্ররূপ চকিতভাবে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—'সর্দার আসছেন। তাঁকে—তাঁর সামনে—'

'না না, তোমার কোনো ভয় নেই।'

সর্দার ধনঞ্জয় প্রবেশ করিলেন। গৌরী ফিরিয়া দেখিল তাঁহার মুখ গম্ভীর, হাতে একখানা চিঠি। জিজ্ঞাসা করিল—'কি সর্দার?'

সর্দার নিঃশব্দে চিঠি তাহার হাতে দিলেন। ঝড়োয়ার রাজ-দরবার হইতে দেওয়ান অনঙ্গদেও কর্তৃক লিখিত পত্র—সাড়ম্বরে বহু সমাসযুক্ত ভাষায় অশেষপ্রতাপ দেবপাদ শ্রীমন্মহারাজ শঙ্কর সিংহকে সবিনয়ে ও সসম্ভ্রমে স্বস্তিবাচনপূর্বক জ্ঞাপন করা হইয়াছে যে, এখন মহারাজ বস্তুত ঝড়োয়া রাজ্যেরও ন্যায্য অধিপতি; সুতরাং তিনি কৃপাপূর্বক কিছুকাল তাঁহার ঝড়োয়া রাজ্যে আসিয়া রাজগৌরবে বাস করতঃ প্রজা ও ভৃত্যবৃন্দের সেবাগ্রহণ করিলে ঝড়োয়ার আপামর সাধারণ কৃতকৃতার্থ হইবে। ঝড়োয়ার মহিমময়ী রাজ্ঞী, পরিষদবৃন্দ ও প্রজা সামান্যের পক্ষ হইতে দেবপাদ মহারাজের শ্রীচরণে এই নিবেদন উপস্থাপিত হইতেছে। অলমিতি।

চিঠি পড়িতে পড়িতে গৌরীর মুখে রক্তিমাভা আনা-গোনা করিতে লাগিল। পাঠ শেষ হইয়া যাইবার পরও সে কিছুক্ষণ চিঠিখানা চোখের সম্মুখে ধরিয়া রহিল। তারপর সর্দারের দিকে চোখ তুলিয়া দেখিল, তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। সে তাচ্ছিল্যভরে পত্র ফেরত দিয়া বলিল—'এ চিঠি এল কখন?'

'এই মাত্র।'

'বজ্রপাণি এ চিঠির মর্ম জানেন?'

'জানেন—তিনিই পত্র খুলেছেন।'

'তুমিও জানো বোধ করি?'

'জানি।'

ঈষৎ হাসিয়া গৌরী প্রশ্ন করিল—'তা তোমরা দু'জনে কি স্থির করলে?'

ধনঞ্জয় দুই চক্ষু গৌরীর মুখের উপর নিশ্চল রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—'আমরা কিছুই স্থির করিনি। আপনি যা আদেশ করবেন তাই হবে।'

গৌরী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল. অজ্ঞাতসারে তাহার দৃষ্টি কিস্তার পরপারে শুভ্র রাজসৌধের উপর গিয়া পড়িল। সে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া বলিল—'ঝড়োয়ায় যাবার কোনো দরকার দেখি না। ওদের লিখে দাও যে অশেষপ্রতাপ দেবপাদ এখন নিজের রাজ্য নিয়েই বিশেষ ব্যস্ত আছেন, তাছাড়া তাঁর শরীরও ভাল নয়। এখন তিনি ঝড়োয়ায় গিয়ে থাকতে পারবেন না।' একটু হাসিয়া বলিল—'চিঠিখানা বেশ মোলায়েম করে ভাল ভাল কথা দিয়ে সাজিয়ে লিখো। কিন্তু সে-কাজ বোধ হয় বজ্রপাণি খুব ভাল রকমই পারবেন।'

ধনঞ্জয়ের মুখ হইতে সংশয়ের মেঘ কাটিয়া গেল, তিনি প্রফুল্লস্বরে 'যো হুকুম' বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

গৌরী তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিল—'তাড়াতাড়ি কিছু নেই—কাল-পরশু চিঠি পাঠালেই চলবে।—এখন তুমি বোসো, কথা আছে?'

ধনঞ্জয় হাঁটু মুড়িয়া গালিচার একপাশে বসিলেন। গৌরী বলিল—'শঙ্কর সিং সম্বন্ধে কি হচ্ছে? তোমরা যে রকম ঢিলাভাবে কাজ করছ তাতে আমার মনঃপূত হচ্ছে না।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'ঢিলাভাবে কাজ হচ্ছে না—তবে খুব গোপনে কাজ করতে হচ্ছে। সোরগোল করে করবার মত কাজ তো নয়।'

'কি কাজ হচ্ছে?'

'শক্তিগড়ে কোনো বন্দী আছে কিনা তারি সন্ধান নেওয়া হচ্ছে। ওটা আমাদের অনুমান বৈ তো নয়, ভুলও হতে পারে।'

'সন্ধান করে কিছু জানা গেল?'

'না। এত শীঘ্র জানা সম্ভবও নয়; মাত্র কাল থেকে লোক লাগানো হয়েছে।'

গৌরী চিন্তা করিয়া বলিল—'হুঁ। অন্যদিকে কোনো অনুসন্ধান হচ্ছে?'

ধনঞ্জয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'না, অন্যদিকে যারা শঙ্কর সিং-এর অনুসন্ধান করছিল

তাদের ডেকে নেওয়া হয়েছে। শঙ্কর সিং যখন সিংহাসনে আসীন রয়েছেন তখন তাঁর তল্লাস করতে গেলেই লোকে নানারকম সন্দেহ করবে।'

'তা ঠিক, গুপ্তচরেরা নিজেরাই সন্দেহ করতে আরম্ভ করবে।'

'এখন যা-কিছু অনুসন্ধান আমাদের নিজেদের করতে হবে। বাইরের লোককে কোনো কথা ঘুণাক্ষরে জানতে দেওয়া যেতে পারে না।'

'কিন্তু আমার আর চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগছে না সর্দার। এখন তো অভিষেক হয়ে গেছে, এবার উঠে পড়ে লাগা দরকার। তোমাদের রাজা-গিরি আর আমার ভাল লাগছে না।'

ঈষৎ বিস্ময়ে ধনঞ্জয় তাহার দিকে চাহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—'কিন্তু উপস্থিত কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকতেই হবে। অন্তত যতদিন না শক্তিগড়ের পাকা খবর পাওয়া যাচ্ছে।'

আরো কিছুক্ষণ এই বিষয়ে কথাবার্তার পর ধনঞ্জয় উঠিয়া গেলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, কিস্তার কালো বুকে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইতেছিল। পশ্চিমাকাশের অস্ত-রাগের পশ্চাৎপটে কিস্তার সেতুটি কঙ্কাল-সেতুর মত প্রতীয়মান হইতেছিল। সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া গৌরী একটা নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিল—'রুদ্ররূপ, দারিদ্র্য কি ভালবাসার পথে খুব বড় বিঘ্ন বলে তোমার মনে হয়?'

রুদ্ররূপ হেঁটমুখে কি চিন্তা করিতেছিল, চকিতভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল।

গৌরী মুখের একটা বিমর্ষ ভঙ্গি করিয়া বলিল—'তার চেয়ে ঢের বড় বাধা আছে—যা অলঙ্ঘনীয়। তুমি হতাশ হয়ো না।'

আশার উল্লাসে রুদ্ররূপের মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে আরো কিছু শুনিবার আশায় সাগ্রহে গৌরীর দিকে তাকাইয়া রহিল।

ঝড়োয়ার প্রাসাদে তখন একটি একটি করিয়া দীপ জ্বলিয়া উঠিতেছিল। গৌরী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'ঠান্ডা মনে হচ্ছে—চল, ভেতরে যাওয়া যাক।'

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভিমরুলের অনুতাপ

রানীর সহিত গৌরীর দৈবক্রমে সাক্ষাৎ ঘটিয়া যাইবার পর হইতে গৌরী ও ধনঞ্জয়ের মাঝখানে ভিতরে ভিতরে একটা দূরত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। পূর্বের বাধাহীন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হ্রাস পাইয়াছিল অথচ ঠিক মনোমালিন্যও বলা চলে না। কিন্তু গৌরী যখন ঝড়োয়ায় গিয়া থাকিবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল, তখন আবার অজ্ঞাতসারেই এই দূরত্ব ঘুচিয়া গিয়া পূর্বের সৌহার্দ্য ও বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। গৌরী মাঝের এই দুই দিন অন্তরের

মধ্যে যেন একটু অবলম্বনহীন ও অসহায় বোধ করিতেছিল, এখন আবার সে মনে বল পাইল। একযোগে কাজ করিতে গিয়া সহকারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অভাব যে মানুষকে কিরূপ বিকল করিয়া ফেলে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ও তাহার কুফল চিন্তা করিয়া দুইজনেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া উভয়েই আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

ঝিন্দে আসিয়া গৌরী আর একটি অনুগত ও অকৃত্রিম বন্ধু লাভ করিয়াছিল—সে রুদ্ররূপ। বয়স দুইজনেরই প্রায় সমান, অবস্থাগতিকে সাহচর্যও প্রায় অবিচ্ছেদ্য হইয়া পড়িয়াছিল--তাই পদ ও মর্যাদার আকাশ পাতাল প্রভেদ সত্ত্বেও দুইজনে পরস্পরের খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। গৌরী যে সত্যই রাজা নয় ইহা রুদ্ররূপ জানিত—সেজন্য তাহার ব্যবহার ও বাহ্য আদব-কায়দায় তিলমাত্র ত্রুটি হয় নাই—কিন্তু তবু মানুষ-গৌরীর প্রতিই সে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। শঙ্কর সিং-এর প্রতি তার মনোভাব কিরূপ ছিল তাহা বলা কঠিন; সম্ভবত শঙ্কর সিংকে মানুষ হিসাবে সে কোনদিন দেখে নাই—রাজা বা রাজপুত্র ভাবিয়া তাহার প্রতি কর্তব্য করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু গৌরীর প্রতি তাহার আনুরক্তি এই রাজভক্তিরও অতিরিক্ত একটা ব্যক্তিগত প্রীতির রূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছিল। শঙ্কর সিং-এর জন্যও রুদ্ররূপ নিঃসঙ্কোচে প্রাণ দিতে পারিত, কিন্তু গৌরীর জন্য প্রাণ দিতে পারিত আনন্দের সঙ্গে—কেবলমাত্র কর্তব্যের অনুরোধে নয়।

সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া উঠিবার পর গৌরী প্রাসাদের বাহির হইবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল। অবশ্য প্রাসাদে নিষ্কর্মার মত তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইত না, সর্বদাই কোনো-না-কোনো কাজ লাগিয়া থাকিত। প্রত্যহ সকালে দরবারে গিয়া বসিতে হইত, সেখানে নানাবিধ কাজ, মন্ত্রণা ও দেশের বহু গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করাও দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। তথাপি সর্বপ্রকারে ব্যাপৃত থাকিয়াও তাহার মনে হইত, যেন তাহার গতিবিধির চারিপাশে একটা অদৃশ্য দেওয়াল তাহাকে ঘিরিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ধনঞ্জয়ের কাছে নগর ভ্রমণের কথা উত্থাপন করিলে তিনি মাথা নাড়িয়া বলিতেন—'এখন নয়, আরো দু'দিন যাক।' বস্তুত নগরভ্রমণে বাহির হওয়া যে সর্বাংশে নিরাপদ নয় তাহা গৌরীও বুঝিত। দেশে অভিষেকের উৎসব এখনও শেষ হয় নাই, এই সময় গোলমালের মধ্যে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু তবু সে স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

এদিকে শঙ্কব সিং-এর কোনো সংবাদই পাওয়া যাইতেছিল না। শক্তিগড়ের দিকে যাহারা তল্লাস করিতে গিয়াছিল তাহারা একে একে ফিরিয়া আসিয়া জানাইয়াছে যে, শক্তিগড়ের অর্ধক্রোশের মধ্যে কাহারো যাইবার উপায় নাই—দুর্গ ঘিরিয়া থানা বসিয়া গিয়াছে। সেই গণ্ডীর ভিতর কেহ পদার্পণ করিবার চেষ্টা করিলেই অশেষভাবে লাঞ্ছিত হইয়া বিতাড়িত হইতেছে। দুর্গের আশেপাশে যে-সকল গ্রাম আছে সেখানেও অনুসন্ধান করিয়া কোনো ফল পাওয়া যায় নাই; গ্রামবাসীরা উদিতের প্রজা ও ভক্ত, কিছু জানিলেও বাহিরের লোকের কাছে প্রকাশ করে না, উপরন্তু কৌতূহলী জিজ্ঞাসুকে গালাগালি ও মার-ধর করিয়া দূর করিয়া দেয়। একজন দুঃসাহসিক গুপ্তচর নৌকায় করিয়া কিস্তার দিক হইতে দুর্গ পর্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিল—উদিত তাহাকে ধরিয়া আনিয়া স্বহস্তে এমন নির্দয় প্রহার করিয়াছে যে লোকটা আধমরা হইয়া কোনো মতে ফিরিয়া আসিয়াছে। অতঃপর আর কেহ ও অঞ্চলে যাইতে রাজী নয়।

এইরূপে শঙ্কর সিং-এর অনুসন্ধান কার্য চারিদিকে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া একপ্রকার নিশ্চল হইয়া আছে।

অভিষেকের দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন অপরাহ্ণে গৌরী ও রুদ্ররূপ প্রাসাদ সংলগ্ন ব্যায়ামগৃহে অসি-ক্রীড়া করিতেছিল। ধনঞ্জয় অদূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন ও বিচারকের কার্য করিতেছিলেন।

দেশী তলোয়ার খেলা। দীর্ঘ ও ঈষদ্বক্র তরবারির ফলায় সূক্ষ্ম কাপড় জড়ানো, খেলোয়াড় দুজনের মুখ ও গ্রীবাদেশ লোহার মুখোসে ঢাকা। খেলার ঝোঁকে দুইজনেই বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে—মুখোসের জালের ভিতর দিয়া তাহাদের চক্ষু জ্বলিতেছে। দুইটি তলোয়ারই বন্‌ বন্‌ করিয়া ঘুরিতেছে। কদাচিৎ অস্ত্রে অস্ত্রে লাগিয়া ঝনৎকার উঠিতেছে, কখনো একের তরবারি অন্যের দেহ লঘুভাবে স্পর্শ করিতেছে। ধনঞ্জয় মাঝে মাঝে বলিয়া উঠিতেছেন—সাবাস! চোট! জখম! ইত্যাদি।

ক্রমে রুদ্ররূপের অসিচালনায় ঈষৎ ক্লান্তি ও শিথিলতার লক্ষণ দেখা দিল; সে গৌরীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া পিছু হটিতে আরম্ভ করিল। তারপর হঠাৎ গৌরী তাহার ঘূর্ণিত অসিকে পাশ কাটাইয়া বিদ্যুদ্বেগে তাহার মস্তকে আঘাত করিল, শিরস্ত্রাণের উপর ঝনাৎ করিয়া শব্দ হইল। ধনঞ্জয় বলিয়া উঠিলেন—'ফতে!'

দুইজন যোদ্ধাই তরবারি নামাইয়া দাঁড়াইল। গৌরী মুখোস খুলিয়া ঘর্মাক্ত মুখ মুছিতে মুছিতে সহাস্যে বলিল—সর্দার, এবার তুমি এস।'

ধনঞ্জয় নিঃশব্দে তরবারি রুদ্ররূপের হাত হইতে লইয়া গৌরীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন; তরবারির মুঠ একবার কপালে ছোঁয়াইয়া বলিলেন—'আসুন!'

'মুখোস পরবে না?'

'দরকার নেই।'

অসি চালনায় ধনঞ্জয়ের খ্যাতি গৌরী জানিত, সে সাবধানে নিজের দেহ যথাসাধ্য সুরক্ষিত করিয়া আক্রমণে অগ্রসর হইল। ধনঞ্জয় শুধু অসিখানা নিজ দেহের সম্মুখে ধরিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ডাহিনের দিকে একটা ফাঁক লক্ষ্য করিয়া গৌরী সেইদিকে তলোয়ার চালাইল, ধনঞ্জয় অবহেলাভরে তাহা সরাইয়া দিলেন। আবার গৌরী বাঁ দিকে আক্রমণ করিল, কিন্তু কব্জির একটা অলস সঞ্চালন দ্বারা ধনঞ্জয় সে আঘাত নিজ তরবারির উপর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অন্যমনস্কভাবে বাঁ হাত দিয়া একটা বিরক্তিকর মাছি তাড়াইতেছেন।

ধনঞ্জয় যতই স্থির ও অবিচলিত হইয়া রহিলেন—গৌরী ততই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষে আর সে ধৈর্য ধারণ করিতে না পারিয়া এক পা পিছু হটিয়া চিতাবাঘের মত ধনঞ্জয়ের ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। তাঁহার মাথার উপর তলোয়ারের কোপ বসাইতে গিয়া দেখিল ধনঞ্জয় সেখানে নাই। ধনঞ্জয় কোথায় তাহা নির্ণয় করিবার পূর্বেই সে নিজের দক্ষিণ হস্তের মুঠিতে একটা বেদনা অনুভব করিল ও পরক্ষণেই দেখিল তলোয়ারখানা তাহার অবশ হস্ত হইতে পড়িয়া যাইতেছে।

ধনঞ্জয় ভূমি হইতে তলোয়ার তুলিয়া গৌরীকে প্রত্যর্পণ করিয়া হাসিমুখে বলিলেন—'ফতে।'

মুখোস খুলিয়া গৌরী কিছুক্ষণ নির্বাকভাবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—'কি হল বল দেখি?'

'কিছু না, আপনি হেরে গেলেন।'

গৌরী মুখের একটা বিমর্ষ অথচ সকৌতুক ভঙ্গি করিয়া বলিল—'তা তো দেখতেই পাচ্ছি; কিন্তু হারালে কি করে?'

'একটা খুব ছোট্ট প্যাঁচ আছে—আপনি সেটা জানেন না।'

'আমার গোয়ালিয়রের ওস্তাদ তাহলে ফাঁকি দিয়েছে বল!'—একটা চেয়ারের পিঠে কাশ্মীরী শালের ঢিলা চোগা রাখা ছিল, গৌরী সেটা গায়ে দিতে লাগিল, ধনঞ্জয় তরবারি রাখিয়া তাহাকে সাহায্য করিলেন।

এই সময় ব্যায়ামগৃহের খোলা দ্বারের কাছে একজন শান্ত্রী আসিয়া দাঁড়াইল। রুদ্ররূপ বলিল—'কি চাও?'

শান্ত্রী কহিল—'ঝড়োয়া থেকে একজন ঘোড়সওয়ার এসেছে—মহারাজের দর্শন চায়।'

ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি জন্যে দর্শন চায় কিছু বলেছে?'

শাস্ত্রী বলিল—'না, সে কিছু বলতে চায় না।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'রুদ্ররূপ, দেখ কি ব্যাপার।'

কিয়ৎকাল পরে রুদ্ররূপ ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে দর্শনপ্রার্থীর নাম সুবাদার বিজয়লাল—রাজার সঙ্গে গোপনীয় কথা আছে, ইহা ছাড়া আর কিছু বলিতেছে না।

ধনঞ্জয় গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি একে চেনেন নাকি?'

গৌরী মাথা নাড়িয়া বলিল—'না।'

ধনঞ্জয় ভ্রূকুটি করিয়া চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন—'আচ্ছা, তাকে এইখানেই নিয়ে এস।'

ঝড়োয়ার দরবার হইতে প্রেরিত দূতও হইতে পারে, আবার না হইতেও পারে; এই ভাবিয়া ধনঞ্জয় ঘরের কোণের এক মেহগ্নির আলমারি খুলিয়া একটি রিভলবার তুলিয়া লইয়া তাহাতে টোটা ভরিতে লাগিলেন। আলমারিতে ছোরাছুরি, পিস্তল ইত্যাদি নানাবিধ অস্ত্র সাজানো ছিল।

গৌরী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ও কি হচ্ছে সর্দার?'

'বলা তো যায় না—হয়তো—' বলিয়া সর্দার একটা জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

সৈনিক বেশধারী দীর্ঘকায় যুবক রুদ্ররূপের সঙ্গে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট রাজাকে দেখিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'কে তুমি? কি চাও?'

যুবক একবার ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল অদূরে জানালার পাশে ধনঞ্জয় একটা রিভলবার লইয়া অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করিতেছেন, পিছনে দ্বারের কাছে রুদ্ররূপ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে বলিল—'মহারাজের সঙ্গে আমার গোপনে কিছু কথা আছে।'

গৌরী ঈষৎ অপ্রসন্নমুখে বলিল—'তা আগেই শুনেছি। তোমাকে কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। আমার সঙ্গে তোমার কী গোপনীয় কথা থাকতে পারে?'

যুবক একটু ইতস্তত করিল, একবার ধনঞ্জয়ের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল, তারপর মৃদুকণ্ঠে কহিল—'আমি ভিমরুলের দূত।'

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গৌরী তাহার দিকে চাহিল—'ভিমরুলের দূত? ও! কৃষ্ণা—?'

যুবক গম্ভীরভাবে মস্তক অবনত করিল।

গৌরী তখন প্রফুল্লমুখে বলিল—'কৃষ্ণা—ভিমরুলের দূত!—একথা আগে বলনি কেন? তা—ভিমরুলের কি সমাচার?'

যুবক মুখ ফিরাইয়া নীরবে ধনঞ্জয়ের দিকে চাহিল।

গৌরী সহাস্যে বলিল—'সর্দার, তুমি যেতে পার। সুবাদারের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।—না, কোনো ভয় নেই—সুবাদার পরিচিত লোকের দূত।'

অনিচ্ছাভরে রিভলবার রাখিয়া ধনঞ্জয় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন; তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল তিনি অপ্রসন্ন হইয় উঠিয়াছেন।

গৌরী রুদ্ররূপকে বলিল—'তুমি ঘরের বাইরে পাহারায় থাকো—কেউ না আসে।'

রুদ্ররূপ নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলে গৌরী উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল—'কৃষ্ণার কি খবর?'

যুবক উত্তর না দিয়া পাগড়ির ভিতর হইতে একটি পত্র বাহির করিয়া গৌরীর হাতে দিল। গৌরী পড়িল, তাহাতে লেখা আছে—

'স্বস্তি শ্রীদেবপাদ মহারাজের চরণে কৃষ্ণাবাঈয়ের শত শত প্রণাম। এই পত্রের বাহক সুবাদার বিজয়লাল ঝড়োয়া রাজবংশের এবং সেই সঙ্গে আমার একজন বিশ্বস্ত ও অনুগত কর্মচারী। তাহাকে সকল বিষয়ে বিশ্বাস করিতে পারেন।

'আপনি সেদিন আমার উপর রাগ করিয়া আমাকে শাস্তি দিবেন বলিয়াছিলেন।

শাস্তির ভয়ে আমি অতিশয় অনুতপ্ত হইয়াছি—স্থির করিয়াছি আজ রাত্রেই প্রায়শ্চিত্ত করিব। আপনাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

'আজ রাত্রি দশটার সময় কিস্তার পুল যেখানে ঝড়োয়ার রাজ্যে আসিয়া শেষ হইয়াছে, সেইখানে বিজয়লাল উপস্থিত থাকিবে। আপনি আসিবেন। ছদ্মবেশে আসিতে হইবে, যাহাতে কেহ আপনাকে চিনিতে না পারে। একজন বিশ্বাসী পার্শ্বচর সঙ্গে লইতে পারেন। বিজয়লাল আপনাকে যথাস্থানে লইয়া আসিবে। ইতি—আপনার চরণাশ্রিতা কৃষ্ণা।'

চিঠি মুড়িতে মুড়িতে গৌরী মুখ তুলিল, কৌতুক-তরল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—'কৃষ্ণা তোমার কে?'—বিজয়লাল নীরবে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল—'ও বুঝেছি, তুমি কৃষ্ণার ভাবী সোহর!—কিন্তু কৃষ্ণা হঠাৎ এত অনুতপ্ত হয়ে উঠ্‌ল কেন তা তো বুঝতে পারছি না।' পত্রখানা চোগার পকেটে রাখিয়া বলিল—'হ্যাঁ—আমি যাব। যথাসময়ে তুমি হাজির থেকো।'

'যে আজ্ঞা মহারাজ!' বলিয়া বিজয়লাল অভিবাদন করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল। গৌরী আবার বলিয়া উঠিল—'কিন্তু আসল কথাটা কি বল তো? এ নিমন্ত্রণের ভিতর একটা গূঢ় রহস্য আছে বুঝতে পারছি। সেটা কি?'

বিজয়লাল বলিল—'তা জানি না মহারাজ।'

বিজয়লাল গম্ভীর প্রকৃতির লোক, অত্যন্ত অল্পভাষী। তাহার শ্যামবর্ণ দৃঢ় মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের কথা কিছুই বুঝা যায় না। তবু গৌরী যদি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত—বিজয়লালের ফৌজী গোঁফের আড়ালে অল্প একটু হাসি দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল।

বিজয়লাল প্রস্থান করিলে গৌরী চিঠিখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। মনের অগোচরে পাপ নাই বটে কিন্তু আশা আকাঙ্ক্ষা প্রবৃত্তি ও কর্তব্যবুদ্ধি মিলিয়া মানুষের মনে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়—যখন সে মনকে চোখ ঠারিতেছে কিনা নিজেই বুঝিতে পারে না। তাই কৌতূহল ও আগ্রহ যতই গৌরীর মনে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল ততই সে মনকে বুঝাইতে লাগিল যে, ইহা কেবল একটা মজাদার অ্যাড্‌ভেন্‌চারের জন্য আগ্রহ, বহুদিন রাজপ্রাসাদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার পর মুক্তির আশাই তাহাকে উদ্‌গ্রীব করিয়া তুলিয়াছে। নচেৎ কৃষ্ণার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আর কোনো আকর্ষণই থাকিতে পারে না।

অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে কৃষ্ণার এই অনুতাপের মর্ম যে সে অভ্রান্তভাবে বুঝিয়াছে, একথা যদি তাহার জাগ্রত মনের সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠিত তাহা হইলে বোধ হয় সে এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সক্ষম হইত না। অথচ পরিহাস এই যে, ধনঞ্জয় সকল কথা শুনিয়া নিশ্চয় এ প্রস্তাবে বাধা দিবেন, ইহা অনুমান করিয়া সে আগে হইতেই মনে মনে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

তাই ধনঞ্জয় যখন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ব্যাপার কি? দূত কিসের?' তখন গৌরী চিঠিখানা সন্তর্পণে পকেটে রাখিয়া দিয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিল—'কিছু না। আজ রাত্রে একবার নগর ভ্রমণে বার হব। সঙ্গে কেবল রুদ্ররূপ থাকবে।'

বিস্মিত ধনঞ্জয় বলিলেন—'সেকি! হঠাৎ এরকম—'

গৌরী বলিল—'হঠাৎই স্থির করেছি।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'কিন্তু রাত্রে অরক্ষিত অবস্থায় যাওয়া তো হতে পারে না।'

গৌরী একটু ঝাঁঝালো সুরে বলিল—'নিশ্চয়ই হতে পারে, যখন আমি স্থির করেছি।'

ধনঞ্জয় কিছুক্ষণ আকুঞ্চিত চক্ষে গৌরীকে নিরীক্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—'কিন্তু এরকম স্থির করার কারণ জানতে পারি কি?'

'না।' গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইল, একটা থামিয়া বলিল—'ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমরা ছদ্মবেশে থাকবো, কেউ চিন্‌তে পারবে না।'

'কিন্তু ঝড়োয়ায় যাওয়া কি আপনার উচিত হচ্ছে?'

গৌরীর মুখ সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে সংযত স্বরেই বলিল—'উচিত কিনা সেকথা আমি কারুর সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না। আমি ঝিন্দের বন্দী নই—আপাতত ঝিন্দের রাজা।'

ধনঞ্জয় আবার কি একটা বলিতে গেলেন, কিন্তু তৎপূর্বেই গৌরী ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

শূন্য ঘরে ধনঞ্জয় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন; তারপর অস্ফুটস্বরে বকিতে বকিতে গৌরীর অনুসরণ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দস্তকুলের প্রহ্লাদ

রাত্রি আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় সাধারণ ঝিন্দী সৈনিকের বেশ পরিধান করিয়া গৌরী ও রুদ্ররূপ বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। যে কক্ষটায় সাজসজ্জা হইতেছিল সেটা রাজার সিঙার-ঘর—অর্থাৎ ড্রেসিং রুম। চম্পাদেঈ ও ধনঞ্জয় উপস্থিত ছিলেন।

মাথার উপর প্রকাণ্ড জরীদার রেশমী পাগড়ি বাঁধিয়া গৌরী আয়নার সম্মুখীন হইয়া দেখিল, এ বেশে সহসা কেহ তাহাকে চিনিতে পারিবে না। চম্পা ও ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল—'কেমন দেখাচ্ছে?'

ধনঞ্জয় গলার মধ্যে কেবল একটা শব্দ করিলেন; চম্পা সপ্রশংস নেত্রে চাহিয়া বলিল—"ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। আপনি যদি ভিখিরির সাজপোশাক পরেন, তবু আপনাকে রাজার মতই দেখায়।'

গৌরী মুখের একটু ভঙ্গিমা করিয়া বলিল—'তা বটে। বনেদী রাজা কিনা।—এখন চললাম। তুমি কিন্তু লক্ষ্মী মেয়েটির মত ঘুমিয়ে পড় গিয়ে—আমার জন্য জেগে থেকো না। যদি জেগে থাকো, কাল সকালেই তোমাকে বাপের কাছে পাঠিয়ে দেব।'

এতবড় শাসনবাক্যে ভীত হইয়া চম্পা ক্ষীণস্বরে বলিল—'আচ্ছা।'

চম্পাকে জব্দ করিবার একটা অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে বুঝিয়া গৌরী মনে মনে হৃষ্ট হইয়া উঠিল। ধনঞ্জয় বিরস গম্ভীরমুখে বলিলেন—'আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাকে কিন্তু জেগে থাকতে হবে।'

অপরাহ্ণে ধনঞ্জয়ের প্রতি রূঢ়তায় গৌরী মনে মনে একটু অনুতপ্ত হইয়াছিল, বলিল—'তা বেশ তো সর্দার। কিন্তু বেশীক্ষণ জাগতে হবে না, আমরা শীগ্‌গির ফিরব।'

প্রাসাদের পাশের একটি ছোট ফটক দিয়া দুইজনে পদব্রজে বাহির হইল। ফটকের শান্ত্রী রুদ্ররূপের গলা শুনিয়াই পথ ছাড়িয়া দিল, তাহার সঙ্গীটি কে তাহা ভাল করিয়া দেখিল না।

প্রাসাদের প্রাচীর-বেষ্টনী পার হইয়া উভয়ে সিংগড়ের কেন্দ্রস্থলে—যেখানে প্রকৃত নগর—সেইদিকে যাত্রা করিল।

নগরে তখনো রাজ-অভিষেকের উৎসব সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই, এখনো গৃহে গৃহে দীপালি জ্বলিতেছে, দোকানে দোকানে পতাকা মালা ইত্যাদি দুলিতেছে, তবু আনন্দের প্রথম উদ্দীপনা যে অনেকটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ছোট্ট রাজ্য হইলেও রাজধানীটি বেশ বড় এবং সমৃদ্ধ। শহরের যেটি প্রধান বাজার, তাহাতে বহু লোকের ব্যস্ত গমনাগমন ও যানবাহনের অবিশ্রাম গতায়াত বাণিজ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টির ইঙ্গিত করিতেছে। অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ রাস্তার দুই ধারে উচ্চ তিন-চার-তলা ইমারৎ। কলিকাতার বড়বাজারের সঙ্কুচিত সংস্করণ বলিয়া মনে হয়।

উৎসুক চক্ষে চারিদিকে দেখিতে দেখিতে গৌরী নিজের বর্তমান অবস্থার কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। সে যে গৌরীশঙ্কর রায়—এখানে আসিবার পর হইতে এই কথাটা একপ্রকার চাপা পড়িয়া গিয়াছিল ; অভিনয় করিতে করিতে অভিনেতাটির মনেও একটু আত্মবিস্মৃতি জন্মিয়াছিল। কিন্তু এখন সে আবার নিজের চোখ দিয়া দেখিতে দেখিতে এই নূতনত্বের রস আস্বাদন করিতে করিতে চলিল। যেন বহুদিন পরে নিজের হারানো সত্তাকে ফিরিয়া পাইল।

শহরের জনাকীর্ণ রাস্তায় তাহাদের মত বেশধারী বহু ফৌজী সিপাহী ও নায়ক হাবিলদার প্রভৃতি ক্ষুদ্র সেনানী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। উপরন্তু এই রাজ্যাভিষেক পর্ব উপলক্ষে জঙ্গী য়ুনিফর্ম পরা একটা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—তাই গৌরী ও রুদ্ররূপ কাহারো বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিল না।

বাজারের চৌমাথায় এক পানওয়ালীর দোকানে খুশবুদার পান কিনিবার জন্য গৌরী দাঁড়াইল। দোকানের সম্মুখে বেশ ভিড় ছিল—কারণ এ দোকানের পান শুধু বিখ্যাত নয়, পানওয়ালীও রূপসী এবং নবযৌবনা। রুদ্ররূপ পান কিনিবার জন্য ভিড়ের মধ্যে ঢুকিল।

বাহিরে দাঁড়াইয়া অলসভাবে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে হঠাৎ গৌরীর নজরে পড়িল, অনতিদূরে রাস্তায় অপর পারে একটা মণিহারীর দোকান। দোকানটি বেশ বড়, কাচ-ঢাকা জানালায় বিলাতী প্রথায় বহুবিধ মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক পণ্য সাজানো রহিয়াছে এবং প্রবেশদ্বারের মাথার উপর বড় বড় সোনালী অক্ষরে সাইন-বোর্ড লেখা রহিয়াছে—

প্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত

মণিহারীর দোকান

গৌরীর একটু ধোঁকা লাগিল। প্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত! বাঙালী নাকি? প্রহ্লাদ নামটা বাঙালীর মধ্যে খুব চলিত নয়—কিন্তু প্রহ্লাদচন্দ্র! ভারতবর্ষের অন্য কোনো জাতি তো নামের মধ্যস্থলে 'চন্দ্র' ব্যবহার করে না। শুধু প্রহ্লাদ দত্ত হইলে অন্য জাতি হওয়া সম্ভব ছিল। গৌরী উত্তেজিত হইয়া উঠিল—বাঙালীর সন্তান এই সুদূর বিদেশে আসিয়া ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছে!

রুদ্ররূপ সুগন্ধি মশলাদার পান আনিয়া হাতে দিতেই গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'রুদ্ররূপ, ঐ দোকানের সাইন-বোর্ড দেখছ? কোন্ দেশের লোক আন্দাজ করতে পার?'

রুদ্ররূপ বলিল—'না। পাঞ্জাবি হতে পারে।'

গৌরী বলিল—'উঁহু, বোধ হয় বাঙালী। এস দেখা যাক।'

রাস্তা পার হইয়া উভয়ে দোকানে প্রবেশ করিল। দোকানের ভিতরটি বেশ সুপরিসর—গোটা চারেক ডে-লাইট ল্যাম্প মাথার উপর জ্বলিতেছে। দূরে ঘরের পিছন দিকে দোকানদারের গদি।

দোকানে প্রবেশ করিয়া প্রথমে গৌরী কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তারপর দেখিল,

গদির বিছানার উপর মুখোমুখি বসিয়া দুইজন লোক নিম্নস্বরে কথা কহিতেছে—'তুমি না গেলে চলবে না, আমাকে এখনি ফিরতে হবে, সকালে স্টেশনে হাজির থাকা চাই।' 'না, আজ আমি পারব না, আমার অনেক কাজ।'—এক পক্ষের অনিচ্ছা ও অন্য পক্ষের সাগ্রহ উপরোধ, অস্পষ্টভাবে গৌরী শুনিতে পাইল।

রুদ্ররূপ একবার তাহাদের দিকে চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইল, মৃদুস্বরে বলিল —'পেছন ফিরে দাঁড়ান, চিনতে পারবে।'

দুইজনে পিছন ফিরিয়া জানালার পণ্য দেখিতে লাগিল। গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'কে ওরা?'

'একজন ঝিন্দের স্টেশনমাস্টার স্বরূপদাস—অন্যটি বোধ হয় দোকানদার। চলুন, এখানে আর থেকে কাজ নেই।'

'একটু দাঁড়াও।'

মিনিট পাঁচেক পরে স্টেশনমাস্টার অসন্তুষ্টভাবে বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। তাহার কয়েকটা অসংলগ্ন কথা গৌরীর কানে পৌঁছিল—'এই রাত্রে শক্তিগড় যাওয়া...কাল সকালেই আবার স্টেশন... '

শক্তিগড় শুনিয়া গৌরী কান খাড়া করিয়াছিল, কিন্তু আর কিছু শুনিতে পাইল না।

এতক্ষণে দোকানদারের হুঁস হইল যে, দুইজন গ্রাহক দোকানে আসিয়াছে। সে উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ক্যা চ্যহিয়ে বাবুসাব?'

পশ্চিমী ধরনে কাপড় ও ছিটের চুড়িদার পাঞ্জাবি পরা দোকানদারকে দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া কাহার সাধ্য আন্দাজ করে যে সে পুরাপুরি খোট্টা নয়! গৌরী তাহার সম্মুখীন হইল: তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বাংলা ভাষায় বলিল—'তুমি বাঙালী?'

লোকটি প্রথমে একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল, তারপর তীক্ষ্নদৃষ্টিতে গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়াই সভয়ে দুই পা পিছাইয়া গিয়া আভূমি অবনত হইয়া অভিবাদন করিল। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দুইবার ঢোক গিলিয়া বলিল—'হ্যাঁ, আমি বাঙালী। মহারাজ —আপনি—আপনি— '

'চুপ!' গৌরী ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিল—'তুমি কতদিন এখানে আছ?'

হাতজোড় করিয়া প্রহ্লাদ বলিল—'আজ্ঞে, প্রায় পনের বছর। এখানেই বসবাস করছি।'

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কায়স্থ? বাড়ি কোন্ জেলায়?'

প্রহ্লাদ বলিল—'আজ্ঞে কায়স্থ, বাড়ি বীরভূম জেলায়। কিন্তু পনের বছর দেশের মুখ দেখিনি। মাঝে মাঝে যেতে বড় ইচ্ছে করে, কিন্তু কারবার ফেলে যেতে পারি না।'

'দেশে তোমার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই!'

'আজ্ঞে না। দূর সম্পর্কের খুড়ো জ্যাঠা যারা ছিল তারা বোধ হয় এতদিন মরে হেজে গেছে। আমি এই দেশেই বিবাহাদি করেছি।'

বাংলা দেশের কায়স্থ সন্তান ঝিন্দে আসিয়া কি ভাবে বিবাহাদি করিয়া ফেলিল, গৌরী ঠিক বুঝিল না; কিন্তু প্রহ্লাদ লোকটিকে তাহার মনে মনে বেশ পছন্দ হইল। সে যে অত্যন্ত চতুর লোক এই সামান্য কথাবার্তাতেই তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। গৌরী বলিল—'বেশ বেশ, খুব খুশি হলাম। আমাকে যখন চিন্‌তে পেরেছ তখন বলি, আমি অপ্রকাশ্যভাবে নগর পরিদর্শন করতে বেরিয়েছি, একথা জানাজানি হয় আমার ইচ্ছা নয়। তুমি হুঁশিয়ার লোক, তোমাকে বেশী বলবার দরকার নেই।—এখন তোমার দোকানে উপহার দেবার মত ভাল জিনিস কি আছে দেখাও।'

'যে-আজ্ঞে মহা—শয়!' প্রহ্লাদ ভালমানুষের মত একটু বিনীত হাস্য করিয়া বলিল —'আপনি এত সুন্দর বাংলা বলেন যে আশ্চর্য হতে হয়। বাঙালী ছাড়া এরকম বাংলা বলতে আমি আর কাউকে শুনিনি।'

তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া গৌরী বলিল—'তাই নাকি? তবে কি

তোমার মনে হয় আমি বাঙালী?'

'না না—সে কি কথা মহারাজ! আমি বলছিলাম— '

'আমি অনেকদিন বাংলা দেশে ছিলাম, তাই ভাল বাংলা বল্‌তে পারি—বুঝলে?'

প্রহ্লাদ তাড়াতাড়ি সম্মতি-জ্ঞাপক ঘাড় নাড়িল ; তারপর স্বয়ং অগ্রগামী হইয়া দোকানের বহুবিধ সৌখীন ও মহার্ঘ্য পণ্যসম্ভার দেখাইতে লাগিল।

গজদন্ত ও সোনারূপার কারুশিল্পের জন্য ঝিন্দ্‌ প্রসিদ্ধ ; অধিকন্তু অন্যান্য দেশ-বিদেশের বাহারে শিল্পও আছে। গৌরী পছন্দ করিয়া কয়েকটি জিনিস কিনিল। কিনিবার প্রয়োজন ছিল বলিয়া নয়, স্বদেশবাসী দোকানদারের প্রতি মমতাবশত প্রায় পাঁচ-সাত শত টাকার জিনিস খরিদ হইয়া গেল। গৌরী মনে মনে স্থির করিল খেলনাগুলি সে চম্পাকে উপহার দিবে।

একটি বৈদ্যুতিক টর্চ গৌরীর ভারি পছন্দ হইল। হাতির দাঁতের একটি ডুট্টা—প্রায় নয় ইঞ্চি লম্বা—তাহার ভিতরটা ফাঁপা, সেল্‌ পুরিবার ব্যবস্থা আছে ; সম্মুখে কাচ বসানো। ডুট্টার গায়ে একটি মাত্র লাল দানা আছে, সেটি টিপিলেই বিদ্যুৎ বাতি জ্বলিয়া উঠে।

টর্চটি হাতে লইয়া গৌরী বলিল—'এটা আমি সঙ্গে নিলাম। বাকীগুলো প্রাসাদে পাঠিয়ে দিও—কাল দাম পাবে।'

আহ্লাদিত প্রহ্লাদ করজোড়ে বলিল—'যো হুকুম।'

দোকান হইতে বাহির হইয়া দুইজনে নীরবে দক্ষিণমুখে চলিল। এই পথই ঋজু রেখায় গিয়া কিস্তার পুলের উপর দিয়া ঝড়োয়ায় পৌঁছিয়াছে।

ক্রমে দোকানপাট শেষ হইয়া পথ জনবিরল হইতে আরম্ভ করিল। দুইপাশে আর ঘনসন্নিবিষ্ট বাড়ি নাই—মাঝে মাঝে তরুবীথি ; তরুবীথির পশ্চাতে ক্বচিৎ দুই একখানা বড় বড় বাড়ি। অধিকাংশই ফাঁকা মাঠ।

ঝিন্দের পথে আলোকের ব্যবস্থা ভাল নয়, বিদ্যুৎ এখনো সেখানে প্রবেশ লাভ করে নাই। দূরে দূরে এক একটা কেরোসিন ল্যাম্পের স্তম্ভ ; তাহা হইতে যে ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ হইতেছে পথ চলার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়। নবক্রীত টর্চটা মাঝে মাঝে জ্বালিয়া গৌরী চলিতে লাগিল।

মাইলখানেক পথ এইভাবে চলিবার পর একটা প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের লোহার রেলিং রাস্তার ধার দিয়া বহু দূর পর্যন্ত গিয়াছে দেখিয়া গৌরী টর্চের আলো ফেলিয়া ভিতরটা দেখিবার চেষ্টা করিল। বিশেষ কিছু দেখা গেল না, কেবল একটা অন্ধকার-দর্শন বাড়ির আকার অস্পষ্টভাবে চোখে পড়িল। রুদ্ররূপ বলিল—'এটা উদিতের বাগানবাড়ি।'

আরো কিছুদূর যাইবার পর বাগানবাড়ির উঁচু পাথরের সিংদরজা চোখে পড়িল। তাহারা সিংদরজার প্রায় সম্মুখীন হইয়াছে, এমন সময় দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একটা ফিটন গাড়ি কম্পাউণ্ডের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। রাস্তায় পড়িয়াই গাড়ি বিদ্যুদ্বেগে উত্তরদিকে মোড় লইল, গৌরী ও রুদ্ররূপ লাফাইয়া সরিয়া না গেলে গাড়িখানা তাহাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িত। গৌরী গাড়ির পথ হইতে সরিয়া গিয়াই গাড়ির উপর টর্চের আলো ফেলিল। নিমেষের জন্য একটা পরিচিত মুখ সেই আলোতে দেখা গেল ; তারপর জুড়ী-ঘোড়ার গাড়ি তীরবেগে অন্ধকার পথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

গৌরী পিছন ফিরিয়া ক্রমশ ক্ষীয়মান চক্রধ্বনির দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া কহিল—'স্টেশনমাস্টার স্বরূপদাস। শক্তিগড়ে যাবার জন্যে ভারি তাড়া দেখছি।' একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'গাড়িখানা উদিতের—না?'

রুদ্ররূপ বলিল—'হ্যাঁ। এইখানেই উদিত সিংয়ের আস্তাবল।'

গৌরী কতকটা নিজমনেই বলিল—'উদিতকে কি খবর দিতে গেল কে জানে। জরুরী খবর নিশ্চয়।'

একটা এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। গৌরী আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন সময় উদিতের ফটকের ভিতর হইতে একখণ্ড কাগজ বাতাসে ওলট-পালট খাইতে খাইতে তাহার প্রায় পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। টর্চের আলো ফেলিয়া গৌরী দেখিল—একটা টেলিগ্রাম—কৌতূহলবশে তুলিয়া লইয়া পড়িল. তাহাতে লেখা রহিয়াছে—

স্বরূপদাস—স্টেশনমাস্টার ঝিন্দ্

সন্ধান পাইয়াছি, গৌরীশংকর রায় বাঙালী জমিদার চেহারা অবিকল—

কিষণলাল

টেলিগ্রামখানা মুড়িয়া গৌরী পকেটে রাখিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'যাক, জানতে পেরেছে তাহলে। এইজন্যে এত তাড়া।'

পথে আর বিশেষ কোনো কথা হইল না। রুদ্ররূপ দুই-একটা প্রশ্ন করিল বটে কিন্তু গৌরী নিজের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিল, উত্তর দিল না। একসময় বলিল—'প্রহ্লাদও তাহলে ওদের দলে।'

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

—ন তস্থৌ

পুল পার হইয়া ঝড়োয়ায় পদার্পণ করিবামাত্র পুলের একটা গম্বুজের পাশ হইতে একজন লোক বাহির হইয়া আসিল; চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল—'কে যায়?'

পথে তখন অন্য জনমানব নাই।

সিপাহী-বেশী লোকটাকে ভাল ঠাহর করা গেল না; গৌরী প্রশ্ন করিল—'তুমি কে! বিজয়লাল?'

বিজয়লাল বলিল—'হুজুর হাঁ। আপনার সঙ্গে কে?'

'রুদ্ররূপ।'

'ভাল। আমার সঙ্গে আসুন।'

বিজয়লাল আগে আগে চলিল, গৌরী ও রুদ্ররূপ তাহার অনুসরণ করিল। পুলের এলাকা পার হইয়া বড় সড়ক ছাড়িয়া বিজয়লাল বাঁ দিকের একটা সরু রাস্তা ধরিল। রাস্তায় আলো নাই. পাশের বাড়িগুলিও অন্ধকার। সুতরাং কোথায় যাইতেছে গৌরী তাহা বুঝিতে পারিল না; কিন্তু কিস্তার জল যে বেশী দূরে নয়, তাহা মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে অনুভব করিতে লাগিল।

এইভাবে প্রায় দশ মিনিট চলিবার পর বিজয়লাল একটি ছোট ফটকের সম্মুখে থামিল, ফটক খুলিয়া বলিল—'আসুন।'

ফটকের মাথায় স্তম্ভের উপর স্বল্পালোক বাতি জ্বলিতেছিল; গৌরী দেখিল,

স্থানটা কোন বড় বাড়ির খিড়কির বাগান। বাগান নেহাৎ ছোট নয়, বড় বড় ফলের গাছ দিয়া ঢাকা, স্থানে স্থানে বসিবার জন্য তরুমূলে গোলাকৃতি চাতাল তৈরি করা আছে।

গৌরীর মনে ঈষৎ বিস্ময়জড়িত প্রশ্ন জাগিল—কার বাড়ি? এ তো ঝড়োয়ার রাজবাড়ি নয়।

প্রশ্নটা মনে উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর চমক ভাঙিল—মনের প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা এতক্ষণে তাহার সজাগ মনের কাছে মুখোমুখি ধরা পড়িয়া গেল। কৃষ্ণার নিমন্ত্রণের গূঢ়ার্থও বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, এই জন্য কৃষ্ণা ডাকিয়াছে। কিন্তু সে তো বহুপূর্বে তাহা মনে মনে বুঝিয়াছিল। তবু সে আসিল কেন? কি প্রতিজ্ঞা সে করিয়াছিল?

এখনো ফিরিবার সময় আছে; কাহাকেও কোনো কৈফিয়ৎ না দিয়া সটান ফিরিয়া যাইতে পারে। বিজয়লাল রুদ্ররূপ বিস্মিত হইবে, কিন্তু তাহাতে কি? সে তো নিজের কাছে খাঁটি থাকিবে! তবে কি ফিরিয়াই যাইবে? কিন্তু—

কস্তুরীবাঈকে আর একবার দেখিবার লোভ তাহার মনে কিরূপ দুর্বার লইয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। না না—সে ফিরিয়াই যাইবে।

কিন্তু এ তো ঝড়োয়ার রাজপ্রাসাদ নয়। তবে কেন বিজয়লাল এখানে আসিয়া থামিল? কৃষ্ণা কি তবে অন্য কোনো প্রয়োজনে তাহাকে ডাকিয়াছে?

মনে মনে এইরূপ দাঁড় টানাটানি চলিতেছে, এমন সময় কৃষ্ণার মৃদু কণ্ঠস্বর শুনা গেল—'আসুন মহারাজ।'

আর দ্বিধা করিবার পথ রহিল না। সঙ্কুচিত পদে গৌরী ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল।

কৃষ্ণা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিল, বলিল—'মহারাজের জয় হোক। বিধি আজ অনুকূল, তাই গরীবের ঘরে মহারাজের পদার্পণ হল।'

গৌরী গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—'কৃষ্ণা, আমায় ডেকে পাঠিয়েছ কেন?'

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল—'তা তো চিঠিতেই জানিয়েছিলাম মহারাজ—প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।'

গৌরী মাথা নাড়িয়া বলিল—'না, সত্যি কি দরকার বল।'

কৃষ্ণা আবার হাসিল, বলিল—'বুঝতে পারেননি? আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি।' তারপর বিজয়লালের দিকে ফিরিয়া কহিল—'আপনারা দু'জনে ততক্ষণ আমার বাগানে বসে আলাপ করুন, আমি মহারাজকে নিয়ে এক জায়গায় যাব।' রুদ্ররূপের মুখে ঈষৎ উৎকণ্ঠার চিহ্ন দেখিয়া কহিল—'ভয় নেই, একঘণ্টার মধ্যেই আমি মহারাজকে ফিরিয়ে এনে আপনার হেপাজাত করে দেব।—মহারাজ, আমার সঙ্গে চলুন।' কৃষ্ণা ফটকের বাহির হইল।

প্রবল চুম্বকের আকর্ষণে লোহা যেমন সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া তাহার অভিগামী হয়, গৌরীও তেমনি তাহার অনুবর্তী হইল। ফটক হইতে বাহির হইয়া কৃষ্ণা সম্মুখ দিকে চলিল। অল্পক্ষণ একটা সঙ্কীর্ণ গলি দিয়া যাইবার পর গৌরী দেখিল, তাহারা কিস্তার তীরে পৌঁছিয়াছে। সম্মুখেই ছোট একটি পাথর বাঁধানো ঘাট, ঘাটে একটি ডিঙি বাঁধা। মাঝি মাল্লা কেহ কোথাও নাই।

কৃষ্ণা সন্তর্পণে ক্ষুদ্র ডিঙিতে উঠিয়া গলুইয়ে বসিল, পাতলা লঘু দুইখানি দাঁড় হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল—'এবার আপনি আসুন, ঐদিকে বসুন।'

গৌরী ডিঙিতে উঠিয়া বলিল—'দাঁড় আমায় দাও।'

কৃষ্ণা মুখ টিপিয়া হাসিল—'কোথায় যেতে হবে আপনি তো জানেন না। আপনি দাঁড় নিয়ে কি করবেন?' বলিয়া দাঁড় জলে ডুবাইল।

গৌরী নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কৃষ্ণার দাঁড়ের আঘাতে ডিঙি পূর্বমুখে চলিতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎকাল নীরবে কাটিবার পর কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল—'চুপ করে বসে কি ভাবছেন?'

কিস্তার জলের দিকে তাকাইয়া গৌরী বলিল—'কিছু না।'

দাঁড় টানিতে টানিতে কৃষ্ণা বলিল—'সেদিন আপনি আমাকে যে রকম শাসিয়েছিলেন, তাতে বুঝেছিলাম যে সখীকে দেখে আপনার আশা মেটেনি। তাই আজ সেদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার ব্যবস্থা করেছি। খুশি হয়েছেন তো?'

গৌরী চুপ করিয়া রহিল, তারপর ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করিল—'তিনি জানেন?'

কৃষ্ণা মনে মনে হাসিল, বলিল—'জানেন।' ও-পক্ষেই যে আগ্রহ ও অধীরতা বেশী তাহা আর প্রকাশ করিল না।

গৌরীর বুকের ভিতরটা টলমল নৌকার মতই একবার দুলিয়া উঠিল; দুইহাতে নৌকার দুইদিকের কানা চাপিয়া ধরিয়া সে বসিয়া রহিল।

রাজবাটির প্রশস্ত ঘাটের পাশ দিয়া একশ্রেণী সংকীর্ণ সোপান উঠিয়া গিয়াছে, কৃষ্ণা সেইখানে নৌকা ভিড়াইল। গৌরী ঊর্ধ্বে চাহিয়া দেখিল, রাজপুরী অন্ধকার নিঃঝুম—কেবল দ্বিতলের একটি জানালা হইতে দীপালোক নির্গত হইতেছে।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে কৃষ্ণা নিম্নস্বরে বলিল—'এটি আমার নিজস্ব সিঁড়ি, একেবারে সখীর খাস-মহলে গিয়ে উঠেছে।'

সোপানশীর্ষে একটি মজবুত কাঠের দরজা; কৃষ্ণা আঁচল হইতে চাবি লইয়া দ্বার খুলিল। কবাট উন্মুক্ত করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে বলিল—'স্বাগত!'

ভিতরে একটি অলিন্দ—অন্ধকার। কৃষ্ণা গৌরীর দিকে হাত বাড়াইয়া দিল—'আমার হাত ধরে আসুন।'

অলিন্দ পার হইয়া একটি নাতিবৃহৎ ঘর। মেঝেয় গালিচা পাতা, গালিচার উপর একস্থানে পুরু গদির উপর মখমলের জাজিম, তাহার উপর মোটা মোটা মখমলের জরিদার তাকিয়া। আতরদান, গোলাপপাশ ইত্যাদি ইতস্তত ছড়ানো—একটি সোনার আলবোলার শীর্ষে সুগন্ধ তামাকুর ধূম ধীরে ধীরে পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতেছে। মাথার উপর দুইটি মোমবাতির ঝাড় স্নিগ্ধ আলো বিকীর্ণ করিতেছে। এই ঘরের আলোই গৌরী ঘাট হইতে দেখিতে পাইয়াছিল।

আলোকিত ঘরে প্রবেশ করিয়াই গৌরীর হৃৎপিণ্ড একবার ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া উঠিল, গলার পেশীগুলা কণ্ঠ আঁটিয়া ধরিল। সে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে চাহিল—ঘরে কেহ নাই।

'আপনি ততক্ষণ বসে তামাকু খান, আমি এখনি আসছি।' বলিয়া গৌরীকে বসাইয়া হাসিমুখে কৃষ্ণা প্রস্থান করিল।

দুইখানা ঘরের পরেই কস্তুরীর শয়নকক্ষ। ঘর প্রায় অন্ধকার, কেবল এককোণে একটি বাতি জ্বলিতেছে। কৃষ্ণা ঘরে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে চাহিল, তারপর শয্যার দিকে নজর পড়িতেই দ্রুতপদে পালঙ্কের পাশে গিয়া বলিল—'একি কস্তুরী! শুয়ে যে!'

লাল চেলির পট্টবস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া কস্তুরী শুইয়া আছে, শুভ্র বালিশের উপর তাহার মুক্তাখচিত কবরীর কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। কৃষ্ণার সাড়া পাইয়া সে আরো গুটাইয়া শুইল, বালিশের ভিতর হইতে মৃদু রুদ্ধ স্বরে বলিল—'না, কৃষ্ণা, আমি পারব না, তুই যা।'

কৃষ্ণা শয্যার পাশে বসিয়া বলিল—'সে কি হয় সখি! অতিথিকে ডেকে এনে এখন 'না' বললে কি চলে? ওঠ।'

কস্তুরী মাথা নাড়িয়া বলিল—'না না, কৃষ্ণা, আমার ভারি লজ্জা করছে।'

কৃষ্ণা বলিল—'তা করুক। প্রথম প্রথম অমন একটু করে। চোখোচোখি হলেই সেরে যাবে।'

'না, আমি পারব না কৃষ্ণা । ছি, যদি বেহায়া মনে করেন।'

কৃষ্ণা এবার রাগিল, বলিল—'তবে দেখবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলে কেন? আর আমাকেই বা পাগল করে তুলেছিলে কেন? মহামান্য অতিথিকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে

দেখা না করে ফিরিয়ে দেবে? তাতে তিনি কিছু মনে করবেন না?'

কস্তুরী কাতরস্বরে বলিল—'তুই রাগ করিস্‌নি কৃষ্ণা! আমি যে পারছি না—দ্যাখ্‌, আমার হাত-পা কাঁপছে।' বলিয়া কৃষ্ণার হাত লইয়া নিজের বুকের উপর রাখিল।

কৃষ্ণা তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপিচুপি বলিল—'সখি, বুক কাঁপছে বলে ভয় করলে চলবে কেন? আজ প্রিয়তম তোমার ঘরে এসেছেন, আজ তো 'রোমে রোমে হরখিলা' লাগবেই। আজ কি লজ্জা করে বিছানায় শুয়ে থাকতে আছে! ওঠ ওঠ সখি, 'ন যুক্তং অকৃতসৎকারং অতিথিবিশেষং উজ্‌ঝিত্বা স্বচ্ছন্দতো গমনম্‌—থুড়ি—শয়নম্‌।' বলিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল।

কস্তুরী কৃষ্ণার কাঁধে মাথা রাখিয়া চুপি চুপি বলিল—'সেদিন আচম্‌কা দেখা হয়েছিল—কিন্তু আজ এমনভাবে সেজেগুজে তাঁর কাছে যেতে বড্ড লজ্জা করবে যে কৃষ্ণা।'

কৃষ্ণা বলিল—'বেশ, আজ তোমার লজ্জাই দেবতাকে ভোগ দিও—তাতেও ঠাকুর খুশি হবেন। আর দেরি কোরো না, তিনি কতক্ষণ একলাটি বসে আছেন।'

কস্তুরী উঠিয়া দাঁড়াইল—'আচ্ছা—কিন্তু তুই থাকবি তো?'

'থাকব। যতক্ষণ তোমাদের বিয়ে না হচ্ছে, ততক্ষণ তোমার সঙ্গ ছাড়ছি না।'

'আচ্ছা, তুই তবে এগিয়ে যা—আমি যাচ্ছি।'

'দেখো, আবার শুয়ে পড়ো না কিন্তু। আর বরের জন্য নিজে হাতে করে পান নিয়ে এস!' বলিয়া কৃষ্ণা প্রস্থান করিল।

তাকিয়ায় ঠেস দিয়া গৌরী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বসিয়াছিল, কৃষ্ণা ফিরিয়া আসিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিল—'কৃষ্ণা, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল।'

অবাক হইয়া কৃষ্ণা তাহার মুখের পানে তাকাইল—'সে কি মহারাজ! আপনি কি রাগ করলেন?'

'না না, কৃষ্ণা, তুমি আমার কথা বুঝবে না, শীগ্‌গির আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল।'

'কিন্তু সখী যে এই এলেন বলে!'

'তিনি আসবার আগেই আমি যেতে চাই। চল।' বলিয়া সে কৃষ্ণার হাত ধরিল।

'কিন্তু আমি যে কিছুই—'

'বুঝবে না। তোমরা কেউ বুঝবে না। হয়তো কোনোদিন—কিন্তু এখন সে থাক। চল।' কৃষ্ণাকে সে একরকম জোর করিয়াই দ্বারের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

অলিন্দের সম্মুখে পৌঁছিয়া সে একবার ফিরিয়া চাহিল। তাহার গতি শিথিল হইয়া গেল, বুকের ভিতর রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। ঘরের অপর প্রান্তে দ্বারের সম্মুখে কস্তুরী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার হাতে পানের করঙ্ক, পরিধানে রক্তের মত রাঙা চেলি। চোখে ঈষৎ বিস্ময়ের স্থির দৃষ্টি।

গলার মধ্যে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া গৌরী মুখ ফিরাইয়া লইল। তারপর অন্ধের মত সেই অলিন্দের ভিতর দিয়া কৃষ্ণাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

কৃষ্ণার হাত যে তাহার বজ্রমুষ্টিতে বাঁধা আছে, তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

ধনঞ্জয়ের একটু ঢুল আসিয়াছিল, গৌরী ও রুদ্ররূপ প্রবেশ করিতেই তিনি ঘড়ির দিকে একবার তাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গৌরী কোনো কথা না বলিয়া আয়নার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। মাথা হইতে পাগড়িটা খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া গলার বোতাম খুলিতে লাগিল।

ধনঞ্জয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন,—তারপর শুধু বলিলেন—'হুঁ।'

গৌরী কষায়িত চক্ষে একবার তাঁহার পানে চাহিল; যেন আর একটি কথা বলিলেই

সে বাঘের মত তাঁহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে।

ধনঞ্জয় কিন্তু তাহাকে কিছু বলিলেন না, রুদ্ররূপের দিকে ফিরিয়া তন্দ্রালস ভাবী গলায় বলিলেন—'রুদ্ররূপ, আজ তুমি পাহারায় থাক। আমি চললাম।' বলিয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ধনঞ্জয় চলিয়া গেলে গৌরী সহসা রুদ্ররূপের দিকে ফিরিয়া বলিল—'রুদ্ররূপ, আজ আমাকে পাহারা দেবার দরকার নেই। তুমি যাও—শুধু আজকের রাত্রিটা আমাকে একলা থাকতে দাও। দোহাই তোমাদের।'

গৌরীর কণ্ঠস্বরে এমন একটা উগ্র বেদনা ছিল যে ক্ষণকালের জন্য রুদ্ররূপকে বিমূঢ় করিয়া দিল; কিন্তু পরক্ষণেই সে সসম্ভ্রমে স্যালুট করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

পত্রাদি

বাতি নিবাইয়া গৌরী শয্যায় শয়ন করিল: অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল। পরিষ্কারভাবে চিন্তা করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না; মস্তিষ্কের মধ্যে দুই বিরুদ্ধ শক্তির প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছিল। শরীর মনের সমস্ত অণুপরমাণু যেন দুই বিপক্ষ দলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পরস্পরকে হানাহানি করিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিতেছিল।

বুকজোড়া এই অশান্ত অন্ধ সংগ্রাম সে কেবল একটিমাত্র দুষ্প্রাপ্য নারীকে কেন্দ্র করিয়া—তাহা ভাবিয়া গৌরীর কণ্ঠ হইতে একটা চাপা বেদনাবিদ্ধ শব্দ বাহির হইল—উঃ! কস্তুরী আজ বাসক-সজ্জায় সাজিয়া নব-বধূর মত দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আর—সে তাহাকে দেখিয়াও মুখ ফিরাইয়া চলিয়া আসিয়াছে। কর্তব্যবুদ্ধির সমস্ত সান্ত্বনা ছাপাইয়া এই দুঃসহ মনঃপীড়াই তাহার হৃৎপিণ্ডকে পিষিয়া রক্তাক্ত করিয়া তুলিতেছিল।

সে ভাবিতে লাগিল—পলাইয়া যাই' চুপি চুপি কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজের দেশে, নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরিয়া যাই, যেখানে দাদা আছেন, বৌদিদি আছেন—ভুলিতে পারিব না? এই মায়াপুরীর মোহময় ইন্দ্রজাল হইতে মুক্তি পাইব না? না পাই—তবু তো প্রলোভন হইতে দূরে থাকিব; পরস্ত্রীলুব্ধ মিথ্যাচারীর জীবন-যাপন করিতে হইবে না।

কিন্তু—

পলাইবার উপায় নাই। তাহার হাতে-পায়ে শিকল বাঁধা। সে তো ঝিন্দের রাজা নয়—ঝিন্দের বন্দী। আরব্ধ কাজ শেষ না করিয়া, একটা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা ওলট-পালট করিয়া দিয়া সে পলাইবে কোন মুখে? নিজের দুঃখ তাহার যত মর্মভেদীই হোক,

একটা রাজ্যকে বিপ্লবের কোলে তুলিয়া দিয়া ভীরুর মত পলাইবার অধিকার তাহার নাই ; পলাইলে শুধু সে নয়, সমস্ত বাঙালী জাতির মুখে কালি লেপিয়া দেওয়া হইবে। —না, তাহাকে থাকিতে হইবে। যদি কখনো শঙ্কর সিংকে উদ্ধার করিতে পারে, তবে তাহার হাতে কস্তুরীকে তুলিয়া দিয়া মুখে হাসি টানিয়া বিদায় লইতে পারিবে—তার আগে নয়।

সমস্ত রাত্রি গৌরী ঘুমাইতে পারিল না ; মোহাচ্ছন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা নহবৎখানার বাজনা শুনিয়া গেল। ভোরের দিকে একটু নিদ্রা আসিল বটে, কিন্তু নিদ্রার মধ্যেও তাহার মন অশান্ত সমুদ্রের মত পাষাণ প্রতিবন্ধকে বারবার আছাড়িয়া পড়িয়া নিজেকে শতধা চূর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিল।

বেলা আটটার সময় বজ্রপাণি আসিয়াছেন শুনিয়া সে জবাফুলের মত আরক্ত চোখ মেলিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল। চম্পা সংবাদ দিতে আসিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'কি চান তিনি?'

চম্পা গৌরীর মুখের চেহারা দেখিয়া সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, গিন্নীপনা করিবার সাহসও আজ তাহার হইল না। সে মাথা নাড়িয়া বলিল—'জানি না।'

গৌরী বোধ করি বজ্রপাণিকে বিদায় করিয়া দিবার কথা বলিতে যাইতেছিল ; কিন্তু তাহার পূর্বে তিনি নিজেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গৌরীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—'একি! আপনার চেহারা এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন? শরীর কি অসুস্থ? —চম্পা, ডাক্তার গঙ্গানাথকে খবর পাঠাও।'

চম্পা গমনোদ্যত হইলে গৌরী বলিল—'না না—ডাক্তার চাই না, আমি বেশ ভালই আছি। আপনি কি জরুরী কিছু বলতে চান?'

বজ্রপাণি একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ—কিন্তু আপনার শরীর যদি—'

গৌরী শয্যা ত্যাগ করিয়া বলিল—'আপনি ও-ঘরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি মুখ-হাত ধুয়েই যাচ্ছি।—চম্পা, আমার জন্যে এক গেলাস ঠাণ্ডা সরবৎ তৈরি করে আনতে পার?'

চম্পা একবার মাথা ঝুঁকাইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আধঘণ্টা পরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া গৌরী ভোজন-কক্ষে আসিয়া বসিল। প্রাতরাশ টেবিলে সজ্জিত ছিল, কিন্তু সে তাহা স্পর্শ করিল না। চম্পা থালার উপর সরবতের পাত্র লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল—বাদাম, মিছরি ও গোলমরিচ দিয়া প্রস্তুত উৎকৃষ্ট ঠাণ্ডাই সহাস্যমুখে এক চুমুক পান করিয়া গৌরী বলিল—'আঃ! চম্পা, তোমার জন্যেই ঝিন্দের রাজাগিরি কোনোমতে বরদাস্ত করছি ; তুমি যেদিন বিয়ে করে বরের ঘরে চলে যাবে, আমিও সেদিন ঝিন্দ্ ছেড়ে বিবাগী হয়ে যাব।'

চম্পার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; সে বলিল—'রাজবাড়ি ছেড়ে আমি একপাও নড়ব না—আপনি যদি তাড়িয়ে দেন তবুও না।'

সরবতের পাত্রে আর এক চুমুক দিয়া গৌরী বলিল—'তোমাকে রাজবাড়ি থেকে তাড়াতে পারি এত সাহস আমার নেই। বরঞ্চ তুমিই আমাকে তাড়াতে পার বটে। তুমি চলে গেলেই আমাকেও চলে যেতে হবে। কিন্তু তুমি যাতে না যাও, তার ব্যবস্থা আমায় করতে হচ্ছে।—দেওয়ানজী, চম্পার বিয়ের আর কোনো কথা উঠেছে?'

বজ্রপাণি অদূরে কৌচে বসিয়াছিলেন, বলিলেন—'হ্যাঁ, ত্রিবিক্রম তো অনেক দিন থেকেই চেষ্টা করছেন—'

'তাঁকে চেষ্টা করতে বারণ করে দেবেন। চম্পার বিয়ের ব্যবস্থা আমি করব—কি বল চম্পা?'

চম্পা কিছুই বলিল না। বিবাহের ব্যবস্থা বাবাই করুন আর রাজাই করুন, বিবাহ জিনিসটাতেই তাহার আপত্তি। সে ক্ষীণভাবে হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসি ভাল ফুটিল না।

রুদ্ররূপ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গৌরী বলিল—'আর, রুদ্ররূপেরও একটা বিয়ে দিতে হবে। আমার আশেপাশে যারা থাকে তাদের আমি সুখী দেখতে চাই।' গৌরীর ঠোঁটের উপর দিয়া ক্ষণকালের জন্য যে ব্যথা-বিদ্ধ হাসিটা খেলিয়া গেল তাহা কাহারও চোখে পড়িল না।

কিন্তু গৌরীর কথার ইঙ্গিত রুদ্ররূপের কানে পৌঁছিল। তাহার মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিল ; সে ফৌজী কায়দায় শূন্যের দিকে তাকাইয়া শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এই সময় সর্দার ধনঞ্জয় প্রবেশ করিয়া রাজাকে অভিবাদন করিলেন। গৌরী নিঃশেষিত সরবতের পাত্র চম্পাকে ফেরত দিয়া মুখ মুছিয়া বলিল—'এবার কাজের কথা আরম্ভ হোক। দেওয়ানজী, আরম্ভ করুন।'

বজ্রপাণি তখন কাজের কথা ব্যক্ত করিলেন। রাজবংশের রেওয়াজ এই যে, যুবরাজের তিলক সম্পন্ন হইয়া যাইবার পর ভাবী যুবরাজ-পত্নীকে বংশের সাবেক অলঙ্কারাদি উপঢৌকন পাঠান হয়—এই সকল অলঙ্কার পরিয়া কন্যার বিবাহ হয়। এই প্রথা বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্তমানে নানা কারণে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নাই। শঙ্কর সিংকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে, এই আশাতেই এতদিন বিলম্ব করা হইয়াছে। কিন্তু আর বিলম্ব করা সমীচীন নয় ; অদ্যই সমস্ত উপঢৌকন ঝড়োয়ায় পাঠানো প্রয়োজন। নচেৎ, এই ত্রুটির সূত্র ধরিয়া অনেক কথার উৎপত্তি হইতে পারে।

শুনিয়া গৌরী বলিল—'বেশ তো। রেওয়াজ যখন, তখন করতে হবে বৈ কি। এর জন্যে আমার অনুমতি নেবার কোনো দরকার ছিল না—আপনারা নিজেরাই করতে পারতেন। —তা কে এসব গয়নাপত্র সঙ্গে করে নিয়ে যাবে? এ বিষয়েও রেওয়াজ আছে নাকি?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'চম্পা নিয়ে যাবে। অবশ্য তার সঙ্গে রক্ষী থাকবে।'

গৌরী বলিল—'বেশ। রুদ্ররূপ চম্পার রক্ষী হয়ে যাক।—তাহলে দেওয়ানজী, আর বিলম্ব করবেন না—সওগাত পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।'

বজ্রপাণি ও ধনঞ্জয় প্রস্থান করিলেন। চম্পা মহানন্দে সাজসজ্জা করিতে গেল।

গৌরী মুষ্টির উপর চিবুক রাখিয়া অনেকক্ষণ শূন্যের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর মনে মনে একটা সংকল্প স্থির করিয়া সন্তর্পণে উঠিয়া গিয়া দরজার বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিল—সম্মুখের বারান্দায় কেবল রুদ্ররূপ পায়চারি করিতেছে। গৌরী অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিল। রুদ্ররূপ কাছে আসিলে বলিল—সর্দার কোথায়?'

'তিনি আর দেওয়ানজী তোশাখানার দিকে গেছেন।'

গৌরী তখন গলা নামাইয়া বলিল—'তুমি যাও, চম্পার কাছ থেকে চিঠির কাগজ আর কলম চেয়ে নিয়ে এস। চুপি চুপি, বুঝলে?'

রুদ্ররূপ প্রস্থান করিল। সদর হইতে লেখার সরঞ্জাম না আনাইয়া চম্পার নিকট হইতে আনাইবার কারণ কি তাহাও আন্দাজ করিয়া লইল। অন্দরের যে অংশটায় চম্পার মহল সেখানে রুদ্ররূপ পূর্বে কখনো পদার্পণ করে নাই ; একজন পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে ঠিকানা জানিয়া লইল। দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল, দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। একটু ইতস্তত করিয়া দরজায় টোকা মারিল, তারপর ভাঙা গলায় ডাকিল—'চম্পা দেঈ!'

কবাট খুলিয়া একজন দাসী মুখ বাড়াইল। রুদ্ররূপকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল—'কাকে দরকার সর্দারজী!'

'চম্পা দেঈ আছেন?'

'আছেন। ঝড়োয়ায় যেতে হবে তাই তিনি সাজগোজ করছেন।'

রুদ্ররূপ বড় বিপদে পড়িল। চম্পাকে সে মনে মনে ভারি ভয় করে, এ সময় তাহাকে ডাকিলে সে যে চটিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এদিকে রাজার হুকুম। সাহসে ভর করিয়া সে বলিল,—'তাঁর সঙ্গে জরুরী দরকার আছে, তাঁকে খবর দাও। আর, তুমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যাও।'

পরিচারিকা চম্পার খাস চাকরানী, বাপের বাড়ি হইতে সঙ্গে আসিয়াছে; সে একটু আশ্চর্য হইল! একে তো অন্দরমহলে পুরুষের গতিবিধি অত্যন্ত কম, তাহার উপর রুদ্ররূপের অদ্ভুত হুকুম শুনিয়া সে থতমত খাইয়া বলিল—'কিন্তু—, এত্তেলা তাঁকে আমি এখনি দিচ্ছি। কিন্তু—তিনি এখন সিঙার করছেন—'

রুদ্ররূপ একটু গরম হইয়া বলিল—'তা করুন—'

ভিতর হইতে চম্পার কণ্ঠ শুনা গেল—'রেওতি, কে ও? কি চায়?'

রেবতী দ্বার ভেজাইয়া দিয়া কর্ত্রীকে সংবাদ দিতে গেল। রুদ্ররূপ অস্বস্তিপূর্ণ দেহে দাঁড়াইয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরে আবার দরজা খুলিল, রেবতী বলিল—'আসুন।'

রুদ্ররূপ সসঙ্কোচে ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরের ভিতর আর একটি ঘর, মাঝখানে পর্দা। এই পর্দার ভিতর হইতে কেবল মুখটি বাহির করিয়া চম্পা দাঁড়াইয়া আছে, রুদ্ররূপকে দেখিয়াই বলিল—'তোমার আবার এই সময় কি দরকার হল? শীগ্‌গির বল, আমার সময় নেই। এখনো চুল বাঁধতে বাকি।'

রুদ্ররূপ রেবতীর দিকে ফিরিয়া বলিল—'তুমি বাইরে যাও।'—চম্পার প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল—'ভারী গোপনীয় কথা।'

চম্পা মুখে অধীরতাসূচক একটা শব্দ করিল। রেবতীকে মাথা নাড়িয়া ইশারা করিতেই সে বাহিরে বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল।

গোপনীয় কথা বলিতে হইবে, চীৎকার করিয়া বলা চলে না। রুদ্ররূপ কৈ মাছের মত কোণাচে ভাবে চম্পার নিকটবর্তী হইল। চম্পা চোখে বোধ করি কাজল পরিতেছিল, প্রসাধন এখনো শেষ হয় নাই; সে কাজলপরা বামচক্ষে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া বলিল—'কি হয়েছে?'

রুদ্ররূপের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, সে একবার গলা খাঁকারি দিয়া চম্পার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া গদ্‌গদ স্বরে বলিল—'রাজা চিঠির কাগজ চাইছেন।'

'এই তোমার গোপনীয় কথা!' রাগের মাথায় চম্পা পর্দা ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল; আবার তখনি নিজের অসম্পূর্ণ বেশবিন্যাসের দিকে তাকাইয়া পর্দার ভিতর লুকাইল। ওড়না গায়ে নাই, শাড়ির আঁচলটাও মাটিতে লুটাইতেছে; এ অবস্থায় রুদ্ররূপের সম্মুখীন হওয়া চলে না—তা যতই রাগ হোক।

রুদ্ররূপ কাতরভাবে বলিল—'সত্যি ব'লছি চম্পা, রাজা বললেন, তোমার কাছ থেকে চুপি চুপি চিঠির কাগজ আর কলম চেয়ে আনতে। বোধ হয় চিঠি লিখবেন।'

'তুমি একটা—তুমি একটা—' চম্পা হাসিয়া ফেলিল—'তুমি একটি বুদ্ধু।'

কিংকর্তব্যবিমূঢ় রুদ্ররূপ বলিয়া ফেলিল—'আর তুমি একটি ডালিম ফুল।' বলিয়া ফেলিয়াই তাহার মুখ ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

চম্পা কিছুক্ষণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার সিন্দুরের মত মুখের পানে তাকাইয়া রহিল; তারপর পর্দা আস্তে আস্তে বন্ধ হইয়া গেল।

রুদ্ররূপ ঘর্মাক্ত দেহে ভাবিতে লাগিল—পলায়ন করিবে কিনা। কিছুক্ষণ পরে চম্পার হাত পর্দার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল—'এই নাও।'

কাগজ কলম লইয়া মুখ তুলিতেই রুদ্ররূপ দেখিল, পর্দার ফাঁকে কেবল একটি কাজলপরা চোখ তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। ভড়্‌কানো ঘোড়ার মত সে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল; হোঁচট খাইতে খাইতে রাজার কাছে ফিরিয়া গেল।

লেখার সরঞ্জাম লইয়া গৌরী বলিল—'তুমি পাহারায় থাক। যদি সর্দার কিম্বা আর কেউ আসে, আগে খবর দিও।'

রুদ্ররূপকে পাহারায় দাঁড় করাইয়া গৌরী চিঠি লিখিতে বসিল। দুইখানা কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিবার পর সে লিখিল:

কৃষ্ণা,

তোমার কাছে আমার অপরাধ ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে; তবু যদি সম্ভব হয় ক্ষমা কোরো। কস্তুরী কি খুব রাগ করেছেন? তাঁকে বোলো, আমি অতি অধম, তাঁর অভিমানের যোগ্য নই। এমন কি, তাঁর হৃদয়ে করুণা সঞ্চার করবার যোগ্যতাও আমার নেই। তিনি আমাকে ভুলে যেতে পারবেন না কি? চেষ্টা করলে হয়তো পারবেন। আমার বিনীত প্রার্থনা তিনি যেন সেই চেষ্টা করেন। ইতি—

শঙ্করসিং নামধারী হতভাগ্য

চিঠি লিখিয়া গৌরী নিজের কোমরবন্ধের মধ্যে গুঁজিয়া রাখিল। তারপর চম্পা যখন সাজিয়া গুজিয়া প্রস্তুত হইয়া তাহার হুকুম লইতে আসিল, তখন সে চিঠিখানা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া চুপি চুপি বলিল—'যাও, কৃষ্ণার হাতে চিঠি দিও।' চম্পা বুকের মধ্যে চিঠি লুকাইয়া রাখিল।

অতঃপর শোভাযাত্রা করিয়া উপঢৌকন-বাহীর দল যাত্রা করিল। চারিটি সুসজ্জিত হাতী; প্রথমটির পৃষ্ঠে সোনালী হাওদায় সূক্ষ্ম মসলিনের ঘেরাটোপের মধ্যে চম্পা বসিল। বাকী তিনটিতে অলঙ্কারের পেটারি উঠিল। ত্রিশজন সওয়ার লইয়া রুদ্ররূপ ঘোড়ায় চড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পশ্চাতে একদল যন্ত্র-বাদক ঝলমলে বেশ-ভূষা পরিয়া অতি মিঠা সুরে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে অনুসরণ করিল।

তাহাদের বিদায় করিয়া দিয়া গৌরী, ধনঞ্জয় ও বজ্রপাণি বৈঠকে আসিয়া বসিলেন। বাহিরের কেহ ছিল না; অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ একথা-সেকথা হইবার পর গৌরী সহসা বলিয়া উঠিল—'ভাল কথা, সর্দার, ওরা আমার নাম-ধাম পরিচয় সব জানতে পেরে গেছে।'

ধনঞ্জয় চকিত হইয়া বলিলেন—'কি রকম?'

গতরাত্রে প্রহ্লাদ দত্তের দোকানে ও উদিতের বাগানবাড়ির সম্মুখে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, গৌরী সব বলিল। টেলিগ্রামখানাও দেখাইল। দেখিয়া শুনিয়া ধনঞ্জয় ও বজ্রপাণি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে ধনঞ্জয় বলিলেন—'হুঁ, ওরাই আমাদের সব খবর পাচ্ছে দেখছি, আমরা ওদের সম্বন্ধে কিছুই পাচ্ছি না। যাহোক, ঐ হতভাগা স্বরূপদাসটাকে গ্রেপ্তার করিয়ে আনতে হচ্ছে; ওই হল ওদের গুপ্তচর! আর, প্রহ্লাদ দত্ত যখন এর মধ্যে আছে, তখন তাকেও সাপ্টে নিতে হবে! এরাই উদিতের হাত-পা, এদের শায়েস্তা না করতে পারলে, উদিতকে জব্দ করা যাবে না।' বলিয়া বজ্রপাণির দিকে চাহিলেন।

বজ্রপাণি ঘাড় নাড়িলেন—'স্বরূপদাসকে সহজেই গ্রেপ্তার করা যাবে। স্টেট রেলওয়ের চাকর, বিনা অনুমতিতে স্টেশন ছেড়েছিল এই অপরাধে তার চাকরি তো যাবেই, তাকে জেলে পাঠানোও চলবে। কিন্তু প্রহ্লাদ সাধারণ দোকানদার—তাকে কোন্ অজুহাতে—' দেওয়ান ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

ধনঞ্জয় বলিলেন—'যাহোক, কোতোয়ালীতে খবর দিই, তারা স্বরূপদাসকে ধরুক, আর আপাতত প্রহ্লাদের ওপর নজর রাখুক—'তিনি উঠিবার উপক্রম করিলেন।

এই সময় একজন দ্বাররক্ষী আসিয়া খবর দিল যে, শহর হইতে এক দোকানদার মহারাজের ক্রীত জিনিসপত্র পাঠাইয়াছে। ধনঞ্জয় সপ্রশ্ননেত্রে গৌরীর পানে তাকাইলেন, গৌরী বলিল—'হ্যাঁ, প্রহ্লাদের দোকানে কিছু জিনিস কিনেছিলাম।—এখানেই আনতে বল।'

একখানা বড় চাঁদির পরাতে রেশমের খুঞ্চেপোষ ঢাকা দ্রব্যগুলি লইয়া ভৃত্য উপস্থিত হইল। আবরণ খুলিয়া সকলে সুদৃশ্য শৌখীন জিনিসগুলি দেখিতে লাগিলেন। গৌরী দেখিল, জিনিসগুলির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র হাতীর দাঁতের কৌটা রহিয়াছে, যাহা সে কেনে নাই। সেটা তুলিয়া লইয়া ঢাকনি খুলিতেই দেখিল, তাহার ভিতরে একখানি চিঠি।

গৌরী প্রথমে ভাবিল, পণ্যদ্রব্যগুলির মূল্য তালিকা; কিন্তু চিঠি খুলিয়া দেখিল—বাংলা চিঠি। সবিস্ময়ে পড়িলঃ

দেবপাদ মহারাজ,

আপনাকে বাংলায় চিঠি লিখিতেছি যাহাতে অন্যে কেহ এ চিঠির মর্ম বুঝিতে না পারে। আপনি কে তাহা আমি জানি।

কাল আপনাকে স্বচক্ষে দেখিয়া ও আপনার সহিত কথা কহিয়া আমার মনের ভাব পরিবর্তিত হইয়াছে। আমি এতদিন অন্য পক্ষে ছিলাম। কিন্তু আমি বাঙালী। আমি যদি আপনাকে সাহায্য না করি তবে এই বিদেশে আর কে করিবে! তাই আজ হইতে আমি ও-পক্ষ ত্যাগ করিলাম।

কিন্তু প্রকাশ্যভাবে সাহায্য করিতে পারিব না; যদি উহারা আমায় সন্দেহ করে তাহা হইলে আমার জীবন সঙ্কট হইয়া পড়িবে, আপনি বা আর কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আমি গোপনে যতদূর সম্ভব আপনাকে সাহায্য করিব। ও-পক্ষের অনেক খবর আমি পাই—প্রয়োজন মনে হইলে আপনাকে জানাইব।

আপনাকে চিঠি লেখা আমার পক্ষে নিরাপদ নয়; কিন্তু আমাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া আরও বিপজ্জনক। তাই চিঠিতেই সংক্ষেপে যাহা জানি আপনাকে জানাইতেছি। আপনি যদি আরো কিছু জানিতে চাহেন, এই কৌটায় চিঠি লিখিয়া কৌটা ফেরত পাঠাইবেন—বলিয়া দিবেন কৌটা পছন্দ হইল না।

উপস্থিত সংবাদ এই—আপনারা যদি শঙ্কর সিংকে উদ্ধার করিতে চান তবে শীঘ্র শক্তিগড়ে গিয়া সন্ধান করুন। তিনি সেখানেই আছেন। কেল্লার পশ্চিম দিকের প্রাকারের নীচে নদীর জলের চার-পাঁচ হাত উপরে একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ জানালা আছে। ঐ জানালা যে ঘরের—সেই ঘরে শঙ্কর সিং বন্দী আছেন। প্রায় সকল সময়েই তাঁহাকে মদ খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া রাখা হয়। তাছাড়া, একজন লোক সর্বদা পাহারায় থাকে।

এই চিঠি অনুগ্রহপূর্বক পত্রপাঠ ছিঁড়িয়া ফেলিবেন। মহারাজের জয় হোক। ইতি—

পরম শুভাকাঙ্ক্ষী চরণাশ্রিত শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত

গৌরী চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া ভৃত্যকে বলিল—'এ সব জিনিস তুমি চম্পা দেঈর মহলে পাঠিয়ে দাও। যে-লোক এগুলো নিয়ে এসেছে, তাকে বল, যদি কোনো জিনিস অপছন্দ হয় ফেরত পাঠানো হবে।'

ভৃত্য 'যো হুকুম' বলিয়া পরাত হস্তে প্রস্থান করিল।

ধনঞ্জয় ও বজ্রপাণি দুইজনেই গৌরীর মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন; ভৃত্য অন্তর্হিত হইলে ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন—'চিঠিতে কি আছে?'

গৌরী বলিল—'আগে দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে এস।'

দরজা বন্ধ করিয়া তিনজনে ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া বসিলেন। গৌরী তখন প্রহ্লাদের চিঠি পড়িয়া শুনাইল। তারপর তিনজনে মাথা একত্র করিয়া নিম্নস্বরে পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। অনেক যুক্তিতর্কের পর স্থির হইল—কোন ছুতায় শক্তিগড়ের নিকটে গিয়া আড্ডা গাড়িতে হইবে—রাজধানীতে বসিয়া থাকিলে কোনো কাজ হইবে না। উদিত সিং কেল্লায় তাহাদের ঢুকিতে না দিতে পারে, কিন্তু কেল্লার বাহিরে যদি তাঁহারা তাঁবু ফেলিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে কিছু করিতে পারিবে না। তখন সেখানে বসিয়া স্থান কাল ও সুযোগ বুঝিয়া শঙ্কর সিংকে উদ্ধার করিবার একটা মতলব বাহির করা যাইতে পারে।

উপস্থিত দেওয়ান বজ্রপাণি রাজধানীতে থাকিয়া এদিক সামলাইবেন। ধনঞ্জয় ও রুদ্ররূপ আরো সহচর সঙ্গে লইয়া গৌরীর সঙ্গে থাকিবেন। এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া যখন তাঁহারা শ্রান্তদেহে গাত্রোত্থান করিলেন তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু তখনো তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইলেন না। এই সময় সদরে দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনিয়া ধনঞ্জয় জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলেন, ময়ূরবাহন তাহার কালো ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিতেছে। তিনি চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—'ময়ূরবাহন এসেছে।'

বসুন—উঠবেন না।

তিনজনে আবার উপবিষ্ট হইলেন। পরক্ষণেই দৌবারিক খবর দিল, ময়ূরবাহন জরুরী কাজে মহারাজের দর্শন চান।

গৌরী বলিল—'নিয়ে এস।'

ময়ূরবাহন প্রবেশ করিল। তাহার মাথার পাগড়ির খাঁজে ধূলা জমিয়াছে—পাতলা গোঁফের উপরেও ধূলার সূক্ষ্ম প্রলেপ; দেখিলেই বোঝা যায়, সে শক্তিগড় হইতে সোজা ঘোড়ার পিঠে আসিয়াছে। কিন্তু তাহার অঙ্গে বা মুখের ভাবে ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নাই। ঘরে ঢুকিয়া সম্মুখে উপবিষ্ট তিনজনকে দেখিয়া সে সকৌতুকে হাসিয়া অবহেলাভরে একবার ঘাড় নীচু করিয়া অভিবাদন করিল। বলিল—'সপার্ষদ মহারাজের জয় হোক।'

রাজার সম্মুখে আদব কায়দার যে রীতি আছে তাহা সম্পূর্ণ লঙ্ঘন না করিয়াও ধৃষ্টতা প্রকাশ করা যায়। ময়ূরবাহনের বাহ্য শিষ্টাচারের ক্ষীণ পর্দার আড়ালে যে বেপরোয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইল তাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না! তাহার দুই চক্ষে দুষ্ট কৌতুক নৃত্য করিতেছিল; রক্তের মত রাঙা ওষ্ঠাধরে যে হাসিটা খেলা করিতেছিল, তাহা যেমন তীক্ষ্ন তেমনি বিদ্রূপপূর্ণ। তাহার কথাগুলার অন্তর্নিহিত গুপ্ত শ্লেষ সকলের মর্মে গিয়া বিঁধিল।

গৌরী মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে ময়ূরবাহনকে অবজ্ঞাপূর্ণ তাচ্ছিল্যের সহিত সম্ভাষণ করিবে। কিন্তু তাহার এই স্পর্ধা গৌরীর গায়ে যেন বিষ ছড়াইয়া দিল; সে অবরুদ্ধ ক্রোধের স্বরে বলিল—'কি চাও তুমি? যা বলতে চাও শীঘ্র বল, সময় নষ্ট করবার আমাদের অবকাশ নেই।'

ময়ূরবাহনের মুখের হাসি আরো বাঁকা হইয়া উঠিল; সে কৃত্রিম বিনয়ের একটা ভঙ্গি করিয়া বলিল—'ঠিক বলেছেন মহারাজ; রাজ্য ভোগ করবার অবকাশ যখন সংক্ষিপ্ত তখন সময় নষ্ট করা বোকামি। আমি কারুর সুখভোগে বিঘ্ন ঘটাতে চাই না, আমার জীবনের উদ্দেশ্যই তা নয়। কুমার উদিত সিং আপনাকে একটি নিমন্ত্রণলিপি পাঠিয়েছেন, সেইটে হুজুরে দাখিল করেই আমি ফিরে যাব।' কোমরবন্ধ হইতে একখানা চিঠি লইয়া গৌরীর সম্মুখে ধরিল।

গৌরী নিষ্পলক চোখে কিছুক্ষণ ময়ূরবাহনের দিকে তাকাইয়া রহিল, কিন্তু ময়ূর-বাহনের চোখের পল্লব পড়িল না। তখন সে চিঠি লইয়া মোহর ভাঙিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। চিঠিতে লেখা ছিলঃ

'ওরে বাঙালী নটুয়া, তুই কি জন্য মরিতে এদেশে আসিয়াছিস? তোর কি প্রাণের ভয় নাই! তুই শীঘ্র এ দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যা—নচেৎ পিঁপড়ার মত তোকে টিপিয়া মারিব।

'তোর নিজের দেশে ফিরিয়া গিয়া তুই নটুয়ার নাচ দেখা—পয়সা মিলিবে। এদেশে তোর দর্শক মিলিবে না।'

পড়িতে পড়িতে গৌরীর মুখ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। সে দাঁতে দাঁত ঘষিয়া আরক্ত চক্ষে বলিল—'এ কি চিঠি?' বলিয়া কম্পিতহস্তে কাগজখানা ময়ূরবাহনের সম্মুখে ধরিল।

ময়ূরবাহন বিস্ময়ের ভান করিয়া চিঠিখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিল; তারপর যেন ভুল করিয়াছে এমনিভাবে বলিল—'ওঃ তাইতো! ও চিঠিখানা আপনার জন্য নয়, ভুলক্রমে আপনাকে দিয়ে ফেলেছি। এই নিন্ আপনার চিঠি!' বলিয়া আর একখানা চিঠি বাহির করিয়া গৌরীর হাতে দিল। প্রথম চিঠিখানা গৌরীর হাত হইতে লইয়া অবহেলাভরে গোলা পাকাইয়া ঘরের এক কোণে ফেলিয়া দিল।

গৌরী অসীমবলে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—'তোমার কাজ শেষ হয়েছে, তুমি এখন যেতে পার।'

ময়ূরবাহন বলিল—'নিশ্চয়। শুধু বুড়ো মন্ত্রীর কাছে একটা পরামর্শ নেওয়া বাকি

আছে।—দেওয়ানজী, বলতে পারেন, যারা রাজ-সিংহাসনে বিদেশী মর্কটকে বসিয়ে নাচ দেখে তাদের শাস্তি কি?'

গৌরী আর ধৈর্য রাখিতে পারিল না, গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া গর্জিয়া উঠিল—'চোপরও বদজাত কুকুরের বাচ্চা—নইলে তোকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব।'

ময়ূরবাহনের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। তাহার ডান হাতখানা সরীসৃপের মত কোমরবন্ধে বাঁধা তলোয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। সাপের মত চোখ দুইটা গৌরীর মুখের উপর ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরিল। কিন্তু ধনঞ্জয়ের মুষ্টিতে যে জিনিসটা ছিল তাহা দেখিবামাত্র ময়ূরবাহনের হাত তরবারি হইতে সরিয়া গেল। সে আবার উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল, সেই নির্ভীক বেপরোয়া হাসি! তারপর দেহের একটা হিল্লোলিত ব্যঙ্গপূর্ণ ভঙ্গি করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তাহার ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ অস্পষ্ট হইয়া ক্রমে মিলাইয়া গেল।

গৌরীর হাত হইতে চিঠিখানা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। বজ্রপাণি এইবার সেটা তুলিয়া লইয়া পড়িলেন।

'স্বস্তি শ্রীমন্মহারাজ শঙ্কর সিং দেবপাদ জ্যেষ্ঠের নিকট অনুগত অনুজ শ্রীউদিত সিংয়ের সানুনয় নিবেদন—আমার জমিদারীতে সম্প্রতি হরিণ শূকর প্রভৃতি অনেক শিকার পড়িয়াছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও যদি মহারাজ মৃগয়ার্থ শুভাগমন করেন তাহা হইলে কৃতার্থ হইব। অলমিতি।'

বজ্রপাণি পত্রটি নিঃশব্দে ধনঞ্জয়ের হাতে দিলেন। গৌরী কিছুক্ষণ অসহ্য ক্রোধে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ অন্দরাভিমুখে প্রস্থান করিল। ময়ূরবাহনের ধৃষ্টতা তাহার দেহ-মনে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল; নূতন চিঠিতে কি আছে না আছে তাহা দেখিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অগাধ জলে ঝাঁপ

চম্পা যখন ঝড়োয়া হইতে ফিরিল তখন অপরাহ্ণ। কিস্তার ধারের বারান্দায় গৌরী মেঘাচ্ছন্ন মুখে বুকে হাত বাঁধিয়া পাদচারণ করিতেছিল—সঙ্গে কেহ ছিল না। ময়ূর-বাহনের শ্লেষ-বিদ্রূপ একটা কাজ করিয়াছিল; গৌরীর মনে তাহার নিজের অজ্ঞাতসারে যে আলস্যের ভাব আসিয়াছিল তাহাকে সে চাবুক মারিয়া একটু বেশী মাত্রায় চাঙ্গা করিয়া দিয়া গিয়াছিল। অপমান জর্জরিত বুকে গৌরী ভাবিতেছিল—প্রাণ যায় যাক্, শঙ্কর সিংকে ঐ ধৃষ্ট কুকুরগুলার কবল হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। আর কলা-কৌশল নয়, রক্তে সাঁতার দিয়া যদি এ কাজ সিদ্ধ হয়, তাও সে করিবে। ময়ূরবাহনের মত

স্পর্ধিত শয়তানগুলোকে সে দেখাইয়া দিবে—বাঙ্গালী কোন্ ধাতুতে নির্মিত।

বাঙালী নটুয়া! ঐ কথাটাতেই তাহার মাথায় রক্ত চড়িয়া গিয়াছিল। ময়ূরবাহন ও উদিত সিংয়ের রক্ত দিয়া এ অপমানের লাঞ্ছনা যতক্ষণ সে মুছিয়া দিতে না পারিবে ততক্ষণ যে তাহার প্রাণে শান্তি নাই, তাহাও সে বুঝিয়াছিল। এই প্রতিহিংসা পিপাসার কাছে নিজের প্রাণের মূল্যও তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল।

চম্পার পায়জনিয়ার আওয়াজ শুনিয়া গৌরী রক্তরাঙা চিন্তার আবর্ত হইতে উঠিয়া আসিল। চম্পা কোনো কথা না বলিয়া নিজের আঙ্‌রাখার ভিতর হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিল। চিঠির উত্তর গৌরী প্রত্যাশা করে নাই, দ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেটা খুলিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় বাহিরে নাগরার শব্দ শুনা গেল। গৌরী ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিখানা পকেটে পুরিল।

ধনঞ্জয় প্রবেশ করিলেন; তাঁহার হাতে একখানা কাগজ। গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'কি সর্দার?'

সর্দার বলিলেন—'উদিতের নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করে চিঠি লেখা হল। এটাতে সহি দস্তখত করে দিন।'

গৌরী চিঠিখানা পড়িয়া দস্তখত করিতে করিতে বলিল—'কবে যাওয়া স্থির করলে?'

'এখনো স্থির করিনি। আপনি কবে বলেন?'

'কালই। আর দেরি নয় সর্দার, যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের কাজকর্ম চুকিয়ে দিয়ে আমি যেতে চাই, তা সে যেখানেই হোক—'

ধনঞ্জয় চকিতে চম্পার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'চম্পা, তুমি ক্লান্ত হয়েছ, কাপড়চোপড় ছাড় গিয়ে।'

চম্পা প্রস্থান করিল। ধনঞ্জয় বলিলেন—'চম্পা জানে না। যাহোক, কি বলছিলেন?'

'বলছিলাম, যেখানে হোক এবার আমি যেতে চাই—তা পরলোকে হলেও দুঃখ নেই। মনে একটা পূর্বাভাস পাচ্ছি যে আমার জীবনের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। যুদ্ধের ঘোড়ার মত আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে; তোমাদের আস্তাবল থেকে তাকে এবার ছেড়ে দাও—সে একবার যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়াক। তারপর যা হবার হবে। যদি মৃত্যুই আসে তাতে আক্ষেপ করবার কিছু নেই; কারণ, জীবনটাকে আঙুরের মত তুলোর পেটারির মধ্যে ঢেকে রেখে বেঁচে থাকাকে আমি বেঁচে থাকা মনে করি না।'

ধনঞ্জয় কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গৌরীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন; তারপর দ্রুত তাহার কাছে আসিয়া দুই হাতে দুই স্কন্ধ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—'রাজা, আজ আপনার মন ভাল নেই! মৃত্যুকে কোন্ মরদ পরোয়া করে? মৃত্যু আমাদের কাছে খেলার বস্তু, উপহাসের বস্তু—তার কথা বেশী চিন্তা করলে তাকে বড় করে তোলা হয়। সুতরাং মৃত্যুর কথা আমরা ভাবব না; আমরা ভাবব শুধু কাজের কথা, কর্তব্যের কথা। যে দুশমন আমাদের বাধা দিয়েছে, অপমান করেছে, তাদের বুকে পা দিয়ে কি করে আমরা তাদের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব—এই হবে আমাদের চিন্তা। শত্রুর কাছে লাঞ্ছিত হয়ে যারা নিজের মৃত্যু চিন্তা করে তারা তো কাপুরুষ; বীর যারা তারা শত্রুর মৃত্যু চিন্তা করে।'

গৌরী একটু হাসিয়া বলিল—'সেই চিন্তাই আমি করছি সর্দার এবং যতক্ষণ না চিন্তাকে কাজে পরিণত করতে পারব ততক্ষণ আমার রক্ত ঠাণ্ডা হবে না।'

ধনঞ্জয় তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—'ব্যস্! এই কথাই তো আমরা আপনার মুখে শুনতে চাই। দেওয়ান কালীশঙ্করের বংশধর আপনি—ঝিন্দে এসে আপনি যদি কারুর সামনে মাথা হেঁট করেন তাহলে তাঁর রক্তের অপমান হবে।'

গৌরীর মুখে এতক্ষণে সত্যকার হাসি ফুটিল; সে বলিল—'সর্দার! আজ নিয়ে তুমি তিনবার দেওয়ান কালীশঙ্করের নাম করলে। এবার কিন্তু তোমাকে বলতে হচ্ছে, ঝিন্দের সঙ্গে কালীশঙ্করের সম্বন্ধ কি এবং কেনই বা তাঁর বংশধর ঝিন্দে এসে মাথা উঁচু করে চলবে।'

'মাথা উঁচু করে চলবে তার কারণ—কিন্তু আজ নয়, সে গল্প আর একদিন বলব। এখন অনেক কাজ।' গৌরীর হাত হইতে চিঠিখানা লইয়া বলিলেন—'তাহলে কালই যাওয়া স্থির? সেই রকম বন্দোবস্ত করি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু একটা কথা। উদিত খামকা আমায় শক্তিগড়ে নেমন্তন্ন করলে—তার উদ্দেশ্য কিছু আন্দাজ করতে পেরেছ?'

'আপনি পেরেছেন?'

'বোধ হয় পেরেছি। আকস্মিক দুর্ঘটনা—কেমন?'

'হুঁ—আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু তা হবে না।' বলিয়া ধনঞ্জয় প্রস্থান করিলেন।

গৌরী দুইবার বারান্দায় পায়চারি করিল, তারপর পকেটে হাত দিয়া দেখিল চম্পার আনীত চিঠিখানা এখনো খোলা হয় নাই। সে একবার চারিদিকে তাকাইল—কেহ কোথাও নাই। একটু ইতস্তত করিল, কিন্তু এখানে চিঠি খুলিয়া পড়িতে ভরসা হইল না—হয়তো এখনি কেহ আসিয়া পড়িবে।

নিজের ঘরে গিয়া গৌরী জানালার ধারে দাঁড়াইল—ঠিক জানালার নীচে দিয়াই কিস্তার গাঢ় নীল জল বহিয়া যাইতেছে—কলকল ছলছল শব্দ করিতেছে। গৌরী কম্পিত-বক্ষে চিঠি বাহির করিল, তারপর ধীরে ধীরে মোহর ভাঙিয়া পড়িল।

কৃষ্ণা লিখিয়াছেঃ

'স্বস্তি শ্রীদেবপাদ মহারাজ শঙ্কর সিংহের চরণাম্বুজে দাসী কৃষ্ণাবাঈর শতকোটি প্রণাম। আপনার লিপির মর্ম আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইল না। আপনি অনুরোধ করিয়াছেন, সখী যেন আপনাকে ভুলিয়া যান। প্রথমে মন কাড়িয়া লইয়া পরে ভুলিয়া যাইতে বলা—মহারাজের এ পরিহাস উপভোগ্য বটে। আগে আমার সখীর মন ফিরাইয়া দিন, তারপর ভুলিয়া যাইবার কথা ভাবা যাইবে। কিন্তু তাহাও কয় দিনের জন্য? আপনার কি আদেশ, বিবাহের পরও সখী আপনাকে ভুলিয়া থাকিবেন?

বুঝিতেছি, সখীর মনে ব্যথা দিয়া আপনি নিজেও কষ্ট পাইতেছেন। কিন্তু কষ্ট পাইবার প্রয়োজন কি? যাঁহার মানভঞ্জন করিলে দুইজনেরই মনের কষ্ট দূর হইবে তিনি তো কাছেই রহিয়াছেন—মাঝে শুধু ক্ষীণা কিস্তার ব্যবধান। অবশ্য একটা কথা গোপনে আপনাকে বলিতে পারি, মানভঞ্জনের পূর্বেই আপনার পত্র দর্শনে সখীর অর্ধেক অভিমান দূর হইয়াছে। মুখে হাসি ফুটিয়াছে; শুধু তাই নয় গানও ফুটিয়াছে। শুনিতে পাইতেছি তিনি পাশের ঘরে চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন আর মৃদুস্বরে গান করিতেছেন। গানটি কী শুনিবেন? মীরার দোঁহা—

মেরে জনম মরণ কী সাথী
তোহে ন বিসরি দিন রাতি

আপনার ভুলিয়া যাওয়ার অনুরোধের জবাব পাইলেন তো? আপনি কি আমার প্রিয়সখীকে গুণ করিয়াছেন? যাঁর অভিমান শত সাধ্যসাধনাতে ভাঙে না, আপনার এতটুকু চিঠির অনুতাপে সেই রাজরানী গলিয়া জল হইয়া গেলেন?

ভাল কথা, আপনি বৈদ্যুতিক আলোটা কাল রাত্রে ভুল করিয়া ফেলিয়া গিয়াছেন, সখী সেটিকে দখল করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, আজ রাত্রে বিশ্রামের পূর্বে নিজের শয়ন-কক্ষের জানালা হইতে তাহার আলো ফেলিয়া দেখিবেন, কিস্তার ব্যবধান পার হইয়া সে-আলো আপনার জানালা পর্যন্ত পৌঁছায় কিনা। আপনার শয়নকক্ষের জানালা যে সখীর শয়নকক্ষের জানালার ঠিক মুখোমুখি তাহা চম্পা-বহিনের মুখে জানিয়া লইয়াছি। মধ্যে কেবল ক্ষীণা কিস্তার ব্যবধান।

অলমিতি।'

রাত্রি দশটার মধ্যে ঝিন্দের রাজপুরী নিশুতি হইয়া গিয়াছিল। কাল প্রভাতেই

শান্তিগড় যাত্রা করিতে হইবে, তাই ধনঞ্জয় সকাল সকাল বিশ্রামের জন্য প্রস্থান করিয়াছিলেন; কেবল রুদ্ররূপ নিয়ম মত শয়নকক্ষের দ্বারে পাহারায় ছিল।

দীপহীন কক্ষের জানালায় দাঁড়াইয়া গৌরী বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া ছিল। কিস্তার জলে ঝড়োয়ার রাজপ্রাসাদের আলো পড়িয়া সোনালী জরীর মত কাঁপিতেছিল। নদীর উপর নৌকার যাতায়াত বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কেবল কিস্তার খরস্রোত নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াছে—সেই মহাপ্রপাতের মুখে যেখান হইতে সে ফেনহাস্যে উন্মুখর কল্লোলে নীচের উপত্যকার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে; যেন এমনি করিয়া তটহীন শূন্যোতায় নিজেকে নিঃশেষে ঢালিয়া দেওয়াই তাহার জীবনের চরম সার্থকতা!

গৌরী ভাবিতেছিল—আজ রাত্রিটা শুধু আমার! কাল কোথায় থাকিব, বাঁচিয়া থাকিব কিনা কে জানে? যদি মরিতেই হয়, মৃত্যুপথের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইব না? কস্তুরীর মুখের দুইটি কথা—তার গলা এখনো ভাল করিয়া শুনি নাই—শেষবার শুনিয়া লইব না? ইহাতে কাহার কি ক্ষতি?

'মেরে জনম মরণ কী সাথী'—কথাগুলি গৌরীর স্নায়ুতন্ত্রীর উপর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। কস্তুরী তাহাকে ভালবাসিয়াছে—'তোহে ন বিসর্রি দিন রাতি'—দিবা-রাত্রি তোমাকে ভুলিতে পারি না। কাল গৌরী তাহার নবোদ্ভিন্ন অনুরাগ-ফুলটিকে আঘ্রাণ না করিয়া অবহেলাভরে চলিয়া আসিয়াছিল, তবু সে অভিমান ভুলিয়া গাহিয়াছে—'তোহে ন বিসর্রি দিন রাতি'। কার্বায় বন্ধ গোলাপ আতরের চাপা গন্ধের মত এই অনুভূতি তাহার দেহের সীমা ছাপাইয়া যেন অন্ধকার ঘরের বাতাসকে পর্যন্ত উন্মাদ করিয়া তুলিল।

'কস্তুরী তাহাকে ভালবাসিয়াছে। তবে? এখন আর সাবধান হইয়া লাভ কি? যাহা হইবার তাহা তো হইয়া গিয়াছে—এখন কর্তব্যবুদ্ধির দোহাই দিয়া সাধু সংযমী সাজিয়া সে কাহাকে ঠকাইবে? একদিন তিক্ত বিষের পাত্র তো তাহাকে কণ্ঠ ভরিয়া পান করিতে হইবে; তবে এখন অমৃতের পাত্র হাতের কাছে পাইয়া সে ঠেলিয়া সরাইয়া দিবে কেন?

ঝড়োয়ার প্রাসাদের দীপগুলি ক্রমে নিবিয়া গেল—কেবল একটি মৃদু বাতি দ্বিতলের একটি গবাক্ষ হইতে দেখা যাইতে লাগিল। গৌরী নির্নিমেষ চক্ষে সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

চাহিয়া চাহিয়া এক সময় তাহার মনে হইল, যেন গবাক্ষের সম্মুখে কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদূর হইতে স্পষ্ট দেখা যায় না, তবু তাহার মনে হইল—এ কস্তুরী। কিছুক্ষণ রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করিবার পর হঠাৎ বিদ্যুতের টর্চ জ্বলিল; কিস্তার জলের উপর এদিক ওদিক আলো ফেলিয়া তাহার জানালার উপর আসিয়া স্থির হইল। আলো অবশ্য অতি অস্পষ্ট, কেবল নীহারিকার মত একটা প্রভা গৌরীর মুখখানাকে যেন মণ্ডল পরিবেষ্টিত করিয়া দিল।

জানালার বাহির পর্যন্ত ঝুঁকিয়া গৌরী হাত নাড়িল। তৎক্ষণাৎ আলো নিবিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে আবার জ্বলিল, আবার তখনি নিবিয়া গেল। আলোকধারিণী যেন গৌরীর সহিত কৌতুক করিতেছে।

ঘরের মধ্যস্থলে ফিরিয়া আসিয়া গৌরী ক্ষণকাল হেঁটমুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইল; তারপর সন্তর্পণে দ্বারের কাছে গিয়া পর্দা ঈষৎ সরাইয়া উঁকি মারিল। রুদ্ররূপ দূরের একটা বন্ধ দ্বারের দিকে তাকাইয়া না জানি কিসের স্বপ্ন দেখিতেছে। গৌরী নিঃশব্দে দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল; তারপর আবার জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই সময় আবার দুই-তিনবার দূর গবাক্ষে আলো জ্বলিয়া নিবিয়া গেল। গৌরী আর দ্বিধা করিল না। তাহার প্রিয়া তাহাকে ডাকিতেছে, এস এস বলিয়া বারবার আহ্বান করিতেছে। সে মনে মনে উচ্চারণ করিল--কস্তুরী! কস্তুরী!

গায়ের জামাটা সে খুলিয়া ফেলিল। একটা পাগড়ির কাপড় জানালার পাশে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া বাহিরের দিকে ঝুলাইয়া দিল। তারপর নগ্নদেহে সেই রজ্জু বহিয়া ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়া কিস্তার জলে নিজেকে নামাইয়া দিল।

ঝড়োয়ার রাজপুরী নিস্তব্ধ—অন্ধকার। কেবল কস্তুরীর ঘরে একটি মৃদু দীপ জ্বলিতেছে। দীপের আলোকে ঘরটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই—শুধু একটি স্নিগ্ধ ছায়াময় স্বচ্ছতার সৃষ্টি করিয়াছে।

পালঙ্কের ঠিক পাশেই মেঝেয় রেশমের গালিচার উপর কস্তুরী একটি হাত মাটিতে রাখিয়া হেঁটমুখে বসিয়া ছিল। গৌরী একটা শাল সিক্তদেহে জড়াইয়া পালঙ্কের উপর বাম বাহু রাখিয়া কস্তুরীর মুখের পানে তাকাইয়া ছিল। অদূরে পর্দাঢাকা দ্বারের পাশে কৃষ্ণা চিত্রার্পিতার মত দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল।

অনেকক্ষণ নীরবে কাটিয়াছে। জল হইতে উঠিবার পর গৌরীকে লইয়া কৃষ্ণা যখন কস্তুরীর ঘরে উপস্থিত হইয়াছিল তখন গুটিকয়েক কথা হইয়াছিল; কৃষ্ণা এই দুঃসাহসিকতার জন্য তাহাকে সস্নেহ বিগলিতকণ্ঠে তিরস্কার করিয়াছিল। কস্তুরীর ঠোঁট দুইটি বারবার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কোনো কথা বাহির হয় নাই। শুধু তাহার নিতল চোখ দুটির দৃষ্টিতে যে গভীর অনির্বচনীয় ভাবাবেশ ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই গৌরীকে পুরস্কৃত করিয়াছিল। তারপর কথার ধারা কেমন যেন ক্ষীণ হইয়া ক্রমে থামিয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণা কিছুক্ষণ তাহাদের পাশে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অপ্রতিভভাবে সরিয়া গিয়া পাহারা দিবার অছিলায় দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল।

সুদীর্ঘ নিশ্বাস পতনের সঙ্গে কস্তুরী চোখ তুলিয়া চাহিল, দুইজনের চোখাচোখি হইল। দুইটি চোখ মাধুর্যের গাঢ়তায় গম্ভীর—অন্য দুইটি জিজ্ঞাসার ব্যগ্রতায় ব্যাকুল।

গৌরী অনুচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'কস্তুরী!'

কস্তুরী চোখ নামাইয়াছিল, আবার তুলিল।

গৌরী সাগ্রহকণ্ঠে বলিল—'কালকের অপরাধ ক্ষমা করেছ?'

একটুখানি হাসি—কিম্বা হাসির আভাস—কস্তুরীর ঠোঁটের কোণ দুইটিকে ঈষৎ প্রসারিত করিয়া দিল। কস্তুরী আবার চক্ষু অবনত করিল।

গৌরী আর একটু কাছে সরিয়া আসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিতে লাগিল—'রানি, আমার বুকের মধ্যে যে তুফান বইছে তা যদি দেখাতে পারতাম, তাহলে বুঝতে তুমি আমাকে কী করেছ। তোমাকে দেখে আমার আশা মেটে না, আবার বেশীক্ষণ দেখতেও ভয় করে—মনে হয় বুঝি অপরাধ করছি। আমার প্রাণের এই উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা তোমাকে বোঝাতে পারব না। ইচ্ছে হয় তোমাকে নিয়ে এমন কোথাও চলে যাই, যেখানে রাজ্য নেই, রাজা নেই, রানী নেই—শুধু তুমি আর আমি। শুধু আমাদের ভালবাসা। কস্তুরী, তোমার ইচ্ছে করে না?'

কস্তুরীর মাথা আর একটু অবনত হইল, নিশ্বাস পতনের শব্দের মত লঘু অস্ফুট-স্বরে সে বলিল—'করে।'

সহসা হাত বাড়াইয়া কস্তুরীর আঁচলের প্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া গৌরী বলিল—'কস্তুরী, চল আমরা তাই যাই।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার চট্‌কা ভাঙ্গিয়া গেল! এ কি অসঙ্গত অর্থহীন প্রলাপ সে বকিতেছে? একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—'আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস—কৃষ্ণার চিঠিতে আজ তা আমি জানতে পেরেছি। কিন্তু একটা কথা জানবার জন্য আমার সমস্ত অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। কস্তুরী—'

কস্তুরী প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলিল।

গৌরী আবার আরম্ভ করিতে গিয়া থামিয়া গেল। এতক্ষণ সে ভুলিয়া গিয়াছিল যে কৃষ্ণা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছে; এখন তাহার দিকে চোখ পড়িতেই সে কস্তুরীর আঁচল ছাড়িয়া দিল। কিন্তু যে প্রশ্নটা তাহার কণ্ঠাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহার উত্তর জানিবার অধীরতাও তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। সে কৃষ্ণার দিকে ফিরিয়া বলিল—'কৃষ্ণা, তুমি একটিবার বাইরে যাবে? বেশী নয়—দু'মিনিটের জন্য।'

কৃষ্ণা মুখ ফিরাইয়া একটু ভ্রূ তুলিল, গৌরীর দিকে একটা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলিল—'আচ্ছা। কিন্তু ঠিক দু'মিনিট পরেই আমি আবার ফিরে আসব।'

কৃষ্ণা পর্দার আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

গৌরী তখন কস্তুরীর মুখের খুব সন্নিকটে মুখ আনিয়া গাঢ়স্বরে বলিল—'কস্তুরী, একটা কথার উত্তর দেবে কি?'

গম্ভীর আয়ত চোখ দুইটি গৌরীর মুখের উপর স্থির হইল—একটু বিস্ময়, একটু কৌতূহল, অনেকখানি ভালবাসা সে দৃষ্টিতে মাখানো ছিল। গৌরী আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, কস্তুরীর যে-হাতখানা কোলের উপর পড়িয়াছিল, সেটা দুই হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল; একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া বলিল—'কস্তুরী, তোমার চোখের মধ্যে যা দেখতে পাচ্ছি তাতে আমার মন আর শাসন মানছে না, মনে হচ্ছে—। তবু তুমি একটা কথা বল। আমি যদি শঙ্কর সিং না হতাম, ঝিন্দের রাজা না হতাম, তবু কি তুমি আমায় ভালবাসতে?'

কস্তুরীর হাতটি গৌরীর মুঠির মধ্যে একটু নড়িল, গ্রীবা একটু বাঁকিল। একবার মনে হইল বুঝি সে উত্তর দিবে, কিন্তু সে উত্তর দিল না, নিজের কঙ্কণের দিকে চাহিয়া রহিল।

গৌরী তখন আরো ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিল—'কস্তুরী, মনে কর আমি ঝিন্দের শঙ্কর সিং নই, মনে কর আমি একজন সামান্য বিদেশী—কোনো দূর দেশ থেকে এসে হঠাৎ ঘটনা-চক্রে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তবু কি তুমি আমায় ভালবাসবে?'

কস্তুরী গৌরীর মুখের দিকে চাহিল; তাহার চোখ দুইটি একটু ঝাপসা দেখাইল। অধর যেন ঈষৎ কাঁপিতেছে। তারপর তাহার ধরা-ধরা অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনা গেল—'আমাকে কি পরীক্ষা করছেন?'

'না না—কস্তুরী। কিন্তু তুমি শুধু বল যে, তুমি আমাকেই ভালবাস, রাজ্যসম্পদ বাদ দিলেও তোমার ভালবাসা লাঘব হবে না।'

ক্ষণকাল কস্তুরী নীরব রহিল, তারপর গৌরীর চোখে চোখ রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল—'আপনি যদি একজন সামান্য সিপাহী হতেন, আপনার পরিচয় ঝিন্দ্-ঝড়োয়ার কেউ না জানত, আপনি যদি অখ্যাত বিদেশী হতেন—তবু আপনি আমার—'

'তোমার?'

'আমার মালিক।'

অকস্মাৎ কস্তুরীর চোখ ছাপাইয়া বুকের কাপড়ের উপর কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

'কস্তুরী!' গৌরীর কণ্ঠস্বর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; সে হাত দিয়া কস্তুরীর চিবুক তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিতে শুরু করিল—'তবে শোনো—আমি—'

ঠিক এই সময় দ্বারের পর্দা নড়িয়া উঠিল; কৃষ্ণা প্রবেশ করিল।

আর একটু হইলে দুর্নিবার আবেগের মুখে গৌরী সত্য কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিত, কৃষ্ণার আবির্ভাবে সে থামিয়া গেল। কৃষ্ণা যেন তাহাকে কঠিন বাস্তব জগতে টানিয়া ফিরাইয়া আনিল। সে বাঁ হাতটা একবার চোখের উপর দিয়া চালাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কৃষ্ণা আসিয়া হাসিমুখে বলিল—'হ্যাঁ, এবার বাঁধন ছিঁড়তে হবে। রাত দুপুরের ঘণ্টা অনেকক্ষণ বেজে গেছে।'

গৌরীর গলার ভিতর যেন একটা কঠিন পিণ্ড আটকাইয়া গিয়াছিল, সে গলা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া বলিল—'কাল সকালেই আমি শক্তিগড় যাচ্ছি—হয়তো আর—'

তাহার কথা শেষ না হইতেই কৃষ্ণা বলিয়া উঠিল—'শক্তিগড়?'

কস্তুরীর চোখের জল তখনো শুকায় নাই, কিন্তু তাহারই ভিতর হইতে নিমেষের জন্য কৌতুক-মাখানো দৃষ্টি কৃষ্ণার মুখের পানে তুলিল।

গৌরী বলিল—'শিকারে যাচ্ছি—কবে ফিরব বলতে পারি না। হয়তো—'

কৃষ্ণা মুখ টিপিয়া বলিল—'হয়তো সেখানে কত আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে পারে, যা আপনি কখনো কল্পনাও করেননি—কে জানে?'

গৌরী কৃষ্ণার মুখের প্রতি অর্থপূর্ণভাবে তাকাইয়া বলিল—'তা পারে।—আজ তাহলে

চললাম।'

কস্তুরী উঠিয়া দাঁড়াইল। সতৃষ্ণ চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া গৌরী বলিল—'কস্তুরী, চললাম। হয়তো—'

নৃত্যচঞ্চল চোখে কৃষ্ণা বলিল—'হয়তো শক্তিগড় থেকে ফেরবার আগেই আবার দেখা হবে। অত কাতরভাবে বিদায় নেবার দরকার নেই।'

গৌরী কেবল একটা নিশ্বাস ফেলিল।

কৃষ্ণা বলিল—'চলুন, আপনাকে আমার ডিঙিতে করেই আপনার ঘাটে পেঁছে দিই।'

গৌরী মাথা নাড়িয়া বলিল—'না, তোমাকে আর কষ্ট দেব না। যে ভাবে এসেছি সেই ভাবেই ফিরে যাবো।'

কস্তুরীর মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়িল, সে অতি মৃদুস্বরে বলিল—'কিন্তু—যদি কোনো দুর্ঘটনা—'

'কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে না কস্তুরী—আমি এখন মরব না। যদি মরি তো শক্তিগড়ে গিয়ে—এখানে নয়।' বলিয়া গৌরী মাথা নাড়িয়া হাসিল।

কৃষ্ণা বলিল—'ও কি কথা! সখীকে মিছিমিছি ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন কেন? চলুন—'

'চল কৃষ্ণা—'

দ্বারের কাছে গৌরী ফিরিয়া দেখিল—কস্তুরী তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। এই শেষ দেখা?

অন্ধকারে ঘাটের পাদমূলে আসিয়া গৌরী কৃষ্ণার হাত চাপিয়া ধরিল, ব্যাকুলস্বরে বলিল—'কৃষ্ণা, হয়তো আমাদের আর দেখা হবে না, এই শেষ দেখা। যদি আমাদের জীবনে এমন কোনো বিপর্যয় ঘটে যায়, যা এখন তোমাদের কল্পনারও অতীত—তুমি কস্তুরীকে ছেড়ো না। সর্বদা তার কাছে থেকো; তুমি কাছে থাকলে হয়তো সে শান্তি পাবে!' বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

হায়! মানুষ যদি ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইত!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিনিয়োগ

পরদিন প্রভাতে শক্তিগড় যাত্রার কথা রাজসংসারে প্রচারিত হইল। চম্পা পূর্বাহ্ণে কিছু জানিত না, সংবাদ পাইয়া তাহার ভারি অভিমান হইল। যাত্রার আয়োজন সব ঠিকঠাক হইয়া গিয়াছে, আজই যাওয়া হইবে—অথচ সে কিছু জানে না! মুখ ভার করিয়া সে রাজার মহলের দিকে চলিল।

দ্বারের সম্মুখে রুদ্ররূপ দাঁড়াইয়া আছে; তাহাকে দেখিয়া চম্পা ভ্রূভঙ্গি করিয়া

বলিল—'রাজা আজ শক্তিগড়ে যাচ্ছেন, তুমি আগে থেকে জানতে?'

উদাসভাবে ঊর্ধ্বদিকে তাকাইয়া রুদ্ররূপ বলিল—'জানতাম।'

'তবে আমাকে বলনি কেন?'

বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া রুদ্ররূপ জবাব দিল—'দরকার মনে করিনি।'

চম্পা রাগিয়া গিয়া বলিল—'দরকার মনে করনি! তোমার কি কোনোদিন বুদ্ধি হবে না? এখন আমি এত কম সময়ের মধ্যে তৈরি হয়ে নেব কি করে বল দেখি!'

রুদ্ররূপ বিস্ময়ে ভ্রূ তুলিয়া বলিল—'তুমি তৈরি হবে কি জন্যে?'

অধীরস্বরে চম্পা বলিল—'বোকা কোথাকার! রাজার সঙ্গে আমাকে যেতে হবে না?'

রুদ্ররূপ যেন স্তম্ভিতভাবে বলিল—'রাজার সঙ্গে তুমি যাবে? সে আবার কি!'

'পথ ছাড়ো। তোমার সঙ্গে আমি বক্‌তে পারি না।'

রুদ্ররূপ রাজার ঘরের দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'চম্পা, রাজার সঙ্গে তোমার যাওয়া হতে পারে না।'

চম্পা অবাক হইয়া গেল। কিছুক্ষণ রুদ্ররূপের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল—'তার মানে? রাজা কি কোনো হুকুম জারি করেছেন?'

'না। কিন্তু তোমার যাওয়া চল্‌বে না।'

'কেন চল্‌বে না শুনি?'

'রাজা যে-কাজে যাচ্ছেন সে-কাজে অনেক বিপদের সম্ভাবনা।'

'বিপদের সম্ভাবনা! রাজা তো বেড়াতে যাচ্ছেন। আর, বিপদের সম্ভাবনা যদি থাকে, তবে তো আমি যাবই। আমি না গেলে তাঁর পরিচর্যা করবে কে?'

'চম্পা, জিদ্‌ করো না, আমরা বড় ভয়ঙ্কর কাজে যাচ্ছি। মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকলে সব ভেস্তে যাবে। তোমার যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না।'

'তোমার হুকুম নাকি?'

'হ্যাঁ, আমার হুকুম।'

'তোমার হুকুম আমি মানি না। তুমি আমার মালিক নও।' বলিয়া চম্পা সগর্বে রুদ্র-রূপকে সরাইয়া ভিতরে প্রবেশের উপক্রম করিল।

'চম্পা দেঈ!'

চম্পা চমকিয়া মুখ তুলিল। এমন দৃঢ় এত কঠিন স্বর রুদ্ররূপের সে কখনো শুনে নাই। দুইজনে কিছুক্ষণ পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল; তারপর আস্তে আস্তে চম্পার চোখ নত হইয়া পড়িল। ঠোঁট দুইটি ফুলিতে লাগিল, রুদ্ধ রোদনের কণ্ঠে সে বলিল—'আমি তাহলে যেতে পাব না?'

রুদ্ররূপের কণ্ঠস্বরও কোমল হইল; সে বলিল—'না, এবার নয়। এবার লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘরে থাক। আমরা শীঘ্রই ফিরে আসব।'

চম্পা হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ একমুহূর্তে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কোন্‌ ইন্দ্রজালে এমন হইল? এতদিন চম্পা রুদ্ররূপকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়াছে—আর আজ—

বশীভূতা চম্পা একবার জল-ভরা চোখ দুইটি রুদ্ররূপের মুখের পানে তুলিল। দর্প তেজ খরশান কথা—আর কিছু নাই! বোধ হয় এতদিনে চম্পা প্রথম নারীত্ব লাভ করিল।

স্খলিত অঞ্চল মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে সে ফিরিয়া গেল। যতক্ষণ দেখা গেল, স্বত্বাধিকারী প্রভুর মত রুদ্ররূপ তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

সিংগড় হইতে যে প্রাচীন পথ সিধা তীরের মত শক্তিগড়ের দিকে চলিয়া গিয়াছে, কিস্তা নদীটি চপলগতি সঙ্গীর মত প্রায় সর্বদাই তার পাশে পাশে চলিয়াছে। কখনো

মোড় ফিরিয়া ঈষৎ দূরে চলিয়া গিয়াছে, আবার বাঁকিয়া পথের ঠিক পাশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বেলা দ্বিপ্রহরে সেই পথ দিয়া গৌরী তাহার সওয়ারের দল লইয়া চলিয়াছিল। সবসুদ্ধ পঞ্চাশজন সওয়ার আগে পিছে চলিয়াছে, মধ্যে গৌরী, সর্দার ধনঞ্জয় ও রুদ্ররূপ। সওয়ারদের কোমরে তরবারি, হাতে বর্শা। রুদ্ররূপের কোমরে তরবারি আছে; কিন্তু বর্শা নাই। ধনঞ্জয়ের কটিবন্ধে সর্দারের ভারী পিস্তল। গৌরী প্রায় নিরস্ত্র, তাহার কোমরে কেবল সেই সোনার মুঠযুক্ত ছোরাটি রহিয়াছে, ঝিন্দে আসার প্রাক্কালে শিবশঙ্কর যেটি তাহাকে দিয়াছিলেন। ঘোড়াগুলি মন্থর কদম চালে চলিয়াছে। দ্রুত যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই; এই চালে চলিলে ঘণ্টা চারেকের মধ্যে শক্তিগড়ে পেঁছানো যাইবে। একদল ভৃত্য তাম্বু ও অন্যান্য অবশ্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি লইয়া সকালেই যাত্রা করিয়াছে; তাহারা বাস-স্থানাদি নির্মাণ করিয়া প্রস্তুত থাকিবে।

হেমন্তের মাধ্যন্দিন সূর্য তেমন প্রখর নয়। মাঝে মাঝে পথের পাশে বৃদ্ধ শাখাপত্রবহুল পাহাড়ী বৃক্ষ একটু ছায়ারও ব্যবস্থা করিয়াছে। তাছাড়া কিস্তার জলস্পৃষ্ট বাতাস ভারি মোলায়েম ও স্নিগ্ধ। গৌরী এদিকে একবারও আসে নাই, এতদিন একপ্রকার রাজপ্রাসাদেই অন্তরীণ ছিল। এই মুক্ত দৃশ্যের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে তাহার মনে পড়িল সেইদিনের কথা—যেদিন সে প্রথম ঝিন্দ্ স্টেশনে নামিয়া অশ্বপৃষ্ঠে সিংগড়ের পথ ধরিয়াছিল।

বর্তমান দৃশ্যটা ঠিক তাহার অনুরূপ না হইলেও স্মৃতি-জাগানিয়া বটে! পথ ঋজু, কিন্তু সর্বদা সমতল নয়, সাগরের ঢেউয়ের মত তরঙ্গায়িত হইয়া গিয়াছে। বামপার্শ্বের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড কঙ্করপূর্ণ ও অমসৃণ। এখানে ওখানে দুই-চারিটি কঠিন-প্রাণ পাহাড়ী গাছের গুল্ম। দক্ষিণে বিসর্পিলগতি কিস্তা। সর্বশেষে সমস্ত পার্বত্য দৃশ্যটিকে ঘিরিয়া বলয়াকৃতি নীল পাহাড়ের রেখা।

ঘোড়ার পিঠে বসিয়া গৌরী কেমন যেন স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। প্রস্তরময় পথের উপর ঘোড়ার ক্ষুরের সমবেত শব্দ, জিনের চামড়ার মসমস শব্দ, ঘোড়ার মুখে জিঞ্জিরের ঝিন্‌ঝিন্‌ শব্দ মিলিয়া একটি ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছে—সেই ছন্দের তালে তালে গৌরীর মনটাও কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছিল। বিশেষ কোনো চিন্তা মনের মধ্যে থাকে না অথচ অতি সূক্ষ্ম একটা লূতাতন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে বিচিত্র আকৃতির ভঙ্গুর জাল বুনিতে থাকে—তাহার মানসিক অবস্থাটা সেইরূপ।

সর্দার ধনঞ্জয়ের কণ্ঠস্বরে তাহার দিবাস্বপ্নের জাল ছিঁড়িয়া গেল। সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, রুদ্ররূপ কখন পিছাইয়া গিয়াছে—কেবল ধনঞ্জয় তাহার পাশে রহিয়াছেন।

ধনঞ্জয় ভ্রূর উপর করতল রাখিয়া সম্মুখ দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিলেন; তারপর মৃদুস্বরে কতকটা আত্মগতভাবে বলিলেন—আজ আমাদের অভিযান দেওয়ান কালীশঙ্করের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। কি আশ্চর্য যোগাযোগ! দেড়শ' বছর আগে কে ভেবেছিল যে ঝিন্দ্ রাজ্যের নাট্যশালায় তাঁর বংশধরেরাই একদিন প্রধান অভিনেতা হয়ে দাঁড়াবে? আশ্চর্য!'

গৌরী বলিল—'এবার তোমার হেঁয়ালি ছেড়ে আসল গল্পটা আগাগোড়া বলতে হবে সর্দার। আমাকে কেবল ভ্যাবাচাকা খাইয়ে চুপ করে যাবে—সে হবে না। নাও, এখন তো তোমার কোনো কাজ নেই, এইবার কালীশঙ্করের কেচ্ছা আরম্ভ কর।'

ধনঞ্জয় একটু হাসিলেন; বলিলেন—'বলছি। বলবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে; কারণ যে-কাজে আমরা চলেছি, তার ফলাফল যে কি হবে তা ভগবানই জানেন। হয়তো শেষ পর্যন্ত—'

'শেষ পর্যন্ত তোমার গল্প শোনবার জন্য আমি বেঁচে না থাকতে পারি?'

'কিম্বা গল্প বলবার জন্য আমি বেঁচে না থাকতে পারি। সবই সম্ভব। হয়তো আমরা দুজনেই বেঁচে থাকব, অথচ এ-গল্প আর বলা চলবে না। তার চেয়ে এই বেলা সেরে রাখা ভাল।'

গৌরী একটু ভাবিয়া বলিল—'আমি এ গল্প শুনলে যদি কারুর অনিষ্টের সম্ভাবনা

থাকে, তাহলে বলবার দরকার কি?'

ধনঞ্জয় গম্ভীরভাবে বলিলেন—'আপনার পূর্বপুরুষ কালীশঙ্কর সম্বন্ধে একটা রহস্যের ইঙ্গিত দিয়ে আমি আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি; এমন কাজে আপনাকে ব্রতী করেছি যাতে জীবননাশের সম্ভাবনা। সুতরাং আমার কাছে আপনার একটা কৈফিয়ৎ প্রাপ্য। সে কৈফিয়ৎ যদি আমি না দিই, আপনি ভাবতে পারেন যে আমি আপনাকে ঠকিয়ে নিজের কাজ হাসিল করেছি।'

'বেশ, তাহলে বল।'

'আমি যে গল্প বলব তাতে শুধু এই কথাই প্রমাণ হবে যে আপনি এ পর্যন্ত অধিকার-বহির্ভূত কোনো কাজ করেননি এবং শেষ পর্যন্ত যদি—'

'ওকথা অনেকবারই শুনেছি। এবার গল্প আরম্ভ কর।'

ধনঞ্জয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। গতিশীল সওয়ার দলের অশ্বক্ষুরধ্বনির ভিতর হইতে তাঁহার অনুচ্চ কণ্ঠস্বর গৌরীর কানে আসিতে লাগিল। সে সম্মুখ দিকে তাকাইয়া শুনিতে লাগিল।

'গল্প আরম্ভ করবার আগে এ কাহিনী আমি কি করে জান্‌তে পারলাম তা বলা দরকার। রাজপরিবারের এই গূঢ় কাহিনী জনসাধারণের জানবার কথা নয়; বোধ হয় বর্তমানে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। শুধু দেওয়ান বজ্রপাণি জানেন, তাঁকে আমি বলেছি।

'জাতিতে বৈশ্য হলেও আমরা পুরুষানুক্রমে রাজার পার্শ্বচর ও দেহরক্ষী—একথা বোধ হয় আগে শুনেছেন। দেড়শ' বছর আগে আমার ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ এই পদ প্রথম পেয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল শেঠ চন্দ্রকান্ত। তিনি কি করে তদানীন্তন মহারাজ ধূর্জটি সিংহের অনুগ্রহভাজন হয়ে ক্রমে তাঁর বন্ধু ও পার্শ্বচর হয়ে উঠেছিলেন সে কাহিনী এখানে অবান্তর। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে তিনি ধূর্জটি সিংহের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন।

'কিন্তু রাজার পার্শ্বচর হয়েও চন্দ্রকান্ত বেনিয়া স্বভাব ছাড়তে পারেননি। সে সময় বেনিয়া ছাড়া অন্য জাতের মধ্যে লেখাপড়ার রেওয়াজ ছিল না; হিসাব-কিতাব লেখার জন্য বেনিয়াদের লেখাপড়া শিখতে হত। চন্দ্রকান্ত হিসাব তো লিখতেনই, তার ওপর আর একটা জিনিস লিখতেন যা আজকের দিনে অমূল্য বলে পরিগণিত হতে পারে। সেটি হচ্ছে তদানীন্তন রাজ-দরবারের দৈনন্দিন রোজ-নাম্‌চা। রাজ-সংসারের খুঁটিনাটি, রাজ-অন্তঃপুরের জনশ্রুতি, দরবারের কেচ্ছা—সবই তাঁর গোপন দপ্তরে স্থান পেত। জীবনের শেষ পনের-কুড়ি বছর তিনি নিয়মিত এই কার্যটি করেছিলেন।

'যাহোক, চন্দ্রকান্ত একদিন বৃদ্ধ বয়সে দেহরক্ষা করলেন। তাঁর দপ্তর অন্যান্য হিসাবের খাতার সঙ্গে রক্ষা করা হল। চন্দ্রকান্তের পর থেকে আমাদের বংশে লেখাপড়ার চর্চা কমে গিয়েছিল। যাদের রাজার পাশে থেকে অস্ত্র চালাতে হবে তাদের আবার বিদ্যাশিক্ষার দরকার কি? কাজেই গত চার পুরুষের মধ্যে চন্দ্রকান্তের দপ্তর কেউ খুলে পড়েনি না।

'আমিই প্রথম এই দপ্তর উদ্ধার করি। তখন আমার বয়েস কম, কৌতূহল বেশী—চন্দ্রকান্তের রোজ-নাম্‌চা পড়তে আরম্ভ করলাম। পড়তে পড়তে মনে হল একটা উপন্যাস পড়ছি। সেই দপ্তরে দেওয়ান কালীশঙ্করের ইতিহাস পড়ি। পনের বছরের ইতিহাসের ভিতর থেকে কালীশঙ্করের জীবনকাহিনী জ্বলজ্বল করে ফুটে ওঠে। মনে হয়, চন্দ্রকান্ত যে কাহিনী লিখে গেছেন তার প্রধান নায়কই যেন কালীশঙ্কর।

'আর একটা জিনিস সেই দপ্তরের সঙ্গে পেয়েছিলাম। আপনি জানেন, হাতীর দাঁতের ফলকের উপর ছবি আঁকার জন্য ঝিন্দ্ চিরদিন বিখ্যাত। এখন প্রতিকৃতি আঁকার শিল্প লোপ পেয়ে গেছে, কিন্তু সে সময় মোগল যুগের শেষ দিকে এই শিল্পের খুব প্রচার ছিল। চন্দ্রকান্তের দপ্তরের সঙ্গে একতাড়া ছবি আঁকার ফলকও পেয়েছিলাম। ফলকের পিছনে চিত্রার্পিত ব্যক্তির নাম লেখা ছিল। সে সময়ের অনেক বড় বড় লোকের ছবি ছিল। রাজা

ধূর্জটি সিংয়ের ছবি ছিল। কালীশংকরের ছবিও ছিল।

'তাই, কালীশংকরের চেহারা আমার জানা ছিল এবং সেইজন্যই আপনাদের বাড়িতে তাঁর তৈলচিত্র দেখেই আমি বুঝতে পারি যে এ কালীশংকর ছাড়া আর কেউ নয়। সেই তীক্ষ্ন চোখ, সেই খড়্গের মত নাক একবার যে দেখেছে সে কখনো ভুলবে না।

'এতক্ষণে আমার কৈফিয়ৎ শেষ হল। এবার গল্পটা শুনুন। গল্পটা রোজ-নাম্‌চার দেড় হাজার পাতার মধ্যে ছড়ানো আছে; আমি যথাসম্ভব সংকুচিত করে বলছি।'

ধনঞ্জয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বোধ করি গল্পটা মনে মনে গুছাইয়া লইলেন; তারপর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'দপ্তরের দ্বিতীয় বছরে কালীশংকরের নাম প্রথম পাওয়া যায়। প্রথমে দেখি, রাজসভায় একজন বাঙালী লড়াক্‌ এসেছে; রাজাকে অনেক রকম অদ্ভুত অস্ত্রকৌশল দেখিয়ে মুগ্ধ করেছে। তারপর দেখি কালীশংকর রাজ-ভ্রাতাদের অস্ত্রগুরু নিযুক্ত হয়েছেন। রাজা তখন বয়সে তরুণ, বংশধর জন্মগ্রহণ করেনি।

'ক্রমে তিন মাস যেতে না যেতেই দেখতে পাই কালীশংকর রাজসভার প্রধান ওমরা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কি শিকারে, কি মন্ত্রণায়, কি বিলাস-ব্যসনে কালীশংকর না হলে রাজার একদণ্ডও চলে না।

'কালীশংকরকে চন্দ্রকান্ত প্রথমে একটু ঈর্ষার চক্ষে দেখতেন, কিন্তু ক্রমে তিনিও কালীশংকরের সম্মোহন শক্তিতে বশীভূত হয়ে পড়লেন। দ্বিতীয় বৎসরের শেষাশেষি দেখি, চন্দ্রকান্ত তাঁর দপ্তরে 'ভাই কালীশংকর' লিখতে আরম্ভ করেছেন। তাঁরা দু'জনে যেমন রাজার ডান হাত বাঁ হাত তেমনি পরস্পর প্রাণপ্রতিম বন্ধু হয়ে উঠেছেন—কেউ কারুর কাছ থেকে কোনো কথা গোপন করেন না।

'চতুর্থ বর্ষে রাজ্যের সাবেক মন্ত্রী মারা গেলেন। এইবার কালীশংকরের চরম উন্নতি হল—রাজা তাঁকে মন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। রায় দেওয়ান কালীশংকর রাজ্যের কর্ণধার হয়ে উঠলেন! একজন বিদেশীর এই উন্নতিতে অনেকের চোখ টাটালো বটে কিন্তু কার্যদক্ষতায় কূটবুদ্ধিতে রায় দেওয়ানের সমকক্ষ কেউ ছিল না—তাই কেউ উচ্চবাচ্য করতে পারল না। চন্দ্রকান্ত অবশ্য খুব খুশি হলেন। দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব এত প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল যে একজন অন্য জনের পরামর্শ না নিয়ে কোনো কাজ করতেন না।

'তারপর আরো দু'বছর কেটে গেল। এই সময়ে কালীশংকরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি—ঝিন্দের সঙ্গে ইংরাজ-সরকারের মিত্রতা-মূলক সন্ধি। তিনি এমন সুকৌশলে রাজার মর্যাদা রেখে এই কাজ সুসম্পন্ন করলেন যে, রাজা রাজ্যের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত শাসন পালনের ভার তাঁর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত আনন্দে দিন যাপন করতে লাগলেন। এইভাবে রাজ্য সুশৃংখলায় চলতে লাগল, কোথাও কোনো গণ্ডগোল নেই। কেবল একটি বিষয়ে রাজা এবং প্রজারা একটু নিরানন্দ—পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত রাজার বংশধর জন্মগ্রহণ করল না। রাজার তিন রানী—তিনজনেই নিঃসন্তান।

'রাজা হোম যজ্ঞ দৈবকার্য অনেক করলেন; কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হল না। হতাশ হয়ে রাজা শেষে মহাপণ্ডিত রাজগুরুর শরণাপন্ন হলেন। রাজগুরু অনেক চিন্তার পর বললেন—'একটিমাত্র উপায় আছে।'

এই পর্যন্ত বলিয়া ধনঞ্জয় থামিলেন।

গৌরী সাগ্রহে বলিল—'তারপর—?'

আরো কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধনঞ্জয় বলিলেন—'প্রাচীনকালে নিয়োগ-প্রথা বলে একটা জিনিস ছিল জানেন?'

স্তম্ভিত হইয়া গৌরী বলিল—'জানি—'

ধনঞ্জয় বলিতে লাগিলেন—'ঝিন্দে পোষ্যপুত্র গ্রহণের বিধি নেই, কিন্তু অবস্থা বিশেষে নিয়োগ-প্রথা আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। রাজবংশেই প্রায় দু'শ বছর আগে ঐ রকম ব্যাপার করতে হয়েছিল। গুরু নজির দেখিয়ে রাজাকে সেই পথ অবলম্বন করতে

উপদেশ দিলেন।

'ব্যাপারটা বোধ হয় এবার বুঝতে পেরেছেন?'

অস্ফুট স্বরে গৌরী বলিল—'কালীশঙ্কর—?'

ধনঞ্জয় ঘাড় নাড়িলেন—'প্রকাশ্যে এক মহা পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন হল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে...যজ্ঞ টিকা পরলেন রায় দেওয়ান কালীশঙ্কর। রাজা, রাজগুরু আর স্বয়ং কালীশঙ্কর ছাড়া একথা আর কেউ জানল না। এমন কি রানী পর্যন্ত না। সেকালে অনেক রকম ওষুধ ছিল—

'যাহোক, যথাসময় পাটরানী পদ্মা দেবী এক কুমার প্রসব করলেন। রাজ্যে মহা সমারোহ পড়ে গেল; দেশ দেশান্তর থেকে অভিনন্দন এল। রাজা ধূর্জটি সিং কিন্তু উৎসবে যোগ দিতে পারলেন না; তিনি রাজপ্রাসাদে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখলেন।

'ক্রমে যতই দিন যেতে লাগল, রাজার মুখ ততই অন্ধকার হতে লাগল। একটা অসূয়া-মিশ্রিত অবসাদের ভাব তাঁর প্রসন্ন চিত্তকে গ্রাস করে নিলে। সর্বদাই ভ্রূকুটি করে থাকেন; সভায় হাসি মস্করার প্রসঙ্গ উঠলে ক্রুদ্ধ সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন।

'রাজকুমারের বয়স বাড়তে লাগল। কিন্তু রাজা কুমারকে স্পর্শ করেন না—ঘৃণাভরে তাকে নিজের সুমুখ থেকে সরিয়ে দেন। ওদিকে কালীশঙ্করের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ এমন হয়ে দাঁড়াল যে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। আগে মুহূর্তের জন্য কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না, এখন কেবল রাজকার্য ব্যপদেশে দেখা হয়। যে দু'-চারটে কথা হয় তাও রাজকীয়-ব্যাপার সংক্রান্ত। বয়স্যের সম্পর্ক ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল।

'এইভাবে দিন কাটতে লাগল। রাজকুমার হরগৌরী সিং বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। কুমারের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন থেকে রাজসভায় কানাঘুষা আরম্ভ হল। কুমার যতই বড় হচ্ছেন, কালীশঙ্করের সঙ্গে তাঁর চেহারার সাদৃশ্য ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সকলেই তা লক্ষ্য করলে। আড়ালে ইশারা ইঙ্গিত চোখ ঠারাঠারি চলতে লাগল।

'রাজা তখন মদ ধরেছেন, অষ্টপ্রহর মদে ডুবে থাকেন। সভায় যখন আসেন তখন চারিদিকে কিছুই লক্ষ্য করেন না; সভাসদ্‌রা নানাভাবে তাঁকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করে, তিনি তাদের কথা শুনতে পান না; ভ্রূকুটি-ভয়াল মুখে বসে থাকেন।

'আরো কয়েক বছর কেটে গেল। রাজা থেকেও নেই, তাই সভাসদ্‌দের স্পর্ধা ক্রমে বেড়ে গিয়েছিল। কুমারের যখন আট বছর বয়স তখন এক কাণ্ড হল। একজন নির্বোধ ওমরা রাজার সুমুখেই কুমারের চেহারা নিয়ে একটা বাঁকা ইঙ্গিত করলে, বললে—'কুমারের চেহারা যেমন দেওয়ান কালীশঙ্করের মত, আশা করা যায়, বুদ্ধিতেও তিনি তেমনই প্রখর হবেন।' রাজা অন্য সময় কিছুই শুনতে পান না, কিন্তু এ কথাগুলো তাঁর কানে গেল; এতদিনের রুদ্ধ গ্লানি অগ্ন্যুৎপাতের মত বেরিয়ে এল। তিনি সিংহাসন থেকে লাফিয়ে গিয়ে সেই ওমরার চুলের মুঠি ধরলেন, তারপর তলোয়ারের এক কোপে তার মাথা কেটে নিলেন।

'হুলস্থূল কাণ্ড! এই সময় কালীশঙ্কর দ্রুতপদে বাইরে থেকে এসে রাজার হাত ধরে বললেন—'মহারাজ, ক্ষান্ত হোন।'

'রাজা ধূর্জটি সিং কষায়িত চোখ কালীশঙ্করের দিকে ফেরালেন; তাঁর মুখ দেখে মনে হল, কালীশঙ্করকেও বুঝি তিনি হত্যা করবেন। কিন্তু কালীশঙ্করের চোখের দৃষ্টিতে কি সম্মোহন শক্তি ছিল জানি না, রাজা তাঁর গায়ে অস্ত্র তুলতে পারলেন না। শুধু রক্তে-রাঙা তলোয়ারখানা দ্বারের দিকে দেখিয়ে বললেন—'যাও।'

'কালীশঙ্কর সভা থেকে ফিরে এলেন। সেই রাত্রে চন্দ্রকান্তের সঙ্গে গোপনে তাঁর মন্ত্রণা হল। কালীশঙ্কর কুশাগ্রধী লোক ছিলেন, অনেক আগে থেকেই তিনি এই দুর্যোগের দিন প্রতীক্ষা করছিলেন—তাই নিজের আজীবন সঞ্চিত টাকাকড়ি সব রাজ্যের বাইরে সরিয়ে ফেলেছিলেন। চন্দ্রকান্ত বললেন, কালীশঙ্করের পক্ষে আর এ রাজ্যে থাকা নিরাপদ নয়; রাজা নিজে তাঁকে হত্যা করতে পারেননি বটে, কিন্তু হত্যা করবার জন্য গুপ্তঘাতক নিযুক্ত হয়েছে—এ খবর তিনি পেয়েছেন। দুই বন্ধু সেই রাত্রে শেষ আলিঙ্গন করে নিলেন।

'পরদিন কালীশঙ্কর নিরুদ্দেশ হলেন। পনের বছর পরে ঝিন্দের রংগমঞ্চে তাঁর অভিনয়ের উপর যবনিকা পড়ে গেল।

'এর পরের যা ইতিহাস, তা আপনার বংশের ইতিহাস। আমার চেয়ে আপনিই তা বেশী জানেন?'

ধনঞ্জয় নীরব হইলেন। তাঁহার দৃষ্টি একবার গৌরীর কোমরের ছোরাটার উপর গিয়া পড়িল।

একাগ্রভাবে শুনিতে শুনিতে গৌরীর চিবুক বুকের উপর নামিয়া পড়িয়াছিল। সে এইবার মুখ তুলিল; তাহার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি খেলিয়া গেল। সম্মুখে প্রায় দুই মাইল দূরে তখন শক্তিগড়ের পাষাণ চূড়া দেখা দিয়াছে, সেইদিকে তাকাইয়া সে যেন অন্যমনস্কভাবে বলিল—'অর্থাৎ শংকর সিং, উদিত আর আমি—আমরা সকলেই কালীশংকরের বংশধর, জ্ঞাতি ভাই। চমৎকার!'

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শক্তিগড়

কিস্তা নদী যেখানে দুন্দুভির ন্যায় শব্দ করিতে করিতে নিম্নের উপত্যকায় ঝরিয়া পড়িয়াছে, সেখান হইতে প্রায় দুইশত গজ দূরে কিস্তার উত্তর তীরে শক্তিগড় দুর্গ অবস্থিত। কিস্তার তীরে বলিলে ঠিক বলা হয় না; বস্তুত দুর্গটি উত্তরতটলগ্ন জলের ভিতর হইতেই মাথা তুলিয়াছে। এই স্থানে কিস্তা অসমতল প্রস্তরবন্ধুর খাতের ভিতর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, জলের ভিতর হইতে বড় বড় পাথরের চাপ মাথা জাগাইয়া আছে। এইরূপ কতকগুলি অর্ধ-নগ্ন প্রস্তরশীর্ষের ভিত্তির উপর উত্তর তীর ঘেঁষিয়া শক্তিগড় দুর্গ নির্মিত।

জলের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শক্তিগড়ের চারিপাশে পরিখা খননের প্রয়োজন হয় নাই; কিস্তার প্রস্তরবিক্ষুব্ধ ফেনায়িত জলরাশি তাহাকে বেষ্টন করিয়া সগর্জনে বহিয়া গিয়াছে। একটি সংকীর্ণ সেতু খরস্রোতা প্রণালীর উপর দিয়া তীরের সহিত শক্তিগড় দুর্গের সংযোগ সাধন করিয়াছে। ইহাই দুর্গপ্রবেশের একমাত্র পথ।

শক্তিগড় দুর্গটি আয়তনে ছোট। দুর্গের আকারে নির্মিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি প্রাচীর পরিখাবেষ্টিত রাজপ্রাসাদ। নিরুপদ্রব ভোগবিলাসের জন্যই বোধ করি অতীতকালের কোনও বিলাসী রাজা ইহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। দুর্গটি এমনভাবে তৈয়ারি যে, মাত্র পাঁচ-ছয় জন বিশ্বাসী লোক লইয়া দুর্গের লৌহদ্বার ভিতর হইতে রোধ করিয়া দিলে অগণিত শত্রু দীর্ঘকাল অবরোধ করিয়াও ইহা দখল করিতে পারিবে না। কিস্তার গর্ভ হইতে কালো পাথরের দুর্ভেদ্য প্রাকার উঠিয়াছে; মাঝে মাঝে স্থূল স্তম্ভাকৃতি

বুরুজ। প্রাকারগাত্রে স্থানে স্থানে পর্যবেক্ষণের জন্য সংকীর্ণ ছিদ্র। বাহির হইতে দেখিলে দুর্গটিকে একটি নিরেট পাথরের সুবর্তুল স্তূপ বলিয়া মনে হয়।

দুর্গদ্বারের সম্মুখে প্রায় দেড়শত গজ দূরে ফাঁকা মাঠের উপর গৌরীর তাম্বু পড়িয়াছিল। মধ্যস্থলে গৌরীর জন্য একটি বড় শিবির; তাহার চারিপাশে সহচরদিগের জন্য কয়েকখানা ছোট তাম্বু। সবগুলি তাম্বু ঘিরিয়া কাঁটাতারের বেড়া। ধনঞ্জয় কোন দিকেই সাবধানতার লাঘব করেন নাই। এইখানে হেমন্ত অপরাহ্নের সোনালী আলোয় গৌরী সদলবলে আসিয়া উপনীত হইল।

অশ্বপৃষ্ঠে এতদূর আসিয়া গৌরী ঈষৎ ক্লান্ত হইয়াছিল; ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস অনেক দিন গিয়াছে। তাই নিজের তাম্বুতে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ও কিছু জলযোগ করিয়া সে নিজেকে চাঙ্গা করিয়া লইল। ধনঞ্জয়ের দেহে ক্লান্তি নাই, তিনি আসিয়া বলিলেন—'উদিতের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বোধ হয় ঘাবড়ে গেছে। আমরা যে আসতে পারি, তা বেচারা বোধ হয় প্রত্যাশাই করেনি। চলুন কিস্তার ধারে একটু বেড়াবেন; জায়গাটা আপনাকে দেখিয়ে শুনিয়ে দিই।'

দুইজনে বাহির হইলেন; রুদ্ররূপ তাঁহাদের সঙ্গে রহিল। কাঁটাবেড়ার ব্যূহমুখে বন্দুক-কিরিচ-ধারী শান্ত্রীর পাহারা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া তিনজনে দুর্গদ্বারের দিকে চলিলেন।

দুর্গের কাছাকাছি কোথাও লোকালয় নাই; প্রায় অর্ধক্রোশ দূরে কিস্তার তটে ঘন-নিবিষ্ট খড়ের চাল একটি গ্রামের নির্দেশ করিতেছে। গ্রামের ঘাটে জেলেডিঙির মত কয়েকটি ক্ষুদ্র নৌকা বাঁধা। সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ধনঞ্জয় বলিলেন—'ঐ শক্তিগড় গ্রাম—ওটা উদিতের জমিদারী। ওখানকার প্রজারা সব উদিতের গোঁড়া ভক্ত।'

গৌরী বলিল—'কাছাকাছি কোথাও শস্যক্ষেত্র দেখছি না; এই সব প্রজাদের জীবিকা কি?'

'প্রধানত মাছ ধরাই ওদের ব্যবসা। এ অঞ্চলে জন্‌রা কি জোয়ার পর্যন্ত জন্মায় না। তা ছাড়া কুটিরশিল্প আছে—ওরা খুব ভাল জরীর কাজ করতে পারে।'

গৌরী দুর্গের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল—'দুর্গের সিংদরজা তো বন্ধ দেখছি; কোথাও জনমানবের চিহ্ন আছে বলে মনে হচ্ছে না। ব্যাপার কি? কেউ নাই নাকি?'

ধনঞ্জয় হাসিয়া বলিলেন—'আছে বৈকি! তবে বেশী লোক নেই, গুটি পাঁচ-ছয় বিশ্বাসী অনুচর আছে।—কিন্তু আপনি অত কাছে যাবেন না। প্রাকারের গায়ে সরু সরু ফুটো দেখতে পাচ্ছেন? ওর ভেতর থেকে হঠাৎ বন্দুকের গুলি বেরিয়ে আসা অসম্ভব নয়—পাল্লার বাইরে থাকাই ভাল।'

দুর্গের এলাকা সাবধানে অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদিকে খানিকদূর গিয়া তাঁহারা কিস্তার পাড়ে দাঁড়াইলেন। কিস্তার জলে অস্তমান সূর্যের রাঙা ছোপ লাগিয়াছে; শক্তিগড়ের নিকষকৃষ্ণ দেহেও যেন কুঙ্কুমপ্রলেপ মাখাইয়া দিয়াছে। গৌরীর মনে পড়িল প্রহ্লাদের চিঠির কথা। এই দিকেই প্রাকার গাত্রে কোথাও একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ আছে—সেই গবাক্ষ চিহ্নিত কক্ষে শঙ্কর সিং অবরুদ্ধ। গৌরী পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল এদিকে জল হইতে তিন-চার হাত উপরে কয়েকটি চতুষ্কোণ জানালা রহিয়াছে; তাহার মধ্যে কোন্‌টি শঙ্কর সিংএর জানালা, তাহা অনুমান করা শক্ত। জানালাগুলির নিম্নে ক্ষুব্ধ জলরাশি আবর্তিত হইয়া বহিয়া গিয়াছে—নিম্নে নিমজ্জিত পাথর আছে। সাঁতার কাটিয়া বা নৌকার সাহায্যে জানালার নিকটবর্তী হওয়া কঠিন।

দুর্গের দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া গৌরী কিস্তার অপর পারে তাকাইল। এতক্ষণ সে লক্ষ্য করে নাই; নদীর অপর পারে দুর্গের প্রায় সমান্তরালে একটি বেশ বড় বাগানবাড়ি রহিয়াছে। কিস্তা এখানে প্রায় তিনশত গজ চওড়া, তাই পরপার পরিষ্কার দেখা যায় না; তবু একটি উপবন-বেষ্টিত প্রাসাদ সহজেই চোখে পড়ে। বাগানের প্রান্তে একটি বাঁধানো ঘাটও কিস্তার জলে ধাপে ধাপে অবগাহন করিতেছে। এই বাগান ও বাড়িতে বহুলোকের চলাচল দেখিয়া মনে হয়, যেন ওই বিজনপ্রান্তে কোনও উৎসবের আয়োজন চলিতেছে।

গৌরী বলিল—'একটা বাগানবাড়ি দেখছি। ওটাও কি উদিতের নাকি?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'না। নদীর ওপারে উদিতের সম্পত্তি কি করে হবে—ওটা ঝড়োয়া রাজ্যের অন্তর্গত। বাগানবাড়িটা ঝড়োয়ার বিখ্যাত সর্দার অধিক্রম সিংয়ের সম্পত্তি; ওদিকটা সবই প্রায় তার জমিদারী।' তারপর চোখের উপর করতল রাখিয়া কিছুক্ষণ সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—'কিন্তু অধিক্রমের বাগানবাড়িতে এত লোক কিসের? অধিক্রম মাঝে মাঝে তার জমিদারীতে এসে থাকে বটে, কিন্তু এ যেন মনে হচ্ছে কোনও উৎসব উপলক্ষে বাগানবাড়ি সাজানো হচ্ছে! কি জানি, হয়তো তার মেয়ের বিয়ে!'

রুদ্ররূপ পিছন হইতে সসম্ভ্রমে বলিল—'আজ্ঞে হাঁ, অধিক্রম সিংয়ের মেয়ে কৃষ্ণা বাঈয়ের সঙ্গে হাবিলদার বিজয়লালের বিয়ে।'

গৌরী সচকিত হইয়া বলিল—'তাই নাকি! তুমি কোথা থেকে শুনলে?'

রুদ্ররূপ বলিল—'শহরে অনেকেই বলাবলি করছিল। শুনেছি, ঝড়োয়ার রানী নাকি স্বয়ং এ বিয়েতে উপস্থিত থাকবেন। কৃষ্ণা বাঈ রানীর সখী কিনা।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'কবে বিয়ে?'

'তা বলতে পারি না। বোধ হয় পরশু।'

সে-রাত্রে কৃষ্ণা যে ইঙ্গিত করিয়াছিল শীঘ্রই আবার সাক্ষাৎ হইতে পারে, গৌরী এতক্ষণে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিল। বাপের জমিদারী হইতে কৃষ্ণার বিবাহ হইবে; রানীও আসিবেন। সুতরাং এত কাছে থাকিয়া দেখা সাক্ষাৎ হইবার কোনও বিঘ্ন নাই। অধিক্রম সিং কন্যার বিবাহে হয়তো রাজাকে নিমন্ত্রণ করিতেও পারেন।

গৌরীর ধমনীতে রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; সে একদৃষ্টে ঐ উদ্যানবেষ্টিত বাড়িটার দিকে চাহিয়া রহিল।

এই সময় দূরে দুর্গদ্বারের ঝনৎকার শুনিয়া তিনজনেই সেইদিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। দুইজন অশ্বারোহী আগে পিছে সংকীর্ণ সেতুর উপর দিয়া বাহিরে আসিতেছে। দূর হইতে অপরাহ্ণের আলোকে তাহাদের চেহারা ভাল দেখা গেল না। ধনঞ্জয় শ্যেনদৃষ্টিতে কিয়ৎকাল সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—'উদিত আর ময়ূরবাহন।'—তাঁহার মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল; তিনি একবার কাঁটা-তার বেষ্টিত তাম্বুর দিকে তাকাইলেন, কিন্তু এখন আর ফিরিবার সময় নাই; উদিত তাঁহাদের দেখিতে পাইয়াছে এবং এই দিকেই আসিতেছে। তিনি গৌরীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'ওরা আপনার কাছেই আসছে, সম্ভবত দুর্গের ভিতরে নিয়ে যাবার আমন্ত্রণ করবে। রাজী হবেন না। আর সতর্ক থাকবেন প্রকাশ্যে কিছু করতে সাহস করবে না বোধ হয়—তবু—। রুদ্ররূপ, তোমার পিস্তল আছে?'

'আছে।'

'বেশ। তৈরি থাকো। বিশেষভাবে ময়ূরবাহনটার দিকে লক্ষ্য রেখো।' বলিয়া তিনি গৌরীর পাশ হইতে কয়েক পা সরিয়া দাঁড়াইলেন। রুদ্ররূপও পিছু হটিয়া কিছু দূরে সরিয়া গেল। দুইজনে এমনভাবে দাঁড়াইলেন যাহাতে উদিত ও ময়ূরবাহন আসিয়া গৌরীর সম্মুখে দাঁড়াইলে তাঁহারা দুইপাশে থাকিয়া তাহাদের উপর নজর রাখিতে পারেন।

উদিত ও ময়ূরবাহন ঘোড়া ছুটাইয়া গৌরীর দুই গজের মধ্যে আসিয়া ঘোড়া থামাইল; তারপর ঘোড়া হইতে নামিয়া যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া অবনতশিরে গৌরীকে অভিবাদন করিল। ধনঞ্জয় তাহা দেখিয়া মনে মনে বলিলেন—'হুঁ—ভক্তি কিছু বেশী দেখছি।'

বাহ্য ব্যবহারে সম্ভ্রম প্রকাশ পাইলেও উদিতের মুখের ভাবে কিন্তু বিশেষ প্রসন্নতা লক্ষ্যগোচর হইল না; সে যেন নিতান্ত গরজের খাতিরেই বাধ্য হইয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান দেখাইতেছে। বস্তুত তাহার চোখের দৃষ্টিতে বিদ্রোহপূর্ণ অসহিষ্ণুতার আগুন চাপা রহিয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। ময়ূরবাহনের মুখের ভাব কিন্তু অতি প্রসন্ন, তাহার কিংশুকফুল্ল অধরে যে হাসিটি ক্রীড়া করিতেছে তাহাতে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের লেশমাত্র নাই, বরঞ্চ ঈষৎ অনুতপ্ত পারবশ্যই ফুটিয়া উঠিতেছে। সে যেন পূর্বদিনের ধৃষ্টতার জন্য লজ্জিত।

উদিত প্রথম কথা কহিল। একবার গলা ঝাড়িয়া লইয়া পাখিপড়ার মত বলিল—'মহারাজ স্বাগত। মহারাজকে সানুচর আমার দুর্গমধ্যে আহ্বান করতে পারলাম না সে জন্য দুঃখিত। দুর্গে স্থানাভাব। তবে যদি মহারাজ একাকী বা দু-একজন ভৃত্য নিয়ে দুর্গে অবস্থান করতে সম্মত হন, তাহলে আমি সম্মানিত হব।'

গৌরী মাথা নাড়িল, নিরুৎসুক স্বরে বলিল—'উদিত, তোমাকে সম্মানিত করতে পারলাম না। দুর্গের বাইরে আমি বেশ আছি। ফাঁকা জায়গায় থাকাই স্বাস্থ্যকর, বিশেষত যখন শিকার করতে বেরিয়েছি।'

উদিত বলিল—'মহারাজ কি সন্দেহ করেন দুর্গের ভিতরে থাকা তাঁর পক্ষে অস্বাস্থ্যকর?' তাহার কথার খোঁচাটা চোখের অনাবৃত বিদ্রূপে আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

গৌরী উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু তৎপূর্বেই ময়ূরবাহন হাসিতে হাসিতে বলিল—'অস্বাস্থ্যকর বৈকি? মহারাজ, আপনি দুর্গে থাকতে অস্বীকার ক'রে দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছেন। দুর্গে একজন লোক সংক্রামক রোগে ভুগছে। আপনার বাইরে থাকাই সমীচীন।'

গৌরী তাহার দিকে ভ্রূকুটি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'সংক্রামক রোগটা কি?'

ময়ূরবাহন তাচ্ছিল্যভরে বলিল—'বসন্ত। লোকটা বোধ হয় বাঁচবে না।'

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'লোকটা কে?'

এবার উদিত উত্তর দিল; প্রত্যেকটা শব্দ দাঁতে ঘষিয়া ধীরে ধীরে বলিল—'একটা বাঙালী—চেহারা অনেকটা আপনারই মত। লোকটা আমার এলাকায় এসে রাজদ্রোহিতা প্রচার করছিল, তাই তাকে বন্দী করে রেখেছি।'

সংযতস্বরে গৌরী বলিল—'বটে! কিন্তু তুমি তাকে বন্দী করে রেখেছ কোন্ অধিকারে?'

ঈষৎ বিস্ময়ে ভ্রূ তুলিয়া উদিত বলিল—'আমার সীমানার মধ্যে আমার দণ্ডমুণ্ডের অধিকার আছে একথা কি মহারাজ জানেন না?'

গৌরী পলকে নিজেকে সামলাইয়া লইল, অবজ্ঞাভরে বলিল—'শুনেছি বটে। কিন্তু সে-লোকটা যদি রাজদ্রোহ প্রচার করে থাকে তাহলে তাকে রাজ-সকাশে পাঠানোই উচিত ছিল, তার অপরাধের বিচার আমি করব। উদিত, তুমি অবিলম্বে এই বিদ্রোহীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

উদিত অধর দংশন করিল। কুটিল বাক্য হানাহানিতে সে পটু নয়; তাই নিজের কথার জালে নিজেই জড়াইয়া পড়িয়াছে। সে ক্রুদ্ধ-চোখে চাহিয়া কি একটা রূঢ় উত্তর দিতে যাইতেছিল, ময়ূরবাহন মাঝে পড়িয়া তাহা নিবারণ করিল। প্রফুল্লস্বরে বলিল—মহারাজ ন্যায্য কথাই বলেছেন। কুমার উদিতেরও তাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু লোকটা হঠাৎ রোগে পড়ায় আর তা সম্ভব হয়নি। তার অবস্থা ভাল নয়, হয়তো আজ রাত্রেই মরে যাবে। এ রকম অবস্থাতে তাকে মহারাজের কাছে পাঠানো নিতান্ত নৃশংসতা হবে। তবে যদি সে বেঁচে যায়, তাহলে কুমার উদিত নিশ্চয় তাকে বিচারের জন্য মহারাজের হুজুরে হাজির করবেন। কিন্তু বাঁচার সম্ভাবনা তার খুবই কম।'

গৌরী আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া যেন ভাবিতে ভাবিতে বলিল—'লোকটা যদি মারা যায় তাহলে কিন্তু বড় অন্যায় হবে। মৃত্যু বড় সংক্রামক রোগ, দুর্গের অন্য অধিবাসীদেরও আক্রমণ করতে পারে।'

অকৃত্রিম হাসিতে ময়ূরবাহনের মুখ ভরিয়া গেল। এই নিগূঢ় বাক্‌যুদ্ধ সে পরম কৌতুকে উপভোগ করিতেছিল, এখন সপ্রশংস নেত্রে গৌরীর মুখের পানে চাহিল। উদিত কিন্তু আর অসহিষ্ণুতা দমন করিতে পারিল না, ঈষৎ কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল—'ও-কথা থাক। মহারাজকে দুর্গে নিমন্ত্রণ করলাম—তিনি যদি সম্মত না হন, তাঁবুতে থাকাই বেশী স্বাস্থ্যকর মনে করেন, সে তাঁর অভিরুচি!' বলিয়া অশ্বে আরোহণ করিতে উদ্যত হইল।

ময়ূরবাহন মৃদুস্বরে তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল—'শিকারের কথাটা—'

উদিত ফিরিয়া বলিল—'হাঁ—। মৃগয়ার সব আয়োজন করেছি। আমার জঙ্গলে বরাহ

হরিণ পাওয়া যায় জানেন বোধ হয়। যদি ইচ্ছা করেন, কাল সকালেই শিকারে বেরোনো যেতে পারে।'

গৌরী বলিল—'বেশ, কাল সকালেই বেরোনো যাবে।'

উদিত লাফাইয়া ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল, তারপর ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া অবজ্ঞাভরে একটা 'নমস্তে' বলিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

ময়ূরবাহন তখনও ঘোড়ায় চড়ে নাই। উদিত দূরে চলিয়া গেলে ময়ূরবাহন রেকাবে পা দিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল—'আপনার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় কথা আছে।' কথাগুলি সে এত নিম্নকণ্ঠে বলিল যে অদূরস্থ ধনঞ্জয়ও তাহা শুনিতে পাইলেন না।

গৌরী সপ্রশ্ননেত্রে চাহিল।

ময়ূরবাহন পূর্ববৎ বলিল—'এখন নয়। আজ রাত্রে আমি আসব। এগারোটার সময় এইখানে আসবেন, তখন কথা হবে। নমস্তে!' বলিয়া মাথা ঝুঁকাইয়া সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়া ঘোড়ায় চড়িল; তারপর তাহার কশাহত ঘোড়া দ্রুতবেগে উদিতের অনুসরণ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রির ঘটনা

ছাউনির দিকে ফিরিতে ফিরিতে গৌরী ধনঞ্জয়কে ময়ূরবাহনের কথা বলিল। শুনিয়া ধনঞ্জয় বলিলেন—'আবার একটা কিছু নূতন শয়তানি আঁটছে।'

'তা তো বটেই। কিন্তু এখন কর্তব্য কি?'

দীর্ঘকাল আলোচনা ও পরামর্শের পর স্থির হইল যে ময়ূরবাহনের সহিত দেখা করাই যুক্তিসঙ্গত। তাহার অভিপ্রায় যদিও এখনও পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না, তবু অনুমান হয় যে সে উদিতের সহিত বেইমানি করিবার মতলব আঁটিয়াছে। ইহাতে রাজাকে উদ্ধার করিবার পন্থা সুগম হইতে পারে। গৌরী যদিও ময়ূরবাহনের সহিত কোনো প্রকার সম্বন্ধ রাখিতেই অনিচ্ছুক ছিল, তথাপি নিজেদের মূল উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া ব্যক্তিগত ঘৃণা ও বিদ্বেষ দমন করিয়া রাখিল।

কর্তব্য স্থির করিয়া ধনঞ্জয় অন্য প্রকার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। দুইজন গুপ্তচর দুর্গের সেতু-মুখে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন—যাহাতে ময়ূরবাহন একাকী আসিতেছে কিনা পূর্বাহ্ণে জানিতে পারা যায়। এমন হইতে পারে যে কুচক্রী উদিত গৌরীকে হঠাৎ লোপাট করিয়া দুর্গে লইয়া যাইবার এই নূতন ফন্দী বাহির করিয়াছে। উদিত ও ময়ূরবাহনের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নাই।

রাত্রি এগারোটার সময় চর আসিয়া খবর দিল যে ময়ূরবাহন একাকী আসিতেছে। তখন গৌরী, রুদ্ররূপ ও ধনঞ্জয় তাম্বু হইতে বাহির হইলেন। অন্ধকার রাত্রি—নক্ষত্রের

সম্মিলিত আলো এই অন্ধকারকে ঈষৎ তরল করিয়াছে মাত্র।

নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া তিনজনে দাঁড়াইলেন। অদূরে কিস্তা কলধ্বনি করিতেছে, দুর্গের কৃষ্ণ অবয়ব একচাপ কঠিন প্রস্তরীভূত অন্ধকারের মত আকাশের একটা দিক আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। দুর্গের পাদমূলে কেবল আলোকের একটা বিন্দু দেখা যাইতেছে, হয়তো উহাই শঙ্কর সিংয়ের গবাক্ষ!

কিয়ৎকাল পরে সতর্ক পদধ্বনি শুনা গেল। পদধ্বনি তিন-চার গজের মধ্যে আসিয়া থামিল, তারপর হঠাৎ বৈদ্যুতিক টর্চ জ্বলিয়া উঠিয়া প্রতীক্ষমান তিনজনের মুখে পড়িল।

ময়ূরবাহন বলিয়া উঠিল—'একি! আমি কেবল রাজার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

গৌরী ও রুদ্ররূপ দাঁড়াইয়া রহিল, ধনঞ্জয় ময়ূরবাহনের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাঁহার দক্ষিণ করতলে পিস্তলটা আলোকসম্পাতে ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন—'তা বটে। কিন্তু তোমার যা বলবার আছে আমাদের তিনজনের সামনেই বলতে হবে।'

'তাহলে আদাব, আমি ফিরে চললাম।' বলিয়া ময়ূরবাহন ফিরিল।

ধনঞ্জয়ের বাম হস্ত তাহার কাঁধের উপর পড়িল—'অত সহজে ফেরা যায় না ময়ূরবাহন।'

ময়ূরবাহন ভ্রূকুটি করিয়া ধনঞ্জয়ের হস্তস্থিত পিস্তলটার দিকে তাকাইল, অধর দংশন করিয়া কহিল—'তোমরা আমাকে আটক করতে চাও?'

'আপাতত তুমি যা বলতে এসেছ তা বলা শেষ হলেই তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি।'

'তোমাদের সামনে আমি কোনও কথা বলব না।' ময়ূরবাহন বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

'তাহলে আটক থাকতে হবে।'

'বেশ। কিন্তু আমাকে আটক করে তোমাদের লাভ কি?'

লাভ যে কিছু নাই তাহা ধনঞ্জয়ও বুঝিতেছিলেন। তিনি ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন—'তুমি রাজার সঙ্গে এই মাঠের মাঝখানে একলা কথা বলতে চাও। তোমার যে কোনও কু-অভিপ্রায় নেই আমরা বুঝব কি করে?'

এবার ময়ূরবাহন হাসিল, বলিল—'কি কু-অভিপ্রায় থাকতে পারে? রাজা কি ক্ষীরের লাড়ু যে আমি টপ্ করে মুখে পুরে দেব?'

'তোমার কাছে অস্ত্র থাকতে পারে।'

'তল্লাস করে দেখ, আমার কাছে অস্ত্র নেই।'

ধনঞ্জয় কথায় বিশ্বাস করিবার লোক নহেন; তিনি রুদ্ররূপকে ডাকিলেন। রুদ্ররূপ আসিয়া ময়ূরবাহনের বস্ত্রাদি তল্লাস করিল, কিন্তু মারাত্মক কিছুই পাওয়া গেল না।

ময়ূরবাহন বিদ্রূপ করিয়া কহিল—'কেমন, আর ভয় নেই তো!'

ধনঞ্জয় আবার বলিলেন—'আমাদের সামনে বলবে না?'

'না—' ময়ূরবাহন দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িল।

তখন ধনঞ্জয় কহিলেন—'বেশ। কিন্তু আমরা কাছাকাছি থাকব মনে রেখো। যদি কোনো রকম শয়তানির চেষ্টা কর তাহলে—' ধনঞ্জয় মুষ্টি খুলিয়া পিস্তল দেখাইলেন।

ময়ূরবাহন উচ্চৈঃস্বরে হাসিল—'সর্দার, তোমার মনটা বড় সন্দিগ্ধ। বয়সকালে তোমার ক্ষেত্রিয়াণীকে বোধ হয় এক লহমার জন্যও চোখের আড়াল করতে না! ক্ষেত্রিয়াণী অবশ্য তোমার চোখে ধুলো দিয়ে—হা হা হা—'

হাসিতে হাসিতে ময়ূরবাহন গৌরীর দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

টর্চের আলো নিবাইয়া ময়ূরবাহন কিয়ৎকাল গৌরীর সঙ্গে ধীরপদে পাদচারণ করিল। রুদ্ররূপ ও ধনঞ্জয় তাহাদের পশ্চাতে প্রায় বিশ হাত দূরে রহিলেন।

হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ময়ূরবাহন বলিল—'আপনার সব পরিচয়ই আমরা জানি।'

শুষ্কস্বরে গৌরী বলিল—'এই কথাই কি এত রাত্রে বলতে এসেছ?'

ময়ূরবাহন উত্তর দিল না; কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া যেন আত্মগতভাবেই বলিতে আরম্ভ করিল—'আপনার ভাগ্যের কথা ভাবলে হিংসা হয়। কোথায় ছিলেন বাংলাদেশের এক নগণ্য জমিদারের ছোট ভাই, হয়ে পড়লেন একেবারে স্বাধীন দেশের রাজা। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে পেলেন এক অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্যার প্রেম। একেই বলে ভগবান যাকে দেন, ছপ্পর ফোড়কে দেন। কিন্তু তবু পৃথিবীতে সবই অনিশ্চিত; অসাবধান হলে সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারীও রাস্তার ফকির বনে যায়। সুখ সৌভাগ্যকে যত্ন না করলে তারা থাকে না। তাই ভাবছি, আপনার এই হঠাৎ-পাওয়া সৌভাগ্যকে স্থায়ী করবার কোনও চেষ্টা আপনি করছেন কি? অথবা, কেবল কয়েকজন ফন্দিবাজ কুচক্রীর খেলার পুতুল হয়ে তাদের কাজ হাসিল করে দিয়ে শেষে আবার পুনর্মূষিক হয়ে দেশে ফিরে যাবেন?'

ময়ূরবাহনের এই ব্যঙ্গপূর্ণ স্বগতোক্তি শুনিতে শুনিতে গৌরীর বুকে রুদ্ধ ক্রোধ গর্জন করিতে লাগিল; কিন্তু সে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিল, ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতে দিল না। ময়ূরবাহন একটা কিছু প্রস্তাব করিতে চায়, তাহা শেষ পর্যন্ত না শুনিয়া ঝগড়া করা উচিত হইবে না। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল—'কাজের কথা যদি কিছু থাকে তো বল। তোমার বেয়াদপি শোনবার আমার সময় নেই।'

ময়ূরবাহন অবিচলিতভাবে বলিল—'কাজের কথাই বলছি, যা বললাম সেটা ভূমিকা মাত্র।' সে টর্চ জ্বালিয়া একবার সম্মুখের পথ খানিকটা দেখিয়া লইল, তারপর আলো নিবাইয়া বলিল—'উদিতের সঙ্গে আমার আর পোট হচ্ছে না। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।'

ময়ূরবাহনের কথার বিষয়বস্তুটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নয়; কিন্তু তাহার বলিবার ভঙ্গি এমন অতর্কিত ও আকস্মিক যে, গৌরী চমকিয়া উঠিল। ময়ূরবাহন বলিল—'স্পষ্ট কথা ঘোর-প্যাঁচ না করে স্পষ্টভাবেই বলতে আমি ভালবাসি। উদিত সিংয়ের মধ্যে আর শাঁস নেই—আছে শুধু ছোবড়া। তাই স্রেফ্ ছোবড়া চুষে আমার আর পোষাচ্ছে না।'

গৌরী ধীরে ধীরে বলিল—'অর্থাৎ উদিতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাও?'

ময়ূরবাহন হাসিল—'সাদা কথায় তাই বোঝায় বটে। আপনি বোধ হয় ঐ কথাটা বলে আমাকে লজ্জা দেবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু নিজের কোনও কাজের জন্য লজ্জা পাবার অবস্থা আমার অনেকদিন কেটে গেছে।'

নীরস স্বরে গৌরী বলিল—'তাই তো দেখছি। চেহারা ছাড়া মানুষের কোনও লক্ষণই তোমার নেই! যাহোক, তোমার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে আমার কৌতূহল নেই।—কি করতে চাও?'

ময়ূরবাহন কিছুক্ষণ কথা বলিল না। অন্ধকারে তাহার মুখ দেখা গেল না; তারপর সে সহজ স্বরেই বলিল—'আগেই বলেছি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। অবশ্য নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করা আমার উদ্দেশ্য নয়, এটা বোধ হয় বুঝতে পারছেন; আমার নিজেরও যথেষ্ট স্বার্থ আছে। মনে করুন আমি যদি আপনাকে সাহায্য করি, তাহলে তার বদলে আপনি কি আমাকে একটু সাহায্য করবেন না?'

'তুমি আমাকে কি ভাবে সাহায্য করতে চাও সেটা আগে জানা দরকার।'

'সেটা এখনও বুঝতে পারেননি?'

'না।'

'বেশ, তাহলে খোলসা করেই বলছি। আমি ইচ্ছে করলে আপনাকে ঝিন্দের গদীতে কায়েমীভাবে বসাতে পারি, এটা অনুমান করা বোধহয় আপনার পক্ষে শক্ত নয়?'

'কি উপায়ে?'

'ধরুন, আসল রাজার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়। তিনি যে অবস্থায় আছেন তা প্রায় মৃত্যু-তুল্য, তবু যতদিন তিনি বেঁচে আছেন ততদিন আপনি নিষ্কণ্টক হতে পারছেন না। আমি যদি আপনাকে সাহায্য করি তাহলে আপনার রাস্তা একেবারে সাফ—আপনি যে শঙ্কর সিং নয়, একথা কেউ চেষ্টা করলেও প্রমাণ করতে পারবে না। সিংহাসনে আপনার দাবী পাকা

হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছেন?'

গৌরী বুঝিল; আগেও সে বুঝিয়াছিল। প্রলোভন বড় কম নয়। শুধু ঝিন্দের সিংহাসন নয়, সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু। তথাপি গৌরীর মন লোভের পরিবর্তে বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। স্বার্থে স্বার্থে এই প্রাণপণ টানাটানি, নীচতা চক্রান্ত নরহত্যার এই ঘূর্ণি-পাক—ইহার আবর্তে পড়িয়া জগতের অতিবড় লোভনীয় বস্তুও তাহার কাছে অত্যন্ত অরুচিকর হইয়া উঠিল। সে একবার গা-ঝাড়া দিয়া যেন দেহ হইতে একটা পঙ্কিল অশুচিতার স্পর্শ ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। তারপর পূর্ববৎ নিতান্ত নিরুৎসুক স্বরে বলিল—'তাহলে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজাকে হত্যা করতেও তোমার আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার স্বার্থ-টা কি শুনি?'

ময়ূরবাহন বলিল—'আমার স্বার্থ গুরুতর না হলে এত বড় একটা সাংঘাতিক প্রস্তাব আমি পরিকল্পনা করতে পারতাম না। কিন্তু গরজ বড় বালাই। আমার অবস্থার কথা প্রকাশ করে বললে আপনি বুঝবেন যে আমার এই প্রস্তাবে বিন্দুমাত্র ছলনা নেই—এ একেবারে আমার খাঁটি মনের কথা।' একটু থামিয়া ময়ূরবাহন সহজ স্বচ্ছন্দতার সহিত বলিতে আরম্ভ করিল—যেন অন্য কাহারও কথা বলিতেছে—'আমি একজন ঘরানা ঘরের ছেলে এ বোধ হয় আপনি জানেন। বিষয়-আশয় টাকাকড়িও বিস্তর ছিল, কিন্তু সে সব উড়িয়ে দিয়েছি। গত দু'বছর থেকে উদিত সিংয়ের স্কন্ধে চেপেই চালাচ্ছিলাম—কিন্তু এভাবে আর আমার চলছে না। উদিতের রস ফুরিয়ে এসেছে; শুধু তাই নয়, গর্দানা নিয়েও টানাটানি পড়ে গেছে। লুকোচুরি করে কোনও লাভ নেই, এখন আমি আমার গর্দানা বাঁচাতে চাই। বুঝতে পারছি উদিতের মতলব শেষ পর্যন্ত ফেঁসে যাবে—কিন্তু আমিও সেই সঙ্গে ডুবতে চাই না। তাকে ঝিন্দের সিংহাসনে বসাতে পারলে আমিই প্রকৃতপক্ষে রাজা হতাম; কিন্তু সে দুরাশা এখন ত্যাগ করা ছাড়া উপায় নেই—আপনি এসে সব ওলট-পালট করে দিয়েছেন।

'এবার আমার প্রস্তাব শুনুন। এতে আমাদের দু'জনেরই স্বার্থ সিদ্ধ হবে—অর্থাৎ আপনি ঝিন্দের প্রকৃত রাজা হবেন, আর আমিও গর্দানা নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে থাকব।'

গৌরী বলিল—'তোমার প্রস্তাব বোধ হয় এই যে, রাজা হবার লোভে আমি তোমার গর্দানা রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দেব—কেমন?'

'প্রতিশ্রুতি!' ময়ূরবাহন মৃদুকণ্ঠে একটু হাসিল—'দেখুন, ও জিনিসের ওপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা নেই। অবস্থাগতিকে মানুষ প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়; আপনিও হয়তো রাজা হয়ে প্রতিশ্রুতি মনে না রাখতে পারেন। আমার প্রস্তাবটা একটু অন্য ধরনের।'

'বটে! কি তোমার প্রস্তাব শুনি?'

'আমার প্রস্তাব খুব মোলায়েম। আমি একটি বিয়ে করতে চাই।'

'বিয়ে করতে চাও!'

'হ্যাঁ। ভেবে দেখুন, বিয়ে করে সংসার ধর্ম পালন করবার আমার সময় উপস্থিত হয়েছে।'

'তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করবার চেষ্টা করছ?'

'আজ্ঞে না, স্থান-কাল-পাত্র কোনটাই রসিকতা করবার অনুকূল নয়। আমি খুব গম্ভীরভাবেই বলছি। তবে শুনুন। ত্রিবিক্রম সিংয়ের মেয়ে চম্পা বাঈকে আমি বিয়ে করতে চাই। উদ্দেশ্য খুব সোজা—ময়ূরবাহনের গর্দানার ওপর কারুর মমতা না থাকতে পারে কিন্তু ত্রিবিক্রম সিংয়ের জামাইয়ের গর্দানার দাম যথেষ্টই আছে। চম্পা বাঈকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করাতে সর্দার ধনঞ্জয়েরও সংকোচ হবে। তারপর, ত্রিবিক্রম সিংয়ের ঐ একটি মেয়ে, তাঁর মৃত্যুর পর মেয়েই উত্তরাধিকারিণী হবে। সুতরাং, সবদিক দিয়েই চম্পা বাঈ আমার উপযুক্ত পাত্রী।'

এই প্রস্তাবের কল্পনাতীত ধৃষ্টতা গৌরীকে কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক করিয়া দিল।

চম্পা! অনাঘ্রাত ফুলের মত নিষ্পাপ চম্পাকে এই ক্লেদাক্ত পশুটা চায়! গৌরী দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল—'তোমার স্পর্ধা আছে বটে!'

ঈষৎ বিস্ময়ে ময়ূরবাহন বলিল—'এতে স্পর্ধা কি আছে! ত্রিবিক্রম আমার স্বজাতি, বংশগৌরবে আমি তার চেয়ে ছোট নয়, বরং বড়। তবে আপত্তি কিসের?'

গৌরী রূঢ়স্বরে বলিল—'ও সব আকাশ-কুসুমের আশা ছেড়ে দাও। তোমার হাতে মেয়ে দেবার আগে ত্রিবিক্রম চম্পাকে কিস্তার জলে ফেলে দেবে।'

'তা দিতে পারে, লোকটা বড় একগুঁয়ে। কিন্তু আপনি রাজা—আপনি যদি হুকুম দেন, তাহলে সে না বলতে পারবে না।'

'আমি হুকুম দেব—চম্পার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে! তুমি—তুমি একটা পাগল।'

ময়ূরবাহন মৃদুস্বরে বলিল—'বিনিময়ে আপনি কি পাবেন সেটাও স্মরণ করে দেখবেন।'

'ও—' গৌরী উচ্চকণ্ঠে হাসিল। তাহারা কিস্তার একেবারে কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সম্মুখে পঞ্চাশ হাত দূরে অন্ধকার দুর্গ; সেইদিকে তাকাইয়া গৌরী বলিল—'বিনিময়ে রাজাকে হত্যা করে তুমি আমার প্রত্যুপকার করবে—এই না?'

সহজভাবে ময়ূরবাহন বলিল—'এতক্ষণে আমার সমগ্র প্রস্তাবটা আপনি বুঝতে পেরেছেন।'

গৌরী তিক্তস্বরে কহিল—'তুমি মনে কর ঝিন্দের সিংহাসনে আমার বড় লোভ?'

'মনে করা অস্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া আর একটি লোভনীয় জিনিস আছে—ঝড়োয়ার কস্তুরীবাঈ—'

গৌরীর কঠিন স্বর তাহার কথা শেষ হইতে দিল না—'চুপ! ও নাম তুমি উচ্চারণ কোরো না। এবার তোমার প্রস্তাবের উত্তর শোনো—তুমি একটা নরকের কীট, কিন্তু আমাকে লুব্ধ করতে পারবে না। সিংহাসনে আমার লোভ নেই, যা ন্যায়ত আমার নয় তা আমি চাই না। পৃথিবীতে রাজ-ঐশ্বর্যের চেয়েও বড় জিনিস আছে—তার নাম ইমান। কিন্তু সে তুমি বুঝবে না। ময়ূরবাহন, তুমি আমাকে অনেকভাবে ছোট করবার চেষ্টা করেছ, তার মধ্যে আজকের এই চেষ্টা সবচেয়ে অপমানজনক। তুমি এখন আমার মুঠোর মধ্যে, ইচ্ছে করলে তোমাকে মাছির মত টিপে মেরে ফেলতে পারি, শুধু একটু হুকুমের ওয়াস্তা। কিন্তু তোমার ওপর আমার বিদ্বেষ এত বেশী যে এভাবে মারলে আমার তৃপ্তি হবে না। তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়ার দিন এখনো আসেনি, কিন্তু সেদিন আসবে—হুঁশিয়ার!'

গৌরী খুব সংযতভাবে ওজন করিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল কিন্তু শেষের দিকে তাহার কথাগুলা ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের অন্তর্গূঢ় গর্জনের মত শুনাইল। সে চুপ করিলে ময়ূরবাহনও কিয়ৎকাল কথা কহিল না; তারপর ধীরে ধীরে কহিল—'আপনি তাহলে আমার প্রস্তাবে রাজী নন? এই আপনার শেষ কথা?'

'হ্যাঁ।'

'ভেবে দেখুন—'

'দেখেছি। তুমি এখন যেতে পার।'

'বেশ, যাচ্ছি। কিন্তু আপনি ভাল করলেন না।'

'তুমি কি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ?'

ময়ূরবাহন গৌরীর নিকট হইতে দুই-তিন হাত দূরে দাঁড়াইয়াছিল; এবার সে ফিরিয়া টর্চের আলো গৌরীর মুখে ফেলিল, বলিল—'না—ভয় দেখিয়ে শত্রুকে সাবধান করে দেওয়া আমার স্বভাব নয়। কিন্তু আমার প্রস্তাবে রাজী হলেই সবদিক দিয়ে ভাল হত। আপনি বোধ হয় বুঝতে পারছেন না যে আপনার জীবন সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলছে, যে-কোনো মুহূর্তে সুতো ছিঁড়ে যেতে পারে। উদিত সিং মরীয়া হয়ে উঠেছে; কোণ-ঠাসা বন-বেড়ালের সঙ্গে খেলা করা নিরাপদ নয়।'

গৌরী হাসিল—'এটা তোমার নিজের কথা, না উদিতের জবানি বলছ?'

'নিজের কথাই বলছি।'

'বটে! আর কিছু বলবার আছে?'

'আছে।' ময়ূরবাহনের স্বর বিষাক্ত হইয়া উঠিল—'দৈবের কথা বলা যায় না, আপনি হয়তো বে'চে যেতেও পারেন। কিন্তু জেনে রাখুন, ঝড়োয়ার রানীকে আপনিও পাবেন না, শঙ্কর সিংও পাবে না—তাকে ভোগ-দখল করবে উদিত সিং—বুঝেছেন?—হা—হা—হা—'

তাহার হাসি শেষ হইতে না হইতে দুর্গের দিক হইতে বন্দুকের আওয়াজ হইল। কাঁধের কাছে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিয়া গৌরী 'উঃ' করিয়া উঠিল। ধনঞ্জয় পিছন হইতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'সরে আসুন! সরে আসুন!' ময়ূরবাহন হাতের জ্বলন্ত টর্চটা গৌরীর গায়ে ছুঁড়িয়া মারিয়া উচ্চহাস্য করিতে করিতে জলে লাফাইয়া পড়িল। মুহূর্তমধ্যে একটা অচিন্তনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

ধনঞ্জয় ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিলেন—'চোট পেয়েছেন? কোথায়?'

গৌরী বলিল—'কাঁধে। বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু ময়ূরবাহনটা পালাল।'

অন্ধকার কিস্তার বুক হইতে ময়ূরবাহনের হাসি ভাসিয়া আসিল—'হা-হা-হা—'

ধনঞ্জয় শব্দ লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িলেন। কিন্তু কোনো ফল হইল না; আবার দূর হইতে হাসির আওয়াজ আসিল। তীব্র স্রোতের মুখে ময়ূরবাহন তখন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে।

ধনঞ্জয় রুদ্ররূপকে বলিলেন—'তুমি যাও; পুলের মুখে আমাদের লোক আছে, সেখানে যদি ময়ূরবাহন জল থেকে ওঠবার চেষ্টা করে, তাকে ধ'র্বে।'

রুদ্ররূপ প্রস্থান করিল।

ধনঞ্জয় তখন গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনার আঘাত গুরুতর নয়? সত্যি বলছেন?'

গৌরী বলিল—'এখন সামান্য একটু চিন্-চিন্ করছে। বোধ হয় কাঁধের চামড়াটা ছি'ড়ে গেছে।'

'যাক, কান ঘে'ষে গেছে। চলুন—ছাউনিতে ফেরা যাক।'

'চল।'

যাইতে যাইতে ধনঞ্জয় বলিলেন—'উঃ—কি ভয়ানক শয়তানি বুদ্ধি। নিজে নিরস্ত্র এসেছে, আর দুর্গে লোক ঠিক করে এসেছে। কথায়-বার্তায় আপনাকে দুর্গের কাছে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে নিয়ে গিয়ে তারপর মুখের উপর টর্চের আলো ফেলেছে—যাতে দুর্গ থেকে বন্দুকবাজ আপনাকে দেখতে পায়। ব্যাপারটা ঘটবার আগে পর্যন্ত ওদের মতলব কিছু বুঝতে পারিনি।'

'না। কিন্তু আমি ভাবছি, ময়ূরবাহন শেষকালে যা বল্‌লে তার মানে কি!'

'কি বললে?'

গৌরী জবাব দিতে গিয়া থামিয়া গেল। বলিল—'কিছু না।'

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

আবার অগাধ জলে

পরদিন প্রাতঃকালে যথারীতি প্রাতরাশ শেষ করিয়া গৌরী একাকী তাহার খাস তাম্বুতে একটা কৌচে ঠেসান দিয়া বসিয়া ছিল। তাম্বুটি বিস্তৃত ও চতুষ্কোণ, মেঝেয় গালিচা বিছানো। মাথার উপর ঝাড় ঝুলিতেছে, দেয়ালে আয়না ছবি প্রভৃতি বিলম্বিত। দরজা জানালাও পাকা বাড়ির মত, ইহা যে বস্ত্রাবাস মাত্র তাহা কক্ষের আভ্যন্তরিক চেহারা দেখিয়া অনুমান করাও যায় না। খোলা বাতায়ন পথে নিকটবর্তী অন্য তাম্বুগুলি দেখা যাইতেছে—প্রশান্ত প্রভাত রৌদ্র বাহিরের দৃশ্যটা যেন চিত্রার্পিতবৎ মনে হয়।

গতরাত্রে গৌরী ঘুমাইতে পারে নাই। কাঁধের আঘাতটা যদিও সামান্যই তবু নিদ্রার যথেষ্ট ব্যাঘাত করিয়াছে। তাহার উপর চিন্তা। বিনিদ্র রজনীর সমস্ত প্রহর ব্যাপিয়া তাহার মনে চিন্তার আলোড়ন চলিয়াছে।

অবশেষে এই দুশ্চিন্তা-সমুদ্র মন্থন করিয়া মনে একটা সংকল্প জাগিয়াছে। সেই অপরিণত সংকল্পটাকেই কার্যে পরিণত করিবার উপায় সে আজ একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় ধনঞ্জয় এত্তালা পাঠাইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একখানা খোলা চিঠি।

অভিবাদন করিয়া ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন—'আজ কেমন বোধ করছেন? কাঁধটা—?'

গৌরী বলিল—'ভালই। একটু টাটিয়েছে—তা ছাড়া আর কিছু নয়।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'আঘাত ভগবানের কৃপায় অল্পই, ব্যান্ডেজও যথাসাধ্য ভাল করে বাঁধা হয়েছে; তবু গঙ্গানাথকে খবর পাঠালে হত না? সে বৈকাল নাগাদ এসে পড়তে পারত।'

গৌরী বলিল—'অনর্থক হাঙ্গামা করো না সর্দার। গঙ্গানাথের আসবার কোনও দরকার নেই। তোমার হাতে ওটা কি?'

ঈষৎ হাসিয়া চিঠিখানা ধনঞ্জয় গৌরীর হাতে দিলেন—'উদিতের চিঠি। আমরা নাকি কাল রাত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁর বন্ধু ময়ূরবাহনকে মেরে ফেলেছি; তাই আজ আর তিনি শিকারে আসবেন না।

চিঠি পড়িয়া গৌরী মুখ তুলিল—'ময়ূরবাহন কি সত্যিই মরেছে নাকি?'

ধনঞ্জয় মাথা নাড়িলেন—'ময়ূরবাহন এত সহজে মরবে বলে তো মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, এই চিঠি লিখে উদিত আমাদের চোখে ধুলো দিতে চায়; ময়ূরবাহন দুর্গে ফিরে গেছে। যদিও ফিরল কি করে, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। দুর্গের মুখে রুদ্ররূপ পাহারায় ছিল, সুতরাং সেদিক দিয়ে ঢুকতে পারেনি। তবে ঢুকলো কোথা দিয়ে?'

'কিস্তার টানে সত্যিই ভেসে যেতে পারে না কি?'

'একেবারে অসম্ভব বলছি না। কিন্তু ভেবে দেখুন, সে আপনাকে খুন করে জলে লাফিয়ে পড়বে বলে কৃতসংকল্প হয়ে এসেছিল। যদি তার দুর্গে ফেরবার কোনও পথই না থাকবে, তবে সে অতবড় দুঃসাহসিক কাজ করবে কেন?'

গৌরী ভাবিয়া বলিল—'তা বটে। হয়তো জলের পথে দুর্গে ঢোকবার কোনও গুপ্তপথ আছে।'

'সেই কথা আমিও ভাবছি। ময়ূরবাহন যদি কিস্তার প্রপাতের মুখে পড়ে গুঁড়ো হয়ে না গিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় সে কোনো গুপ্তপথ দিয়ে দুর্গে ঢুকেছে। কিন্তু কোথায় সে গুপ্তপথ?'

'গুপ্তপথ কোথায়, তা যখন আমরা জানি না তখন বৃথা জল্পনা করে লাভ নেই। উদিত আমাদের বোঝাতে চায় যে ময়ূরবাহন মরে গেছে—যাতে আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত

হতে পারি। তার মানে ওরা একটা নূতন শয়তানী মতলব আঁটছে। এখন কথা হচ্ছে, আমাদের কর্তব্য কি?'

সর্দার বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িলেন—'কিছুই তো ভেবে পাচ্ছি না।' দাবা খেলিতে বসিয়া বাজি এমন অবস্থায় আসিয়া পেঁাছিয়াছে যে, কোনো পক্ষই নূতন চাল দিতে সাহস করিতেছে না, পাছে একটা অচিন্তিত বিপর্যয় ঘটিয়া যায়।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর গৌরী হঠাৎ বলিল—'সর্দার, শঙ্কর সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে না পারলে কোনও কাজই হবে না। আমি ঠিক করেছি, যে করে হোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

ভ্রূ তুলিয়া ধনঞ্জয় বলিলেন—'কিন্তু কি করে দেখা করবেন?'

'ঐ জানালা দিয়ে। তাঁর অবস্থাটা জানা দরকার। বুঝছ না, আমরা যে তাঁর উদ্ধারের চেষ্টা করছি, একথা তিনি হয়তো জানেনই না। তাঁকে যদি খবর দিতে পারা যায়, তাহলে তিনিও তৈরি থাকতে পারেন। তাছাড়া আমরাও তাঁর কাছ থেকে এমন খবর পেতে পারি যাতে উদ্ধার করা সহজ হবে। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে—'

'কি মতলব?'

এই সময় রুদ্ররূপ প্রবেশ করিয়া জানাইল যে কিস্তার পরপার হইতে অধিক্রম সিং মহারাজের দর্শনপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন।

আলোচনা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। অধিক্রম সিং আসিয়া প্রণামপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইলেন। তাঁহার হস্তে একটি সুবর্ণ থালির উপর কয়েকটি হরিদ্রারঞ্জিত সুপারি। তিনি কন্যার বিবাহে ঝিন্দের মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন।

ধনঞ্জয় তাঁহাকে সমাদর করিয়া বসাইলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া শিষ্টাচারসম্মত অত্যুক্তি ও বিনয়-বচনের বিনিময় চলিল। তারপর অধিক্রম সিং আর্জি পেশ করিলেন। কন্যার বিবাহে দীনের ভবনে দেবপাদ মহারাজের পদধূলি পড়িলে গৃহ পবিত্র হইবে। অদ্য রাত্রেই বিবাহ। কন্যার সখী মহামহিমময়ী ঝড়োয়ার মহারানী স্বয়ং আসিয়াছেন; এরূপক্ষেত্রে দেবপাদ মহারাজও যদি বিবাহমণ্ডপে দেখা দেন তাহা হইলে বর-কন্যার ইহজগতে প্রার্থনীয় আর কিছুই থাকিবে না ইত্যাদি।

আদব-কায়দা-দুরস্ত বাক্যোচ্ছ্বাসের মধ্য হইতেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইলে যে মহারাজ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলে অধিক্রম সত্যই কৃতার্থ হইবেন। মহারাজ কিন্তু তাঁহার বাক্‌বিন্যাস শুনিতে শুনিতে ঈষৎ বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলেন, অধিক্রম থামিলে তিনি সজাগ হইয়া বলিলেন—'সর্দারজী, আপনার নিমন্ত্রণ পেয়ে খুবই আপ্যায়িত হলাম। কৃষ্ণাবাঈ আর বিজয়লাল দু'জনেই আমার প্রিয়পাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের বিবাহে আমি উপস্থিত থাকতে পারব না। আজ রাত্রে আমার অন্য কাজ আছে।'

অধিক্রম নিরাশ হইলেন, তাহা তাঁহার মুখের ভাবেই প্রকাশ পাইল। গৌরী বলিল—'আপনি দুঃখিত হবেন না! নবদম্পতীকে আমি এখান থেকেই আশীর্বাদ করছি। তাছাড়া, স্বয়ং মহারানী যেখানে উপস্থিত, সেখানে আমার যাওয়া না-যাওয়া সমান।'

অধিক্রম জোড়হস্তে নিবেদন করিলেন—'মহারাজ, আপনার অনুপস্থিতিতে শুধু যে আমরাই মর্মাহত হব তা নয়, মহারানীও বড় নিরাশ হবেন। আমি কৃষ্ণাব মুখে শুনেছি, তিনি আপনার প্রতীক্ষায়—' কুণ্ঠিতভাবে অধিক্রম কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া দিলেন। রাজা-রানীর অনুরাগের কথা, মধুর হইলেও প্রকাশ্যে আলোচনীয় নয়।

তবু অধিক্রম যেটুকু ইঙ্গিত দিলেন তাহাতেই গৌরীর মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; কিছুক্ষণ দৃষ্টিহীন চক্ষু বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে ফিরিয়া বলিল—'অধিক্রম সিং, আজ আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হয়তো অন্য কখনও—আপনারা বোধ হয় জানেন না, কৃষ্ণার কাছে আমি অনেক বিষয়ে ঋণী। কিন্তু এবার সে ঋণ শোধ করতে পারলাম না। যাহোক, আশা রইল, কখনো না কখনো শোধ করব। আপনি দুঃখ করবেন না, বর-কন্যাকে

আমি সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি, তারা সুখী হবে।'

অগত্যা অধিক্রম ব্যর্থমনোরথ হইয়া বিদায় লইলেন। গৌরী আবার জানালার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল; কিছুক্ষণ কোনো কথা হইল না। তারপর গৌরী ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরিয়া দেখিল তিনি তাহার দিকেই তাকাইয়া আছেন; তাঁহার মুখে একটা নিতান্তই অপরিচিত কোমলভাব। এই লৌহকঠিন যোদ্ধার মুখে এমন ভাব গৌরী আর কখনো দেখে নাই।

ধনঞ্জয় নরমসুরে বলিলেন—'আপনি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান না করলেই পারতেন। অধিক্রম দুঃখিত হল।'

গৌরীর মুখে একটা ব্যঙ্গহাসি ফুটিয়া উঠিল; সে বলিল—'নিমন্ত্রণ রক্ষা করলে তুমি খুশি হতে?'

'নিশ্চয়।'

'কিন্তু ঝড়োয়ার কস্তুরীবাঈয়ের সঙ্গে আমার দেখা হত যে! তাতেও কি তুমি খুশি হতে সর্দার?'

ধনঞ্জয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'কিছুদিন আগে খুশি হতাম না—বরং বাধা দেবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু আশ্চর্য মানুষের মন! আজ আপনাকে আর কস্তুরীবাঈকে একত্র কল্পনা করে মনে কোনো রকম অশান্তি বোধ করছি না; বরঞ্চ—আপনি না হয়ে যদি শঙ্কর সিং—' সহসা দুই হস্ত আবেগভরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—'ভগবানের কি অবিচার! কেন আপনি শঙ্কর সিং হয়ে জন্মালেন না?'

বিধাতার বিধানের বিরুদ্ধে সর্দারের এই ক্ষুদ্র বিদ্রোহ গৌরীরও বহুযত্নলব্ধ চিত্তের দৃঢ়তা যেন ভাঙিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। তাহার মনটা দ্রবীভূত হইয়া একরাশ অশ্রুর মত টলটল করিতে লাগিল। ধনঞ্জয় পুনরায় বলিয়া উঠিলেন—'কী ক্ষতি হত পৃথিবীর—যদি আপনি শঙ্কর সিং হতেন? আমি শঙ্কর সিংয়ের বাপদাদার নিমক খেয়েছি, কিন্তু তাই বলে মিথ্যে মোহ আমার নেই—শঙ্কর সিং আপনার পায়ের নখের যোগ্য নয়। অথচ—যখন মনে হয়, আপনি একদিন ঝিন্দ্ ছেড়ে চলে যাবেন, আর শঙ্কর সিং ঝড়োয়ার রানীকে বিবাহ করে গদীতে বসবেন—'

এবার গৌরী প্রায় রূঢ়স্বরে বাধা দিল, বলিল—'ব্যস! সর্দার, আর নয়, যা হবার নয় তা নিয়ে আক্ষেপ কোরো না। এস এখন পরামর্শ করি। আমার প্রস্তাবটা তোমাকে বলা হয়নি।'

ধনঞ্জয় যেন হোঁচট খাইয়া থামিয়া গেলেন। তারপর চোখের উপর দিয়া একবার হাত চালাইয়া নীরস কঠোরস্বরে বলিলেন—'বলুন।'

মধ্যরাত্রির ঘড়ি বাজিয়া যাইবার পর গৌরী, রুদ্ররূপ ও ধনঞ্জয় চুপিচুপি শিবির হইতে বাহির হইলেন। ছাউনি নিস্তব্ধ—শিবির-বেষ্টনীর দ্বারমুখে বন্দুকধারী প্রহরী নিঃশব্দে পথ ছাড়িয়া দিল।

পূর্বরাত্রে যেখানে ময়ূরবাহন কিস্তার জলে লাফাইয়া পড়িয়াছিল সেইস্থানে আবার তিনজনে গিয়া দাঁড়াইলেন। কোনো কথা হইল না, অন্ধকারে গৌরী নিজের গাত্রবস্ত্র খুলিতে লাগিল।

বহু আলোচনার পর কর্তব্য স্থির হইয়াছিল। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকিয়া গৌরী সন্তরণে দুর্গের নিকটে যাইবে। সে সন্তরণে পটু, কিস্তার স্রোত তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। দুর্গের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া যে-জানালার কথা প্রহ্লাদ বলিয়াছিল, সে সেই জানালার নিকটবর্তী হইবে। রাত্রে জানালায় সাধারণত দীপ জ্বলে, সুতরাং লক্ষ্য হারাইবার ভয় নাই। জানালা জল হইতে দুই-তিন হাত উর্ধ্বে, বাহির হইতে কক্ষের অভ্যন্তর একটু উঁচু হইলেই দেখা যাইবে। শব্দ হইবার আশঙ্কাও নাই, কিস্তার গর্জনে অন্য শব্দ চাপা পড়িয়া যাইবে। গৌরী জানালা দিয়া কক্ষের অভ্যন্তর দেখিবে। রাজা

সেখানে বন্দী আছেন কিনা এবং রাজার সহিত কোনও প্রহরী আছে কিনা তাহা লক্ষ্য করিবে। যদি না থাকে তাহা হইলে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবে। তারপর দুর্গের আভ্যন্তরিক অবস্থা বুঝিয়া রাজাকে উদ্ধারের আশ্বাস দিয়া ফিরিয়া আসিবে।

গৌরীকে এই সংকটময় কার্যে একাকী পাঠাইতে সর্দার ধনঞ্জয় প্রথমে সম্মত হন নাই; কিন্তু সে ক্রুদ্ধ ও অধীর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতি দিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, গৌরীর মনের অবস্থা এমন একস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে তাহাকে বাধা দিলে সে আরও দুর্নিবার হইয়া উঠিবে।

রুদ্ররূপ তাঁহাদের পরামর্শে যোগ দিয়াছিল, কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়ে হাঁ-না কোনো মন্তব্যই প্রকাশ করে নাই।

গৌরী কাপড়-চোপড় খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে কালো রংয়ের হাঁটু পর্যন্ত হাফ্-প্যান্ট ছিল; আর কোনো আবরণ নাই, ঊর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত। কারণ সাঁতারের সময় গায়ে বস্ত্রাদি যত কম থাকে ততই সুবিধা। অস্ত্রও কিছু সঙ্গে লওয়া আবশ্যক বিবেচিত হয় নাই; তবু ধনঞ্জয় একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রুপুরীর নিকটস্থ হওয়া অনুমোদন করেন নাই। অনিশ্চিতের রাজ্যে অভিযান; কখন কি প্রয়োজন হইবে স্থির নাই—এই ভাবিয়া গৌরী তাহার দাদার দেওয়া ছোরাটা কোমরে গুঁজিয়া লইয়াছিল। ইহা যে সত্যই কোনো কাজে লাগিবে তাহা সে কল্পনা করে নাই; একটা সুদূর সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া অনাবশ্যক বুঝিয়াও লইয়াছিল। নিয়তির করাঙ্কচিহ্নিত ঐ ছোরা যে আজ নিয়তির ইঙ্গিতেই তাহার সঙ্গী হইয়াছে তাহা সে কি করিয়া জানিবে?

বস্ত্রাদি বর্জনপূর্বক প্রস্তুত হইয়া গৌরী অন্ধকারের মধ্যে ঠাহর করিয়া দেখিল, রুদ্র-রূপও ইতিমধ্যে গাত্রাবরণ খুলিয়া তাহারি মত কেবল জাঙিয়া পরিয়া দাঁড়াইয়াছে। গৌরী বিস্মিত হইয়া বলিল—'এ কি রুদ্ররূপ!'

রুদ্ররূপ বলিল—'আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।'

গৌরী কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিল। রুদ্ররূপ নিজ অভিপ্রায় পূর্বাহ্নে কিছুই প্রকাশ করে নাই। সে অল্পভাষী, তাই তাহার মনের কথা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বোঝা যায় না। গৌরীর প্রতি তাহার আনুরক্তি যে কতখানি তাহা অবশ্য গৌরী জানিত, কিন্তু এই বিপদ-সঙ্কুল যাত্রায় সে যে সহসা কোন কথা না বলিয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা গৌরী ভাবিতে পারে নাই; তাহার বুকে একটা অনির্দিষ্ট ভার চাপানো ছিল, তাহা যেন হঠাৎ হাল্কা হইয়া গেল। তবু সে বলিল—'কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে গেলে কি সুবিধে হবে—'

রুদ্ররূপ দৃঢ়স্বরে বলিল—'মহারাজ, আমাকে বারণ করবেন না। সুবিধা অসুবিধা জানি না, কিন্তু আজ আমি আপনার সঙ্গ ছাড়ব না।'

গৌরী তাহার পাশে গিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া একটু চাপ দিল, অস্ফুটস্বরে বলিল—'বেশ, চল। তোমাতে আমাতে যে-কাজে বেরিয়েছি তা কখনো নিষ্ফল হয়নি। কিন্তু তুমি ভাল সাঁতার জানো তো?'

'জানি মহারাজ।'

'বেশ। এস তাহলে।'

কিস্তার পরপারে অধিক্রম সিংয়ের বাগানবাড়িতে তখন সহস্র দীপ জ্বলিতেছে; মিঠা মৃদু শানায়ের আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণার আজ বিবাহ। রানী কস্তুরী ঐ দীপোজ্জ্বল ভবনের কোথাও আছেন, হয়তো তিনি আজিকার রাত্রে গৌরীর কথাই ভাবিতেছেন।—'তোহে ন বিসরিঁ দিন রাতি।' এদিকে শক্তিগড়ের কৃষ্ণমূর্তি কিস্তার বুকের উপর দুস্তর ব্যবধানের মত দাঁড়াইয়া আছে; তাহারই একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে একটিমাত্র আলোকের ক্ষীণ শিখা দেখা যাইতেছে। শঙ্কর সিং হয়তো ঐ কক্ষে বন্দী। আর ময়ূরবাহন? সে কোথায়? সে কি সত্যই বাঁচিয়া আছে?

ধনঞ্জয় তীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন; গৌরী ও রুদ্ররূপ সন্তর্পণে জলে নামিয়া নিঃশব্দে দুর্গের দিকে সাঁতার কাটিয়া চলিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পুরাতন বন্ধু

মিনিট দুই সজোরে হাত ছুঁড়িবার পর ঠাণ্ডা জল গা-সওয়া হইয়া গেলে গৌরী দেখিল, সাঁতার কাটিবার প্রয়োজন নাই, নদীর স্রোত তাহাদের সেই দীপান্বিত গবাক্ষের দিকেই টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। দুইজনে তখন কেবলমাত্র গা ভাসাইয়া স্রোতের টানে ভাসিয়া চলিল।

জল হইতে সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র আলোকবিন্দু ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না; চারিদিকে কেবল নক্ষত্রালোক খচিত মসীকৃষ্ণ জলরাশি। গৌরী ও রুদ্ররূপ যতই দুর্গের নিকটবর্তী হইতে লাগিল, জলের কল্লোলধ্বনি ততই বাড়িয়া চলিল; মগ্ন পাথরের সংঘাতে একটানা স্রোত ফুলিয়া ফাঁপিয়া এলোমেলোভাবে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। গৌরী দেখিল, তাহারা আর সিধা সেই গবাক্ষের দিকে যাইতেছে না, বাধাপ্রাপ্ত জলধারা তাহাদের ভিন্নমুখে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। গৌরী প্রাণপণে সাঁতার কাটিয়া নিজের গতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুক্ষণ চেষ্টা করিবার পর দেখিল বৃথা চেষ্টা, দুর্বার জলস্রোতে ইচ্ছামত চলা অসম্ভব। নিরুপায়ভাবেই দুইজনে ভাসিয়া চলিল।

ক্রমশ দুর্গের বিশাল ছায়ার তলে তাহারা আসিয়া পৌঁছিল। এখানে নক্ষত্রের ক্ষীণ দীপ্তিও অন্ধ হইয়া গিয়াছে—চোখের দৃষ্টি জমাট অন্ধকারের মধ্যে কোথাও আশ্রয় খুঁজিয়া পায় না। গবাক্ষের আলোটিও বামদিকের আলোড়িত তমিস্রায় কখন ডুবিয়া গিয়াছে। দুর্গের প্রাচীর আর কতদূরে তাহাও অনুমান করা অসম্ভব। গৌরীর ভয় হইতে লাগিল, এইবার বুঝি তাহারা সবেগে দুর্গের পাষাণগাত্রে গিয়া আছড়াইয়া পড়িবে। সে মৃদুস্বরে একবার রুদ্ররূপকে ডাকিল; রুদ্ররূপ তাহার দুইহাত অন্তরে তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল—ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল।

গৌরী বলিল—'হুঁশিয়ার! সামনেই দুর্গ, জখম হয়ো না।'

রুদ্ররূপ বলিল—'না। আপনি সাবধান।'

অন্ধকারে গৌরী হাসিল। দুইজনেই দুইজনকে সাবধান করিয়া দিল বটে কিন্তু সত্যই দুর্গের গায়ে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইলে কি ভাবে আত্মরক্ষা করিবে কেহই ভাবিয়া পাইল না। বিক্ষুব্ধ জলরাশির বুকে তৃণখণ্ড! তাহাদের ইচ্ছার শক্তি কতটুকু?

গৌরীর মনে হইল, আজিকার এই নিঃসহায়ভাবে ভাসিয়া-চলা তাহার জীবনের একটা বৃহত্তর সত্যের প্রতীক। দৈবী খেয়ালের দুর্নিবার টানে সে তো অনেকদিন হইতেই

ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া চলিয়াছে। পাষাণ প্রাকারে নিক্ষিপ্ত হইয়া এতদিন চূর্ণ হইয়া যায় নাই কেন, ইহাই আশ্চর্য। কে জানে, হয়তো আজিকার জন্যই নিয়তি অপেক্ষা করিয়া ছিল—তাহার লক্ষ্যহীন ভাসিয়া-চলাকে পরিসমাপ্তির উপকূলে পৌঁছাইয়া দিবে। কিন্তু কোথায় সে উপকূল? বৈতরণীর এপারে, না ওপারে?

একটা প্রকাণ্ড ঢেউ এই সময় গৌরীকে বিপর্যস্ত নিমজ্জিত করিয়া তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেল। ক্ষণেকের জন্য একটা মগ্ন পাথরের পিচ্ছিল অঙ্গ তাহাকে স্পর্শ করিল; তারপর জলের উপর মাথা জাগাইয়া সে দেখিল—স্রোতের এলোমেলো গতি আর নাই, অপেক্ষাকৃত শান্ত জলের মন্থর একটা ঘূর্ণির মধ্যে সে ধীরে ধীরে পাক খাইতেছে। সম্ভবত জলমগ্ন পাথরগুলা এইখানে এমন একটা সুদৃঢ় প্রাচীর রচনা করিয়াছে যাহাতে স্রোতের প্রবল গতি ব্যাহত হইয়া যায়; ঐ বড় ঢেউটা গৌরীকে সেই মজ্জিত প্রাচীরের পরপারে আনিয়া দিল। ঘূর্ণির চক্রে আবর্তমান তাহার দেহটা দুর্গের দেয়ালে গিয়া ঠেকিল।

এখানেও ডুব জল, মসৃণ দুর্গ-গাত্রে কোথাও অবলম্বন নাই; তবু এই শৈবাল-পিচ্ছিল দেয়ালে হাত রাখিয়া গৌরীর মনে হইল, সে একটা আশ্রয় পাইয়াছে। ক্ষণকাল জিরাইয়া লইয়া সে মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—'রুদ্ররূপ, কোথায় তুমি?'

রুদ্ররূপ জবাব দিল—'এই যে, দেয়ালে এসে ঠেকেছি! আপনি?'

'আমিও। এস, বাঁ দিকে জানালাটা আছে, সেইদিকে যাওয়া যাক। দেয়াল ধরে ধরে এস।'

'আচ্ছা।'

তখন পৃথিবীর আদিম পঙ্ক-শয্যার উপর অন্ধ মহীলতার মত দুইজনে কেবল স্পর্শানুভূতির সাহায্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। দশ মিনিট, পনের মিনিট এমনি ভাবে কাটিয়া গেল; কিন্তু জানালার দেখা নাই। গৌরীর আশঙ্কা হইল হয়তো তাহারা কখন অজ্ঞাতে জানালার নীচে দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, জানিতে পারে নাই।

সে পিছু ফিরিয়া রুদ্ররূপকে সম্বোধন করিতে যাইতেছিল, এমন সময় ঠিক মাথার উপর একটা অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল; তাহার অনুচ্চারিত স্বর কণ্ঠের মধ্যেই রুদ্ধ হইয়া গেল। সে ঘাড় তুলিয়া দেখিল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। জানালার আলো দূর হইতে দেখা যায়, কিন্তু নীচে হইতে তাহা অদৃশ্য। গৌরী ঊর্ধ্বে হাত বাড়াইয়া অনুভব করিয়া দেখিতে লাগিল; জানালার কিনারা হাতে ঠেকিল—জল হইতে দুই-আড়াই হাত মাত্র ঊর্ধ্বে।

আবার জানালার ভিতর হইতে পরিচিত কণ্ঠস্বর আসিল—'বেইমান, তুই তবে আমাকে মেরে ফ্যাল্, আমি বেঁচে থাকতে চাই না।'

গৌরী নিজের গলার স্বর চিনিতে পারিল; কোথাও এতটুকু তফাৎ নাই। তাহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন আনচান করিয়া উঠিল; মনে হইল সে নিজেই ঐ কারাকূপে আবদ্ধ হইয়া মৃত্যু কামনা করিতেছে।

এবার দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর শুনা গেল; কশাইয়ের ছুরির মত তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর কোমলতার বাষ্প পর্যন্ত কোথাও নাই—'ব্যস্ত হ'য়ো না; দরকার হয়নি বলেই এতদিন মারিনি, তোমার প্রতি মমতাবশত নয়। কিন্তু আর দেরি নেই, আজই যাহোক একটা হবে।'

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। তারপর আবার শঙ্কর সিং কথা কহিল। এবার তাহার স্বর অত্যন্ত কাতর, মিনতি-বিগলিত—'উদিত, আমার প্রতি কি তোমার এতটুকু দয়া হয় না? আমায় ছেড়ে দাও ভাই। আমি রাজ্য চাই না, আমায় শুধু ছেড়ে দাও—'

'আর তা হয় না। তোমার বন্ধু ধনঞ্জয় সর্দার সব মাটি করে দিয়েছে।'

'কিন্তু আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করিনি। আমি তো তোমাকে সিংহাসন ছেড়ে দিচ্ছি।'

'এখন তোমার সিংহাসন ছাড়া না-ছাড়া সমান। ঝিন্দের গদীতে একটা বাঙালী কুত্তা বসে সর্দারি করছে। শয়তানের বাচ্চা মরেও মরে না। সে যদি মরত তাহলে তোমার ফুরসৎ হয়ে যেত। যাক, আজকের কাজে যদি সিদ্ধ হই তখন তোমার কথা ভেবে দেখব। এখন

ঘুমোও।'

গৌরী গবাক্ষের কানায় আঙুল রাখিয়া বাহুর সাহায্যে ধীরে ধীরে নিজেকে তুলিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিল। পাথর কুঁদিয়া বাহির করা অপরিসর একটি প্রকোষ্ঠ—মোমবাতির আলোয় অল্পমাত্র আলোকিত। গবাক্ষের ঠিক বিপরীত দিকে লোহার ভারি দরজা বন্ধ রহিয়াছে। দেয়ালে সংলগ্ন একটা লম্বা বেদীর মত আসন, বোধ হয় ইহাই বন্দীর শয্যা। এই বেদীর উপর গালে হাত দিয়া উদিত বসিয়া আছে, তাহার কোলের উপর একটা খোলা তলোয়ার। আর উদিতের অদূরে দাঁড়াইয়া তাহার পানে করুণনেত্রে চাহিয়া আছে—শঙ্কর সিং। পরিধানে কেবল একটি হাফ্-প্যান্ট, ঊর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত, কয়েদীর সাজ। তাহার মুখে দুর্দশা ও দৈহিক গ্লানির ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। চোখের কোণ হইতে গভীর কালির আঁচড় ক্ষতরেখার মত গণ্ডের মাঝখান পর্যন্ত পোঁছিয়াছে; অধরোষ্ঠের দুই প্রান্ত নত হইয়া ক্লিষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে; বাহু ও কণ্ঠের পেশী ঈষৎ শীর্ণ। তবু, অবস্থার নিদারুণ প্রভেদ সত্ত্বেও, গৌরীর সহিত তাহার সর্বাঙ্গীণ সাদৃশ্য অদ্ভুত। গৌরী সম্মোহিতের মত শঙ্কর সিংয়ের পানে তাকাইয়া রহিল।

উদিত ভ্রূকুটি করিয়া চিন্তা করিতেছিল, শঙ্কর সিংয়ের দীর্ঘশ্বাস মিশ্রিত হাস্য শুনিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। শঙ্কর সিং স্খলিতস্বরে বলিল—ঘুম! ঘুম আমার আসে না।'

'ঘুম না আসে—মদ খাও।' বিরক্ত তাচ্ছিল্যভরে ঘরের কোণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া উদিত উঠিয়া দাঁড়াইল। বন্ধ কক্ষে বাতাসের অভাব বোধ হয় তাহাকে পীড়া দিতেছিল, সে জানালার দিকে অগ্রসর হইল।

গৌরী নিঃশব্দে নিজেকে জলের মধ্যে নামাইয়া দিয়া জানালা ছাড়িয়া দিল। আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়, হাতড়াইতে হাতড়াইতে সে ফিরিয়া চলিল।

রুদ্ররূপের গায়ে তাহার হাত ঠেকিল। তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া সে বলিল—'ফিরে চল।'

জানালা হইতে পঁচিশ গজ গিয়া তাহারা থামিল।

রুদ্ররূপ জিজ্ঞাসা করিল—'কি দেখলেন?'

গৌরী বলিল—'শঙ্কর সিং আর উদিত। উদিত পাহারা দিচ্ছে।' কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'আজ রাত্রেই ওরা একটা কিছু করবে।'

'কি করবে?'

'জানি না। হয়তো—'

গতরাত্রে ময়ূরবাহনের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের কথা তাহার স্মরণ হইল। কি করিতে চায় উহারা? কোন্ দিক দিয়া আক্রমণ করিবে? কস্তুরীর বিরুদ্ধে কি কোনও মতলব আঁটিতেছে? কিন্তু তাহাতে উহাদের লাভ কি? তাহাতে ঝিন্দের সিংহাসন তো সুলভ হইবে না।

কিস্তার দক্ষিণ কূলে কৃষ্ণার বিবাহোৎসবের দীপগুলি এক ঝাঁক খদ্যোতের মত মিটমিট করিতেছে; দক্ষিণ কূল অন্ধকার। গৌরী ভাবিল—আর এখানে থাকিয়া লাভ নাই, শঙ্কর সিংয়ের সহিত কথা কহিবার সুযোগ হইবে না; স্বয়ং উদিত তাহাকে পাহারা দিতেছে। সম্ভবত উদিত আর ময়ূরবাহন পালা করিয়া পাহারা দিয়া থাকে। দুর্গে অন্য যাহারা আছে, তাহারা হয়তো বন্দীর পরিচয় জানে না; কিম্বা জানিলেও উদিত তাহাদের বিশ্বাস করিয়া রাজার পাহারায় রাখে না। দুর্গে আর কাহারা আছে? দুই-চারি জন অনুগত ভৃত্য, আর দুই-চারি জন রাজদ্রোহী বন্ধু! আশ্চর্য! এই মুষ্টিমেয় লোক লইয়া উদিত একটা রাজ্যের সমস্ত শক্তিকে তাচ্ছিল্যভরে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে।

এই সব অফলপ্রসূ চিন্তা ত্যাগ করিয়া গৌরী ফিরিবার উপক্রম করিতেছে, হঠাৎ নিকটেই জাঁতা ঘোরানোর মত গড় গড় শব্দে সে থামিয়া গেল। পরক্ষণেই একটা ভৌতিক হাসির শব্দ যেন দুর্গের পাথর ভেদ করিয়া তাহার কানে ভাসিয়া আসিল; গৌরীর সর্বাঙ্গের স্নায়ু-পেশী সহসা শক্ত হইয়া উঠিল।

ময়ূরবাহনের হাসি! তবে সে মরে নাই!

কিন্তু হাসির শব্দটা আসিল কোথা হইতে?

সতর্কভাবে একবার এদিক ওদিক চাহিতেই গৌরী ক্ষিপ্রহস্তে রুদ্ররূপকে টানিয়া দুর্গের দেয়ালের গায়ে একেবারে সাঁটিয়া গেল। মাত্র পাঁচ-ছয় হাত দক্ষিণে দুর্গের গাত্রে পীতবর্ণ আলোকের একটি চতুষ্কোণ দেখা দিয়াছে।

জাঁতার মত গড় গড় শব্দ করিয়া এই চতুষ্কোণ প্রস্থে বাড়িতে লাগিল। প্রায় আট ফুট উচ্চ ও ছয় ফুট চওড়া একটি দ্বার ধীরে ধীরে কর্কশ অসমতল দেয়ালে আত্মপ্রকাশ করিল।

গুপ্তদ্বার! এই পথেই গতরাত্রে ময়ূরবাহন দুর্গে ফিরিয়াছিল! গৌরী ও রুদ্ররূপ নিশ্বাস রোধ করিয়া দেখিতে লাগিল।

কয়েকজন লোকের অস্পষ্ট কথার শব্দ গুপ্তদ্বারের অভ্যন্তর হইতে ভাসিয়া আসিল। যেন তাহারা একটা ভারী জিনিস বহন করিয়া আনিতেছে। ক্রমে একটি ক্ষুদ্র ডিঙির অগ্রভাগ দ্বারমুখে বাহির হইয়া আসিল।

'আস্তে! হুঁশিয়ার!' ময়ূরবাহনের গলা।

নৌকা ছপাৎ করিয়া জলে পড়িল। ময়ূরবাহন দাঁড় ধরিয়া ছিল, টানিয়া নৌকা দ্বারের মুখে লইয়া আসিল।

'স্বরূপদাস, তুমি মোটা মানুষ, আগে নৌকায় নামো।'—একজন স্থূলকায় লোক সন্তর্পণে নৌকায় নামিল—'দাঁড় ধর।'

'এবার তুমি।' আর একজন নৌকায় নামিল।

তখন দাঁড় নৌকার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ময়ূরবাহন লঘুপদে নৌকায় লাফাইয়া পড়িল। নৌকা টলমল করিয়া উঠিল; ময়ূরবাহন হাসিল—সেই বিজয়ী বেপরোয়া হাসি। গুপ্তদ্বারের দিকে ফিরিয়া বলিল—'দরজা খোলা থাক, আর তুমি লণ্ঠন নিয়ে এইখানে বসে থাকো—নইলে ফেরবার সময় দরজা খুঁজে পাব না। কখন ফিরব ঠিক নেই, হয়তো রাত কাবার হয়ে যেতে পারে। হুঁশিয়ার থেকো।'

দ্বারের ভিতর হইতে উত্তর আসিল—'যো হুকুম।'

ময়ূরবাহন বলিল—'দাঁড় চালাও।'

ক্ষুদ্র তরী তিনজন আরোহী লইয়া পলকের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। গৌরী চক্ষের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল—নৌকাটা কোন্ দিকে যাইতেছে, কিন্তু কিছুই নির্ধারণ করিতে পারিল না। আকাশ ও জলের ঘন তমিস্রার মধ্যে নৌকা যেন মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

পাঁচ মিনিট নিঃশব্দে কাটিল।

তারপর গৌরী রুদ্ররূপের মাথাটা নিজের মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া চুপি চুপি বলিল—'রুদ্ররূপ, তুমি তাঁবুতে ফিরে যাও।'

রুদ্ররূপ সচকিত বলিল—'আর আপনি?'

'আমি এই পথে দুর্গে ঢুকব।'

'কিন্তু—'

গৌরী সাঁড়াশির মত আঙুল দিয়া রুদ্ররূপের কাঁধ চাপিয়া ধরিয়া বলিল—'আমার হুকুম, দ্বিরুক্তি কোরো না। এমন সুযোগ আর আসবে না। তুমি তাঁবুতে ফিরে গেলে ধনঞ্জয় আর বিশ জন সিপাহী নিয়ে দুর্গের পুলের মুখে লুকিয়ে থাকবে। আমি দুর্গের ভিতর ঢুকছি, যেমন করে পারি দুর্গের সিংদরজা খুলে দেব। বুঝেছ?'

'বুঝেছি।' রুদ্ররূপের স্বর আজ্ঞাবাহী সৈনিকের মত ভাবহীন।

'গুপ্তদ্বারে একটা মাত্র লোক আছে, সে আমাকে আটকাতে পারবে না। তারপর দুর্গের ভিতরকার অবস্থা বুঝে যেমন হয় করব। উদিত রাজাকে পাহারা দিচ্ছে, ময়ূরবাহন নেই—দুর্গে হয়তো কয়েকজন চাকর-বাকর মাত্র আছে। এই সুযোগ। ময়ূরবাহন ফেরবার আগেই কার্যোদ্ধার করতে হবে। তুমি যাও, আর দেরি কোরো না।'

'যো হুকুম'—রুদ্ররূপ সাঁতার দিবার উপক্রম করিল।

গৌরী আস্তে আস্তে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—'স্রোত ঠেলে যেতে পারবে না, বরং স্রোতে গা ভাসিয়ে দাও—দুর্গ পেরিয়ে কিনারায় উঠতে পারবে।'

রুদ্ররূপ নিঃশব্দে চলিয়া গেল। এতক্ষণ দিক্‌ব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে তবু একজন অদৃশ্য সহচর ছিল, এখন সে-ও গেল। গৌরী একা!

ছোরাটা সে কোমর হইতে হাতে লইল। তারপর অতি সাবধানে গুপ্তদ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

জল হইতে এক হাত উচ্চে গুপ্তদ্বার। গৌরী কোণ হইতে সরীসৃপের মত মাথা তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টি প্রেরণ করিল। সম্মুখেই একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে, তাহার ওপারে কি আছে দেখা যায় না। ক্রমে দৃষ্টি অভ্যস্ত হইলে গৌরী দেখিল—সুড়ঙ্গের মত গুপ্তদ্বার ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে—অস্পষ্ট অন্ধকার; হয়তো অপর প্রান্তে দুর্গের উপরে উঠিবার সোপান আছে।

চক্ষু আলোকে আরও অভ্যস্ত হইলে গৌরী দেখিতে পাইল, লণ্ঠনের দুই-তিন হাত পিছনে একটা লোক দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া আছে। তাহার মুখ দেখা যাইতেছে না, একটা হাত কপালের উপর ন্যস্ত; বোধ হয় একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছে, কিম্বা তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে আর কেহ নাই।

গৌরী একবার চক্ষু মুদিয়া নিজেকে সুস্থ ও সংযত করিয়া লইল। তারপর দ্বারের কানায় ভর দিয়া জল হইতে উঠিয়া সিক্তদেহে দ্বারমুখে দাঁড়াইল।

উপবিষ্ট লোকটা অব্যক্ত শব্দ করিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গৌরী ছোরা তুলিয়া এক লাফে তাহার সম্মুখীন হইল।

'মহারাজ!'

গৌরীর উদ্যত ছোরা অর্ধপথে রুখিয়া গেল। কণ্ঠস্বর পরিচিত।

গৌরী লণ্ঠনের আলোকে লোকটার ত্রাসবিস্ময়-বিকৃত মুখের পানে চাহিল। মুখখানা চেনা-চেনা। কোথায় তাহাকে দেখিয়াছে?

তারপর সহসা স্মৃতির দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। গৌরীর হাতের ছোরা মাটিতে পড়িয়া গেল। সে বিপুল আবেগে তাহাকে দুই হাতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল—'প্রহ্লাদ!'

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কাল রাত্রি

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছিল।

কৃষ্ণার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কস্তুরী শ্রান্তদেহে দ্বিতলে নিজের শয্যাকক্ষে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ঘরে তৈলের বাতি জ্বলিতেছে, তাহার স্নিগ্ধ আলোকে কস্তুরী একবার চারিদিকে চাহিল। বহুমূল্য আভরণে সজ্জিত কক্ষ, মধ্যস্থলে একটি মখমলে মোড়া পালঙ্ক। নিশ্বাস ফেলিয়া কস্তুরী ভাবিল, আর কৃষ্ণা তাহার শয়নসঙ্গিনী হইবে না।

ক্লান্তিতে শরীর ভরিয়া গিয়াছে, তবু শয্যা আশ্রয় করিতে মন চাহিল না। কস্তুরী ধীরে ধীরে জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। আজ কৃষ্ণার বিবাহের প্রত্যেকটি ঘটনা তাহার মনকে আন্দোলিত করিয়াছে; সে আন্দোলন এখনো থামে নাই।

জানালার বাহিরে হৈমন্তী রাত্রির দেহও যেন ধীরে ধীরে হিম হইয়া আসিতেছে। উদ্যানে দুই-চারিটা আলো দূরে দূরে জ্বলিতেছে; গাছের শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়া একটা অপরিস্ফুট প্রভা অন্ধকারকে তরল করিয়া দিয়াছে। উদ্যানের পরেই দ্রুতবহমানা কিস্তা; ক্লান্তি নাই, সুপ্তি নাই, অধীর আগ্রহে প্রপাতের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

কস্তুরী কিস্তার পরপারে অগাধ অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিল। ঐখানে কোথাও এক তাঁবুর মধ্যে তিনি ঘুমাইতেছেন! কেন তিনি একবার আসিলেন না? আসিলে কাজের খুব বেশী ক্ষতি হইত কি?

আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কস্তুরী ঘরের দিকে ফিরিতেছিল, জানালার নীচে একটা শব্দ শুনিয়া চকিতে নীচের দিকে তাকাইল। যেন চাপা গলায় কে কথা কহিল।

নীচে অন্ধকার; মনে হইল একটা লোক সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পাগড়ির জরীর উপর ক্ষণেকের জন্য আলো প্রতিফলিত হইল।

'রানীজী!'

কণ্ঠস্বর অতি নিম্ন, কিন্তু সম্বোধনটা স্পষ্ট কস্তুরীর কানে আসিল। সে গলা বাড়াইয়া বিস্মিতস্বরে বলিল—'কে?'

নীচ হইতে উত্তর আসিল—'আমি রুদ্ররূপ।'

রুদ্ররূপ! কস্তুরীর মনে পড়িল, কৃষ্ণার মুখে শুনিয়াছে, রুদ্ররূপ মহারাজের পার্শ্বচর। 'কি চাও?' তাহার গলা একটু কাঁপিয়া গেল।

পূর্ব্ববৎ চাপা গলায় আওয়াজ আসিল—'রানীজী, মহারাজ এসেছেন, ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন—আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।'

কস্তুরী জানালা হইতে একটু সরিয়া গিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি আসিয়াছেন! কিন্তু এই শেষ রাত্রে কেন? নির্জ্জনে দেখা করিতে চান বলিয়াই কি আজ বিবাহ-বাসরে আসেন নাই?

সে আবার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইল।

পুনশ্চ স্বর শুনিতে পাইল—'রানীজী, দোষ নেবেন না। মহারাজ আপনার সঙ্গে দেখা করেই চলে যাবেন। বড় জরুরী ব্যাপারে তাঁকে কালই চলে যেতে হবে, তাই একবার—'

কিছুক্ষণ নীরব। তারপর—

'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। তুমি দাঁড়াও।' কস্তুরীর কথাগুলি শিউলি ফুলের মত অন্ধকারে ঝরিয়া পড়িল।

ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সে একবার ভাবিল, কাহাকেও সঙ্গে লইবে? কিন্তু কৃষ্ণা ছাড়া আর তো কাহাকেও সঙ্গে লওয়া যায় না। অথচ কৃষ্ণাকে এখন ডাকা সম্ভব নয়—

কিন্তু প্রয়োজন কি? সে একাই যাইবে।

ওড়না গায়ে জড়াইয়া সে নিঃশব্দে দ্বার খুলিল। কেহ কোথাও নাই; বৃহৎ প্রাসাদের অপরাংশে সকলে তখনও আমোদে মগ্ন। যে-কয়জন দাসী রানীর পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল, রানী শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবার পর তাহারাও চলিয়া গিয়াছে। লঘু পদে কস্তুরী নীচে নামিয়া গেল।

সেই লোকটি জানালার নীচে অপেক্ষা করিতেছিল, একবার ভাল করিয়া তাহাকে দেখিয়া লইয়া আভূমি অবনত হইয়া অভিবাদন করিল। কস্তুরীও তাহার মুখ অস্পষ্ট দেখিতে পাইল। এই রুদ্ররূপ! সে রুদ্ররূপকে পূর্বে দেখে নাই।

পুরুষ সসম্মানে কহিল—'এইদিকে রানীজী, এইদিকে—'

তাহার অনুসরণ করিয়া কম্প্রবক্ষে কস্তুরী ঘাটের দিকে চলিল।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে।

গৌরী আর প্রহ্লাদ মুখোমুখি বসিয়া, তাহাদের মধ্যস্থলে লণ্ঠন। গৌরী স্থিরভাবে বসিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহার নিষ্কম্প দেহটা দেখিয়া মনে হইতেছে যেন একটা অনলস্তম্ভ নির্ধূম শিখায় জ্বলিতেছে—যে-কোনো মুহূর্তে বারুদের স্তূপের মত প্রচণ্ড উন্মত্ততায় বিস্ফুরিত হইয়া চারিদিকে দাবানল ছড়াইয়া দিবে।

কস্তুরী! এই নরকের ক্লেদাক্ত সরীসৃপগুলো কস্তুরীকে বলপূর্বক হরণ করিয়া আনিবার অভিসন্ধি করিয়াছে। প্রহ্লাদের মুখে এই কথা শুনিবার পর ইহাদের গগনস্পর্শী ধৃষ্টতা গৌরীর মনটাকে ক্ষণকালের জন্য অসাড় করিয়া দিয়াছিল; প্রথমটা সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কিন্তু সত্যই ইহা তো অসম্ভব নয়। উদিত মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে। ভাইকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া যে সিংহাসন গ্রাস করিবার চেষ্টা করে, তাহার অসাধ্য কি আছে? ঝিন্দের সিংহাসন পাইবার আশা হারাইয়া সে অবশেষে ঝড়োয়ার সিংহাসন দখল করিবার জন্য এই ক্রুর মতলব বাহির করিয়াছে। কস্তুরীকে বলপূর্বক বিবাহ করিবে; হিন্দুর বিবাহ, একবার সম্পাদিত হইলে আর নড়চড় হয় না—তখন ঝড়োয়া রাজ্যের উপর উদিতের দাবী কে অস্বীকার করিবে? Factum Valet...কি নৃশংস স্বার্থপরতা! কি পৈশাচিক ক্রুর-বুদ্ধি! এই ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত ময়ূরবাহন তাহাকে দিয়াছিল।

প্রহ্লাদ কুণ্ঠিতস্বরে মৌনভঙ্গ করিল—'ময়ূরবাহনের ফিরতে এখনো বোধ হয় দেরি আছে। ইতিমধ্যে রাজাকে—'

গৌরী অগ্নিগর্ভ চোখ তুলিল; কথা কহিল না। প্রহ্লাদ দেখিল, চোখের মধ্যে সর্বগ্রাসী একটি চিন্তাই প্রতিফলিত হইতেছে। রাজার স্থান সেখানে নাই, বোধ করি জগতের আর কিছুরই স্থান নাই।

প্রহ্লাদ একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিল—'ওদিকে দুর্গের সামনে আপনার সিপাহীরা এতক্ষণ নিশ্চয় পৌঁছে গেছে—দুর্গের সিংদরজা খুলে দেবার চেষ্টা করলে হত না? দু'জন শান্ত্রী পাহারায় আছে, আমি তাদের ভুলিয়ে ওখান থেকে সরিয়ে দিতে পারি। আপনার লোকেরা একবার ঢুকে পড়লে—'

'না, ওসব পরে হবে।'

আবার দীর্ঘকাল উভয়ে নীরব। লণ্ঠনের আলোক-শিখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে; রাত্রিশেষের শীতল বাতাস জোরে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সহসা প্রহ্লাদ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল; চাপা উত্তেজনায় বলিল—'ওরা আসছে—দাঁড়ের শব্দ পেয়েছি। আপনি এখন আলোর কাছ থেকে সরে যান। যেমন যেমন ঠিক হয়েছে তেমনি করবেন, যথাসময়ে আমি সংকেত করব—'

গৌরীও চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভূপতিত ছোরাটা তাহার পায়ে ঠেকিল, সেটা ক্ষিপ্রহস্তে তুলিয়া লইয়া সে সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরের দিকে অন্ধকারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

প্রহ্লাদ লণ্ঠন লইয়া গুপ্তদ্বারের মুখের কাছে দাঁড়াইল।

দাঁড়ের মৃদু ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ, তারপর ময়ূরবাহনের হাসি শোনা গেল। নৌকার মুখ আসিয়া দ্বারের নীচে ঠেকিল।

'প্রহ্লাদ, দড়িটা ধর।'

ময়ূরবাহন লাফাইয়া প্রহ্লাদের পাশে দাঁড়াইল, নৌকার দিকে ফিরিয়া বলিল—'এইবার রানীজীকে তুলে দাও। হুঁশিয়ার স্বরূপদাস, সব সুদ্ধ জলে পড়ে যেও না। আস্তে রানীজী—চঞ্চল হবেন না, কোনো ভয় নেই, আমরা আপনার অনুগত ভৃত্য—হা হা হা—'

ওড়না দিয়া মুখ ও সর্বাঙ্গ দড়ির মত করিয়া বাঁধা একটি বিদ্রোহী নারীমূর্তি ধরাধরি করিয়া নৌকা হইতে নামানো হইল। প্রহ্লাদ ও ময়ূরবাহন দেহটিকে সুড়ঙ্গের মধ্যে আনিয়া একপাশে শোয়াইয়া দিল। তারপর ময়ূরবাহন জলের দিকে ফিরিয়া বলিল—'স্বরূপদাস, এবার তোমরা নেমে এস। ডিঙি ভেতরে তুলতে হবে।'

স্বরূপদাস নৌকা হইতে কাতরস্বরে বলিল—'দাঁড় দুটো জলে পড়ে গিয়ে কোথায় ভেসে গেছে খুঁজে পাচ্ছি না।'

ময়ূরবাহন হাসিয়া উঠিয়া বলিল—'তা যাক; আপাতত আর দাঁড়ের দরকার নেই। —প্রহ্লাদ, তুমি আর আমি এবার রানীজীকে—'

তাহার কথা শেষ হইতে পাইল না। অকস্মাৎ পূর্ব-নিরূপিত সমস্ত সঙ্কল্প উপেক্ষা করিয়া প্রহ্লাদের সঙ্কেতের অপেক্ষা না করিয়াই দুরন্ত ঝড়ের মত গৌরী অন্ধকারের ভিতর হইতে তাহাদের মাঝখানে আসিয়া পড়িল। কস্তুরীর ঠিক পাশে প্রহ্লাদ দাঁড়াইয়া ছিল, গৌরীর প্রথম ধাক্কাটা তাহাকেই গিয়া লাগিল। প্রহ্লাদ টাউরি খাইয়া ময়ূরবাহনের গায়ে পড়িল। ময়ূরবাহন আচম্‌কা ঠেলা খাইয়া ঘুরপাক খাইতে খাইতে লণ্ঠনটা ডিঙাইয়া জলের কিনারা পর্যন্ত গিয়া কোনোমতে নিজেকে সামলাইয়া লইল। তারপর ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে ফিরিয়াই নিমেষমধ্যে যেন পাথরে পরিণত হইয়া গেল।

দৃশ্যটা নাটকীয় বটে। মেঝের উপর পীতাভ লণ্ঠন জ্বলিতেছে; তাহার অনতিদূরে প্রহ্লাদ ভূমি হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিয়া নতজানু অবস্থাতেই ময়ূরবাহনের দিকে নিষ্পলক তাকাইয়া আছে; আর তাহার পশ্চাতে ভূলুণ্ঠিত নারী দেহের দুইদিকে পা রাখিয়া একটা দীর্ঘকায় দৈত্য দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দুই চক্ষে জ্বলন্ত অঙ্গার, হাতে একটা ঝকঝকে বাঁকা ছোরা।

ময়ূরবাহনের চক্ষু ক্রমশ কুঞ্চিত হইয়া আলোকের দুইটি বিন্দুতে পরিণত হইল। তারপর সে হাসিল; কোমর হইতে বিদ্যুদ্বেগে অসি বাহির হইয়া আসিল—

'আরে! বাংগালী নটুয়া! তুই এখানে?'

ময়ূরবাহনের হাসিতে পৈশাচিক উল্লাস ফুটিয়া উঠিল। সে তরবারি হস্তে একপদ অগ্রসর হইল।

'বাঘের গুহায় গলা বাড়িয়েছিস! হা হা হা—বাংগালী নটুয়া! আজ তোকে কে রক্ষা করবে?'

প্রহ্লাদ ভয়ার্ত চোখে তাহার দীর্ঘ তরবারির দিকে চাহিয়া রহিল। গৌরীর হাতে কেবল ছোরা, অন্য অস্ত্র নাই।

পিছন হইতে স্বরূপদাসের করুণ স্বর আসিল—'দাঁড় ছেড়ে দিলেন কেন? নৌকা যে ভেসে যাচ্ছে—'

কেহ কর্ণপাত করিল না; ময়ূরবাহন গৌরীর দিকে আর এক পদ অগ্রসর হইল।

প্রহ্লাদ সহসা নতজানু অবস্থা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—'মহারাজ, পালান—'

ময়ূরবাহনের সাপের মত চোখ প্রহ্লাদের দিকে ফিরিল—'তুই বেইমানি করেছিস! তোকেই আগে শেষ করি।'

প্রহ্লাদ তখনও ময়ূরবাহনের তরবারির নাগালের মধ্যে ছিল না, ময়ূরবাহন আর এক পা

আগে আসিয়া তরবারি তুলিল।

প্রহ্লাদের কানের পাশ দিয়া শাঁই করিয়া একটা শব্দ হইল; একটা আলোর রেখা যেন তাহার পিছন হইতে ছুটিয়া গিয়া ময়ূরবাহনের পঞ্জরের নীচে গাঁথিয়া গেল।

ডান হাতে উত্থিত তরবারি, ময়ূরবাহন নিশ্চলভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার অধরের রক্তিম হাসি ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে হইয়া গেল। তারপর উত্থিত তরবারিটা ঝন্ ঝন্ শব্দে পাথরের মেঝেয় পড়িল।

ময়ূরবাহন কিন্তু পড়িল না। একটা অর্ধচক্রাকৃতি পাক খাইয়া সে নিজেকে খাড়া করিয়া রাখিল। আমূলবিদ্ধ ছোরার মুঠ ধরিয়া সেটাকে নিজের দেহ হইতে টানিয়া বাহির করিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিল। তাহার মুখ বুকের উপর নত হইয়া পড়িল, চোখে কাচের মত একটা দৃষ্টিহীন স্বচ্ছতার আবরণ পড়িয়া গেল। স্খলিত পদে গুহ্যদ্বারের কিনারা পর্যন্ত গিয়া যেন অসীম বলে সে নিজেকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; মাতালের মত দুইবার টলিয়া হঠাৎ কাৎ হইয়া জলের মধ্যে পড়িয়া গেল।

প্রহ্লাদ এতক্ষণ জড়ের মত অনড় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এখন সচেতন হইয়া ব্যগ্র বিস্ফারিত নেত্রে গৌরীর পানে তাকাইল। গৌরী তেমনি দাঁড়াইয়া আছে, শুধু তাহার হাতে ছোরা নাই।

প্রহ্লাদ ছুটিয়া জলের কিনারায় গিয়া উঁকি মারিল। ময়ূরবাহনের দেহ সেখানে নাই—হয়তো ডুবিয়া গিয়াছে। দাঁড়হীন নৌকাও দুইজন আরোহী লইয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। স্থূলকায় স্টেশনমাস্টার স্বরূপদাস সাঁতার জানে না—অন্য লোকটাও—

'প্রহ্লাদ, আলো নাও—পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে চল।'

প্রহ্লাদ ফিরিয়া দেখিল, গৌরী কস্তুরীকে দুই হাতে বুকের কাছে তুলিয়া লইয়াছে।

রাত্রি শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই।

দুর্গের উপরিভাগে একটি কক্ষ। বোধ হয় অস্ত্রাগার; চারিদিকের দেয়ালে সেকালের প্রাচীন অস্ত্র—ঢাল, তলোয়ার, বল্লম ইত্যাদি সজ্জিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঘরটি নিরাভরণ।

এই ঘরের দ্বারের কাছে সেই লণ্ঠন আলো বিকীর্ণ করিতেছে; আর, ঘরের মধ্যস্থলে গৌরী ও কস্তুরী দাঁড়াইয়া আছে।

আলোর পীতাভ অস্পষ্টতায় দুইজনকে পৃথকভাবে দেখা যাইতেছে না। কস্তুরীর দুই বাহু গৌরীর কণ্ঠে দৃঢ়বদ্ধ, মুখখানি ক্লান্ত মুদিত কুমুদের মত তাহার নগ্ন বক্ষে নামিয়া পড়িয়াছে। গৌরীর বাহুও এমনভাবে কস্তুরীকে বেষ্টন করিয়া আছে যেন সে-বন্ধন ইহ-জীবনে আর খুলিবে না।

দুইজনেই নীরব; কেবল গৌরী মাঝে মাঝে অস্পষ্ট ক্ষুধিত স্বরে বলিতেছে—'কস্তুরী-কস্তুরী-কস্তুরী—'

কস্তুরী সাড়া দিতেছে না। সে কি মূর্ছিতা? অথবা নিজের দুরবগাহ অনুভূতির অতলে ডুবিয়া গিয়াছে।

'রানী!' গৌরী তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ডাকিল।

এবার কস্তুরী চোখ খুলিল। ধীরে ধীরে গৌরীর মুখের কাছে মুখ তুলিয়া ধরা-ধরা অস্ফুট স্বরে বলিল—'রাজা!'

গৌরী মর্মছেঁড়া হাসি হাসিল—'রাজা নয়। সব তো বলেছি কস্তুরী, আমি নগণ্য বিদেশী। এবার ছেড়ে দাও, কর্তব্য শেষ করে চলে যাই।'

কস্তুরীর হাত দুইটি ক্রমশ শিথিল হইয়া গৌরীর কণ্ঠ হইতে খসিয়া পড়িল। সে একটু সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তেমনি ধীর অচঞ্চল স্বরে বলিল—'চলে যাবে?'

'তাছাড়া আর তো পথ নেই কস্তুরী। তুমি ঝিন্দের বাগ্‌দত্তা রানী—'

'বেশ—যাও। আমারও চিন্তা আছে।'

'না না না, ও-কথা নয় কস্তুরী। আমি মরি ক্ষতি নেই—কিন্তু তুমি—'

'আমি ঝিন্দের রানী হবার জন্যে বেঁচে থাকব!' অতি ক্ষীণ হাসি কস্তুরীর অধরপ্রান্তে দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল—'তুমি যাও, তোমার কর্তব্য কর গিয়ে, আমার কর্তব্য আমি জানি।'

'কস্তুরী, ভালবাসার কাছে আমাদের প্রাণ তুচ্ছ, সে আমি জানি। কিন্তু ইচ্ছে করে মরবে কেন? যদি বেঁচে থাকি—দূরে থেকে দু'জনে দু'জনকে ভালবাসব। হলেই বা তুমি ঝিন্দের রানী, তোমার ভালবাসা তো চিরদিন আমার থাকবে—'

'রাজা, তোমাকে যদি না পাই, আমার কিস্তা আছে।'

এই অচঞ্চল উত্তাপহীন দৃঢ়তার সম্মুখে গৌরীর সমস্ত যুক্তি ভাসিয়া গেল; সে যে মিথ্যা যুক্তি দিয়া নিজেকেই ঠকাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাও বুঝিতে পারিল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'বেশ, তাই ভাল। আমি চললাম, রাত শেষ হয়ে গেছে, তুমি এখানেই থাক। যদি রাজাকে উদ্ধার করেও বেঁচে থাকি, তোমার কাছে ফিরে আসব। আর—যদি না ফিরি, তখন যা-ইচ্ছে কোরো।'

কস্তুরী দুই বাহু বাড়াইয়া গৌরীর মুখের পানে চাহিল। আয়ত চোখ দুইটিতে ভালবাসা টল্‌টল্‌ করিতেছে; লজ্জা নাই, নিজের মনের নিবিড়তম বাসনা গোপন করিয়া তিলমাত্র খর্ব করিবার চেষ্টা নাই। যে মৃত্যুর কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে লজ্জা করিবে কাহাকে?

দুঃসহ যন্ত্রণার আর্তস্বর গৌরীর কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। দুরন্ত আবেগে কস্তুরীর দেহ নিজ বাহুমধ্যে একবার নিষ্পেষিত করিয়া সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

'প্রহ্লাদ, একটা অস্ত্র আমাকে দাও।'

প্রহ্লাদ তলোয়ার দিল। সেটা হাতে লইয়া গৌরী হঠাৎ হাসিল, বলিল—'চল, এবার উদিতের সঙ্গে দেখা করি; বাংগালী কুত্তার ওপর তার বড় রাগ। প্রহ্লাদ, এই তলোয়ার দিয়ে ঝিন্দের সমস্ত মানুষকে হত্যা করা যায় না? তুমি—আমি—উদিত—ধনঞ্জয়—রুদ্ররূপ—শত্রু-মিত্র কেউ বেঁচে থাকবে না!'

প্রহ্লাদ ভিতরের ব্যাপার বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল, চুপ করিয়া রহিল। গৌরী বলিল—'রাজার কোত-ঘরের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।'

লণ্ঠন হস্তে প্রহ্লাদ আগে আগে চলিল। কয়েক প্রস্থ অপরিসর সিঁড়ি নামিয়া তাহারা অবশেষে এক গোলকধাঁধার মত স্থানে উপস্থিত হইল; সুড়ঙ্গের মত একটা বদ্ধ সংকীর্ণ গলি বাঁকা হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার একপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহার দরজা। গৌরী বুঝিল, এগুলি দুর্গের প্রাচীন কারা-কক্ষ, ইহাদেরই গবাক্ষ বাহির হইতে দেখা যায়।

এই গলির একটা বাঁকের মুখে এক বদ্ধ দরজার সম্মুখে প্রহ্লাদ দাঁড়াইল; গৌরীকে একটা চোখের ইংগিত জানাইয়া আস্তে আস্তে কবাটে টোকা মারিল।

ভিতর হইতে শব্দ আসিল—'কে?'

'আমি প্রহ্লাদ। দরজা খুলুন, ময়ূরবাহন ফিরেছেন।'

দরজার জিঞ্জির খোলার শব্দ হইতে লাগিল। গৌরী প্রহ্লাদের কানে কানে বলিল—'তুমি যাও—দুর্গের সিংদরজা খোলার ব্যবস্থা কর।'

প্রহ্লাদ আলো লইয়া দ্রুত অদৃশ্য হইয়া গেল।

উদিত দরজা খুলিয়া দেখিল, গলিতে অন্ধকার। কক্ষের ভিতরে ক্ষীণ আলোকে তাহার চেহারার রেখা দেখা গেল।

দরজার উপর দাঁড়াইয়া উদিত বলিল—'প্রহ্লাদ, এ কি! আলো আনো নি কেন?

ময়ূরবাহন ফিরেছে? রানীকে এনেছে?'

সে দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—'প্রহ্লাদ, তুমি কোথায়? রানীকে এনেছে ময়ূর-বাহন?' তাহার কণ্ঠস্বরে একটা জঘন্য লুব্ধতা প্রকাশ পাইল।

গৌরী তাহার দুই হাত দূরে দাঁড়াইয়াছিল, দাঁতে দাঁত চাপিয়া তলোয়ারখানা উদিতের বুকের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। উদিতের কণ্ঠ হইতে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বাহির হইল। আর সে কথা কহিল না, নিঃশব্দে দরজার সম্মুখে পড়িয়া গেল।

গৌরী তাহার মৃতদেহ লঙ্ঘন করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

শঙ্কর সিং মলিন শয্যায় উঠিয়া বসিয়াছিল—ধীরে ধীরে দাঁড়াইল। মোমবাতির আলোয় দুইজনে পরস্পর মুখের পানে চাহিল। শঙ্কর সিংয়ের দেহটাও উদিতের দেহের মতই নশ্বর, শুধু তলোয়ারের একটা আঘাতের ওয়াস্তা।

তারপর অদ্ভুত হাসিয়া গৌরী বলিল—'শঙ্কর সিং, তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।'

রাত্রি আর নাই; পূর্বাকাশে উষা ঝলমল করিতেছে।

দুর্গপ্রাকারের পাশে দাঁড়াইয়া দুই শঙ্কর সিং অরুণায়মান কিস্তার পানে তাকাইয়া আছে। প্রাকারের কোলে কোলে তখনও রাত্রির নষ্টাবশেষ অন্ধকার জমা হইয়া আছে।

পাশাপাশি দুই শঙ্কর সিং—চেহারা ও বেশভূষায় কোনো প্রভেদ নাই। দুইজনেই বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া চিন্তা করিতেছে।

একজন ভাবিতেছে—ফুরাইয়া আসিল আমার ঝিন্দের খেলা। ঐ দুর্গের দ্বার খুলিল। ধনঞ্জয় আসিতেছে—আর দেরি নাই।

আর একজন ভাবিতেছে—কি ভাবিতেছে সে নিজেই জানে না। বোধ করি সুসংলগ্ন চিন্তা করিবার শক্তিও তাহার নাই।

প্রাকার-ক্রোড়ের অন্ধকারে কি একটা নড়িল। কেহ লক্ষ্য করিল না। উভয়ের দৃষ্টি দূর-বিন্যস্ত!

ধনঞ্জয় ও রুদ্ররূপ দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে। পাথরের অঙ্গনে তাহাদের জুতার কঠিন শব্দ শুনা যাইতেছে। প্রহ্লাদের গলার আওয়াজ ভাসিয়া আসিল; সে পথ নির্দেশ করিয়া লইয়া আসিতেছে।

আবার অন্ধকার প্রাকারের ছায়ায় কি নড়িল। দুই শঙ্কর সিং নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

পিছনে অস্পষ্ট শব্দ শুনিয়া দুইজনেই ফিরিল।

একটি নারীমূর্তি তাহাদের অদূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! কস্তুরী! দুই শঙ্কর সিং তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা পাংশু নারীমূর্তি অস্ফুট চীৎকার করিয়া তাহাদের কি বলিতে চাহিল। কিন্তু বলিবার পূর্বেই প্রাকারের ছায়াশ্রয় হইতে একটি মূর্তি বাহির হইয়া আসিল। মূর্তিটা টলিতেছে, সর্বাঙ্গ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে, হাতে ছোরা।

ছোরা একজন শঙ্কর সিংয়ের বুকে বিঁধিল—আমূল বিঁধিয়া গেল। শুধু সোনার কাজকরা মুঠ উষালোকে ঝিকমিক করিতে লাগিল।

নিয়তির করাঙ্কচিহ্নিত ছোরা। এতদিনে বুঝি তাহার কাজ শেষ হইল।

আততায়ী ও আহত একসঙ্গে পড়িয়া গেল। শঙ্কর সিং নিশ্চল; মরণাহত ময়ূর-বাহনের শেষ নিশ্বাস-বায়ুর সঙ্গে একটা অস্ফুট হাসির শব্দ বাহির হইয়া আসিল।

বিজয়ী বেপরোয়া বিদ্রোহী ময়ূরবাহন।

ধনঞ্জয় ও রুদ্ররূপ মুক্ত তরবারি হস্তে প্রবেশ করিল।

একজন শঙ্কর সিং তখনো স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া আছে; আর তাহার অদূরে একটি পাংশু নারীমূর্তি ধীরে ধীরে সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে।

ধনঞ্জয় ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার সমস্ত দৃশ্যটা দেখিয়া লইলেন। তারপর কর্কশ কণ্ঠে হুকুম দিলেন—'রুদ্ররূপ, এখানে আর কাউকে আসতে দিও না।'

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

ঝিন্দ্ রাজপ্রাসাদের সদর ও অন্দরের মধ্যবর্তী বিশাল কক্ষটির কেন্দ্রস্থলে আবলুশের টেবিলের সম্মুখে বসিয়া ঝিন্দের রাজা শঙ্কর সিং পত্র লিখিতেছেন।

চারিদিকের খোলা জানালার বাহিরে রৌদ্র-প্রফুল্ল প্রভাত; কয়েক দিন আগে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হইয়া গিয়া আকাশ পালিশ-করা ইস্পাতের মত ঝকঝক করিতেছে; কোথাও এতটুকু মলিনতার চিহ্ন নাই।

শঙ্কর সিং পত্র লিখিতেছেন বটে, কিন্তু নিবিষ্টমনে পত্র শেষ করিবার অবকাশ পাইতেছেন না। ঘরের দ্বারে রুদ্ররূপ পাহারায় আছে এবং প্রাসাদের সদরে স্বয়ং ধনঞ্জয় বাঘের মত থাবা পাতিয়া বসিয়া আছেন; তবুও রাজদর্শনপ্রার্থী সম্ভ্রান্ত জনগণের স্রোত ঠেকাইয়া রাখা যাইতেছে না। ডাক্তার গঙ্গানাথের দোহাই পর্যন্ত কেহ মানিতেছে না। শক্তিগড় দুর্গে রাজার প্রতি হিংসুক উদিতের আক্রমণ ও রাজার অসাধারণ বাহুবলে উদিত, ময়ূরবাহন প্রভৃতির মৃত্যুর কথা রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। উদিত যে রাজাকে দুর্গে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, একথা কাহারও অবিদিত নাই। মন্ত্রী বজ্রপাণি ভার্গব ও সর্দার ধনঞ্জয় এই শোচনীয় ভ্রাতৃ-বিরোধের কাহিনী গোপন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সত্য কথা চাপিয়া রাখা যায় না, প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। তাই গত কয়েকদিন ধরিয়া দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ক্রমাগত রাজাকে অভিনন্দন জানাইয়া যাইতেছেন।

তাঁহাদের শুভাগমনের ফাঁকে ফাঁকে পত্র-লিখন চলিতেছে—

—যার হাতে চিঠি পাঠালাম, তার নাম প্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত। সে বাঙালী, যদিও তার ভাষা শুনলে সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মাতে পারে। কিন্তু ভাষা যাই হোক, প্রহ্লাদ খাঁটি বাঙালী। গত কয়েক দিন ধরে আমি কেবলই ভাবছি, প্রহ্লাদ যদি বাঙালী না হত? অনেককে বলতে শুনেছি, বাঙালীর ভায়ে ভায়ে মিল নেই, যেখানে দুটি বাঙালী সেখানেই ঝগড়া। মিথ্যে কথা। বিদেশে বাঙালীর মত বাঙালীর বন্ধু আর নেই। যদি সন্দেহ হয়, প্রহ্লাদকে স্মরণ কোরো।

রুদ্ররূপ দ্বারের পর্দা ফাঁক করিয়া জানাইল, ঝড়োয়ার বিজয়লালকে সঙ্গে লইয়া ধনঞ্জয়

আসিতেছেন। শঙ্কর সিং অসমাপ্ত পত্র সরাইয়া রাখিলেন।

বিজয়লাল মিলিটারি স্যালুট করিয়া একখানি পত্র রাজার হাতে দিল। ঝড়োয়ার মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষ হইতে রাজকীয় লেফাপাদুরুস্ত পত্র—দেওয়ান লিখিয়াছেন। অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

পত্রে চোখ বুলাইয়া শঙ্কর সিং বিজয়লালের দিকে দৃষ্টি তুলিলেন; গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—'রানী কস্তুরীবাঈ ভাল আছেন?'

'আছেন মহারাজ!'

মহারাজের গম্ভীর মুখের এক কোণে একটু হাসি দেখা দিল—'আর—কৃষ্ণাবাঈ? তিনি ভাল আছেন?'

বিজয়লাল অবিচলিত মুখে কেবল একবার মাথা ঝুঁকাইল।

রাজা ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'সর্দার, সুবাদার বিজয়লালকে আমি আমার খাস পার্শ্বচর নিযুক্ত করতে চাই। এ বিষয়ে ঝড়োয়ার দরবারের সঙ্গে যে লেখাপড়া করা দরকার, তা আজই যেন করা হয়।'

'যো হুকুম মহারাজ!'

রাজা মস্তকের একটি সঙ্কেতে উভয়কে বিদায় দিলেন।

—তোমার পায়ে পড়ি অচলবৌদি, দেরি কোরো না। যত শীগ্‌গির পারো দাদাকে নিয়ে চলে এস। তোমাদের জন্য যে কি ভয়ঙ্কর মন কেমন করছে তা বলতে পারি না। যদি সম্ভব হত, আমি ছুটে গিয়ে তোমাদের কাছে পড়তাম। কিন্তু এ রাজ্য ছেড়ে বার হবার উপায় নেই, হয়তো ইহজীবনে ছাড়া পাব না। আমি ত ঝিন্দের রাজা নই, ঝিন্দের বন্দী—

রুদ্ররূপের ফ্যাকাসে মুখ ক্ষণকালের জন্য পর্দার ফাঁকে দেখা গেল—'ত্রিবিক্রম সিং আসছেন।'

কিছুক্ষণ ত্রিবিক্রমের সঙ্গে অভিনন্দনের অভিনয় চলিল। তারপর শঙ্কর সিং সহসা গম্ভীর হইয়া বলিলেন—'ত্রিবিক্রম সিং, আমি আপনার মেয়ে চম্পা দেঈর জন্য পাত্র স্থির করেছি।'

ত্রিবিক্রম ঈষৎ চমকিত হইয়া মামুলি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন; তারপর দুইবার কাশিয়া পাত্রের নাম-ধাম জানিতে চাহিলেন।

শঙ্কর সিং কহিলেন—'ভারি সৎ পাত্র—আমার দেহরক্ষী রুদ্ররূপ। চম্পাও তাকে পছন্দ করে।'

ত্রিবিক্রম মনে মনে অতিশয় বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল। তিনি গলার মধ্যে নানাপ্রকার শব্দ করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর সিং যেন লক্ষ্য করেন নাই এমনিভাবে বলিলেন—'ময়ূরবাহন মরেছে—তার কেউ ওয়ারিস নেই। আমি স্থির করেছি ময়ূরবাহনের জায়গীর রুদ্ররূপকে বক্‌শিশ দেব।'

ত্রিবিক্রমের মুখের মেঘ কাটিয়া গেল। তিনি সবিনয়ে রাজার স্তুতিবাচন করিয়া জানাইলেন যে, রাজার অভিরুচির বিরুদ্ধে তাঁহার কোনো কথাই বলিবার ছিল না এবং কোনো কালেই থাকিতে পারে না।

আরো কিছুক্ষণ সদালাপের পর তিনি বিদায় লইলেন।

—রাজকার্যে ভয়ানক ব্যস্ত আছি। ঘটকালি করছি। এইমাত্র একটি বিয়ে ঠিক করে ফেললাম। পাত্র ও পাত্রী পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসে, কিন্তু মেয়ের বাপ বেঁকে

বলেছিল। যাহোক, অনেক কষ্টে তাকে রাজী করেছি। প্রণয়ী-যুগলের মিলনে বাধা আর নেই।

বৌদি, বাড়ি ছেড়ে আসবার সময় তোমাকে বলেছিলাম মনে আছে?—যে, তুমি যা চাও—অর্থাৎ বৌ—তাই এবার একটা ধরে নিয়ে আসব? একটি বৌ জোগাড় হয়েছে। আমাদের বংশে বেমানান হবে না; তোমারও বোধ হয় পছন্দ হবে। কিন্তু তুমি তাকে বরণ করে ঘরে না তুললে যে কিছুই হবে না বৌদি! তুমি এস এস এস। তোমরা না এলে কিছু ভাল লাগছে না। তার নাম কস্তুরী। নামটি ভাল, নয়? মানুষটিকে বোধ হয় আরো ভালো লাগবে। সে একটা দেশের রাজকন্যা; কিন্তু আগে থাকতে কিছু বলব না। যদি চিঠিতেই কৌতূহল মিটে যায়, তাহলে হয়তো তুমি আসবে না।

এত্তালা না দিয়াই চম্পা প্রবেশ করিল।

রাজা মুখ তুলিয়া চাহিলেন—'কি চম্পা দেঈ?'

চম্পা রাজার পাশে দাঁড়াইয়া অনুযোগের স্বরে বলিল—'আজকাল কিছু না খেয়েই দরবার করতে চলে আসছেন? আপনাকে নিয়ে আমি কি করি বলুন তো?'

'খাওয়া হয়নি! তাই তো, ভুলে গিয়েছিলাম।'

'আপনি ভুলে যান, কিন্তু আমাকে যে ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াতে হয়। রুদ্ররূপেরও কি একটু আক্কেল নেই, মনে করিয়ে দিতে পারে না?'

'হাঁ, ভাল কথা। চম্পা, তোমার বাবা এসেছিলেন; রুদ্ররূপকে তুমি বিয়ে করতে চাও শুনে তিনি খুব খুশি হয়ে মত দিয়ে গেছেন।'

চম্পার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, সে ঘাড় বাঁকাইয়া কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, থামিয়া গিয়া হাত নাড়িয়া যেন কথাটাকে দূরে সরাইয়া দিয়া বলিল—'ওসব বাজে কথা শোনবার আমার সময় নেই। আপনার জন্য কি নিয়ে আসব বলুন। দুটো আনারসের মোরব্বা আর একপাত্র গরম সরবৎ—'

রাজা চিঠিতে মনোনিবেশ করিয়া বলিলেন—'দরকার নেই।'

চম্পা বলিল—'তাহলে এক বাটি গরম দুধ—'

'বিরক্ত কোরো না চম্পা, আমি এখন ভারি জরুরী চিঠি লিখছি।'

'কিন্তু কিছু তো খাওয়া দরকার। একেবারে—'

রাজা হাঁকিলেন—'রুদ্ররূপ!'

রুদ্ররূপ শঙ্কিত মুখে প্রবেশ করিল।

চম্পার প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া রাজা হুকুম করিলেন—'তুমি চম্পা দেঈর হাত ধর।'

রুদ্ররূপ কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিল, তারপর ফাঁসির আসামীর মত মুখের ভাব করিয়া চম্পার একটি হাত ধরিল।

রাজা বলিলেন—'বেশ শক্ত করে ধরেছ? আচ্ছা, এবার ওকে নিয়ে যাও।'

ক্ষীণকণ্ঠে রুদ্ররূপ বলিল—'কোথায় নিয়ে যাব?'

'তোমার বাড়িতে। না না, এখন থাক, সেটা বিয়ের পরে হবে। আপাতত তুমি ওকে ওর মহালে নিয়ে যাও। সেখানে ওকে আটক রাখবে, যতক্ষণ তোমার কথা না শোনে ওর হাত ছাড়বে না—যাও।'

কড়া হুকুম দিয়া রাজা পুনরায় চিঠিতে মন দিলেন। চম্পা ও রুদ্ররূপ আরক্তমুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আড়চোখে পরস্পরের পানে চাহিল। দুইজনেরই ঠোঁটের কূলে কূলে হাসি ভরিয়া উঠিল। রাজা তখন চিঠিতে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন; পা টিপিয়া টিপিয়া উভয়ে দ্বারের দিকে চলিল।

পর্দার ওপারে গিয়াই চম্পা সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইল, তারপর রুদ্ররূপের বুকে

একটা আচমকা কীল মারিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল।

—ঝিন্দের মহারাজ শঙ্কর সিং বিদেশীদের খুব খাতির করেন। তোমরা এলে রাজ-প্রাসাদেই অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা হবে। তা ছাড়া রাজকীয় প্রকাণ্ড যাদুঘরের ভার নেবার জন্য একজন পণ্ডিত লোকের দরকার; দাদা ছাড়া আর তো যোগ্য লোক দেখি না।

এত কথা লেখবার আছে যে কিছুই লেখা হচ্ছে না। তোমরা কবে আসবে?

দাদাকে বোলো, তাঁর দেওয়া ছোরাটা কিস্তার জলে ভেসে গেছে; ছোরার ন্যায্য অধিকারী সেটা বুকে করে নিয়ে গেছে। দুঃখ করবার কিছু নেই।

ভাল কথা, গৌরীশঙ্কর রায় নামক একজন বাঙালী যুবক ঝিন্দে বেড়াতে এসেছিল, সম্প্রতি তার মৃত্যু হয়েছে।

কবে আসবে? প্রণাম নিও। ইতি—

দেবপাদ শ্রীমন্মহারাজ
সিং

লাল পাঞ্জা

চরিত্র

পুরুষ

আশুতোষ	...	প্রৌঢ় ধনী ব্যবসায়ী
কেশব	...	ঐ
ত্রিদিব	...	ব্যারিস্টার
অজয়	...	আশুতোষের সেক্রেটারি
কুমার	...	কেশবের পুত্র
শেখর	...	মদ্যপ যুবক
মৃত্যুঞ্জয়	...	বীমার দালাল
লালচাঁদ পাঞ্জা	...	পুলিস ইন্সপেক্টর
রণবীর	...	ডাক্তার

ভদ্রলোক, কম্পাউণ্ডার ও ভৃত্য।

স্ত্রী

আলতা	...	আশুতোষের কন্যা
ঝর্ণা	...	কেশবের কন্যা
অনসূয়া	...	শেখরের ভগিনী

ভদ্রমহিলা ও ঝি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী আশুতোষ রায়ের বাড়িতে তাঁহার লাইব্রেরি ঘর। রাত্রি আন্দাজ সাড়ে আটটা। আশুতোষবাবু ঘরময় পায়চারি করিতেছেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ, শীর্ণ মুখ, চোখে একটা আতঙ্কপূর্ণ সতর্কতা। তিনি মাঝে মাঝে চমকিয়া গরাদযুক্ত খোলা জানালার দিকে তাকাইতেছেন।

আশুতোষ। লাল পাঞ্জা!—লাল পাঞ্জা! (ভীতভাবে পিছনে তাকাইলেন) না—ভয় পাচ্ছি কেন? সে তো আমার কোনও অনিষ্ট করতে চায় না, বরং...(টেবিলের উপর হইতে একটা রক্তবর্ণ হাতের পাঞ্জার আকৃতির কাগজ তুলিয়া লইলেন, তাহার উপর লিখিত কয়েকটি কথা পাঠ করিলেন, আবার রাখিয়া দিলেন)—কিন্তু—কিন্তু—(সহসা টেবিলের উপরস্থিত ঘণ্টি টিপিলেন।)

জনৈক আর্দালির প্রবেশ

আশুতোষ। আলতা কোথায়?

আর্দালি। আজ্ঞে, তিনি তো পার্টিতে গেছেন।

আশুতোষ। কোথায় গেছে? কার বাড়িতে পার্টি?

আর্দালি। তা তো মিসিবাবা কিছু বলে যাননি হুজুর।

আশুতোষ। টেলিফোনে চারিদিকে খোঁজ নাও—যেখানে থাকে এখনি তাকে ডেকে পাঠাও।

আর্দালি। যো হুকুম— (প্রস্থানোদ্যত)

আশুতোষ। কিন্তু—থাক। ডাকবার দরকার নেই। যাও। (আর্দালি প্রস্থান করিল) আজকের রাতটা আমোদ করে নিক। কাল থেকে বন্ধ করে দেব। (উপবেশন) লাল পাঞ্জার হুকুম! কাউকে এখনো বলিনি। কিন্তু—না, সত্যিই তো! আলতা যেন দিন দিন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে, কেবল থিয়েটার, পার্টি, নাচ নিয়ে মত্ত হয়ে আছে। মা-মরা মেয়ে, শাসন করতে পারি না—(নিজ বক্ষে হস্ত রাখিয়া) কিন্তু আমিও তো বেশী দিন নয়। Angina Pectoris যখন ধরেছে—! তার ওপর লাল পাঞ্জা!

কিছুক্ষণ মাথায় হাত রাখিয়া চিন্তা করিলেন, তারপর ঘণ্টি বাজাইলেন।

আর্দালির প্রবেশ

আশুতোষ। অজয়বাবুকে ডেকে দাও—

আর্দালি। যো হুকুম— (নিষ্ক্রান্ত)

আশুতোষ। অজয়কে সব কথা বলব—কিছু লুকোব না। মনে হচ্ছে, আজ না বললে আর বলবার সুযোগ পাব না। হয়তো এর পরে নিজের দুষ্কৃতির কথা লজ্জায় বলতে পারব না।

অজয়ের প্রবেশ। সৌম্যমূর্তি যুবক, গায়ে একটি মোটা খদ্দরের চাদর।

আশুতোষ। এস অজয়। এই চেয়ারটাতে ব'স—

অজয় নির্দিষ্ট চেয়ারে উপবিষ্ট হইল

আশুতোষ। (চারিদিকে তাকাইয়া) অজয়, লাল পাঞ্জার নাম শুনেছ?

অজয়। শুনেছি বৈকি। লাল পাঞ্জার নামে তো দেশে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

আশুতোষ। অজয়, আমি লাল পাঞ্জার চিঠি পেয়েছি।

অজয়। (সবিস্ময়ে) সে কি! আপনি!

আশুতোষ। হ্যাঁ, আমি।

অজয়। কিন্তু—যতদূর শুনেছি, দুষ্টের দমন করাই লাল পাঞ্জার কাজ! আপনি তো সেরকম কিছু করেননি।

আশুতোষ। আমি কি করেছি তা তুমি জানো না কিন্তু লাল পাঞ্জা জানে। লাল পাঞ্জার অজানা কিছু নেই! তবু কেন জানি না, সে আমাকে আমার দুষ্কৃতির জন্যে শাসন করতে চায়নি—বরং বন্ধুর মত আমাকে সাবধান করে দিয়েছে।

অজয়। আশ্চর্য! এ রকম তো কখনো শুনিনি।

আশুতোষ। এই দ্যাখ। (পাঞ্জা দেখাইলেন)

অজয়। (পাঞ্জা লইয়া) তাই তো! এই যে লেখা রয়েছে—'আপনার কন্যা আলতা দেবীর উচ্ছৃঙ্খলতা সংযত করুন। বাঙালী গৃহস্থ কন্যার এরূপ স্বেচ্ছাচার শোভা পায় না।' এ যে রীতিমত হিতোপদেশ দিয়েছে দেখছি।

আশুতোষ। অজয়, তুমিও হয়তো লক্ষ্য করেছ, আলতা সম্প্রতি কিছু বাড়াবাড়ি করছে। মেয়েদের স্বাধীনতা ভাল, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে, স্বৈরাচার ভাল নয়। তোমার কি মনে হয়?

অজয়। প্রভুকন্যার আচরণ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করবার আমার অধিকার নেই।

আশুতোষ। তোমার অধিকার আছে, সে কথা আমি পরে বলছি। অজয়, আজ সকালে লাল পাঞ্জার এই চিঠি পেয়ে শুধু আলতার আচরণ নয়, নিজের অতীত জীবনটাও যেন চোখের সামনে দেখতে পেলুম। (কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) অজয়, জীবনে আমি অনেক অন্যায় করেছি। এই যে আমার অতুল ঐশ্বর্য দেখছ, এর ভিত—বিশ্বাসঘাতকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

অজয় বিস্ময় প্রকাশ করিল না, শান্তমুখে নীরব হইয়া রহিল।

আশুতোষ। যৌবনে অদম্য অর্থ লালসায় আমি এক মহাপাতক করেছিলুম। আজ তোমার কাছে কিছু লুকোব না। মনে হচ্ছে, লাল পাঞ্জার চিঠি আমার বিবেকের চিঠি—বন্ধু হত্যার রক্তে রাঙা হয়ে আমাকে আমার পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছে। উঃ! (কিছুক্ষণ দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া রহিলেন) তোমার বাবা প্রিয়নাথ যৌবনে আমার বন্ধু ছিলেন।

অজয়। জানি।

আশুতোষ। জানো! কিন্তু তুমি কি করে জানলে? তোমার বাবার যখন মৃত্যু হয় তখন তো তুমি আট-নয় বছরের ছেলে।

অজয়। বাবার মৃত্যুর পর আমি অনাথ আশ্রমে প্রতিপালিত হয়েছিলুম, তারপর লেখা-পড়া শেষ করে যখন বেরুলুম তখন কোথাও আশ্রয় নেই। সেই সময় আপনি হঠাৎ এসে আমাকে সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত করলেন; এই অযাচিত কৃপা দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, আমার বাবার সঙ্গে হয়তো আপনার পরিচয় ছিল।

আশুতোষ। সেজন্যে নয়, অজয়, শুধু সেজন্যে নয়। অনুতাপের তাড়নায় তোমাকে সাহায্য করেছিলুম। শোনো, তোমার বাবা আমাদের বন্ধু ছিলেন। তাঁর টাকা ছিল, আর, আমরা দু'জন ছিলাম নিঃস্ব।

অজয়। দু'জন! আপনার সঙ্গে কি আর কেউ ছিলেন?

আশুতোষ। আর একজন ছিল। সে ছিল সব কাজে আমার মন্ত্রণাদাতা। কিন্তু তার নাম করব না, জীবনে টাকার মোহে অনেক বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, সে পাপ আর বাড়াব না।

অজয়। আমি তাঁর নাম জানতে চাইনি।

আশুতোষ। তারপর শোনো। আমরা পরামর্শ করে প্রিয়নাথের কাছে টাকা ধার চাইলুম। বন্ধুদের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস ছিল, সে কোনো রকম লেখাপড়া না করে তার

সমস্ত পুঁজি আমাদের ধার দিলে। সেই টাকা নিয়ে আমরা কলকাতায় ব্যবসা ফেঁদে বসলুম। (কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া) বছরখানেক পরে প্রিয়নাথ হঠাৎ রোগে পড়ল। ডাক্তারেরা সন্দেহ করলেন, টি-বি; ভাল চিকিৎসা এবং হাওয়া বদলানো দরকার। প্রিয়নাথের হাতে বেশী টাকা ছিল না, চাকরিও ছেড়ে দিতে হল। সে আমাদের কাছে তার টাকা চেয়ে পাঠালে। তখন আমাদের ব্যবসার একটা মস্ত টাল যাচ্ছে। নতুন ব্যবসা, এসময় প্রিয়নাথের টাকা ফেরত দিলে হয়তো ব্যবসা ফেঁসে যেত। আমরা দু'জনে পরামর্শ করে প্রিয়নাথের ঋণ অস্বীকার করলুম।

আশুতোষ থামিলেন, অজয় নিজের করতলের দিকে তাকাইয়া
নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল।

আশুতোষ। প্রিয়নাথ আর দ্বিতীয়বার টাকা চাইলে না। তার রোগ ক্রমে বেড়ে উঠল। সুচিকিৎসা হল না। কোনো চিকিৎসাই সে করালে না; বোধ হয় মনুষ্য জীবনের ওপর তার ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল। তারপর ছ'মাস যেতে না যেতে তার মৃত্যু-সংবাদ পেলুম। মনে আছে, খবর পেয়ে মস্ত একটা আরামের নিশ্বাস ফেলেছিলুম—

অজয়। (সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া) এসব কথা আজ আমাকে বলছেন কেন?

আশুতোষ। প্রায়শ্চিত্ত করছি—প্রায়শ্চিত্ত করছি! শোনো, আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে—অ্যান্‌জাইনা ধরেছে, কোনরকমে এমিল্ নাইট্রেটের ক্যাপসুল শুঁকে বেঁচে আছি। কিন্তু এভাবে জোড়াতাড়া দিয়ে আর কদ্দিন? শিগ্‌গির যেতে হবে। তাই যাবার আগে ভাল করে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। তুমি ব'স—(অজয় বসিল) অজয়, আজ আমি আমার উইল তৈরি করেছি। উইলে আমার মৃত্যুর পর তোমাকে আমার মেয়ে আলতার অভিভাবক নিযুক্ত করেছি।

অজয়। আমাকে?

আশুতোষ। হ্যাঁ, তোমাকে জেনেশুনেই করেছি। তুমি যদি তোমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চাও, আমার মেয়ের ওপর সহজেই প্রতিশোধ নিতে পারবে, তাই তাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু জানি তুমি তা পারবে না। এই দু'বছরে আমি তোমাকে চিনেছি, একজনের অপরাধে আর একজনকে শাস্তি দিতে তুমি পারবে না।

অজয়। কিন্তু এ গুরুভার আমার মাথায় না দিয়ে—

আশুতোষ। আমার বিষয়সম্পত্তির ভার তোমার মাথায় চাপাইনি। তুমি সৎ, কিন্তু ছেলেমানুষ—বিষয়বুদ্ধিতে এখনও কাঁচা; তাই আমার বন্ধু কেশবকে আমার সম্পত্তির ট্রাস্টি নিযুক্ত করেছি।

অজয়। তাঁকে আপনার মেয়ের অভিভাবক নিযুক্ত করলেও তো পারেন।

আশুতোষ। অজয়, কেশব আমার বাল্যবন্ধু, সারা জীবন আমরা দু'জন একই পথে চলেছি। তবু, আলতাকে তার হাতে সঁপে দিতে পারিনি, কোথায় যেন বেধে গেছে। হয়তো আমি শিগ্‌গির মরব না; কিন্তু যদি মরি, তুমি তার অভিভাবক থাকবে। তাকে সৎশিক্ষা দেবে, দরকার হলে শাসন করবে, সদ্‌বংশে সৎপাত্রে তার বিয়ে দেবে—এই আশা করেই আমি তোমাকে তার অভিভাবক নিযুক্ত করেছি।

অজয়। কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন, আপনার মেয়ে আমার প্রতি—

আশুতোষ। তোমার প্রতি সে খুব প্রসন্ন নয়। তুমিও তার চপলতা পছন্দ কর না, তা আমি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু অজয়, আলতা এখনও ছেলেমানুষ, মাত্র উনিশ বছর তার বয়স,—এখনও তাকে সংশোধন করবার অনেক সময় আছে। আর আমার বিশ্বাস, যদি কেউ তাকে বশ করতে পারে তো সে তুমি—

আর্দালির প্রবেশ

আর্দালি। কেশববাবু এসেছেন।

আশুতোষ। নিয়ে এস— (আর্দালি নিষ্ক্রান্ত)

অজয়। কিন্তু আমি—

আশুতোষ। আজ এই পর্যন্ত থাক। তোমাকে সব কথা বলে আমার মনটা হালকা হয়েছে। যদি আরও কিছু আলোচনা করবার থাকে, কাল হবে।

অজয়। বেশ—(ঘড়ির দিকে তাকাইয়া) আজ আর বোধ হয় অন্য কোনও কাজ নেই? আমি বাড়ি যেতে পারি?

আশুতোষ। হ্যাঁ, যাও।—(নিজ মনে) ন'টা বেজে গেছে, এখনও আলতা ফিরল না। যাক, আজকের রাতটা—

কেশব প্রবেশ করিলেন। অজয় তাঁহাদের নমস্কার করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। কেশবের দেহ স্থূলে, মাথার চুল অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছে, মুখের মাংস লোল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, স্বভাবত রক্তবর্ণ চোখের কোলে গভীর কালীর দাগ। বর্তমানে তাঁহার দৃষ্টি বিভ্রান্ত; তিনি অজয়কে লক্ষ্য করিলেন না।

আশুতোষ। কেশব, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে।

কেশব। ভালই হয়েছে! (সাগ্রহে) আশু, তবে কি তুমি বুঝতে পেরেছ আমি কেন এসেছি?

আশুতোষ। না—কি হয়েছে?

কেশব। কি হয়েছে! (শুষ্ক হাস্য) খবর পাওনি তাহলে। র'স—বল্‌ছি।

(দ্বার বন্ধ করিলেন)

আশুতোষ। ব্যাপার কি কেশব! তুমি অমন করছ কেন?

কেশব। (পাশে বসিয়া আশুতোষের হাত ধরিয়া) আশু, তুমি আমার আজীবনের বন্ধু; আজ বন্ধুর কাজ করবে?

আশুতোষ। (হতবুদ্ধি ভাবে) বন্ধুর কাজ!

কেশব। হ্যাঁ—আমাকে কিছু টাকা ধার দেবে?

আশুতোষ। ধার?—কত?

কেশব। তোমার পক্ষে কিছুই নয়—এক লাখ পঁচাশি হাজার।

আশুতোষ। সে কি!

কেশব। শেয়ার মার্কেটে speculate করেছিলুম, এক লাখ আশি হাজার ধার হয়েছে। সাতদিনের মেয়াদ—আসছে শনিবারে ধার শোধ না করলে—

আশুতোষ। কিন্তু সেজন্যে ধার চাইবার দরকার কি? তুমি নিজেই তো ইচ্ছে করলে ব্যাঙ্ক থেকে দু'লাখ টাকা বার করতে পার।

কেশব। (বিকৃত হাস্য) পারতুম, কিন্তু এখন আর পারি না। এখন আমার বাড়ি গাড়ি ঘটিবাটি বিক্রি করলেও দু' হাজার টাকা উঠবে না। সব গেছে।

আশুতোষ। সব গেছে?

কেশব। হ্যাঁ, শেয়ার মার্কেটের জুয়ায় সব গেছে। এখন যদি শনিবারের মধ্যে ধার শোধ করতে না পারি, আত্মহত্যা করতে হবে।

আশুতোষ। কিন্তু—আমি যে তোমাকে আমার উইলে—

কেশব। কি—কি—?

আশুতোষ। কেশব, আজ আমি আমার উইল তৈরি করেছি; তাতে তোমাকে আমার সম্পত্তির ট্রাস্টি নিযুক্ত করেছিলুম। কিন্তু—

কেশব। আমাকে ট্রাস্টি করেছিলে? (মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়া আবার নিবিয়া গেল)—কিন্তু সে তো তোমার মৃত্যুর পর—অর্থাৎ—(থামিয়া গেলেন)

আশুতোষ। কিন্তু এখন তো আর আমি তোমাকে ট্রাস্টি রাখতে পারি না।

কেশব। কেন?

আশুতোষ। কেশব, তুমি যতদিন ধনী ছিলে ততদিন তোমাকে হয়তো বিশ্বাস করতে পারতুম, কিন্তু এখন কি করে বিশ্বাস করব? তুমি তো আমার মেয়েকে ঠকিয়ে সমস্ত আত্মসাৎ করবে। না—কালই আমি উইল বদলে ফেলব।

কেশব। বেশ, তাই ক'রো, তোমার উইল সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু এখন আমাকে ঐ টাকাটা দাও—শপথ করছি—

আশুতোষ। বন্ধুকে টাকা ধার দেওয়া!—কেশব, প্রিয়নাথকে মনে আছে? বন্ধুকে টাকা ধার দেওয়া যদি সহ্য না হয়?

কেশব। আমাকে বিশ্বাস না করতে পারো, রীতিমত রেজিস্ট্রি করে টাকা দাও—তাহলে তো আর ভয় নেই!

আশুতোষ। না কেশব, আমি তোমাকে অত টাকা ধার দিতে পারব না। আমার শরীরের যে অবস্থা, আজ আছি কাল নেই। তারপর আমার নাবালিকা মেয়ে যদি তোমার কাছ থেকে টাকা উদ্ধার না করতে পারে? মেয়েকে তো পথে বসিয়ে যেতে পারি না। (উঠিলেন) উইলখানা বদলে ফেলব—(নিজ মনে) অজয়কেই ট্রাস্টি করি, আর তো কেউ নেই। সে ছেলেমানুষ কিন্তু চুরি করবে না—

কেশব। দেবে না?

আশুতোষ। না কেশব। কি জানি কেন, তোমার সম্বন্ধে চিরদিনই আমার মনে একটা দুর্বলতা আছে। তোমার কথা কোনো দিন এড়াতে পারিনি; কিন্তু আজ লাল পাঞ্জার চিঠি পেয়ে নিজের স্বরূপ যেমন দেখতে পেয়েছি, আর সকলকেও তেমনি চিনতে পেরেছি। যেখানে টাকার গন্ধ আছে সেখানে তো আর তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি না বন্ধু!

কেশব। দেবে না তাহলে! অকৃতজ্ঞ scoundrel! আজ যে তোমার এত সম্পত্তি সে কার জন্যে? প্রিয়নাথের কাছ থেকে টাকা ধার নেবার পরামর্শ কে দিয়েছিল? আমি। তারপর সে যখন টাকা ফেরত চাইলে তখন গাড়োলের মত টাকা ফেরত দিতে যাচ্ছিলে—আমি যদি না আটকে রাখতুম, তাহলে আজ এ সব আসত কোথা থেকে? বেইমান কৃতঘ্ন কোথাকার!

আশুতোষ। কেশব—কেশব—(সহসা বুকে হাত রাখিয়া বসিয়া পড়িলেন; কেশব হিংস্রভাবে তাকাইয়া রহিলেন।) অ্যান্‌জাইনার অ্যাটাক্‌! কেশব—শিগ্‌গির—(হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন)

কেশব। কী—কী—?

আশুতোষ। শিগ্‌গির—আমার দেরাজের মধ্যে—ওষুধের ক্যাপসুল আছে—

কেশব। কী—কী—

তাঁহার মুখের ভাব আশায় ও আশঙ্কায় ভীষণাকৃতি হইয়া উঠিল।

আশুতোষ। দেরাজের মধ্যে—শিগ্‌গির—উঃ বুক ফেটে যাচ্ছে—ওষুধ আছে তাই ভেঙে আমার নাকের কাছে ধর—

কেশব। (নিজ মনে) ট্রাস্টি—ট্রাস্টি—! দেখি দরজা বন্ধ আছে তো!

(দরজা দেখিলেন)

আশুতোষ। কেশব—বাঁচাও—শিগ্‌গির—উঃ!

কেশব দেরাজ খুলিয়া কয়েকটি এমিল্‌ নাইট্রেটের ক্যাপসুল বাহির করিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন; আশুতোষকে দিলেন না।

দিলে না! উঃ—আ ল তা— (মৃত্যু)

কেশব। (কাছে আসিয়া) হয়ে গেছে! এইবার—(উচ্চকণ্ঠে) ডাক্তার! ডাক্তার! কে আছো শিগ্‌গির এস—

ক্যাপসুল ভাঙিয়া নাকের কাছে ধরিলেন। জানালার গরাদের ভিতর দিয়া লাল মুখোশ পরা একটা ভয়ঙ্কর মুখ দেখা গেল। সে হাতের রক্তবর্ণ পাঞ্জা তুলিয়া ধরিয়া বিকট স্বরে হাস্য করিয়া উঠিল।

কেশব। (ভয় বিকৃত-কণ্ঠে) লাল পাঞ্জা!

দ্বিতীয় দৃশ্য

ব্যারিস্টার ত্রিদিব রায়ের প্রশস্ত ড্রয়িং-রুম। কয়েকটি আধুনিক তরুণ-তরুণী ইতস্তত বসিয়া আছেন। ঝর্ণা পিয়ানোর সম্মুখে বসিয়া গান গাহিতেছে; সে খুব সুন্দরী নয়, কিন্তু মুখের ডৌল অতি সুকুমার ও শিষ্ট—বয়স সতের-আঠার। আলতা—অপরূপ সুন্দরী, গৌরী কৃশাঙ্গী— একটি সেটিতে বসিয়া গানের তালে তালে পা নাড়িতেছে; তাহার পরিধানে রূপালী জরীর শাড়ি, হাতে হাতীর দাঁতের পাখা, বেণীতে যূথী পুষ্প বিজড়িত। সেই সেটির অন্য কোণে বসিয়া ডাক্তার রণবীর একটি মোটা চুরুট টানিতেছে ও একদৃষ্টে আলতার পানে তাকাইয়া আছে; রণবীরের চেহারা গজস্কন্ধ, কথা বলিবার ভঙ্গী ঈষৎ মুরুব্বিয়ানা ব্যঞ্জক। অদূরে আর একটি সেটির একপ্রান্তে কুমার অর্ধশয়ান থাকিয়া দীর্ঘ হোলডারে সিগারেট টানিতেছে, তাহার দুঃস্বপ্নভরা দৃষ্টি শূন্যে নিবদ্ধ। সে কবিতা-প্রিয় ও কল্পনা-বিলাসী, অধিকাংশ সময় কবিতা উদ্ধৃত করিয়া কথা বলে। ঐ সেটিতে মৃত্যুঞ্জয় বসিয়া আছেন; কোট-প্যাণ্ট পরা, বেঁটে গোঁপ-কামানো ব্যক্তি, মুখের বর্ণ এত কালো যে হাসিলে দাঁতগুলি অস্বাভাবিক সাদা দেখায়, কিন্তু তিনি স্বভাবত গম্ভীর। তাঁহার হাতে একটি চামড়ার স্যাচেল। গান চলিতেছে—

আমার মন-চুয়ানো মধু—
ঝরবে যখন—বাতাসে ক্ষরবে যখন
—আসবে না কি বঁধু?
গন্ধে যখন ভরবে চরাচর
আসবে না কি মধু-মাতাল
পাগল মধুকর?
ওগো তার তরে যে আমি
পথটি চেয়ে কাটাই দিবাযামী,
আমার বুকের বরমালা
সুখের মধু-ঢালা
পরিয়ে দেব তার গলাতে
আসবে যখন বরমালার বর—
মধু-পাগল মধুকর!

গান শেষ হইলে পুরুষগণ মৃদুহস্তে করতালি দিলেন; ঝর্ণা লজ্জিত মুখে আলতার পাশ ঘেঁষিয়া বসিল।

আলতা। বরমালার বরের জন্যে ভারি অস্থির হয়ে পড়েছিস্ যে! দেখিস্, মন-চুয়ানো মধু যাকে তাকে দিয়ে ফেলিস নি যেন; একটা কাচের জারের মধ্যে যত্ন করে ধরে রাখিস্!

ঝর্ণা। যাঃ! আলতাদি'র সবতাতেই ঠাট্টা! সকলে মিলে গাইতে বললেন তাই গাইলুম, নইলে আমি কি ভাল গান জানি?

রণবীর। কেন, আপনি তো ভালই গাইলেন। আপনার গলাটি বেশ মিষ্টি!

মৃত্যুঞ্জয়। মিষ্টি! খুব মিষ্টি! ভয়ঙ্কর মিষ্টি! একদম মিষ্টি!

সকলে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিলেন

আলতা। খুব সাবধানে থাকিস ঝর্ণা। তোর গলা যে রকম ভয়ঙ্কর মিষ্টি, হয়তো কোনদিন পিঁপড়ে ধরবে। মাঝে মাঝে রোদ্দুরে দিস্!

মৃত্যুঞ্জয়। (হঠাৎ হাস্য) হিঃ হিঃ হিঃ—

কুমার। (নিজ মনে) দেবি, মরণে ভাবিনা আর ভয়ঙ্কর অতি।
তুমি যাহে দেছ পদ, সে যে ফুল্ল কোকনদ
সে নহে শ্মশান-চন্ডী ভীষণ মূরতি॥

মৃত্যুঞ্জয় হাসিতে হাসিতে কুমারকে অকস্মাৎ চিমটি কাটিলেন;
কুমার চমকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মৃত্যুঞ্জয়। হিঃ হিঃ হিঃ— (হঠাৎ গম্ভীর হইলেন)

কুমার। (রণবীরকে জনান্তিকে) কে হে লোকটা?

রণবীর। চিনি না। বোধ হয় ত্রিদিববাবুর বন্ধু!—কি হয়েছে?

কুমার। মনে হল হঠাৎ আমাকে চিমটি কাটলে!

রণবীর। বল কি! চিমটি কাটলে!—না, ও তোমার ভুল। হয়তো ছারপোকা কামড়েছে—

কুমার। ছারপোকা! তা হবে—

ছারপোকা কামড়েছে নিতম্ব ফুলে গেছে
ছারপোকাগুলো ভারি বজ্জাৎ!

মৃত্যুঞ্জয়। (ঝর্ণাকে) গলা সম্বন্ধে আপনার খুব সাবধান হওয়া দরকার।

ঝর্ণা। (শঙ্কিত) কেন? কি হয়েছে?

মৃত্যুঞ্জয়। গলা খারাপ হয়ে গেলেই গেল। কিন্তু ইন্সিওর করে রাখলে আর লোকসানের ভয় নেই।

ঝর্ণা। গলাও কি ইন্সিওর করা যায় নাকি?

মৃত্যুঞ্জয়। চুলের ডগা থেকে পায়ের সুকতলা পর্যন্ত ইন্সিওর করা যায়। এই দেখুন— (স্যাচেল খুলিতে উদ্যত)

রণবীর। ও—আপনি বীমার দালাল।—কিন্তু এখানে ঢুকলেন কি করে?—বলি, ত্রিদিববাবুর সঙ্গে পরিচয় আছে—না দোর খোলা দেখে ঢুকে পড়েছেন?

মৃত্যুঞ্জয়। পরিচয় আছে—তিনি আমার একটি লাইফ!

রণবীর। তাহলে আর কিছু বলবার নেই।—যাক, বাজে সময় নষ্ট হচ্ছে। ত্রিদিববাবু যখন আমাদের নিমন্ত্রণ করে নিজেই অনুপস্থিত, তখন তাঁর কর্তব্য আমরাই করি। মিস আলতা, ঝর্ণা দেবীর গানের পরে আপনার নৃত্য ছাড়া আর কিছু জমবে না। সুতরাং—একটা অজন্তা-নৃত্য—

আলতা। কিন্তু আমি তো নাচের ড্রেস পরে আসিনি।

রণবীর। কোনও ক্ষতি নেই। (সাগ্রহ মৃদু কণ্ঠে)—আপনি যে বেশেই নাচুন, আমি মুগ্ধ হবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি। মিস আলতা, সেদিন মিলন-মন্দিরের উৎসবে একটিবার আপনার নৃত্য দেখেছিলুম, সেই থেকে প্রত্যহ রাত্রে আমি আপনাকে স্বপ্ন দেখি—

আলতা। (পাখার দ্বারা মৃদু প্রহার করিয়া) মিথ্যে কথা বলতে আপনাদের একটুও বাধে না।

রণবীর। মিথ্যে কথা নয়—এই অগ্নি ছুঁয়ে বলছি— (সিগার তুলিয়া ধরিল)

আলতা। আচ্ছা আচ্ছা—!

রণবীর। তাহলে নাচুন।

আলতা। আপনার যখন এত আগ্রহ—, ঝর্ণা, তুই একটা নাচের গান বাজা— (উঠিল)

মৃত্যুঞ্জয়। আপনার পা দুটি ইন্সিওর করা আছে তো! যদি না থাকে—

রণবীর। কোনও লোকসান হবে না! কারণ উনি প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলা দেখাবেন, বিলিতি জিমনাস্টিক দেখাবেন না।

মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ হাসিয়া রণবীরের পেট খামচাইয়া ধরিলেন।

মৃত্যুঞ্জয়। হিঃ হিঃ হিঃ—

রণবীর। ও কি মশাই, পেট খামচাচ্ছেন কেন। ছাড়ুন—ছাড়ুন! আরে, এ তো বিপদ হল দেখছি! আপনি কি রকম ভদ্রলোক মশাই!

অপরিমিত হাস্যে মৃত্যুঞ্জয় রণবীরকে খামচাইতে লাগিলেন।

ত্রিদিবের প্রবেশ

সুশ্রী সুগঠন, বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি।

ত্রিদিব। এ কি! কি হয়েছে! এত হৈ চৈ কিসের?

রণবীর। কোথা থেকে এক বদ্ধ পাগল জুটিয়েছেন, বলা নেই কওয়া নেই খামচে খামচে গায়ের মাংস তুলে নিলে।

ত্রিদিব। তাইতো! এ যে মৃত্যুঞ্জয়! কি সর্বনাশ, ওর সামনে কেউ হাসির কথা বলেছে নাকি?

আলতা। কই, তেমন কিছু তো নয়। কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

ত্রিদিব। তাতেই সর্বনাশ হয়েছে। ওর হাসি পেলে আর রক্ষে নেই। এমনিতে মৃত্যুঞ্জয় বেশ গম্ভীর প্রকৃতির লোক, কিন্তু একবার হাসি পেলে আর ওকে সামলানো যায় না, হাত পা ছুঁড়ে আঁচড়ে কামড়ে ও একেবারে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দেয়।

কুমার। তাহলে ছারপোকা নয়, আমাকে চিমটি কেটেছিল।

ত্রিদিব। যাক্ যাক্। মৃত্যুঞ্জয়, তুমি চুপ করে ব'স! (সকলকে সম্বোধন করিয়া) আমার বড় ত্রুটি হয়ে গেছে, আপনাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে উপস্থিত থাকতে পারিনি। আলতা—তোমাদের কাছে অর্থাৎ মহিলাদের কাছে আমি বিশেষভাবে মার্জনা চাইছি।

আলতা। কোথায় গিয়েছিলেন যে এত দেরি হল?

ত্রিদিব। হঠাৎ এমন একটা কাজ পড়ে গেল যে অবহেলা করবার উপায় নেই। যাক, আমি আসার জন্যে আমোদ-প্রমোদে যেন বিঘ্ন না হয়। যেমন চলছিল চলুক।

রণবীর। আমরা মিস আলতার একটি নৃত্য দেখবার আশায় তাঁকে অনুরোধ করছিলুম —এমন সময়—

ত্রিদিব। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) নৃত্য! আলতা, তুমি—নাচবে?

আলতা। রণবীরবাবু অনুরোধ করলেন, আর—সকলেরই ইচ্ছে—তাই—

ত্রিদিব। (গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে) বেশ—সকলেরই যখন ইচ্ছে, আর তোমারও যখন অনিচ্ছে নেই, তখন তাই হোক।

রণবীর। (তীক্ষ্ণ কণ্ঠে) আপনার অনিচ্ছা আছে না কি? আপনি একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, আপনার কাছ থেকে এটা তো প্রত্যাশা করিনি।

ত্রিদিব। আমি বিলেত ফেরত বটে এবং শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকি। তবু পুরকন্যাদের প্রকাশ্যে নাচানাচির ব্যাপারটা ঠিক বরদাস্ত করতে পারি না রণবীরবাবু। কিন্তু আমার মতামতে কিছু আসে যায় না। আপনারা আজ আমার অতিথি, আপনাদের মনোরঞ্জন করাই আমার কর্তব্য। এমন কি আপনারা যদি আমাকে নাচতে বলেন তাহলে হয়তো আমাকেই নাচতে হবে—(মৃত্যুঞ্জয় হাসিবার উপক্রম করিল) হাসির কথা নয়—হাসির কথা নয়, তুমি চুপ করে ব'স।

রণবীর। বেশ, তাহলে এবার আরম্ভ হোক—

ঝর্ণা উঠিয়া গিয়া পিয়ানোতে বসিল এবং গান গাহিতে আরম্ভ করিল।
গানের ভাব ও ছন্দানুযায়ী আলতা নৃত্য করিল।

ঝর্ণা ঝরার ছন্দেরে—
নেচে চল্ জল-ধারার
আকুল আনন্দেরে।
নেচে চল্ পিছল স্রোতে
ছড়ানো উপল পথে
মেখে নে রবির হাসি
বনফুলের গন্ধ রে!
মনে যে লাগল পরশ
ফাগুনের ফেনিল হরষ—

চামেলি পড়ল খসে
শিথিল বেণী বন্ধে রে!

নৃত্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ সমস্ত আলো নিভিয়া গেল। অন্ধকারে গণ্ডগোল—'কি হল! মেন ফিউজ পুড়ে গেছে'—ত্রিদিবের কণ্ঠস্বরে—'আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমি আলোর ব্যবস্থা করছি। বেয়ারা! বেয়ারা!' অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ অনৈসর্গিক হাসিতে গোলমাল স্তব্ধ হইয়া গেল! পাঁচ সেকেণ্ড পরে আবার আলো জ্বলিয়া উঠিল। সকলে পরস্পর তাকাইতে লাগিলেন। তারপর ত্রিদিব দেখিতে পাইলেন অদূরে একটি টীপাইয়ের উপর লাল খাম রাখা আছে—

ত্রিদিব। একি! খাম কোথা থেকে এল?

(খাম ছিঁড়িয়া লাল পাঞ্জা বাহির করিলেন)

ত্রিদিব। লাল পাঞ্জা!

সকলে। (বিভিন্ন স্বরে) লাল পাঞ্জা—

ত্রিদিব। পাঞ্জার ওপর কি লেখা রয়েছে দেখছি—(পাঠ) আলতা দেবীর পিতা—

(থামিয়া গেলেন)

আলতা। (ভয়ার্ত কণ্ঠে) কি—কি হয়েছে ত্রিদিববাবু?

ত্রিদিব। কিছু না। (পাঞ্জা মুষ্টিতে তাল পাকাইয়া পকেটে রাখিলেন) আলতা, চল, এখনি তোমাকে বাড়িতে যেতে হবে।

আলতা। কেন? বাবার কথা কি লেখা আছে ওতে?

ত্রিদিব। তিনি হঠাৎ—অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। চল আলতা।

রণবীর। অসুস্থ! তাহলে তো আমার যাওয়া দরকার, আমি ডাক্তার। ত্রিদিববাবু, আপনি থাকুন, আমি আলতা দেবীকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

ত্রিদিব। আপনার আর দরকার হবে না রণবীরবাবু।

আলতা। অ্যাঁ! তবে কি—তবে কি—!

ত্রিদিব। এস আলতা।

(আলতাকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান)

কুমার। দারুণ দেবতার ডাক যে পেল তার
আগুন লাগিয়াছে সুখের ঘরে

সহসা একটি মুণ্ড সেটির পিছন হইতে উঁকি মারিল

রণবীর। ও কি! কে তুমি! বেরিয়ে এস।

একটি ভদ্রবেশী যুবক বাহির হইয়া আসিল

রণবীর। আপনিও কি ত্রিদিববাবুর অতিথি নাকি?

যুবক। ত্রিদিববাবু আমাকে নিমন্ত্রণ করতে ভুলে গিয়েছিলেন।

রণবীর। বটে! কে আপনি?

যুবক। দেখতেই পাচ্ছেন, আপনাদের মত একজন ভদ্রলোক।

রণবীর। হুঁ—এখানে ঢুকলেন কখন?

যুবক। এই সবে মাত্র ঢুকে আপনাদের লীলা খেলা দেখতে আরম্ভ করেছিলুম এমন সময় আলো নিভে গেল।

রণবীর। নাম কি?

যুবক। লালচাঁদ পাঞ্জা।

মৃত্যুঞ্জয়। (হঠাৎ চীৎকার করিয়া) লাল পাঞ্জা—লাল পাঞ্জা। ধরেছি—

(যুবককে চাপিয়া ধরিলেন)

যুবক। ছেড়ে দাও বাবা বীমা কোম্পানী। আমাকে বীমা করিয়ে কোন লাভ হবে না, হয়তো ফার্স্ট প্রিমিয়াম দিতে না দিতে দেখবে ফোৎ হয়েছি। কেন মিছে লোকসান দেবে—ছেড়ে দাও।

মৃত্যুঞ্জয়। ধরেছি—লাল পাঞ্জা—ধরেছি—

যুবক। ছাড়বে না। নিতান্তই তাহলে কাতুকুতু দিতে হল দেখছি।

মৃত্যুঞ্জয়কে বগলে কাতুকুতু দিল, মৃত্যুঞ্জয় তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া উচ্চৈস্বরে হাস্য ও দাপাদাপি করিতে লাগিল। যুবক সকলের ধরিবার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া পলায়ন করিল

রণবীর। যাঃ! নিশ্চয় লাল পাঞ্জা—(মৃত্যুঞ্জয়কে) আঃ থামুন না মশাই, লাফাচ্ছেন কেন?

মৃত্যুঞ্জয়। লাল পাঞ্জা—কাতুকুতু—(লাফাইতে লাগিলেন)

দ্বিতীয়

প্রথম দৃশ্য

অজয়ের বহিঃকক্ষ। ঘরের একপাশে তক্তাপোশের উপর ফরাশ পাতা, কয়েকটি চেয়ারও আছে। অজয় ফরাশের উপর একটি তাকিয়া কোলে লইয়া বসিয়া আছে; ত্রিদিব একটি চেয়ারে উপবিষ্ট। পূর্বোক্ত ঘটনার পর মাসাবধি কাল অতীত হইয়াছে।

সময়—প্রভাত।

অজয়। তাহলে আশুবাবুর উইলের নড়্‌চড়্‌ হতে পারে না?

ত্রিদিব। না।

অজয়। অর্থাৎ আমাকেই আলতা দেবীর অভিভাবক হতে হবে।

ত্রিদিব। হ্যাঁ। তবে তুমি ইচ্ছা করলে আদালতে দরখাস্ত দিয়ে ও-পদ ত্যাগ করতে পার। আইনত তোমার ওপর কোনও জোর নেই।

অজয়। আমি যদি পদত্যাগ করি তাতে কি ফল হবে?

ত্রিদিব। আলতা আপাতত আদালতের শাসনাধীনে চলে যাবে; তারপর কোর্ট যাকে ভার দেবেন সেই অভিভাবক হবে।—কোর্ট সম্ভবত আলতার পিতৃবন্ধু কেশববাবুকেই তার গার্জেন নিযুক্ত করবেন এবং কেশববাবুরও সম্ভবত তাতে আপত্তি হবে না।

অজয়। ও—(চিন্তিত মুখে নীরব রহিল)

ত্রিদিব। কিন্তু তুমি এত উদ্বিগ্ন হচ্ছ কেন আমি তো বুঝতে পারছি না। আলতার অভিভাবক হওয়া এমন কি দুর্ঘটনা যে তুমি সেই চিন্তাতেই একেবারে কাবু হয়ে পড়েছ? জানো, এ সৌভাগ্য পাবার জন্যে কত বড় বড় লোক লোলুপ হয়ে আছে!

অজয়। তুমি বুঝছ না ত্রিদিবদা। আমি দীন-দরিদ্র—অনাথাশ্রমে মানুষ হয়েছি, এই পাহাড়-প্রমাণ দায়িত্ব আমি কি বহন করতে পারব?

ত্রিদিব। ভাই, দীন-দরিদ্রের কাঁধই সবচেয়ে বেশী মজবুত হয়, সুতরাং পাহাড়-প্রমাণ দায়িত্ব যদি কেউ বহন করতে পারে তো দীন-দরিদ্রই পারে। যাঁরা রূপোর চামচে মুখে করে জন্মগ্রহণ করেছেন, শেষ পর্যন্ত চামচেটা বহন করবার ক্ষমতাও আর তাঁদের থাকে না। যেমন ধর আমি। বাবা অনেক টাকা রেখে গিয়েছিলেন, তাই বিলেত থেকে ব্যারিস্টারী পাস করে এসেছি; কিন্তু এমন অকর্মণ্য যে, সে বিদ্যেটা কাজে লাগাবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। আমার ব্যারিস্টারী করা প্রায় লুকোচুরি খেলার মত দাঁড়িয়েছে।

অজয়। কি রকম?

ত্রিদিব। হয় মক্কেল আমাকে দেখে পালায়, নয় আমি মক্কেল দেখে পালাই—এই আর কি।

অজয়। (হাসিয়া) ত্রিদিবদা, তুমি নিজের মূল্যটা কমাতেই ভালবাস—কিন্তু তাতে কি সকলকে ঠকানো যায়! তুমি যে কি বস্তু তা আমি জানি।

ত্রিদিব। আমি আবার কী বস্তু?

অজয়। মুখের সামনে বলব না; কিন্তু আমি জানি।

ত্রিদিব। আরে এ যে হেঁয়ালির মত ঠেকছে, নিন্দে করছ কি প্রশংসা করছ বুঝতেই পারছি না! (সহসা সচকিতভাবে) আরে সর্বনাশ! তুমি আমাকে লাল পাঞ্জা বলে সন্দেহ করছ না তো? (অজয় হাসিতে লাগিল) আরে কি বিপদ! তুমি কি ক্ষেপে গেলে নাকি!

অজয়। ও কথা থাক। জানো, যে রাত্রে আশুবাবু মারা যান সেদিন সকালে তিনি লাল পাঞ্জার চিঠি পেয়েছিলেন?

ত্রিদিব। অ্যাঁ—তাই নাকি?

অজয়। আর, আমার বিশ্বাস তাইতেই ভয় পেয়ে তিনি এই অসম্ভব উইল তৈরি করেছিলেন।

ত্রিদিব। না—না—ও তোমার বাজে কথা। আশুবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন; আর উইলের ব্যবস্থাও এমন কিছু মন্দ করে যাননি। যদিও—কেশববাবুকে সম্পত্তির ট্রাস্টি করাটা সুবিবেচনার কাজ হয়েছে কি না বলতে পারি না, ভয়ানক ধূর্ত আর ধড়িবাজ বলে বাজারে লোকটার নাম ডাক আছে। কিন্তু তোমাকে যে আশুবাবু আলতার গার্জেন নিযুক্ত করে গেছেন এইটেই সব চেয়ে আনন্দের কথা।

অজয়। তুমিও এই কথা বলছ ত্রিদিবদা?

ত্রিদিব। নিশ্চয় বলছি। আমার বিশ্বাস আলতার তোমার মত একজন অভিভাবকের দরকার হয়েছিল। তোমাকে সত্যি বলছি অজয়, আলতা সম্প্রতি যেন একটু বাড়াবাড়ি করছিল; আমাদের দেশে বাঙালীর ঘরের মেয়ের পক্ষে যা যা অশোভন, তাই যেন সে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় করছিল—

অজয়। লাল পাঞ্জাও তাই লিখেছিল।

ত্রিদিব। অ্যাঁ—বল কি! আরে এ তো বড় মুশকিল হল দেখছি! আমি যা বলি লাল পাঞ্জাও যদি তাই বলে—

অজয়। তাহলে সন্দেহের কারণ হয়ে পড়ে। (হাস্য)

ত্রিদিব। না, না, হাসির কথা নয়—

অজয়। হাসির কথা নয়, ভয়ানক গম্ভীর কথা। ত্রিদিবদা শোনো, আলতার দায়িত্ব গ্রহণ করাই আমি স্থির করেছি।

ত্রিদিব। এই তো চাই! দায়িত্ব ভারী বলে যদি ভয় পাও, তাহলে তোমার মনুষ্যত্বের মূল্য কি?

অজয়। মনুষ্যত্বের মূল্য আমার যাই হোক, তবু ভয় যে পাচ্ছি ত্রিদিবদা তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। দায়িত্ব নিতেই হবে জানি, তবু ভয় কিছুতেই যাচ্ছে না।

ত্রিদিব। ভয়টা কিসের?

অজয়। নিজের দুর্বলতার। বুঝতেই পারছ, আমায় কঠোর হতে হবে। যদি কঠোর হতে না পারি?

ত্রিদিব। (ঘাড় নাড়িয়া) তা বটে। আলতাকে শাসনে রাখা খুব সহজ হবে না।

অজয়। আজই সে এ বাড়িতে আসবে। এখানেই তার থাকার ব্যবস্থা করেছি; কারণ দূরে থেকে তো অভিভাবক হওয়া চলে না। তাকে আমার কাছে আমার বাড়িতে থাকতে হবে।

ত্রিদিব। সে তো ঠিক কথা। (ইতস্তত করিয়া) উইলের সব provision আমি জানি না। তোমার সম্বন্ধে কি রকম ব্যবস্থা হয়েছে?

অজয়। নগদ বিশ হাজার এবং যতদিন অভিভাবক থাকব ততদিন মাসিক আড়াই শ

টাকা পাব।

ত্রিদিব। ও—নগদ বিশ হাজার কিসের জন্যে?

অজয়। তা ঠিক জানি না। শুনেছি আশুবাবু নাকি আমার বাবার কাছে কোনো সময়ে ঐ টাকা ধার করেছিলেন, তাই বোধ হয় মৃত্যুকালে শোধ দিয়ে গেলেন।

ত্রিদিব। ও—

অজয়। ত্রিদিবদা, এখন যদি কিছু উপদেশ দেবার থাকে তো দাও—

ত্রিদিব। কিছু দরকার হবে না অজয়! তুমি নিজে ভাল বুঝে যে পথে চলবে সেইটেই হবে সব চেয়ে ভাল পথ। উপদেশ দিয়ে তোমাকে বিব্রত করব না; তবে মাঝে মাঝে এসে তোমাদের নূতন ঘরকন্না দেখে যাবো। (ঈষৎ গাঢ়স্বরে) আলতা আমার—অশেষ স্নেহের পাত্রী, শুধু এইটুকু স্মরণ রেখো! আজ উঠলুম—

অনসূয়ার প্রবেশ

তন্বী দীর্ঘাঙ্গী, মাথায় কোঁকড়া চুল, চোখ দুটি হরিণের মত আকর্ণ-বিস্তৃত। মুখখানি স্বভাবত ম্লান, হাসিলে মনে হয় যেন জোর করিয়া হাসিতেছে। পরিধানে মামুলি শাড়ি-শেমিজ।

অন। অজয়দা, আজ কি চা খেতে হবে না—

(ত্রিদিবকে দেখিয়া সরিয়া আসিল)

অজয়। অনু, দু'পেয়ালা চা দিয়ে যাও— (অনসূয়ার প্রস্থান)

ত্রিদিব। (বিস্মিতভাবে) এ মেয়েটি কে?

অজয়। অনসূয়া—আমার বোন।

ত্রিদিব। বোন! তোমার বোন আছে তা তো জানতুম না!

অজয়। আমিও জানতুম না। একদিন গভীর রাত্রে গঙ্গার ঘাটে ওকে কুড়িয়ে পেয়েছি।

ত্রিদিব। আরে তুমি যে অবাক করলে দেখছি। গঙ্গার ঘাটে বোন কুড়িয়ে পেলে কি রকম?

অজয়। সে অনেক কথা ত্রিদিবদা, আর একদিন বলব। ওর কাহিনী বড় দুঃখের। সংসারে ওর ঠাঁই ছিল না, তাই গঙ্গায় ডুবতে যাচ্ছিল। আমি কুড়িয়ে এনে ওকে আমার কাছে রেখেছি।

ত্রিদিব। কুমারী?

অজয়। হ্যাঁ, কুমারী।

ট্রে'র উপর দু'পেয়ালা চা লইয়া অনসূয়ার প্রবেশ

অজয়। অনু, ইনি ত্রিদিববাবু, এ'কে আমি দাদা বলি।

(অনসূয়া ত্রিদিবকে প্রণাম করিল)

ত্রিদিব। আরে হয়েছে হয়েছে। কি বলে আশীর্বাদ করতে হয় অজয়? হ্যাঁ—হ্যাঁ—চিরজীবিনী হও। (হাস্য) ম্লেচ্ছ সংসর্গে থেকে সব ভুলে মেরে দিয়েছি।

অন। ও আশীর্বাদ করবেন না, আশীর্বাদ করুন যেন শিগ্‌গির মরতে পারি।

অজয়। ছি অনু, আমার কাছে কি দিব্যি করেছ ভুলে গেলে!

অন। আচ্ছা—আর বলব না।

ত্রিদিব। না না, ও সব কথা একেবারেই বলা উচিত নয়। ভয়ানক গর্হিত কথা। (চা পান করিয়া) আঃ কি চমৎকার চা তৈরি করেছ। বেয়ারার হাতের চা খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গিয়েছে, এবার থেকে ভাল চা খাবার ইচ্ছে হলেই অনুর কাছে চলে আসব—কি বল অনু? তুমি যখন অজয়ের বোন, তখন আমারও বোন। অর্থাৎ আমিও তোমার দাদা।

অন। দাদা—(সহসা আঁচলে মুখ ঢাকিল)

ত্রিদিব। (বিপন্নভাবে) কি হল! ঐ রে, হয়তো কি বেফাঁস কথা বলে ফেলেছি! নাঃ আমি উঠলুম অজয়—কোর্টের বেলা হয়ে গেল। মক্কেল না থাক, বার-লাইব্রেরিতে হাজরি তো দিতে হবে। (প্রস্থান)

অজয়। অনু, তোমার নিজের দাদা আছেন—না?

অনসূয়া উত্তর দিল না, ফোঁপাইতে লাগিল

অজয়। কেন তাঁর নাম বলছ না অনু; নাম বললেই আমি তাঁকে খুঁজে বার করতে পারি।

অন। না—না, সে আমি পারব না। (দ্রুত প্রস্থান)

অজয় বিষণ্ণভাবে বসিয়া রহিল। সহসা আলতার প্রবেশ
অজয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল

আলতা। অজয়বাবু, এ কথা কি সত্য? আমাকে আপনার বাড়িতে থাকতে হবে?

অজয়। হ্যাঁ, সেই রকম ব্যবস্থাই হয়েছে।

আলতা। কিন্তু এর মানে কি! আমি নিজের বাড়িতে থাকতে পাব না কেন?

অজয়। তার অনেক কারণ আছে। একটা কারণ এই যে, অতবড় বাড়ি তোমার একার জন্যে দরকার নেই, তাই ওটা কেশববাবু ভাড়া দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

আলতা। কিন্তু এ কি অত্যাচার! আমি নিজের বাড়িতে থাকতে পাব না?

অজয়। এ বাড়িকে তোমার নিজের বাড়ি মনে করতে পার।

আলতা। কিন্তু আমি এখানে থাকতে চাই না। (চারিদিকে অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে তাকাইয়া) এ রকম বাড়িতে থাকা আমার অভ্যেস নেই, আমি থাকতে পারব না।

অজয়। অবস্থাগতিকে মানুষকে গাছতলায় থাকতে হয়—এ বাড়িটা তো আমার মন্দ বোধ হয় না; অনেক দিন এতে আছি, কোনও কষ্ট হয়নি। তোমারও কষ্ট হবে না।

আলতা। (জ্বলিয়া উঠিয়া) আপনি আমায় ঠাট্টা করছেন!

অজয়। তোমার সঙ্গে আমার ঠাট্টার সম্বন্ধ নয়, আমি তোমার অভিভাবক।

আলতা। তা আমি জানি। বাবা যে ভুল করে গেছেন সেই ভুলের সুযোগ নিয়ে আপনি আমাকে জব্দ করতে চান। কিন্তু আমি আপনার শাসন মানি না, আমি আমার নিজের ইচ্ছামত চলব। মনে রাখবেন, এটা স্ত্রী স্বাধীনতার যুগ, নারী নির্যাতন এ যুগে অচল!

অজয়। তা আমার মনে আছে। কিন্তু তুমি কি করতে চাও?

আলতা। আমি এখানে থাকব না।

অজয়। কিন্তু এখানে ছাড়া আর তো কোথাও তোমার আশ্রয় নেই। কেউ আশ্রয় দেবেও না; কারণ আশ্রয় দিলে তাকে আইনত অপরাধী হতে হবে।

আলতা। (বিবর্ণ মুখে) আশ্রয় নেই! কেউ আমাকে আশ্রয় দেবে না!

অজয়। না।

আলতা চেয়ারে বসিয়া পড়িল

আলতা। তাহলে এইখানেই আমাকে থাকতে হবে?

অজয়। হ্যাঁ।

আলতা। উঃ এ অসহ্য! অসহ্য! (প্রজ্জ্বলিত চক্ষে) অজয়বাবু, আপনার মতলব আমি বুঝেছি। আপনি আমাকে নিজের কবলে এনে—(পদদাপ) কিন্তু তা হবার নয়। আমার প্রাণ থাকতে তা হবে না জানবেন।

অজয়। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না, বোঝবার দরকারও নেই। মোট কথা, তুমি এই বাড়িতে থাকবে এবং আমার মতানুযায়ী চলবে। এর বেশী কিছু আমি তোমার কাছে চাই না, কোনোদিন প্রত্যাশাও করব না। এবার তুমি ভেতরে যাও। এখনি হয়তো কোনও লোক আসবে।

আলতা। (রুদ্ধ বিদ্রূপের সুরে) আমাকে কি হারেমের মধ্যে পর্দানশীন হয়ে থাকতে হবে?

অজয়। না। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পুরুষের সঙ্গে বেশী মাখামাখিও আমি পছন্দ করি না।

আলতা। উঃ ষড়যন্ত্র! আজ বাবা নেই—তাই—

(মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল)

অনসূয়ার প্রবেশ

অন। ওমা! আলতা এসেছে? (দ্রুতপদে নিকটে গিয়া হস্তধারণ পূর্বক) এস ভাই।

আলতা। (মুখ তুলিয়া) তুমি আবার কে?

অন। (আলতার মুখ দেখিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে) অ্যাঁ! আলতা এত সুন্দর! অজয়দা, কি দুষ্টু তুমি—একবারও তো বলনি যে আলতা এত সুন্দর! এ যে চোখ ফেরানো যায় না।

আলতা। তুমি কে?

অন। আমার পরিচয় পরে দেব ভাই—এখন এস (হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল) সকাল-বেলাই বুঝি রাগারাগি কান্নাকাটি করতে আছে? তাহলে সমস্ত দিনটা খারাপ যায়। চল, তুমি আসবে শুনে কখন থেকে চা-টা সব তৈরি করে রেখেছি; এতক্ষণে সব ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল।

অজয়। ঠাণ্ডা জলই ভাল। তাতে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হতে পারে।

আলতা। অজয়বাবু, আপনি—আপনি—উঃ, লাল পাঞ্জা এত লোককে শাস্তি দেয়, আপনাকে শাস্তি দিতে পারে না।

অনসূয়া আলতাকে টানিয়া লইয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

(পার্কের এক অংশ। পার্ক ঘিরিয়া বড় বাড়ি দেখা যাইতেছে। কাল—মধ্যাহ্ন)
একটি বেঞ্চের উপর লালচাঁদ বসিয়া আছে ও নিজ মনে আঙুল গণিয়া জল্পনা করিতেছে।

লালচাঁদ। এক দুই তিন চার।—না, পাঁচ। মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে বাদ দেওয়া চলে না। সর্বসাকুল্যে পাঁচটি। জাল ক্রমে গুটিয়ে আসছে।

শেখরনাথ ঈষৎ টলিতে টলিতে প্রবেশ করিল ও লালচাঁদের পাশে উপবিষ্ট হইল। তাহার গায়ে ময়লা টুইলের সার্ট; মাথার চুল উস্কখুস্ক। চেহারা ভাল কিন্তু অত্যধিক অত্যাচারে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে; চক্ষে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ

শেখর। (লালচাঁদকে নিরীক্ষণ করিয়া) তুমি ছোটলোক।

লালচাঁদ। তাই নাকি! কিন্তু মশাই এত শিগ্‌গির বুঝলেন কি করে?

শেখর। তোমার গায়ে ভদ্রলোকের সাজ পোশাক, সুতরাং তুমি ছোটলোক হতে বাধ্য। যারা ছোটলোকের মত জামাকাপড় পরে কিম্বা একেবারেই পরে না, তারাই শুধু ভদ্রলোক।

লালচাঁদ। নেহাৎ মিথ্যে নয়। কিন্তু এই দিব্যজ্ঞানটি লাভ হল কি করে? আপনা-আপনি, না দ্রব্যগুণে?

শেখর। তোমার মত একটা ছোটলোককে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি—কিন্তু পাচ্ছি না। হয়তো তুমিই সে! (সন্দেহপ্রখর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হইল)

লালচাঁদ। দোহাই আপনার, আমি আর যা হই, 'সে' নই। এই আপনার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি।

শেখর। সব গুলিয়ে যাচ্ছে—টাকাকড়ি যা ছিল, ফুরিয়ে গেছে; শেষ কপর্দক শুঁড়ির বাড়ি দিয়ে এসেছি। (হাস্য) শেষ পারাণীর কড়ি আমার কণ্ঠে নিলাম গান—একটা গান শুনবে?

লালচাঁদ। যদি দেহতত্ত্ব না হয়, শুনতে রাজী আছি।
শেখর। দেহতত্ত্ব নয়—মনস্তত্ত্ব। মাতালের মনস্তত্ত্ব।

গীত

ওগো বহ্নি, জ্বলো জ্বলো
বহে জীবন নদী খর বৈতরণী
কল কল ছলছল!
তারি তীরে সে তিমিরে
প্রাণ-বহ্নি জ্বলো জ্বলো।
হাসে মৃত্যু বিষ-কণ্ঠে খল খল
নাচে ধ্বংস—কাঁপে পৃথ্বী টলমল;
তারি ছন্দে মহানন্দে
চিতা-ধূমে শব-গন্ধে
প্রেম-বহ্নি, জ্বলো জ্বলো।

লালচাঁদ। গলাটি তো বেশ। চেহারা দেখেও ভদ্রলোক ধুড়ি—ছোটলোক বলেই বোধ হচ্ছে। লেখাপড়াও জানেন বলে মনে হয়। তবে এতটা অধঃপতন হল কি করে?

শেখর। অধঃপতন এখনো কিছুই হয়নি। ফাঁসির দড়ি দেখেছেন? সেই দড়ি গলায় জড়িয়ে যেদিন ফাঁসির মঞ্চ থেকে ঝুলে পড়ব সেইদিন হবে আমার চরম অধঃপতন; তার আগে নয়। (উঠিয়া কিছুদূর গিয়া) আমায় একটা চাকরি দিতে পারেন? আরও কিছুদিন বাঁচতে চাই। কিন্তু বাঁচতে হলে টাকা দরকার। দেবেন একটা চাকরি?

লালচাঁদ। (স্বগত) চাকরি আমি পকেটে নিয়ে বসে আছি? (প্রকাশ্যে) কি বললেন—চাকরি। এ আর বেশী কথা কি? ঐ যে সামনেই প্রকাণ্ড বাড়ি দেখছেন, ওর মালিক মস্ত বড় মানুষ,—প্রকাণ্ড ব্যবসাদার—ঐখানে চলে যান। চাকরি জুটতে কতক্ষণ?

শেখর। ঐ বাড়ি? আচ্ছা—(যাইতে যাইতে ফিরিয়া) আপনাকে নমস্কার। আপনার ভদ্রলোকের মত সাজ পোশাক বটে, তবু আপনি ভদ্রলোক! (প্রস্থান)

লালচাঁদ। (কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া) সত্যি মাতাল? না ঢং করছিল? কিছু মতলব নেই তো? (উঠিয়া) এখানে আর নয়, গা তুলতে হল। নাঃ আবার সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

কেশবের বহিঃকক্ষ। চেয়ার টেবিল ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত। টেবিলের ওপর টেলিফোন। কেশব একাকী বসিয়া কাজ করিতেছেন। টেলিফোন বাজিয়া উঠিল।

কেশব। হ্যালো...হ্যাঁ...স্টক্ ব্রোকারের অফিস থেকে কথা বলছেন? কি চাই...দর নামছে? না না, অ্যামালগামেটেড এখন ছাড়বেন না—আরও দশ হাজার কিনুন...হ্যাঁ হ্যাঁ, দশ হাজার কভার করতে হবে তো...ওসব বাজে বাজার গুজব; অ্যামালগামেটেড আবার চড়বে।...কী বলছেন, আপনার সন্দেহ আছে? ...শতকরা পঁচিশ টাকা অগ্রিম চাই? বেশ,

চেক পাঠিয়ে দিচ্ছি!...কি বলছেন?...অবশ্য আমার নামে কেনা হবে!...হ্যাঁ, আমার টাকা—আমার টাকা। আচ্ছা নমস্কার। (ফোন রাখিয়া ভ্রূকুঞ্চিত মুখে) আমার টাকা নয়, এ সন্দেহ ওদের হল কোত্থেকে? না, বেশী দেরি করলে চলবে না; তাড়াতাড়ি আলতার টাকা খাটিয়ে নিজের লোকসান তুলে নিতে হবে! বেশী জানাজানি হবার আগে—

(চেক লিখিয়া ঘণ্টি টিপিলেন; একটি কর্মচারী প্রবেশ করিল)

এই চেকখানা এখনি পাঠিয়ে দাও।

(চেক লইয়া কর্মচারীর প্রস্থান)

কেশব উঠিয়া চিন্তাক্রান্তমুখে পায়চারি করিলেন

কেশব। (চমকিয়া) কে ডাকলে?—না, 'কেশব' বলে আমাকে কে ডাকবে?—কিন্তু ঠিক যেন মনে হল কে ডাকলে,—'কেশব'—গলাটা যেন চেনা চেনা। না, ভুল শুনেছি। (মুখের উপর হাত চালাইয়া) সে রাত্রে লাল পান্নার সেই হাসি—(শিহরিয়া উঠিলেন)

ঝর্ণার প্রবেশ

ঝর্ণা। (উৎসুকভাবে) বাবা, গান শুনলে?

কেশব। গান!

ঝর্ণা। শোনোনি? পার্কে বসে কে একজন গাইছিল। ঐ তো তোমার জানালা খোলা রয়েছে, তবু শুনতে পাওনি? উঃ কি সুন্দর গান!

কেশব। না, আমি শুনিনি।

ঝর্ণা। (আবদারের সুরে) বাবা, আমাকে একজন ভাল গানের মাস্টার রেখে দাও না। গান শিখতে এত ইচ্ছে করে, কিন্তু শেখাবার কেউ নেই। সেদিন ললিতাদের বাড়িতে সকলে গান গাইতে বললেন, কিন্তু ভাল গান একটাও জানি না বলে গাইতে পারলুম না।

কেশব। গানের মাস্টার! আচ্ছা, দেখব—

ঝর্ণা। দেখো লক্ষ্মীটি। আজ ঐ গানটা এত ভাল লেগেছে, কিছুতেই ভুলতে পারছি না—('ওগো বহ্নি' গানের সুর ভাঁজিবার চেষ্টা করিল)

কেশব। ঝর্ণা, ভেতরে যাও—এখন কাজের সময়।

ঝর্ণা। (জিভ কাটিয়া) অফিসে বুঝি গান গাইতে নেই! আচ্ছা—কিন্তু মাস্টারের কথা মনে থাকে যেন— (প্রস্থানোদ্যত)

কেশব। তোমার দাদা বাড়িতে আছেন?

ঝর্ণা। দাদা তো নিজের ঘরে বসে বসে কবিতা আওড়াচ্ছে। কী যে হয়েছে দাদার! রাতদিন খালি কবিতা আর কবিতা। তাও যদি ভাল কবিতা হত। তা নয়, খালি দুঃখের কথা, শুনতে শুনতে মন খারাপ হয়ে যায়।

কেশব। হুঁ। তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

ঝর্ণা। আচ্ছা— (প্রস্থান)

আর্দালির প্রবেশ

আর্দালি। হুজুর, এক বাবু মুলাকাত মাংতে হ্যায়।

কেশব। ক্যা মাংতা?

আর্দালি। মালুম নেহি হুজুর।

কেশব। বৈঠনে বোলো।

আর্দালি। হুজুর— (প্রস্থান)

উদাস ভঙ্গীতে কুমার প্রবেশ করিল।
কেশব তাহাকে তীক্ষ্নচক্ষে নিরীক্ষণ করিলেন।

কেশব। কুমার, কি হয়েছে তোমার?

কুমার। দুঃখের বরষায়—

কেশব। থাক। আমি তোমার কাব্যের উচ্ছ্বাস শুনতে চাই না, আমি জানতে চাই তোমার কি হয়েছে।

কুমার নীরব রহিল

কেশব। তুমি জানো তোমার এই অবহেলায় আমার কত ক্ষতি হচ্ছে? আমি খবর পেলুম, আলতা সম্বন্ধে তুমি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে আছ। অন্য লোকে যখন তাকে নানা-ভাবে বশ করবার ফন্দি আঁটছে, তুমি আকাশের দিকে মুখ তুলে দুঃখের কবিতা আওড়াচ্ছো। এর মানে কি!

কুমার। এর মানে তো আপনি জানেন।

কেশব। (রুদ্ধস্বরে) সেই হতভাগা হা-ঘরে মেয়েটা। যাকে তুমি রংপুর থেকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলে—আর প্রত্যাশা করেছিলে যে তার সঙ্গে আমি তোমার বিয়ে দেব! মুখ্যু ইডিয়ট কোথাকার। যে তোমার সঙ্গে কুলত্যাগ করতে পারে, সে আর একজনের সঙ্গে তোমাকে ত্যাগ করতে পারে না? তাকে তুমি বিয়ে করতে চাও?

কুমার। বাবা—সে—তার কোনো দোষ নেই, আমি তাকে বিয়ে করব বলে—

কেশব। চুপ কর। বাপের সামনে এসব কথা উচ্চারণ করতে লজ্জা হয় না। রংপুরে তোমাকে ব্যবসার কাজে পাঠিয়েছিলুম, তুমি সেখানে গিয়ে এক কেলেঙ্কারি করে এলে! কোথাকার এক বিধবার মেয়ে, তাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলে। জানো, মেয়েটা যদি এখন মামলা করে, তোমাকে নিয়ে পুলিসে টানাটানি করবে?

কুমার। (অবরুদ্ধ কণ্ঠে) বাবা, সে মরে গেছে।

কেশব। (সাগ্রহে) মরে গেছে! যাক্। তাহলে তো কোনো গোলমালই নেই। যে মরে গেছে তার জন্যে আক্ষেপ করা বৃথা। শোনো কুমার, যে ছেলেমানুষী করে ফেলেছ তার আর চারা নেই, কিন্তু এখন থেকে সব ভুলে গিয়ে আলতার পেছনে লেগে থাক। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে, আলতার মত মেয়ে হাতের কাছে থাকতে অন্যদিকে তোমার মন যায়!

কুমার। কিন্তু—

কেশব। আবার কিন্তু! (গলা খাট করিয়া) আর একটা দিক ভেবে দেখছ না! যে সম্পত্তি এখন আলগোছে ধরে আছি, তুমি আলতাকে বিয়ে করলেই সেটা যে নিজের হয়ে যাবে। এতটুকু বিষয়বুদ্ধিও নেই!

কুমার। কিন্তু—

কেশব। (সক্রোধে) কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু। কোনো কথা শুনতে চাই না। আলতাকে তোমার বিয়ে করা চাই—বুঝলে? যেমন করে হোক। এই আমার হুকুম—যাও।

কুমার ক্ষণকাল হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে প্রস্থান করিল;
কেশব নিজে চেয়ারে বসিলেন।

কেশব। Young idiot! নিজের ইষ্ট বোঝে না!

আর্দালির প্রবেশ

আর্দালি। হুজুর, বাবুঠো আভিতক্ বৈঠা হ্যায়।

কেশব। ভেজ্ দেও।

আর্দালি। হুজুর— (প্রস্থান)

শেখর প্রবেশ করিল। নমস্কার করিবার জন্য হাত
তুলিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

কেশব। (কড়া সুরে) কে আপনি?

শেখর। আমি বেকার। নাঃ, বেকারই বা কেন? যার কাজ নেই, সে বেকার। আমার তো কাজ রয়েছে—মস্ত কাজ। দেখুন, আমার সব পয়সা ফুরিয়ে গেছে—তাই চাকরি খুঁজতে বেরিয়েছি।

কেশব। আপনি তো দেখছি মদ খেয়েছেন।

শেখর। ঠিক ধরেছেন, মদ খেয়েছি। যতক্ষণ পয়সা ছিল খেয়েছি। কিন্তু কেন খেয়েছি তা তো জানেন না!

কেশব। জানতে চাই না। আপনি বিদেয় হোন্—এখানে চাকরি হবে না।

শেখর। চাকরি হবে না! বেশ চললুম। (উঠিয়া) কিন্তু কেন মদ খাই সেটা জানা দরকার। আমার একটা বোন ছিল তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—কিন্তু পাচ্ছি না। বুকের মধ্যে একটা আগুন জ্বলছে, তাকে নিভতে দেওয়া হবে না, তাই অহর্নিশি তাতে মদ ঢালছি। দয়া মায়া মনুষ্যত্ব সব গলা টিপে মেরে ফেলতে হবে কিনা, তাই মদ খাচ্ছি—এবার বুঝেছেন? নমস্কার। (গমনোদ্যত)

কেশব। শুনুন। (শেখর ফিরিল) বসুন। (বসিল) আপনি দেখছি ভদ্রলোকের ছেলে। আপনার বাড়ি কোথায়?

শেখর। রংপুর।

কেশব। রংপুর! (কেশবের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল) আপনার মা বাপ আত্মীয় স্বজন কেউ নেই?

শেখর। এক বিধবা মা ছিলেন, তিনি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছেন। আর, এক বোন ছিল, তাকে—তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—

কেশব। বড়ই দুঃখের বিষয়। তা' আপনার বোনটি কি হারিয়ে গেছে?

শেখর। হ্যাঁ, হারিয়েই গেছে। হাওড়া ব্রীজের ওপর থেকে একটি দোয়ানি গঙ্গার জলে পড়লে যেমন হারিয়ে যায় তেমনি হারিয়ে গেছে—

কেশব। আহা! আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, কোনো লোক তাকে—

শেখর। হ্যাঁ! আমার মত আপনার মত একটি ভদ্রলোক তাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে! ভদ্রলোক! ভদ্রলোক! (হাস্য) সেই ভদ্রলোকটিকেই তো খুঁজছি।

কেশব। তাকে—তাকে নিশ্চয়ই চেনেন?

শেখর। চোখে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি, তাই তো এত দুঃখ। নাম ধামও জানি না। সে সময় বাড়ি ছিলুম না—কলকাতায় লেখাপড়া করছিলুম। বাড়ি গিয়ে দেখলুম মা লজ্জায় গলায় দড়ি দিয়েছেন—বাড়ি খালি। শুনলুম তারা কলকাতায় এসেছে। ব্যস, আমিও বেরিয়ে পড়লুম।

কেশব। (ক্ষণকাল গভীর চিন্তা করিয়া) আপনার কাহিনী শুনে বড়ই সহানুভূতি হচ্ছে। ভদ্রলোকের ছেলে—আচ্ছা, আপনাকে আমি চাকরি দেব। কি কাজ করতে পারেন?

শেখর। কাজ? বাঙালীর ছেলে, লেখাপড়া শিখেছি, কাজ করতে তো কেউ শেখায়নি। তবে, চেষ্টা করলে হয়তো মাস্টারি করতে পারি।

কেশব। মাস্টারি! গান গাইতে জানেন?

শেখর। গান! (হাস্য) জানি! য়ুনিভার্সিটি শেখায়নি বলেই বোধ হয় জানি। শুনবেন?

কেশব। না না, শোনাবার দরকার নেই; আমি আপনাকে গানের মাস্টার নিযুক্ত করলুম।

শেখর। বিলক্ষণ! পরীক্ষা না করে নিযুক্ত করলেই হল?
শুনুন—

গীত

ওগো বহ্নি জ্বলো জ্বলো!
বহে জীবন-নদী খর বৈতরণী
কলকল খলখল ইত্যাদি

স্বর্ণা পর্দা সরাইয়া প্রথমে উঁকি মারিতে লাগিল, তারপর পিতার চেয়ারের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

ঝর্ণা। (কানে কানে) বাবা, ইনিই পার্কে বসে গাইছিলেন।

কেশব। হুঁ, শুনুন, আমার এই মেয়েকে গান শেখাতে হবে। ভাল কথা, আপনি আছেন কোথায়?

শেখর। গাছতলায়। কাল রাত্রি পার্কে বেঞ্চিতে শুয়ে কাটিয়েছি।

কেশব। বেশ বেশ। তাহলে আমার বাড়িতেই আপনি থাকুন। বাইরে কয়েকটা খালি ঘর পড়ে আছে—কোনও কষ্ট হবে না। আপনার নামটি জানা হয়নি।

শেখর। শেখরনাথ আচার্য। (ঝর্ণাকে) আপনিই গান শিখবেন? আপনারই মত আমার একটি বোন ছিল—কথায় কথায় হাসত, গান শেখাবার জন্যে জ্বালাতন করত—

কেশব। যাক যাক, ও সব কথা যাক! ঝর্ণা, তোমার মাস্টারকে গানবাজনার ঘরে নিয়ে যাও।

ঝর্ণা। আসুন মাস্টার মশাই।

শেখর। চলুন—হ্যাঁ একটা চিঠি আছে।

কেশব। চিঠি!

শেখর। আপনার বাড়িতে যখন ঢুকছি, একজন লোক চিঠিখানা দিয়ে বললে, বাড়ির মালিককে দেবেন।

কেশব। ও—দিন। (পত্র লইলেন)

ঝর্ণা। আসুন মাস্টার মশাই।

ভিতর দিকে শেখর ও ঝর্ণার প্রস্থান

কেশব। (পত্র হস্তে কিছুক্ষণ কুটিল চক্ষে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন) যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়। না, ওকে চোখের আড়াল করা হবে না; নিজের বাড়িতে নজরবন্দী রাখতে হবে। (কুটিল হাস্যে) বুঝে বুঝে কেউটে সাপের গর্তে হাত দিয়েছে! ছোঁড়া যখন মদ ধরেছে তখন আর ভয় নেই; ঐ মদেই ওকে শেষ করব। (চিঠির খাম ছিঁড়িয়া প্রায় আর্তনাদ করিলেন) অ্যাঁ—লাল পাঞ্জা।

তাঁহার শিথিল হস্ত হইতে পাঞ্জা পড়িয়া গেল, তিনি ভয়ার্ত চক্ষে একবার বাহিরের দ্বার ও একবার ভিতরের দ্বারের দিকে তাকাইতে লাগিলেন—তারপর ভূপতিত পাঞ্জার উপর দৃষ্টি পড়িল; কম্পিতহস্তে উহা তুলিয়া লইলেন।

কেশব। কি লিখেছে! দেখি কি লিখেছে—'শীঘ্রই দেখা হইবে, সাবধান।' দেখা হবে? কেন? কেন? কি করেছি আমি!—অ্যাঁ, কে?

মৃত্যুঞ্জয়কে লইয়া আর্দালির প্রবেশ

আর্দালি। মুৎরুঞ্জিবাবু মুলোকাত মাংতেহেঁ।

কেশব। ও—মৃত্যুঞ্জয়! তুমি! (কপালের ঘাম মুছিলেন) আমি ভেবেছিলুম—যাক্। দেখ, তোমার সঙ্গে কাজের কথা পরে হবে, আজ নয়। আজ আমার শরীরটা ভাল নেই।

মৃত্যুঞ্জয়। মনে রাখবেন, মোটরের কারবুরেটার থেকে কুকুরের ল্যাজ পর্যন্ত সমস্ত আমরা ইন্সিওর করি।

কেশব। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আমার মনে আছে। এখন তুমি যাও।

আর্দালি। চলিয়ে মুৎরুঞ্জিবাবু—

মৃত্যুঞ্জয়। মুৎরুঞ্জিবাবু! হিঃ—হিঃ—হিঃ—

সহসা আর্দালির পেটে তর্জনীর খোঁচা মারিলেন। চমকিত আর্দালি পিছু হাঁটিয়া প্রস্থান করিল; মৃত্যুঞ্জয় উচ্চ হাসিতে হাসিতে তাহার অনুসরণ করিলেন।

কেশব। সেই হাসি। হ্যাঁ, সেই হাসি—যা সেদিন রাত্রে শুনেছিলুম। কে মৃত্যুঞ্জয়? কে ও? লাল পাঞ্জা!

কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অজয়ের বহিঃকক্ষ। সময় সকাল আন্দাজ আটটা। অজয় বাড়ি নাই। অনসূয়া ও আলতা একটি ছোট টেবিলে বসিয়া চা পান করিতেছে ও গল্প করিতেছে। আলতা আসিবার পর অজয়ের বহিঃকক্ষে টেবিলের আমদানি হইয়াছে, যদিও তক্তাপোশ মজুত আছে।

আলতা। তুমি যাই বল, তোমার অজয়বাবু একটি আস্ত শয়তান।

অন। অজয়দা শয়তান! (উচ্চ হাস্য)

আলতা। হাসছ যে?

অন। (হাসি থামাইয়া) সত্যি আলতা, এমন হাসির কথা আর কখনো শুনিনি।

আলতা। বেশ, হাসো তাহলে। কিন্তু একদিন টের পাবে অজয়বাবু কত বড় শয়তান। উনি হচ্ছেন মিট্‌মিটে ডান্‌, ছেলে খাবার রাক্ষস ; ও'কে যতই দেখছি ততই তা বুঝতে পারছি।

অন। সেইটেই আমার সব চেয়ে আশ্চর্য লাগে। তুমি তো ওঁকে আমার চেয়ে ঢের বেশী দেখেছ, তবু চিনতে পারনি!

আলতা। চিনতে পারিনি আবার! পেরেছি বলেই বলছি—খাঁটি জলজ্যান্ত শয়তান।

অন। (গম্ভীর হইয়া) অজয়দা শয়তান নয়। ওঁর নিন্দে করলে, এমন কি ওঁর সম্বন্ধে মন্দ চিন্তা করলেও পাপ হয়।—তোমাকে তো বলেছি, উনি আমার জন্যে কী করেছেন।

আলতা। সেই জন্যেই তুমি ও'র দোষ দেখতে পাও না। কিন্তু ভুল বুঝেছ, তোমার জন্যে উনি যা করেছেন তা মোটেই নিঃস্বার্থভাবে করেননি।

অন। ছি আলতা, ওকথা বলতে নেই!

আলতা। যা বিশ্বাস করি তা বলতে আমি ভয় পাই না। আর, যে লোক আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার স্পর্ধা রাখে, তাকেও আমি মহাপুরুষ জ্ঞানে স্তব করতে পারব না।

অন। আলতা, অজয়দা সম্বন্ধে শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে, কারুর অনিষ্ট তিনি কখনো করতে পারেন না। তিনি যা করেন ভালর জন্যেই করেন।

আলতা। (বিদ্রূপের সুরে) তুমি তো তা বলবেই। বোধ হয় মনে মনে ওঁর প্রেমে পড়েছো!

অন। (চকিতে দাঁড়াইয়া) আলতা! (বসিয়া পড়িয়া) ও কথা আর কখনো বোলো না। (অশ্রুপূর্ণ চোখে) তুমি তো সবই জানো। তবে কেন আমার মনে কষ্ট দিচ্ছ? অজয়দা আমার মা'র পেটের বড় ভাই ; তাঁকে ভক্তি করি ভালবাসি— ; কিন্তু আর একজন—(আঁচলে মুখ ঢাকিয়া)

আলতা। (অনুর হাত ধরিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে) আমার দোষ হয়েছে, আর কখনো বলব না। কেঁদনা ভাই—লক্ষ্মীটি—

অন। (চোখ মুছিয়া) চল, রান্নাবান্না সব পড়ে আছে, কুটনো কোটা পর্যন্ত হয়নি। অজয়দা সকালবেলাই বেরিয়েছেন, এখনি হয়তো ফিরবেন।

আলতা। তা হলেই বা এত তাড়া কিসের?

অন। না ভাই, ঠিক সময়ে না খেলে ও'র শরীর খারাপ হয়। যদিও মুখে কিছুই বলেন না, আমি বুঝতে পারি।

আলতা। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমি কারুর নিন্দে করছি না, কিন্তু এই যে তুমি দু'বেলা রাঁধছ, একটা রাঁধুনী রাখবার ক্ষমতা কি অজয়বাবুর নেই?

অন। শোনো কথা, ক্ষমতা থাকবে না কেন?

আলতা। তবে? তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন তাই তোমাকে খাটিয়ে নেন; রাঁধুনী রাখবার খরচটা বেঁচে যায়—কেমন?

অন। (হাসিয়া) আ কপাল! তুমি বুঝি তাই বুঝলে? রাঁধুনী তো ছিল, আমি এসে তাকে তাড়িয়েছি। তাড়াতে কি দেন অজয়দা! যখন বললুম রাঁধুনীর রান্না আমি মুখে দিতে পারব না, তখন রাজী হলেন।

আলতা। কিন্তু কেন? এর তো কোন মানেই হয় না।

অন। কেন মানে হবে না? আচ্ছা তুমিই বল, বাড়িতে মেয়েমানুষ থাকতে বাড়ির একটি মাত্র পুরুষ মানুষ রাঁধুনীর রান্না খাবে, এটা কি লজ্জার কথা নয়?

আলতা। লজ্জার কথা! কি জানি—

অন। যদি এটুকু না পারি, আপনার জনকে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াবার ক্ষমতাও না থাকে, তাহলে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি কেন ভাই?

আলতা। পুরুষকে রেঁধে খাওয়াবার জন্যেই বুঝি মেয়েমানুষের জন্ম?

অন। না—কিন্তু ভালবাসবার জন্যেই মেয়েমানুষের জন্ম।

আলতা। ভালবাসার সঙ্গে রান্নার সম্বন্ধ কি?

অন। ঐ রান্নার সঙ্গে মেয়েমানুষের কতখানি ভালবাসা মিশে থাকে তা তোমাকে বোঝাতে পারব না ভাই। তুমি তো কোনদিন কাউকে রেঁধে খাওয়াওনি।

আলতা। না, তা খাওয়াইনি। কোনদিন দরকার হয়নি।

অন। অভাবের দরকারটাই কি সবচেয়ে বড় দরকার? ভালবাসার দাবি কি কিছু নেই?

আলতা। কি জানি; বাবাকে তো ভালবাসতুম, কিন্তু কই—!

অন। মিছে তর্ক থাক! এখন ওঠ—আজ তোমাকে রাঁধতে হবে।

আলতা। (অবাক হইয়া) আমাকে?

অন। হ্যাঁ। অজয়দা যত মন্দ লোকই হোন, তোমার হাতের রান্না খেতে আপত্তি করবেন না।

আলতা। কিন্তু—কিন্তু আমি যে কিছু রাঁধতে জানি না।

অন। শিখবে। একদিনেই কি হয়?

আলতা। কিন্তু—(মনের ঔৎসুক্য দমন করিয়া) না অনু, আমি হয়তো পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে সব একাকার করে ফেলব। সবাই হাসবে।

অন। সবাই কে? আমি আর অজয়দা তো? তা আমি হাসব না কথা দিচ্ছি। আর অজয়দা যদি হাসেন তাতেই বা কি? গায়ে তো আর ফোস্কা পড়বে না।

আলতা। না ভাই অনু, আমার ভারি লজ্জা করছে।

অন। অমন গোড়ায় গোড়ায় একটু লজ্জা করে। তুমি যখন নাচতে শিখেছিলে তখনও তো লজ্জা করেছিল। তোমার নাচ কিন্তু ভাই একদিন দেখাতে হবে। দুপুরবেলা ঘরে দোর বন্ধ করে—কি বল?

আলতা সহসা লজ্জা পাইল, যেন তাহার গোপনীয়
দুষ্কৃতি ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

আলতা। নাচের খবর তুমি কোত্থেকে পেলে?

অন। খবরের কাগজে পড়েছি। নাও এস, আর দেরি নয়, অনেক বেলা হয়ে গেল।

আলতা। চল—কিন্তু— (উভয়ে প্রস্থান করিল)

তক্তাপোশের নীচ হইতে লালচাঁদ বাহির হইল; এদিক ওদিক দেখিয়া—

লালচাঁদ। না, কবিদের কথা বিলকুল মিথ্যে। এতদিন ধারণা ছিল তরুণীরা একটু নিরিবিলি পেলেই নিজেদের মধ্যে কেবল রসের কথা আলোচনা করেন। তা নিজের কানে যা শুনলুম তাতে রস তো কিছু পেলুম না। একজন যদি বা প্রেমের কথা একবার উচ্চারণ

করলেন, অন্যটি কে'দেই আকুল। এদিকে আমি শালা তক্তাপোশের তলায় কাঠ হয়ে পড়ে আছি, আর, একপাল আরসোলা আমার গায়ের ওপর কুচকাওয়াজ করছে। না—আর এ সব পোষাচ্ছে না। (প্রস্থানোদ্যত) ও বাবা, কারা যেন আসছেন! সট্‌কান দেবার তো রাস্তা নেই—আবার তক্তাপোশের তলায় ঢুকি। (তথাকরণ)

অজয় ও রণবীর কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিল; রণবীরের কথার ভঙ্গীতে মুরুব্বিয়ানা প্রকাশ পাইতেছে।

রণবীর। আলাপ না থাকলেও আপনাকে আমি অনেকবার দেখেছি; আপনি যে আশুবাবুর সেক্রেটারি ছিলেন তাও জানি কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় করবার সুযোগ ঘটে ওঠেনি।

অজয়। এতদিন পরে যে সে সুযোগ ঘটল এটা আমার সৌভাগ্য।

(চেয়ার নির্দেশ করিল)

রণবীর। না না, সৌভাগ্য আর কি—(উপবেশন) তা সে যাক, মিস আলতা ভাল আছেন তো?

অজয়। কুমারী আলতা ভালই আছেন।

রণবীর। পিতার মৃত্যুর পর কিছুদিন সামাজিক আমোদ প্রমোদে যোগ না দেওয়াই রুচিসংগত! কিন্তু তবু, আমরা তাঁর এই শোকে সহানুভূতি না জানালেও আমাদের কর্তব্যের ত্রুটি হয়!

অজয়। তা তো বটেই। শোকে সহানুভূতি জানানো প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য।

রণবীর। মিস আলতা বাড়িতেই আছেন তো?

অজয়। হলফ্‌ দিয়ে বলতে পারি না, তবে আমার বিশ্বাস তিনি বাড়িতেই আছেন।

রণবীর। তাহলে তাঁকে যদি একবার খবর দেন তো ভাল হয়। তাঁর সঙ্গে দেখা করব বলেই এসেছি।

অজয়। দেখা করবেন!—কোনো দরকার আছে কি?

রণবীর। বললুম তো সহানুভূতি জানাতে চাই।

অজয়। কিন্তু জানানো তো হয়ে গেছে। আমার কাছে যখন জানিয়েছেন তখন তাঁর কাছেও জানানো হয়েছে।—আর কোনো কাজ আছে কি?

রণবীর। (বিরক্তভাবে) না, তাঁর সঙ্গে দেখা করাই প্রধান কাজ।

অজয়। কিন্তু তা তো হতে পারে না। আপনি জানেন বোধ হয়, আমি তাঁর অভিভাবক। ও জিনিসটার আমি অনুমোদন করি না।

রণবীর। (শ্লেষমন্থর কণ্ঠে) আপনি অনুমোদন করেন না! কোন্‌ জিনিসটার অনুমোদন করেন না শুনি?

অজয়। আপনি যে জিনিসটা প্রস্তাব করেছেন। অনাত্মীয় পুরুষদের সঙ্গে অকারণে মেয়েদের মেলামেশা আমি পছন্দ করি না।

রণবীর। বটে! কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আলতা আমার বান্ধবী।

অজয়। আলতা নয়—আলতা দেবী। মহিলাদের সম্বন্ধে সসম্ভ্রমে কথা বলা বাঞ্ছনীয়।

রণবীর। তাই নাকি! আপনি শিষ্টাচারও জানেন দেখছি। (গলার মধ্যে ব্যঙ্গপূর্ণ হাস্য করিল) শিখলেন কোথায়? অনাথ আশ্রমে?

অজয়। আজ তাহলে আসুন। নমস্কার।

রণবীর। (উঠিয়া বিষাক্ত কণ্ঠে) অজয়বাবু, আমি ডাক্তার, আপনার কী রোগ হয়েছে বলব? Whitlow হয়েছে। অর্থাৎ সাদা বাংলায় যাকে বলে আঙুল ফুলে কলা গাছ। বুঝলেন? (দ্বারের দিকে চলিল)

ত্রিদিব প্রবেশ করিল

ত্রিদিব। রণবীরবাবু যে! ভাল তো? তারপর অজয়, আলতার খবর কি?

অজয়। ভাল। তুমি ভেতরে যাও ত্রিদিবদা।

ত্রিদিব ঈষৎ বিস্মিতভাবে একবার অজয় একবার রণবীরের পানে তাকাইল,
তারপর অন্দরের দিকে অগ্রসর হইল।
রণবীর অট্টহাস্য করিয়া উঠিল

রণবীর। ও—ত্রিদিববাবুর বেলা মহিলার সম্ভ্রম রক্ষার দরকার নেই দেখছি, তিনি আসবামাত্র অন্দরমহলের ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন। বলি ব্যাপারখানা কি? ঝেড়েই কাশুন না অজয়বাবু।

ত্রিদিব। (ফিরিয়া) কি, কি হয়েছে অজয়?

অজয়। কিছু না।

রণবীর। যা হয়েছে তা এতক্ষণে বুঝতে পারছি। কালনেমির লঙ্কাভাগ। (হাস্য) দু'জনে মতলব করে আলতা আর তার বিষয় ভাগাভাগি করে নেবে, তৃতীয় ব্যক্তিকে আমল দেবে না—এই তো! তা আলতা কার ভাগে পড়ল?

ত্রিদিব। চোপ রও ছুঁচো কোথাকার। তোমাকে আমি ভদ্রলোক বলে জানতুম; দেখছি তুমি একটা ইতর; একটা আস্ত ক্যাড।

রণবীর। (অট্টহাস্য করিয়া) ল্যাজে পা পড়তেই যে ফোঁস করে উঠেছ ত্রিদিববাবু! ঠিক ধরেছি তাহলে, diagnosis ভুল হয়নি। হ্যাঃ—হ্যাঃ—হ্যাঃ—

ত্রিদিব। (ঘুষি বাগাইয়া) বেরোও এখান থেকে—ক্যাডাভারাস উল্লুক! নইলে ঘুষি মেরে মুখের চেহারা বদলে দেব।

অজয়। (বাধা দিয়া) যেতে দাও ত্রিদিবদা, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করো না।

রণবীর। হ্যাঃ—হ্যাঃ—হ্যাঃ সাবাস! বলিহারি। দু'জনে মিলে খাসা অভিনয় করেছ। তোমাদের জোড়া নেই বাবা—একেবারে রাজযোটক। কিন্তু বাঘেরও ঘোগ আছে যাদু। মনে রেখো। এক সঙ্গে রাজকন্যে আর ষোল আনা রাজত্ব ভোগ দখল করা অতি সহজ নয়। (প্রস্থান)

ত্রিদিব। কী সাংঘাতিক বদমায়েস! ভদ্রসমাজে ভদ্রলোক সেজে বেড়ায়, কখনো ভাবতে পারিনি যে লোকটার মন এত নোংরা।

আলতা প্রবেশ করিল

আলতা। কিসের এত গোলমাল! (ত্রিদিবকে দেখিয়া সহাস্যে) আপনি চেঁচাচ্ছিলেন নাকি?

ত্রিদিব। আরে না না, ঐ হতভাগা রণবীরটা—

অজয়। (মৃদুহাস্যে) তুমিও কম চেঁচাওনি ত্রিদিবদা।

আলতা। কি হয়েছিল? রণবীরবাবু এসেছিলেন?

অজয়। হ্যাঁ।

আলতা। কেন এসেছিলেন?

অজয়। তোমার সঙ্গে দেখা করে সহানুভূতি জানাতে।

আলতা। ও—তা, তিনি চলে গেলেন কেন?

অজয়। চলে গেলেন যেহেতু আমি তাঁকে বললুম যে তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হতে পারে না।

আলতা। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) আপনি জানেন রণবীরবাবু আমার একজন বন্ধু?

অজয়। শুনেছি বটে। তিনিও সেই ধরনের কথাই বললেন।

আলতা। (তীব্র ক্রোধে) তবে কোন্ স্পর্ধায় আপনি তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন?

ত্রিদিব। আহাহা—আলতা তুমি অমন করছ কেন? রণবীরকে তাড়িয়ে দিয়ে অজয় কিছুমাত্র অন্যায় করেনি। আর, সত্যি কথা বলতে কি, অজয় তাকে তাড়ায়নি, তাড়িয়েছি আমি। আর একটু হলেই একটি মুষ্ট্যাঘাতে তার দাঁত ভেঙে দিতুম।

আলতা। ত্রিদিববাবু, আপনি এদের দলে! আপনিও এমন করে আমাকে নির্যাতন

করতে চান?

ত্রিদিব। তুমি ভুল করছ আলতা। রণবীরটা একটা প্রকাণ্ড ক্যাডাভারাস শয়তান। কোনো ভদ্রমহিলার ওর সঙ্গে কথা কওয়া উচিত নয়।

আলতা। আমি কিছু শুনতে চাই না, আপনারা সবাই মিলে আমাকে শাস্তি দিতে চান, আমাকে অপমান করতে চান। আমি বুঝেছি। কিন্তু এমনভাবে দগ্ধে দগ্ধে না মেরে আমাকে একেবারে মেরে ফেলুন না, তাহলে আপনাদের সকলের প্রাণেই শান্তি হবে। বিশেষত অজয়বাবুর। (ক্রন্দনোন্মুখী)

ত্রিদিব। (আলতার দুই স্কন্ধে হাত রাখিয়া দৃঢ়স্বরে) পাগলামি করো না আলতা। অজয় তোমার কত বড় শুভাকাঙ্ক্ষী তা যদি এখনো না বুঝে থাকো তাহলে সে তোমার বুদ্ধির দোষ। ও যা করেছে তাতে বিন্দুমাত্র অন্যায় হয়নি। তুমি নিজেই ভেবে দেখ দেখি, সম্ভ্রান্ত ঘরের বিদুষী মেয়ে তুমি, একজন অতি সাধারণ স্ত্রীলোকের মত কতকগুলো অপদার্থ লোকের সঙ্গে হাসি তামাশায় সময় কাটানো কি তোমার শোভা পায়! তুমি শিক্ষিতা, কিন্তু তোমার শিক্ষা যদি তোমাকে শান্ত সংযত হবার প্রেরণা না দিয়ে থাকে, তাহলে সে শিক্ষার মূল্য কি? আজ তুমি ছেলেমানুষ, কাল তুমি ভবিষ্য বংশের জননীস্থানীয় হয়ে দাঁড়াবে। বুঝতে পারছ না কত বড় দায়িত্ব তোমার মাথার ওপর রয়েছে?

আলতা। কিন্তু—আমি—আমি—

ত্রিদিব। নিজের সুখ সুবিধা খেয়ালের মোহে অন্ধ হয়ে থেকো না আলতা। তোমাকে তো আমি জানি, একদিন তোমার চোখ ফুটবে। তখন আজকের কথা ভেবে, নিজের এই দায়িত্বহীন অর্থহীন প্রয়োজনহীন জীবনের কথা ভেবে তোমার নিজেরই লজ্জা হবে। সে লজ্জা যাতে দুঃসহ না হয়ে ওঠে এখন থেকে সে চেষ্টা কর।

আলতা। কি করব আমি! কি করতে বলেন আমাকে আপনারা?

ত্রিদিব। (হঠাৎ আত্মসচেতন হইয়া আলতাকে ছাড়িয়া দিয়া) আমি কিছুই বলি না, বলবার অধিকারও নেই। ঝোঁকের মাথায় লম্বা লেক্‌চার দিয়ে ফেললুম; মাপ করো। —আরে যাঃ, কোথায় এলুম তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে অনুর হাতের চা খাবো বলে—তা' সব ভেস্তে গেল। নাঃ আমি চললুম। এর পর আর চায়ের আসর জমবে না। (প্রস্থানোদ্যত)

অজয়। দাঁড়াও ত্রিদিবদা, আমিও বেরুব।

ত্রিদিব। তুমি আবার এখন কোথায় বেরুবে?

অজয়। একটু কাজ আছে শেয়ার মার্কেটের দিকে। আলতা, অনুকে বলে দিও আমি ফিরে এসে খাব। ফিরতে হয়তো একটু বেলা হবে। আমার জন্যে যেন বসে না থাকে, চল ত্রিদিবদা। (উভয়ের প্রস্থান)

আলতা কিছুক্ষণ দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল।

আলতা। এরা আমাকে কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছে? অজয়বাবু কি সত্যই আমার ভালর জন্যে—? ত্রিদিববাবু তো মিথ্যে বলবার লোক নয়। (চিন্তা) এক এক সময় মনে হয় ত্রিদিববাবু আমাকে মনে মনে ভালবাসেন, কিন্তু কখনো ভাবে ইঙ্গিতেও তা প্রকাশ করেননি। কিন্তু আমার জীবনের পরিচিত পথ ছেড়ে আমি কি করে চলব! অজয়বাবু—আশ্চর্য লোক! লোহার মত শক্ত, অথচ দেখলে মনে হয় তুলোর চেয়েও নরম। হাসি ঠাট্টা করতেও তো জানেন। অনুর সঙ্গে এমন করেন যেন পিঠো-পিঠি ভাই বোন, অথচ আমার সঙ্গে—

তক্তাপোশের তলায় হুটোপুটি শব্দ হইল।

আলতা। ও কি। কে?

লালচাঁদ হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইল ও মেঝের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া নাকের মধ্য হইতে যেন কিছু বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

আলতা। (সভয়ে উঠিয়া) এ যে একটা লোক! অজয়বাবু! অনু—অনু—

ছুটিয়া ভিতর দিকে পলায়ন করিল ও সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

লালচাঁদ। শালার আরসোলা! নাকের মধ্যে ঢোকবার জন্যে একেবারে ধস্তাধস্তি। (হাঁচি) ভাগ্যে আর একটু আগে হেঁচে ফেলিনি, তাহলে গুণ্ডাদুটো মিলে ঠেঙিয়ে আধমরা করে দিত। (উঠিয়া) ইনিই আলতা দেবী! আধুনিক শিক্ষিতা হলে কি হয়, বঙ্গমহিলা তো! অচেনা মানুষ তক্তাপোশের তলা থেকে বেরুচ্ছে দেখেই অন্দরমহলের দিকে ছুট দিলেন। কিন্তু আর নয়, এখনি হয়তো আলতা দেবীর আরো গুটিকয়েক উমেদার এসে হাজির হবেন। আরে খেলে যা—এ যে বলতে না বলতেই—

লালচাঁদ পুনশ্চ তক্তাপোশের তলায় ঢুকিবার অবকাশ পাইল না।

কুমার প্রবেশ করিল।

কুমার। পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥

লালচাঁদ। আজ্ঞে হ্যাঁ, খাঁটি নির্জলা সত্যি কথা—ভেজাল নেই। এবার আপনি বসুন, আমি বিদেয় হই।

কুমার। আপনি কে?

লালচাঁদ। আমি কে সেটা এখন ঠিক মনে পড়ছে না। নাকের মধ্যে আরসোলা ঢুকে-ছিল, আর একটু হলেই ব্রহ্মকোটরে গিয়ে বাসা বাঁধত, অনেক কষ্টে বার করেছি। কিন্তু মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেছে। চললুম—নমস্কার। (প্রস্থান)

কুমার। বোধ হয় পাগল! পৃথিবীতে সবাই পাগল; হয়তো আমিও পাগল! সেও পাগল ছিল—নইলে মরতে গেল কেন? আর, সে যদি মরেছে, আমিই বা বেঁচে আছি কেন? পাগলামি—সব পাগলামি—

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগ সম।
ফাল্গুন রাতে দক্ষিণ বায়ে
কোথা দিশা খুঁজে পাইনা
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাইনা।

অন্দরের দিক হইতে অনসূয়া প্রবেশ করিল।

অনু। আলতা—রান্নাবান্না ফেলে কোথায় গেলে— .

কুমার। এ কি! অনু! তুমি বেঁচে আছ—

অনু। তুমি! তুমি!

কুমার। অনু। সত্যিই তবে তুমি বেঁচে আছ!

অনু। তুমি! তুমি! না—না—না—

ব্যাকুল দিশাহারা ভাবে ছুটিয়া প্রস্থান করিল। কুমার চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কেশবের গৃহে শেখরের কক্ষ। মেঝের একধারে ফরাশ পাতা; কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র ইতস্তত ছড়ানো রহিয়াছে। ঘরের অন্য প্রান্তে একটি ছোট টেবিল, দুটি চেয়ার ও একটি আলমারি রহিয়াছে। ঝর্ণা ফরাশের উপর একটি সেতার লইয়া গান অভ্যাস করিতেছে, অদূরে বসিয়া শেখর হাতে তাল দিতেছে, মাঝে মাঝে ঝর্ণার কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতেছে। বেলা বৈকাল আন্দাজ পাঁচটা।

গান

পল্লীবধূ সন্ধ্যা হল
জল্‌কে চল জল্‌কে চল।
দিঘির জলে নামে কালো ছায়া—মায়াবিনী
বীথি পথে চল পল্লীজায়া—পথ চিনি
আসে রাত্রি সাথে লয়ে কাজল মায়া
পল্লীবধূ ওগো জল্‌কে চল।
তুলসীমূলে দীপ হয়নি জ্বালা—সন্ধিক্ষণে
বেণীবন্ধে নাহি নবমল্লীমালা—সঙ্গোপনে।
ফুরায় বেলা ওগো পল্লীবালা—জল্‌কে চল।

শেখর। আজ এই পর্যন্ত থাক। তোমার চা খাবার সময় হল।

ঝর্ণা সেতার রাখিয়া উঠিবার উপক্রম করিল কিন্তু উঠি উঠি করিয়াও উঠিল না; দেখিয়া মনে হয় চা পান করিবার জন্য সে বিশেষ ব্যগ্র নয়।

ঝর্ণা। মাস্টার মশাই, আপনি চা খান না কেন?

শেখর। আগে খেতুম। কিন্তু চায়ে আর আমার নেশা হয় না, তাই ছেড়ে দিয়েছি।

ঝর্ণা। চায়ে বুঝি আবার কারুর নেশা হয়!—চলুন না মাস্টার মশাই, আমার সঙ্গে বসে চা খাবেন। দাদা বাড়ি নেই, বাবা অফিস ঘরে কাজ করছেন,—একলা একলা চা খেতে কি ভাল লাগে?

শেখর। না ঝর্ণা। একসঙ্গে চা খাওয়াতে দোষের কিছুই নেই, কিন্তু ঐ চা খাওয়ার ব্যাপারের সঙ্গে এমন একটা তিক্ত স্মৃতি আমার মনে জড়িয়ে গেছে যে—আমি পারব না।

ঝর্ণা। বেশ চা খাবেন না, কিন্তু একটু জলখাবার কিম্বা দুটো ফল—? আপনি তো বিকেলবেলা কিছু খান না।

শেখর। না তাও নয়। (ঝর্ণার মুখ মলিন হইয়া গেল) আচ্ছা ঝর্ণা, তুমি চা খাওয়া ছেড়ে দিতে পার?

ঝর্ণা। আপনি যদি বলেন এক্ষুনি পারি—(আগ্রহভরা উৎসাহে) বলুন না মাস্টার মশাই, ছেড়ে দেব?

শেখর। না, তার দরকার নেই।—আমার শুধু ভয় হয় তুমিও তো বালিকা, আর, মনটি তোমার শরতের নদীর মত স্বচ্ছ—কোথায় তোমার জন্যে বিপদ লুকিয়ে আছে কে জানে?

ঝর্ণা। বিপদ! কোন্ বিপদের কথা বল্‌ছেন মাস্টার মশাই!

শেখর। কালবোশেখী ঝড়ের মুখে প্রজাপতির যে বিপদ সেই বিপদের কথা বল্‌ছি, বাঘ ভাল্লুক ভরা জঙ্গলে একলা নিরস্ত্র ঘুরে বেড়ানোর যে বিপদ সেই বিপদের কথা বলছি। কিন্তু তুমি বুঝবে না ঝর্ণা। তোমার মত সরল নির্ভরশীলা মেয়েরা গোড়ায় কিছু

বোঝে না, এইটেই সব চেয়ে বড় বিপদ।

ঝর্ণা। কিন্তু এখনো যে আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না।

শেখর। পারবে না। তুমি যাও চা খাওগে।

ঝর্ণা। আপনি যাবেন না? (শেখর মাথা নাড়িল, ঝর্ণা ঈষৎ সঙ্কুচিত স্বরে) একটা জিনিস তৈরি করেছিলুম, আপনাকে দেখাতুম—

শেখর। কি জিনিস?

ঝর্ণা। একটা ছবি এঁকেছি—

শেখর। তুমি ছবি আঁকতেও জান? কার ছবি এঁকেছ?

ঝর্ণা। আপনার!

শেখর। আমার। সে কি, কেমন করে আঁকলে?

ঝর্ণা। কেন, মন থেকে এঁকেছি। (উৎসুক আগ্রহে) ভারি সুন্দর হয়েছে মাস্টার মশাই! দেখবেন না?

শেখর। (ক্ষণকাল অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া) আশ্চর্য! আজ নয় ঝর্ণা—কাল সকালে দেখব।

ঝর্ণা অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইয়াছে তাহার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। সে কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

শেখর উঠিয়া আলমারি হইতে মদের বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

শেখর। আশ্চর্য! শকুন্তলা মিরাণ্ডার কথা কাব্যে পড়েছি। তারা ছিল আশ্রম বালিকা। ঝর্ণা এই পচা পঙ্কিল সংসারে থেকে এমন হল কি করে? (মদ্যপান)—ওকে দেখে, ওর সংসর্গে এসে নিজেকে অশুচি মনে হয়; আবার ভাল হতে ইচ্ছে করে, যেমন আগে ছিলুম। না, আর হয় না। আমি তো ভাল ছিলুম, নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক ছিলুম; সংসার আমার সারা গায়ে সারা মনে পাঁক মাখিয়ে দিয়েছে। আমি কেন ভাল হব, কিসের আশায় ভাল হব! অধঃপথই আমার পথ। (মদ্যপান)

বিভ্রান্ত ভাবে কুমার প্রবেশ করিল; তাহার লক্ষ্যহীন দৃষ্টি শূন্যে স্থাপিত

কুমার।

ওরে মাতাল দুয়ার খুলে দিয়ে
পথেই যদি করিস মাতামাতি
থলি ঝুলি উজাড় করে দিয়ে
যা আছে তোর ফুরাস রাতারাতি।
অশ্লেষাতে যাত্রা করে শুরু
পাঁজি পুঁথি করিস পরিহাস
অকারণে অকাজ নিয়ে ঘাড়ে
অসময়ে অপথ দিয়ে যাস—
হালের দড়ি আপন হাতে কেটে
পালের পরে লাগাস ঝোড়ো হাওয়া
আমিও ভাই তোদের ব্রত লব
মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া।

শেখর। খুব ভাল কথা। চলে আসুন কুমারবাবু—(মদের গ্লাস আগাইয়া দিয়া)

শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্য মনে করুন পান—(হাস্য)

কুমার। (সচকিত হইয়া) এ কি! ও—এটা আপনার ঘর?—(চেয়ারে বসিয়া পড়িল) শেখরবাবু, সে বেঁচে আছে—

শেখর। থাক বেঁচে—ক্ষতি কি? নিন, আর দেরি করবেন না—জুড়িয়ে গেল।

কুমার। ও—আপনি জানেন না। কেউ জানে না, তার বেঁচে থাকা কত আশ্চর্য। এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। (মদের গেলাস দেখিয়া) ওটা কি?

শেখর। মদ! অমৃত—সুধা—সাগর মন্থন করা জিনিস। নিন, ঢক করে গিলে ফেলুন, দেখবেন যত অসম্ভব কথাই হোক বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে না।

কুমার। মদ! কখনো খাইনি। মদে কী হয়?

শেখর। মদে মানুষ দেবতা হয়, দেবতা পিশাচ হয়। মদে সব মনে করিয়ে দেয়, সব ভুলিয়ে দেয়। কুমারবাবু, আমি কবি নই, কিন্তু—বুঝেছি ভাই সুখের মধ্যে সুখ

মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া!

কুমার। শেখরবাবু, আপনি বলতে পারেন, মদ কি অনুতাপের আগুন নেভাতে পারে? বুকে দুর্জয় সাহস আনতে পারে? ভালবাসার জন্যে গৃহত্যাগী করাতে পারে?

শেখর। বোধ হয় পারে। খেয়েই দেখুন না—

কুমার মদের পাত্র লইল।

সহসা কেশব প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চেহারার অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। চক্ষু কোটরগত, গালের মাংস বসিয়া পড়িয়াছে, চুল প্রায় সমস্ত পাকা। কুমার তাঁহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি মদের গেলাস লুকাইল।

কেশব। এ কি! কুমার, তুমি এখানে কি করছ!

কুমার। আমি—আমি—

কেশব। যাও—এখানে তোমার কি দরকার?

কুমার। (যাইতে যাইতে সহসা ফিরিয়া) বাবা, সে—সে বেঁচে আছে—

কেশব। চুপ! (সভয়ে শেখরের দিকে তাকাইল) পরে হবে—ও পরে হবে। এখন যাও।

(কুমার প্রস্থান করিল)

কেশব। (শেখরকে তীক্ষ্ণচক্ষে দেখিয়া কাষ্ঠ হাসি) কুমার একটা আস্ত পাগল। আপনাকে কিছু বলেছে নাকি?

শেখর। কবিতা বলেছেন। বলেছেন, দুনিয়ায় যদি কোন সুখ থাকে, সে হচ্ছে মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া! এবিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মত একদম মিলে যাচ্ছে। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। কেশববাবু, আপনার বাড়িতে কি ভূত আছে?

কেশব। (চমকিয়া) ভূত!

শেখর। ভূত কিম্বা পিশাচ কিম্বা আলাদীনের দৈত্য—যা বলুন। নইলে আমার বোতল ফুরিয়ে গেলেই আবার নতুন বোতল রেখে যায় কে?

কেশব। (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া) ও তাই! আছে হয়তো, কিন্তু আপনার তো তাতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না?

শেখর। অসুবিধা—কিছু না। হাতের কাছে বিনামূল্যে অমৃত যোগান দেয় এমন বন্ধু একটা আছে!

কেশব। বেশ বেশ—(উপবেশন করিয়া গল্পচ্ছলে) শেখরবাবু! আপনি লাল পাঞ্জার নাম শুনেছেন নিশ্চয়?

শেখর। লাল পাঞ্জা! বসুন, ভেবে দেখি। কাগজে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে—কে একটা মাড়োয়ারী কোটিপতি তার যুবতী স্ত্রীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করত, লাল পাঞ্জা তার ঘরে ঢুকে আগাপাস্তলা চাবকেছে। লোকে বলে, লাল পাঞ্জা নাকি বিবেকের চাবুক।

কেশব। মিথ্যে কথা! লাল পাঞ্জা একটা দুর্দান্ত বদমায়েস। বড়লোকের জীবনের রহস্য বার ক'রে তাকে উৎপীড়ন করাই হচ্ছে তার পেশা। কিন্তু লোকটা কে, কেউ ধরতে পারছে না, পুলিসও হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে! আমি যদি তাকে পাই—(ধড়মড় করিয়া উঠিয়া) ওকি! ওকি! ওকি!—কে ডাকলে? শেখরবাবু, শুনতে পেলেন কে ডাকলে?

শেখর। কই না, আমি তো কিছু শুনিনি।

কেশব। শুনতে পেলেন না? কে যেন আমার পেছন থেকে ডাকলে 'কেশব'! ওই—ওই আবার! ওই ডাকছে।

শেখর। তাই নাকি! তবে বোধ হয় সেই ভূতটা হবে।

কেশব। ভূত! আঁ—না—না—ঐ! আশু! আশুর গলা! আমি তোমাকে মারিনি—আমি ওষুধ দিয়েছিলুম—লাল পাঞ্জা দেখেছে, ওষুধ দিয়েছিলুম—

শেখর। কেশববাবু—কেশববাবু। (ঝাঁকানি দিল)

কেশব। সম্পত্তি? আলতার সম্পত্তি? আমি সব ফেরত দেব, শপথ করছি! ডবল করে ফেরত দেব। তুমি আর এসো না—আর এসো না— (উন্মত্তবৎ প্রস্থান)

শেখর। মস্তিষ্কে কীট প্রবেশ করেছে—পাগলামির বীজাণু!—

শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি
সরমের ডালি
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি—

আমারও পাগলামির ছোঁয়াচ লাগল না কি? লাগুক—মন্দ কি? ডাক্তার, ডাক্তার!

Canst thou not minister to a mind diseased,
Pluck out from the memory a rooted sorrow,
And with some sweet oblivious antidote—?

উহু—এ রোগ ডাক্তারের চিকিৎসার বাইরে। **Therein the patient must minister unto himself!** পাগলের মহৌষধ তো হাতের কাছেই রয়েছে—(হাস্য ও মদ্যপান)

হাতে একটি ছবি লইয়া ঝর্ণা পা টিপিয়া প্রবেশ করিল

ঝর্ণা। মাস্টার মশাই!

শেখর চকিতে উঠিয়া মদের বোতল প্রভৃতি আড়াল করিয়া দাঁড়াইল

শেখর। ঝর্ণা! তুমি আবার এলে যে?

ঝর্ণা। ও কি! আপনি কি খাচ্ছিলেন?

শেখর। কিছু নয়।

ঝর্ণা। নিশ্চয় কিছু খাচ্ছিলেন। বোতলে কি আছে?

শেখর। (কিছুকাল নীরব থাকিয়া) মদ!

ঝর্ণা। মদ! আপনি মদ খাচ্ছিলেন! না না; মিছে কথা, আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।

শেখর। ঠাট্টা নয় ঝর্ণা, সত্যিই মদ খাচ্ছিলুম।

ঝর্ণা। (শিথিল দেহে বসিয়া পড়িল) কিন্তু কেন? কেন? আপনি মদ খাবেন কেন? মদ তো মন্দ লোকেরা খায়।

শেখর। আমিও মন্দ লোক ঝর্ণা।

ঝর্ণা। না কক্ষনো না, আমি বিশ্বাস করি না। আপনি—আপনি—
(টেবিলের ধারে মাথা রাখিয়া কান্না)

শেখর। (বিস্মিত বিচলিত) ঝর্ণা, তুমি কাঁদছ?

ঝর্ণা। (মুখ তুলিয়া) আমার কান্না পাচ্ছে। কেন আপনি নিজেকে মন্দ লোক বলবেন? কেন আপনি মদ খাবেন?

শেখর। কেন মদ খাই তা তোমাকে বোঝাতে পারব না ঝর্ণা।

ঝর্ণা। আমি বুঝতে চাই না। আপনাকে আমি মদ খেতে দেব না। বলুন আর মদ খাবেন না!

শেখর। ঝর্ণা—

ঝর্ণা। (সবেগে মাথা নাড়িয়া) না বলুন—নইলে আমি পড়ে থাকব এখানে, পড়ে পড়ে খালি কাঁদব। বলুন।

শেখর। ঝর্ণা, তুমি যা বলছ তার মানে বুঝতে পারছ? আমি একটা নরকের কীট—আমার জন্যে তুমি—

ঝর্ণা। বলবেন না? বলবেন না? বেশ, তবে—

ছবির উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল

শেখর। ওটা কি? (ছবি টানিয়া দেখিল)

ঝর্ণা। আপনার ছবি।

শেখর। আমার ছবি! এ কি করেছ ঝর্ণা! আমারি চেহারা বটে, কিন্তু এর মুখে যে মনুষ্যত্বের চিহ্ন আঁকা রয়েছে? কপালে উদ্দীপনার আলো, চোখে বিশ্বাসের জ্যোতি। এ কার ছবি তুমি এ'কেছ?

ঝর্ণা। আপনার ছবি এ'কেছি।

শেখর। কিন্তু—কিন্তু বিশ্বাস হয় না। আমার মুখে কি এখনো মনুষ্যত্বের চিহ্ন বর্তমান আছে! কালির প্রলেপে মুছে যায়নি! ঠিক বলছ ঝর্ণা?

ঝর্ণা। ঠিক বলছি। আপনার মুখ থেকে মনুষ্যত্বের চিহ্ন মুছে যেতে পারে না। এবার বলুন মদ খাবেন না।

শেখর। মদ খাব না? কিন্তু—

ঝর্ণা। আমার গা ছুঁয়ে বলুন, আর কখনো মদ ছোঁবেন না।

শেখর। তোমার গা ছুঁয়ে! এসব তুমি কি বলছ ঝর্ণা, ক্লেদাক্ত নরকের কীটকে কোন্ নির্মল নির্ঝরিণীর প্রলোভন দেখাচ্ছ? তোমার গায়ে তো আমি হাত দিতে পারব না—আমার হাত পুড়ে যাবে।

ঝর্ণা। বেশ, তবে আমিই তোমার গায়ে হাত দিচ্ছি। (শেখরের ডান হাত দু'হাতে লইয়া নিজ বক্ষে রাখিল) এবার বল।

শেখর। (আবেগরুদ্ধ স্বরে) ঝর্ণা! (তারপর সসম্ভ্রমে মাথা নীচু করিয়া) আব মদ ছোঁব না।

উভয়ের কিছুক্ষণ এইভাবে অবস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আলতার শয়নকক্ষ। একপাশে শয্যা, অন্যদিকে ড্রেসিং টেবিল; একটি লাল নাইট ল্যাম্প ঘরটিকে ঈষদালোকিত করিয়া রাখিয়াছে।

একটি আবছায়া মানবের মূর্তি নিঃশব্দে গবাক্ষ দিয়া প্রবেশ করিল; তাহার মুখে লাল মুখোশ, হাতে কি একটা রহিয়াছে; আলতার শয্যার উপর উহা রাখিয়া দিয়া মূর্তি আবার ছায়ার মত নিঃশব্দে গবাক্ষ পথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিয়ৎকাল পরে আলতা ও অনসূয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বড় আলো জ্বালিল।

অন। এই ঘরে—চুপি চুপি—কেমন?

আলতা। না ভাই, যদি অজয়বাবু এসে পড়েন?

অন। আসবেন না। আর যদি এসেই পড়েন, তিনিও দেখবেন।

আলতা। না, সে আমি পারব না।

অন। কেন, লজ্জা করবে?

আলতা। না—তা নয়, তবে—উনি এসব ভালবাসেন না।

অন। তাহলে আজকাল একটু ভয়ও হয়েছে?

আলতা। ভয় আবার কিসের! আমি কাউকে ভয় করি না।

অন। আমি সে ভয়ের কথা বলিনি। মানুষ যাকে শ্রদ্ধা করে তার মনে কষ্ট দিতে ভয় পায়, সেই ভয়ের কথা বলছি।—আচ্ছা আলতা, সত্যি বল, এখন তুমি আগেকার মত সকলের সামনে নাচতে পারো? (আলতা চুপ করিয়া রহিল) বল না ভাই, পারো?

আলতা। বোধ হয় পারি না, লজ্জা করে।

অন। কেন লজ্জা করে? আগে তো করত না!

আলতা। (নড়িয়া চড়িয়া) তোমাদের দুই ভাই বোনের সংসর্গে এসে আমার মন বোধ হয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। লজ্জা দুর্বলতার লক্ষণ জান তো?—কিন্তু ও কথা এখন থাক। আজ কি রান্নাবান্না কিছু হবে না? অজয়বাবুর কি আজ একাদশী?

অন। একাদশী হতে যাবে কেন, ত্রিদিববাবুর বাড়িতে তাঁর নেমন্তন্ন।

আলতা। ও—আমি জানতুম না।

অন। কী সব ভাই কাজের কথা হবে তাই ত্রিদিববাবু নেমন্তন্ন করেছেন! ওঁরা দু'জনে মিলে শেয়ারের ব্যবসা করেছেন কিনা।

আলতা। হুঁ—ওসব কাজ-টাজ মিছে কথা। অজয়বাবু নিজেই যেচে নেমন্তন্ন নিয়েছেন, আর, কেন নিয়েছেন তাও আমি বুঝতে পেরেছি।

অন। কেন?

আলতা। আমার হাতের রান্না খাবার ভয়ে পালিয়েছেন! (তিক্তস্বরে) কেন ভাই রোজ রোজ তুমি আমাকে রাঁধতে বল! আমি পারি না, উনিও মুখে দিতে পারেন না—

অন। তাই নেমন্তন্ন খেয়ে পেট ভরাতে গেছেন। কিন্তু তোমার রান্না ভাল লাগে না এ কথা তিনি একদিনও বলেছেন কি?

আলতা। বলেন নি—হয়তো সঙ্কোচ হয়েছে। তোমার অজয়দা ভালমানুষ লোক, মুখ ফুটে বলতে পারেন নি।

অন। অজয়দা ভালমানুষ লোক, তাহলে স্বীকার করছ?

আলতা। আমার স্বীকার করা না করায় কী আসে যায়! আমি তো পর, বাইরের লোক। তুমি তাঁকে ভালমানুষ বলে জানো—তাহলেই হল।

অন। আলতা, কি উলটো বোঝা মেয়ে তুমি! ইচ্ছে করে তোমায় ধরে ঝাঁকানি দিই!—এই যে কোঁকড়া চুলে ভরা মাথাটি, ওর মধ্যে বুদ্ধি কি এক ফোঁটা নেই? পদ্ম-পলাশের মত চোখদুটি কি মুখের শোভার জন্যেই ভগবান দিয়েছিলেন? দেখে কি দেখতেও পাও না?

আলতা। কি দেখব?

অন। দেখবে তোমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু!—নাও, নাচতে যদি নিতান্তই লজ্জা করে, একটা গান গাও—

আলতা। না ভাই, আমার কিছু ভাল লাগছে না, শরীরটা কেমন যেন ক্লান্ত বোধ হচ্ছে—(বিছানার দিকে তাকাইল) ও কি! আমার বিছানায় ফুল রাখলে কে?

শয্যা হইতে পাঁচটি লাল গোলাপের গুচ্ছ তুলিয়া লইল

অন। ওমা সত্যি তো! পাঁচটি গোলাপ ফুল! কোত্থেকে এল ভাই?

আলতা। তা তো জানি না! জানালা খোলা রয়েছে দেখছি? কে রেখে গেল?

অন। হয়তো তোমার কোন বন্ধু চুপি চুপি রেখে গেছেন।

আলতা। বন্ধু? কে বন্ধু পাঁচটি ফুল—লাল ফুল! (সহসা আলতার চক্ষু উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল) অনু, বুঝেছি কে ফুল রেখে গেছেন!

অন। কে?

আলতা। লাল পাঞ্জা! পাঁচটি লাল ফুল, বুঝতে পারলে না?

অন। লাল পাঞ্জা! কিন্তু শুনেছি—লাল পাঞ্জা শুধু হাতের ছাপ পাঠায়।

আলতা। সে যাদের শাস্তি দিতে চায় তাদের পাঠায়। লাল পাঞ্জা আমার বন্ধু— আমার—(মুগ্ধভাবে ফুলের আঘ্রাণ লইল)

অজয় প্রবেশ করিল

অজয়। এই যে অনু তুমি এখানে। তোমাকে খুঁজছিলুম।

অনু। কেন অজয়দা, তুমি এখনো ত্রিদিববাবুর বাড়ি গেলে না?

অজয়। না, এইবার যাব। আজ শেয়ার মার্কেটে কিছু লাভ করেছি, তাই ভাবলুম তোমার জন্যে যাহোক কিছু নিয়ে যাই। (পকেট হইতে মখমলের কৌটা বাহির করিয়া দুইটা দুল দেখাইল) কেমন, পছন্দ হয়?

অনু। অজয়দা, একবার এদিকে এস তো। (দূরে লইয়া গিয়া চাপা গলায়) আলতার জন্যে কি এনেছ?

অজয়। কিছু তো আনিনি।

অনু। আনোনি! কেন আনলে না?

অজয়। মনে ছিল না।

অনু। তুমি ইচ্ছে করে আনোনি। উঃ, অজয়দা, তুমি মাঝে মাঝে এমন কাণ্ড কর যে লজ্জায় আমার মুখ দেখাবার যো থাকে না। না, আমি তোমার উপহার নেব না। কেন তুমি আলতাকে অমন করে অবহেলা করবে!

(দ্রুত প্রস্থান)

আলতা এতক্ষণ আরক্তমুখে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অজয় যখন ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম করিল, তখন আলতা তাহার অপমানলাঞ্ছিত মুখে জোর করিয়া একটু হাসি আনিয়া অজয়ের দিকে ফিরিল।

আলতা। অজয়বাবু, দাঁড়ান—(অজয় ফিরিল) অনুর জন্যে কি উপহার এনেছেন দেখি—(অজয় দেখাইল) বেশ জিনিস। কিন্তু এর চেয়ে ভাল নয়। (ফুল দেখাইল)

অজয়। গোলাপ ফুল দেখছি! কোথায় পেলে?

আলতা। আমার এক বন্ধু আমাকে উপহার দিয়েছেন।

অজয়। ও! তা—বন্ধু এলেন কোন্ দিক দিয়ে?

আলতা। ঐ জানালা দিয়ে!

অজয়। বটে। বন্ধুটির নাম জানতে পারি কি?

আলতা। শুনবেন তাঁর নাম? লাল পাঞ্জা।

অজয়। লাল পাঞ্জা! কিন্তু লাল পাঞ্জার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব আছে তা তো জানতুম না।

আলতা। (অবরুদ্ধ ক্রোধে) শিগ্‌গিরই জানতে পারবেন। আপনি মনে করেন, ইচ্ছে করলেই আমাকে অপমান করতে পারেন; সেটা আপনার ভুল। আপনি সাবধানে থাকবেন।

অজয়। আমি খুব সাবধানেই থাকি, রাত্রে ঘরে দোর বন্ধ করে শুই। কিন্তু অপমান আমি তোমাকে কোনদিন করিনি।

আলতা। করেছেন—একশ বার করেছেন। কিন্তু তা বোঝবার ক্ষমতাও বোধ হয় আপনার নেই।

অজয়। তা হবে—আর কিছু বলবার আছে কি? না থাকে আমি চললুম। তোমার শোবার ঘরে বেশীক্ষণ থাকলে তোমাকে অপমান করা হবে। (প্রস্থানোদ্যত)

আলতা। অজয়বাবু! (অজয় ফিরিল) দোহাই আপনার, আমাকে মুক্তি দিন। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আপনি আমাকে অব্যাহতি দিন।

অজয়। তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

আলতা। আপনার বাড়িতে আপনাদের সংসর্গে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। স্নেহ মমতা তো দূরের কথা যেখানে দুটো মিষ্টি কথাও পাওয়া যায় না—সেখানে আর আমি তিষ্ঠিতে পারছি না। কোথাও আশ্রয় না পাই আমি গাছতলায় থাকব, আপনি আমাকে

ছেড়ে দিন।

অজয়। কিন্তু তা কি করে হবে? আমার কর্তব্য তো আমি অবহেলা করতে পারি না! তোমার বাবার উইল—

আলতা। বাবার উইলের নাগপাশ ছিঁড়ে বেরুবার কি আমার কোন উপায় নেই?

অজয়। তোমার কুড়ি বছর বয়স কিম্বা বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত উপায়ই দেখছি না!

আলতা। বিবাহ! কি বললেন—বিবাহ?

অজয়। হ্যাঁ—বিবাহ। উইলের নির্দেশ এই যে, তোমার বিবাহ হলেই আমার দায়িত্ব শেষ হবে।

আলতা। (অর্ধ স্বগত) এ কথা আগে শুনিনি কেন! তাহলে তো এতদিন ধরে আমাকে অপমান সহ্য করতে হত না!

অজয়। কি করতে—বিবাহ?

আলতা। নিশ্চয়। কেন, আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন নাকি?

অজয়। না! আমার একটা মহৎ গুণ, কোনো অবস্থাতেই আমি আশ্চর্য হই না। কিন্তু বিবাহের পাত্রটি হত কে? লাল পাঞ্জা নাকি ?

আলতা। লাল পাঞ্জা! (ফুলের দিকে চাহিয়া) হ্যাঁ, তাঁকেই আমি বিয়ে করতুম! কেন করব না! লাল পাঞ্জার মত স্বামী পাওয়া তো ভাগ্যের কথা।

অজয়। (ঊর্ধ্বদিকে তাকাইয়া) হয়তো লাল পাঞ্জার বয়স ৭৫ বৎসর।

আলতা। কখ্‌খনো না—তিনি যুবাপুরুষ। আদর্শ যুবাপুরুষ তিনি. অসহায় নারীকে নির্যাতন করেন না—উদ্ধার করেন।

অজয়। তা হবে। তোমার সঙ্গে যখন তার এত মাখামাখি তখন তুমিই ভালো জানো।

আলতা। (অধর দংশন) মাখামাখি নেই—আমি তাঁকে কখনো দেখিনি। কিন্তু তিনি আমাকে চেনেন; আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট!

অজয়। তাহলে—লাল পাঞ্জাকেই বিবাহ করা স্থির?

আলতা। আমার বিবাহ তো বিবাহ নয়, আপনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার একটা উপায় মাত্র! লাল পাঞ্জা কেন, আমি যাকে সামনে পাব তাকেই বিবাহ করব; শুধু আপনার জেলখানা থেকে মুক্তি চাই।

অজয়। সে বেশ কথা, তাই কোরো তাহলে! (দ্বার পর্যন্ত গিয়া) কিন্তু পাত্র যদি আমার পছন্দ না হয়, আমি বিয়ে হতে দেব না—

(প্রস্থান)

আলতা। এরা সব পাথর দিয়ে তৈরি! দয়া নেই মায়া নেই, একটা মিষ্টি কথা পর্যন্ত কইতে জানে না। আমি পারব না, পারব না—যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব। এর চেয়ে গাছতলাও ভাল। সেই যে রূপকথার রাজকন্যা প্রতিজ্ঞা করেছিল, সকালে উঠে যার মুখ দেখবে তাকেই বিয়ে করবে, আমিও তাই করব!—

নেপথ্যে ত্রিদিবের কণ্ঠস্বর—অজয়। অজয়।

আলতা। ঐ ত্রিদিববাবু এসেছেন! ঠিক হয়েছে! আমি ওঁকে ভালবাসি না কিন্তু তবু—; আমি মুক্তি চাই—মুক্তি চাই!

ত্রিদিব প্রবেশ করিল

ত্রিদিব। অজয় কোথায়? অনু বললে, এখানে আছে!

আলতা। ছিলেন, চলে গেছেন।

ত্রিদিব। ও তাকে খুঁজতেই বেরিয়েছিলুম—তারপর, তোমার খবর কি? তুমি আজকাল খুব ভাল রাঁধতে শিখেছ শুনলুম, কই আমাকে তো একদিনও নেমন্তন্ন করে খাওয়ালে না।

আলতা। ভাল রাঁধতে শিখেছি কে বললে?

ত্রিদিব। অজয় কাল বলছিল।

আলতা। বোধ হয় ঠাট্টা করে বলেছেন।

ত্রিদিব। ঠাট্টা বলে তো বোধ হল না। বরং আমি নেমন্তন্ন করাতে বেশ একটু বিমর্ষ হয়ে পড়ল। তা সে যাহোক তুমি আমাকে রেঁধে খাওয়াচ্ছ কবে বল। নেহাৎ যদি নেমন্তন্ন না কর তাহলে অনাহূত ভাবেই একদিন খেয়ে যাব!—কিন্তু একেবারে ফাঁকি পড়তে রাজী নই। আজ চললুম, অজয় হয়তো এতক্ষণ আমার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছে।

(গমনোদ্যত)

আলতা। ত্রিদিববাবু, শুনুন—

আলতার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যে ত্রিদিব চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল।

ত্রিদিব। (কাছে গিয়া) কি হয়েছে? আলতা, আজ তোমার মুখ এত বিমর্ষ দেখছি কেন? আবার কিছু হয়েছে নাকি?

আলতা। (অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া) ত্রিদিববাবু, আপনি—আপনি—

ত্রিদিব। থামলে কেন, কি বলবে বল?

আলতা। বলতে লজ্জা করছে যে!

ত্রিদিব। লজ্জা করছে! এমন কি কথা যা আমার সামনে বলতে লজ্জা করছে! আমার দিকে ফেরো তো দেখি।

আলতা। না—(জোর করিয়া) আপনি—আপনি আমায় বিয়ে করবেন?

ত্রিদিব। কী! কী বললে?

আলতা। বললুম তো—কতবার বলব?

ত্রিদিব। হয়তো শুনতে ভুল করেছি; কিন্তু মনে হল তুমি যেন বললে 'আপনি আমায় বিয়ে করবেন!'

আলতা। তাই তো বলেছি।

ত্রিদিব কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর নিজেকে একটা ঝাঁকানি দিয়া যেন মিথ্যার স্বপ্ন ঝাড়িয়া ফেলিল।

ত্রিদিব। না, বিশ্বাস হচ্ছে না—(আলতার সম্মুখীন হইয়া) দেখি তোমার মুখ! (মুখ তুলিয়া ধরিল) এবার সত্যি কথা বল দেখি কী হয়েছে?

আলতা। (হাত চাপিয়া ধরিয়া) ত্রিদিববাবু, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন, অজয়-বাবুর হাত থেকে আমাকে বাঁচান—আমি আর কিছু চাই না।

ত্রিদিব। (ছাড়িয়া দিয়া) তাই বল! (ঈষৎ হাসিয়া) এক মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হয়েছিল, বুঝি সত্যিই তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও।

আলতা। সত্যিই চাই ত্রিদিববাবু।

ত্রিদিব। (সস্নেহে পিঠে চাপড় মারিয়া) পাগলি! রাগ হলে আর জ্ঞান থাকে না। অজয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে তো? ও কিছু নয়, একসঙ্গে থাকতে গেলে ঘটি-বাটিতে ঠোকা-ঠুকি লাগে, মিটে গেলে আর কিছু থাকবে না। কিন্তু তোমার এ অভ্যেসটা তো ভাল নয়! রাগ হলেই যদি যার-তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে বসো তাহলে বিপদে পড়বে। সকলে ত্রিদিববাবু নয়—আসল কথাটি বুঝবে না; তখন সারা জন্ম ধরে কাঁদলেও আর উপায় থাকবে না।

আলতা। আপনিও আমাকে অপমান করছেন! উঃ ভেবেছিলুম আপনি আমাকে ভালবাসেন।

ত্রিদিব। ভালবাসি আলতা। তোমাকে এত ভালবাসি যে সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আর, সেই জন্যেই তোমাকে বিয়ে করে তোমার জীবনটা নষ্ট করে দিতে পারব না; তুমি জান না কিন্তু আমি জানি তোমার মন কোথায় বাঁধা পড়েছে! যেদিন মান-অভিমান দর্প-অহঙ্কার সব ভেঙে পড়বে, সেদিন তুমিও বুঝতে পারবে। কিন্তু আর নয়, এবার চললুম— (প্রস্থান)

আলতা। কেউ আমাকে চায় না! এত নগণ্য আমি! আমি কী করব এখন! আমার

জীবনটা যেন দিন-দিন জট পাকিয়ে যাচ্ছে; গুটিপোকার মত নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়েছি। কেন এমন হল! কেন এমন হল! (উদ্‌ভ্রান্তভাবে প্রস্থান)

অনসূয়া প্রবেশ করিল

অন। আলতা! কই, কেউ তো নেই। এরা সব গেল কোথায়!

গবাক্ষ পথে কুমারকে দেখা গেল

কুমার। (চাপা গলায়) অনু—আমি এসেছি!

অন। তুমি! আবার!—

কুমার আসিয়া অনসূয়ার সম্মুখে নতজানু হইল

কুমার। অনু, আজ চোরের মত লুকিয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি। আমার দুর্বলতা আমাকে তোমার কাছে অপরাধী করে রেখেছিল; তারপর তুমি যখন চলে গেলে তখন বুঝতে পারলুম নিজের কী সর্বনাশ করেছি। আমাকে ক্ষমা কর অনু, আমি ভাবতে পারিনি যে ইহজন্মে তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার অবকাশ পাব।

অন। কিন্তু—আমি যে ভুলতে চেয়েছিলুম—

কুমার। ভুলতেই তো হবে অনু; আমার দোষ-ত্রুটি ভুলে গিয়ে আমার হাত ধরে তোমাকে দাঁড়াতে হবে। (উঠিয়া) আমার দুর্বলতা আমি কাটিয়ে উঠেছি—এখন তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও, আমার অতীত দুর্বলতার সব গ্লানি মুছে দাও, পৃথিবীতে সকলের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অধিকার দাও—(হস্ত প্রসারণ) এস!

অনসূয়া কিছুক্ষণ নিশ্চল হইয়া রহিল; তারপর ধীরে ধীরে কম্পিতহস্তে কুমারের প্রসারিত হস্ত ধারণ করিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

কেশবের গৃহে বহুমূল্য আসবাবে সজ্জিত ড্রয়িং-রুম। পিয়ানোতে বসিয়া শেখর ও তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ঝর্ণা গান করিতেছে। কখনো ঝর্ণার কখনও শেখরের গলা শুনা যাইতেছে। গানের 'আমার প্রিয়া' কথাগুলি শেখর গাহিতেছে।

পিয়াল বনে আমার প্রিয়া বেড়ায় ঘুরে ছন্দ হয়ে,
প্রজাপতির পাখা অথির—ছুটে অধীর অন্ধ হয়ে।
হরিণী চমকি ফিরিয়া চায়
ভ্রমরী গুমরি গুমরি গায়
পিয়াল ছায় মলয় বায় সুখে ঘুমায় গন্ধ হয়ে।
ঝরে কুসুমের রেণু-কণা
কানন বধূরা আনমনা
নূপুর পায় প্রিয়া আমার নেচে বেড়ায় ছন্দ হয়ে।

গান শেষ হইলে শেখর ঝর্ণার হাত ধরিয়া নিজের সম্মুখে বসাইল; ঝর্ণা রকিং চেয়ারে বসিয়া দুলিতে লাগিল। শেখর তাহার অনতিদূরে বসিল।

শেখর। ঝর্ণা, একটা অমানুষকে তুমি মানুষ করে তুললে—

ঝর্ণা। সত্যি। (সুরে) হরিণী চমকি ফিরিয়া চায়
ভ্রমরী গুমরি গুমরি গায়—

শেখর। আমার কথা শেষ পর্যন্ত শোনো। মানুষ তো করে তুললে কিন্তু তার অবশ্যম্ভাবী পরিণামটা ভেবে দেখেছ কি?

ঝর্ণা। কই না দেখিনি তো—(সুরে)

পিয়াল ছায় মলয় বায় সুখে ঘুমায় গন্ধ হয়ে।

শেখর। পরিণাম হচ্ছে এই যে, মানুষটা তোমাকেই গ্রাস করতে চাইবে। মানুষের দাবী যে অনেক ঝর্ণা! বেশ ছিলে, এখন হঠাৎ মানুষ তৈরি করে কী বিপদে পড়লে দেখ দেখি!

ঝর্ণা। বিপদ কিসের! মানুষ যদি তৈরি করে থাকি সে মানুষটা তো আমারই! আমি তাকে নিয়ে ভাঙব গড়ব খেলা করব—যা ইচ্ছে করব। তুমি বাধা দেবে কেন?

শেখর। বাধা দিইনি! কিন্তু মানুষটা তো কাচের পুতুল নয়—মানুষ!

ঝর্ণা। বেশ তো! ভালই তো! (উঠিয়া) যাই, তোমার খাবার তৈরি হল কি না দেখি গে— (গমনোদ্যত)

শেখর। ঝর্ণা, শোনো—

ঝর্ণা। না—(ফিরিয়া) ঝরে কুসুমের রেণু-কণা

কানন বধূরা আনমনা—

শেখর উঠিয়া ধরিতে গেল; ঝর্ণা হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল।

শেখর কয়েকবার পায়চারি করিল; তাহার স্মিতমুখ ক্রমশ গম্ভীর হইল।

শেখর। না, আর দেরি করা উচিত নয়, কেশববাবুকে বলা দরকার। কেশববাবু ভাল লোক, আমাকে অনেক দয়া করেছেন—কিন্তু এই চরম দয়া করবেন কি?—বিশ্বাস হয় না—আমি তো দীন দরিদ্র, জীবনপথের একমাত্র সম্বল গলা। (বিমর্ষ হাস্য) তবু—বলা যায় না। ভাগ্যদেবতা কোন পথ দিয়ে কোথায় নিয়ে চলেছেন কে জানে! আশ্চর্য মানুষের জীবন! কী খুঁজতে বেরিয়েছিলুম, কী খুঁজে পেলুম। প্রতিহিংসার শ্মশানবহ্নি বুকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলুম, যাত্রা শেষে দেখছি ভালবাসার ঘৃত-প্রদীপ জ্বলছে! কিন্তু অনু—আমার হারিয়ে যাওয়া বোন—সে আজ কোথায়!—

হাত ধরাধরি করিয়া অনসূয়া ও কুমারের প্রবেশ। শেখরকে দেখিয়া অনসূয়া ক্ষণকালের জন্য পাষাণ মূর্তিতে পরিণত হইল; তারপর ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

অন। দাদা!—আমার দাদা! (কাঁদিতে লাগিল)

শেখর। অনু! অনু—ছোট বোনটি আমার!

শেখর কিয়ৎকাল আত্মহারা ভাবে ভগিনীকে জড়াইয়া ধরিয়া চুলে হাত বুলাইয়া আদর করিল; তারপর ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া

শেখর। কুমারবাবু, অনু এখানে কি করে এল?

কুমার। এখানেই তো ওর স্থান শেখরবাবু।

শেখর। বুঝতে পারছি না। অনুর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ কি?

কুমার। অনু আমাকে ভালবাসে, আমি অনুকে ভালবাসি—এর চেয়ে বড় সম্বন্ধ পৃথিবীতে আর কী আছে শেখরবাবু!

শেখর। (ধীরে ধীরে অনসূয়াকে ছাড়িয়া দিয়া) তবে—তবে আপনিই?

অন। (অশ্রুসিক্ত মুখে) দাদা, আমরা আজ বাবার আশীর্বাদ নিতে এসেছি, তুমিই আশীর্বাদ কর।

নতজানু হইয়া শেখরেব জানু জড়াইয়া ধরিয়া

শেখর। আশীর্বাদ! কুমারবাবু, আপনি অনুকে বিয়ে করবেন?

কুমার। হ্যাঁ, বাবা যদি অনুমতি না দেন, তাঁর অবাধ্য হয়েই বিয়ে করব। শেখরবাবু, আপনি অনুর দাদা, আপনার কাছে আমি অপরাধী; ক্ষমা চাইবার যোগ্যতা আমার নেই—

শেখর। দরকার নেই, দরকার নেই ভাই! তুমি অনুকে বিয়ে করবে, আমার পক্ষে এই যথেষ্ট—(ঊর্ধ্বে চাহিয়া) আজ কি আমার সব ফিরে পাওয়ার দিন! মনুষ্যত্ব স্নেহ প্রেম—সব একসঙ্গে পেলুম।

ঝর্ণা প্রবেশ করিল

ঝর্ণা। দাদা।—(অনসূয়াকে দেখিয়া) ইনি কে?

কুমার। উনি—তোমার বৌদিদি।

ঝর্ণা। অ্যাঁ—সত্যি! ইনিই আমার হারিয়ে যাওয়া বৌদিদি—যাঁর জন্যে তুমি খালি কবিতা আওড়াতে? আজকাল বৌদিকে পেয়েছ বলে বুঝি আর কবিতা বল না?

কুমার। হ্যাঁ, ঝর্ণা!

শেখর। ঝর্ণা, তোমার বৌদির আর একটা পরিচয় আছে—উনি আমার বোন।

ঝর্ণা। উঃ—কী আশ্চর্য! চল ভাই বৌদি, তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে যাই—(হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে যাইতে) আচ্ছা, তুমিও গান গাইতে জানো—? (উভয়ের প্রস্থান)

কুমার। অপরিচয়ের মাঝে থাক তুমি অশ্যালক বেশে
ঘনিষ্ঠ হলেই তব শালা মূর্তি বাহিরায় এসে!
কি বিচিত্র ব্যাপার! শেখরবাবু, তুমি যে একদিন আমার শালা হবে, এ কথা কে জানত!

শেখর। কেউ না। এমন কি তুমি যে একদিন আমার শালা হবে একথাও কেউ জানত না।

কুমার। অ্যাঁ—বল কি! ঝর্ণা তাহলে—?

শেখর। (ঘাড় নাড়িয়া) ঠিক ধরেছ।

দুজনে সহাস্যমুখে করমর্দন করিল

কুমার। তাহলে বাবার কাছে দুজনে একসঙ্গেই দরখাস্ত পেশ করব। যদি না মঞ্জুর হয়, তখন দুজনে হাত ধরাধরি করে একসঙ্গেই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ানো যাবে—কি বল! মরার বাড়া তো গাল নেই!

কেশব প্রবেশ করিলেন, চক্ষে উন্মাদের দৃষ্টি

কেশব। (নিজ মনে) সব গেছে—যাক। টাকা তো ধুলো—যাক। আমার টাকা নয়, আলতার টাকা—আশুর মেয়ের টাকা—হাঃ হাঃ হাঃ—(উৎকর্ণভাবে শুনিয়া) আশু! তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া পরে হবে, আগে এখানকার দেনাপাওনা শোধ করে নিই। লাল পাঞ্জা! তাকে আমি চাই! যত লাগে—বিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার—তাকে চাই। আমাকে সর্বস্বান্ত করেছে। একবার মুখোমুখি দেখব—সে কে! তারপর—

পৈশাচিক মুখভঙ্গি করিয়া পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিলেন।

শেখর। কেশববাবু—

কেশব। (বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরিয়া) কে তুমি! তোমাকে তো চিনি না। (নিকটে গিয়া) তুমিই কি লাল পাঞ্জা!—চিনেছি! চিনেছি! তুমিই লাল পাঞ্জার চিঠি হাতে করে আমার বাড়িতে ঢুকেছিলে! তোমাকে মদ খাইয়ে মারব ভেবেছিলুম, কিন্তু তুমি মরনি। কুছ পরোয়া নেই, এবার মরতে হবে—(পিস্তল তুলিলেন)

কুমার। বাবা—!

ছুটিয়া গিয়া কেশবের হাত চাপিয়া ধরিল।

কেশব। কে—কুমার! (সন্দিগ্ধ নিরীক্ষণ করিলেন) তুমিই যে লাল পাঞ্জা নও তার প্রমাণ কি? তুমি একটা হা-ঘরে মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে—আমি দিইনি। প্রতিশোধ—হাঃ হাঃ হাঃ—প্রতিশোধ?

টেলিফোন বাজিয়া উঠিল, কেশব ভয়ার্তভাবে চমকিয়া উঠিলেন।

কেশব। ঐ—ঐ—! লাল পাঞ্জা হাসছে! ঘুমের মধ্যে ঐ হাসি শুনতে পাই—জেগে শুনতে পাই!—কোথায় গেল! কোথায় গেল! (চারিদিকে চাহিলেন)

মৃত্যুঞ্জয় প্রবেশ করিল

কেশব। তুমি! তুমি হাসছিলে? তুমি তাহলে লাল পাঞ্জা! (ঘাড় ধরিলেন)

মৃত্যুঞ্জয়। আজ্ঞে আমি মৃত্যুঞ্জয়।

কেশব। মৃত্যুঞ্জয়! মৃত্যুকে তুমি জয় করেছ? কি চাও তুমি?

মৃত্যুঞ্জয়। (ভয়কম্পিত স্বরে) আপনার এক লাখ টাকার life কোম্পানী accept

করেছে, সেই খবর দিতে এসেছিলুম,—আপনার first premiumও দাখিল হয়ে গেছে, রসিদ এনেছি—

কেশব। (ছাড়িয়া দিয়া) ঠিক কথা! এক লাখ টাকার লাইফ ইন্সিওর!—আমি মরলে টাকা পাব তো! (মৃত্যুঞ্জয় সভয়ে ঘাড় নাড়িল) ব্যস্‌, তাহলে আমার মরা দরকার, এক লাখ টাকা পাব!

রণবীর প্রবেশ করিল

কেশব। দুষমনের মত চেহারা—কে তুমি!

রণবীর। কী সর্বনাশ! এ তো দেখছি উন্মাদ পাগল—কেশববাবু—

কেশব। ধরেছি—হাঃ হাঃ হাঃ এতক্ষণে ধরেছি। লাল পাঞ্জা! (অগ্রসর)

রণবীর। (পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে) চেপে ধরুন—চেপে ধরুন। কি করছেন আপনারা! দেখছেন না, কেশববাবু পাগল হয়ে গেছেন!

শেখর। দেখছি তো, কিন্তু ধরবে কে! ওঁর হাতে কি রয়েছে—দেখছেন না?

রণবীর। ও বাবা।

ত্রিদিব প্রবেশ করিল

ত্রিদিব। কেশববাবু, শুনলুম নাকি—এ কি!

কেশব। তুমি ত্রিদিব ব্যারিস্টার। বলতে পার লাল পাঞ্জা কে?—বলবে না! গুলি করব, সবাইকে খুন করব! বলবে না? (একে একে সকলের দিকে তাকাইয়া) এরা সবাই লাল পাঞ্জা!! (চীৎকার) সবাইকে আমি খুন করব! কিন্তু না, পিস্তলে একটি গুলি আছে!—তবে উপায়! কাকে মারি?—ঠিক হয়েছে; আমি মরব। লাইফ ইন্সিওর করেছি, মরলে লাখ টাকা পাব—লাখ টাকা—

নিজের বুকে পিস্তল লাগাইয়া ছুড়িলেন।

এই সময়ে দুই দিক হইতে একসঙ্গে অজয় ও লাল চাঁদ প্রবেশ করিল।

লালচাঁদ। (মৃতদেহ দেখিয়া) এক নম্বর—নিষ্ক্রান্ত! বাকি সকলেই উপস্থিত। দাঁড়ান, কেউ নড়বেন না; আমি পুলিসে ফোন করছি—

রণবীর। আপনি কে?

লালচাঁদ। আমি লাল পাঞ্জা। (ফোন তুলিলেন) হ্যালো—

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অজয়ের গৃহাভ্যন্তরে একটি কক্ষ। আলতা একাকিনী একটি ছোট টেবিলের উপর সযত্নে টেবিল-ক্লথ বিছাইতেছে। কাল—সন্ধ্যার পর।

আলতা। আমার সর্বস্ব গিয়েছে—কিন্তু কই, দুঃখ তো হচ্ছে না! বরং মনে হচ্ছে, আমার প্রাণটা টাকার তলায় চাপা পড়ে ছিল, এতদিনে মুক্তি পেয়েছে! (ঘড়িতে সাতটা বাজিল) অজয়বাবু এখনো এলেন না। সেই সাত-সকালে খেয়ে বেরিয়েছেন, এখনো ফেরবার নামটি নেই। পুরুষমানুষ জাতটা বাইরে বাইরে খুব বেড়াতে কি ভালোই বাসে! আর আমরা যে সারাদিন একলাটি বাড়িতে পড়ে থাকি, সেদিকে কারুর নজর নেই। (ঘরের এটা-ওটা গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে) অনু চলে গেছে—সে তার ভায়ের কাছে স্বামীর কাছে গিয়েছে। নিশ্চয় খুব সুখে আছে। আর ঝর্ণা—সে তো অসুখী হতে জানে না। ওরা বেশ আছে। (দীর্ঘশ্বাস) দূর ছাই, কিছু ভাল লাগে না। একটা গান গাই। অনেক

দিন গাইনি, হয়তো ভুলে গেছি—(খামখেয়ালী হাস্য)

মৃদুকণ্ঠে গান

ভাল লাগে তার পথ চাওয়া
যে-পথ স্মৃতির ঝরা কুসুমে ছাওয়া
—ভাল লাগে।
সে আসিবে কি না
জানিনা—ওগো জানিনা,
তবু মরমে বাজে বীণা
তনু পুলকে দখিন হাওয়া
—ভাল লাগে।
মন-বীথি পথে বাজে চরণ-ধ্বনি
রহি শ্রবণ পাতি, প্রহর গণি;
সে ত আসে না—
শুধু অচেনা
পায়ের ধ্বনি করে আসা যাওয়া
—ভাল লাগে।

অজয় প্রবেশ করিল; গান অর্ধপথে থামিয়া গেল।

অজয়। (ধীরে সুস্থে টেবিলের সম্মুখে উপবেশন করিল) বেশ গানটি। কার উদ্দেশ্যে গাওয়া হচ্ছে জানতে পারলে আরো ভাল লাগত।

আলতা। (লজ্জা দমন করিয়া গম্ভীর মুখে) কারুর উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়নি, নিজের মনেই গাওয়া হচ্ছিল।

অজয়। ও—আমি ভেবেছিলুম বুঝি লাল পাঞ্জাকে—(আলতা অধর দংশন করিল)—যাক্, আমার চা কই? গৃহস্বামী যখন সমস্ত দিন খেটে-খুটে গৃহে ফিরে আসেন, তখন চা তৈরি থাকে না কেন?

আলতা। চা তৈরি আছে। গৃহস্বামীর তো সময়ের ঠিক নেই, তাই থার্মো ফ্লাস্কে ভরে রাখা হয়েছে।

কাবার্ড খুলিয়া চা জলখাবার লইয়া টেবিলে রাখিল।

অজয়। (মহানন্দে) হুর্‌রে! থ্রি চিয়ার্স! বন্দে মাতরম্! ইনক্লাব জিন্দাবাদ! গড্ সেভ্ দি কিং।

আলতা। (স্মিত বিস্ময়ে) কী হল! চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করলেন যে!

অজয়। (গম্ভীর হইয়া চা পান পূর্বক) দেখ আলতা আমরা এই পুরুষ জাতটা অত্যন্ত নিরীহ ভালমানুষ; ঠিক সময়ে খেতে পেলে আর কিছু চাই না। তাই, আমরা বাড়িতে পদার্পণ করতে না করতে যখন লক্ষ্মী ঠাকরুণের মত চা আর রসগোল্লা এনে হাজির কর, তখন আনন্দে আমাদের প্রাণটা একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে।

আলতা। (আনন্দ গোপন করিয়া) ও—তাই! আমি ভেবেছিলুম বুঝি আর কিছু হয়েছে।

অজয়। না—আর কিছু হয়নি। (কিছুক্ষণ নিবিষ্ট মনে ভোজন) আচ্ছা আলতা, অনু চলে গিয়ে অবধি তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে—না?

আলতা। কষ্ট হবে কেন?

অজয়। একলা তোমাকেই তো সংসারের সব কাজ করতে হয়, তাই বলছি।

আলতা। আমি কি এতই অপদার্থ যে দু'জনের সংসার চালাতে পারি না! তার চেয়ে বলুন আপনারই কষ্ট হচ্ছে। অনু যেমনটি পারত আমি কি তেমনটি পারি! (অজয় মুখ ফিরাইয়া হাসিল) হাসছেন যে?

অজয়। কই হাসলুম! হাসিনি তো।

আলতা। এত মিথ্যে কথাও বলতে পারেন আপনি!

অজয়। অ্যাঁ—হেসেছিলুম নাকি! তাহলে বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে হেসে ফেলেছিলুম।

আলতা। কৈফিয়ৎ দেবার দরকার নেই। (মুখ ভার করিয়া কাবার্ডের নিকট গেল; সেখানে এটা-সেটা নাড়িতে নাড়িতে) আমার একশ'টা টাকা চাই।

অজয়। ওরে ব্বাসরে! একশ টাকা! হাসির খেসারৎ নাকি? কী হবে শুনি?

আলতা। দরকার আছে।

অজয়। (পকেট হইতে মণি-ব্যাগ বাহির করিতে করিতে স-নিশ্বাসে) দরকার যখন আছে তখন দিতেই হবে। (উদাস কণ্ঠে) দরকারটা সম্ভবত গোপনীয়, আমি জানতে পারি না?

আলতা। (ফিরিয়া) শীত আসছে, গরম জামা কাপড় চাই না?

অজয়। ও—তা একশ টাকার গরম জামা কে পরবে?

আলতা। আপনি পরবেন, আবার কে পরবে। গরম কাপড় যে এক টুকরো বাড়িতে নেই, তা জানেন?

অজয়। তাই আমি একশ টাকার গরম জামা পরে ভাল্লুক সেজে বসে থাকব!—আর তুমি?

আলতা। আমার আছে। এ বছর চলে যাবে।

অজয়। কেন, একটা ভাল ফার-কোট কিম্বা কাশ্মীরী শাড়ি—

আলতা। বললুম না, আমার আছে।

অজয়। বেশ, যা ভাল বোঝ কর। তুমি যখন বাড়ির গিন্নী তখন তোমার শাসন মেনে চলতে হবে বৈকি।

অজয় কয়েকটি নোট দিল; আলতা সেগুলি আলমারিতে তুলিয়া রাখিল

আলতা। অজয়বাবু, একটা কথা কয়েকদিন ধরে আপনাকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছি—

অজয়। আমিও একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছি। তা তোমার কথাটাই আগে হোক।

আলতা। (একটু সঙ্কুচিতভাবে) আমি কি একেবারে নিঃস্ব? কেশববাবু কি আমার কিছুই রাখেননি?

অজয়। শুধু তোমার বসত-বাড়িখানা আছে। তা—আজকালকার মন্দার বাজারেও তার দাম লাখ দেড়েকের কম হবে না।

আলতা। তাহলে আমি—আপনার গলগ্রহ নই?

অজয়। না তুমি আমার গলগ্রহ নও—(মুখের পানে চাহিয়া হাসিয়া) বরং আমিই তোমার গলগ্রহ। তোমার টাকায় খাচ্ছি পরছি বাড়ি ভাড়া দিচ্ছি—আর তোমার ওপর প্রভুত্ব করছি।—কি চমৎকার ব্যবস্থা তোমার বাবা করে গিয়েছেন।

আলতা। বাবার কোনো কাজের সমালোচনা করবার ধৃষ্টতা আমার নেই। আপনারও থাকা উচিত নয়।

অজয়। (জিভ কাটিয়া) সমালোচনা করিনি। তিনি আমাকে অনাথ আশ্রম থেকে কুড়িয়ে এনে সব চেয়ে বিশ্বাসের পদে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পেরেছি কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর নিন্দে করব এত অধম আমি নই।

আলতা। ও কথা যাক্। এখন আপনি কি বলবেন বলুন।

অজয়। আমি! ও—হ্যাঁ। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) দ্যাখ, অনু যতদিন ছিল, কোনো কথা ছিল না, কিন্তু এখন তুমি আমি ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ থাকে না। লোকে হয়তো কুৎসা করবে।

আলতা। (বিস্মিত) কুৎসা করবে কেন?

অজয়। তাদের মন কুৎসিত তাই কুৎসা করবে। বুঝতে পারছ না?

আলতা। (উত্তপ্ত মুখে) বুঝেছি। আপনি এই সব কুৎসাকে ভয় করেন?

অজয়। নিজের জন্যে করি না। কিন্তু তোমার জন্যে করি।

আলতা। (ঘৃণা ভরে) আমি করি না। ইতর লোকের ঘৃণিত কুৎসা আমি গ্রাহ্য করি না।

অজয়। জনমত যতই ঘৃণিত হোক, তাকে উপেক্ষা করে সমাজে থাকা চলে না। তাই ভাবছিলুম, তোমার জন্যে একটি সঙ্গিনী যদি যোগাড় করতে পারা যায়—

আলতা। (তীক্ষ্ন কণ্ঠে) আমরা কি এতই দুর্বল যে আমাদের পাহারা দেবার জন্য একজন চৌকিদার দরকার?

অজয়। আমরা জানি চৌকিদার দরকার নেই, কিন্তু বাইরের লোক তো তা বুঝবে না। (উঠিয়া) দেখি যদি একটি আধবয়সী গিন্নীবান্নি গোছের ভদ্রমহিলা যোগাড় করতে পারি—সংসারের কাজেও তিনি তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন।

আলতা। (জ্বলিয়া উঠিয়া) যে মুহূর্তে আপনি গিন্নীবান্নি ভদ্রমহিলাকে এ বাড়িতে ঢোকাবেন সেই মুহূর্তে আমি তাকে বিদেয় করব—এই বলে দিলুম। ভদ্রমহিলার সাহায্য আমি চাই না। এ বাড়িতে একটা ঝি আছে—সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

পত্র হস্তে ঝি প্রবেশ করিল

ঝি। একটা লোক চিঠিখানা দিয়ে গেল। (অজয়ের হাতে চিঠি দিয়া প্রস্থান)

অজয়। (খামের উপরে নাম দেখিয়া) তোমার চিঠি দেখছি।

আলতা। আমার চিঠি! কে লিখেছে?

অজয়। বলতে পারি না। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) হয়তো লাল পাঞ্জা!

(খাম আলতাকে দিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান)

আলতা। (খাম উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে) আমাকে তো কেউ চিঠি লেখে না। তবে কি সত্যিই—(পত্র বাহির করিয়া পড়িল) না, রণবীরবাবু লিখেছেন! কি আশ্চর্য! (কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি ভাবে বসিয়া রহিল) না—আমি যাব! (পত্র দেখিয়া) অজয়বাবু সম্বন্ধে গোপনীয় কথা! কী গোপনীয় কথা। কি করেছেন উনি?—আমি যাব; আমাকে জানতেই হবে। কিন্তু এই রাত্রে। তা হোক—দোষ কি। রণবীরবাবু একজন ডাক্তার, ভদ্রলোক—দোষ কি? (পত্র দেখিয়া) একলা ট্যাক্সিতে করে যেতে লিখেছেন। তাই যাব—আজই আমার জানা দরকার। অজয়বাবু সম্বন্ধে গোপনীয় কথা কী থাকতে পারে? জানতে ভয় করছে—তবু না জেনেও আমি পারব না—

বেশভূষার সামান্য পরিবর্তন করিয়া আলতা বাহির হইবার উপক্রম করিল;
সে দ্বারের সম্মুখীন হইয়াছে—অজয় প্রবেশ করিল

অজয়। (আপাদমস্তক দেখিয়া) কোথায় যাচ্ছ?

আলতা। আমি একটু বেরুব। আমার দরকার আছে।

অজয়। এত রাত্রে কোথায় তোমার দরকার? (আলতা নীরব) আলতা, কী হয়েছে, কে চিঠি লিখেছিল?

আলতা। তা আমি বলতে পারব না। অজয়বাবু, আমার বিশেষ দরকার, এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব।

অজয়। চল—আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

আলতা। না—আমি একলা যাব। (গমনোদ্যত)

অজয়। আলতা, যেও না। আমি—আমি মিনতি করছি যেও না।

আলতা। আমাকে যেতেই হবে অজয়বাবু, আমার দরকার আছে— (প্রস্থান)

অজয় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল

অজয়। দরকার আছে!—পৃথিবীতে শুধু আমারই কিছু দরকার নেই—

চিঠিখানা মেঝের পড়িয়াছিল; দেখিতে পাইয়া অজয় সাগ্রহে তুলিয়া লইল

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণবীরের গৃহে দ্বিতলের একটি কক্ষ। মেঝের কার্পেট, একটি সোফা, একটি ঔষধের আলমারি প্রভৃতি রহিয়াছে। রণবীর বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া পায়চারি করিতেছে। সময়—রাত্রি।

রণবীর। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যে—রাজত্ব তো ফাঁক হয়ে গেছে—এখন বাকি রাজকন্যে। তাই বা মন্দ কি! দেখি কে পায়! (দ্বারের নিকট গিয়া উচ্চকণ্ঠে) হরিহর!

শীর্ণকায় কম্পাউণ্ডার প্রবেশ করিল

হরিহর। আজ্ঞে?

রণবীর। রাত হয়েছে, ডিস্‌পেন্সারি বন্ধ করে তুমি বাড়ি যাও। আর রামদীনকে বলে দাও, আজ রাত্তিরটা তার ছুটি। কাল সকালে যেন আসে।

হরিহর। যে আজ্ঞে—(স্বগত) আজ একটু রকমফের আছে দেখছি। আজ্ঞে তা রাত্তিরে যদি রুগী আসে?

রণবীর। আসে তো আমি আছি—যাও।

হরিহর। (স্বগত) হুঁ হুঁ—রুগী নয়, রুগিনী আসছে।—যে আজ্ঞে— (প্রস্থান)

রণবীর আলমারি হইতে ব্রাণ্ডি আনিয়া এক মেজার গ্লাস পান করিল

রণবীর। ঐ অজয়টা হচ্ছে হর্তেল ঘুঘু। মিটমিটে ডান, ছেলে খাবার রাক্কস। কিন্তু বাবা আমিও এক হাত ভানুমতির খেল দেখিয়ে দোব। (আবার মদ্যপান) ক'দিন থেকে মনে হচ্ছে একটা লোক অনবরত আমার পেছু পেছু ঘুরছে। কেউ কিছু সন্দেহ করে নাকি? (চিন্তা) কোকেন বিক্রি করি—তা কোন্ শালার ডিস্‌পেন্সারি করে না? আর, এ ব্যাপার তো এখনো আরম্ভই হয়নি; আজই হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। (ঘড়ি দেখিয়া) আসবার সময় হল। আসবে নিশ্চয়; না এসে যাবে কোথায়! (উৎকর্ণ ভাবে শুনিয়া) ঐ আসছে—সিঁড়িতে পায়ের শব্দ—প্রথমটা নিজমূর্তি দেখানো চলবে না; ভদ্রভাবে—মার্জিত ভাবে—গায়ে সভ্যতার বার্নিশ লাগিয়ে—(মুখের ভাব পরিবর্তন করিয়া দাঁড়াইল)

আলতার প্রবেশ

আলতা। রণবীরবাবু—

রণবীর। আসুন মিস আলতা। এই কৌচটাতে বসুন; আপনি আমার বাড়িতে পদার্পণ করবেন, এ সৌভাগ্য আমার কল্পনার অতীত—

আলতা। আপনার চিঠি পেয়ে আসতে হল। নইলে এত রাত্রে—

রণবীর। (অনুযোগের স্বরে) কি করব মিস আলতা, চিঠি লেখা ছাড়া আমার আর গতি ছিল না। আপনি হয়তো জানেন না, আমি একবার বন্ধুভাবে আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম, কিন্তু এমনি আমার দুর্ভাগ্য দেখা তো পেলুমই না, উপরন্তু অজয়বাবু আর ত্রিদিববাবু আমাকে অপমান করে বিদেয় করে দিলেন—

আলতা। সে আমি শুনেছি—কিন্তু ও কথা থাক—কী গোপনীয় কথা বলবেন লিখেছিলেন—

রণবীর। (পাশে বসিয়া) মিস আলতা, আপনি হয়তো আমাকে একজন সাধারণ বন্ধু বলেই মনে করেন।কিন্তু আপনার প্রতি আমার মনোভাব যে কত গভীর—

আলতা। (তাড়াতাড়ি) কি গোপনীয় কথা বলবেন বলুন। অজয়বাবু সম্বন্ধে আপনি কী জানেন?

রণবীর। পরের নিন্দে করতে আমি ভালবাসি না। কিন্তু অজয়বাবু সম্বন্ধে আমি এমন অনেক কথা জানি যা মহিলার সামনে বলা যায় না।

আলতা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তবে আমাকে মিছে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন?

রণবীর। বসুন বসুন। আপনি যখন শুনতে চান তখন বলছি।—অজয় চৌধুরী যে

একজন জোচ্চোর ধড়িবাজ, এতদিনে নিশ্চয় আপনি তা বুঝতে পেরেছেন। আপনার বাবাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে উইল তৈরি করে নিয়েছিল তার ফলে আপনি এখন তার বাড়িতে একরকম বন্দী হয়ে আছেন।

আলতা। মিথ্যে কথা! অজয়বাবু জোচ্চোর নন; আর, তাঁর বাড়িতে আমার বন্দী হয়ে থাকার কথাও মিথ্যে!

রণবীর। মিথ্যে! জানেন, এই নিয়ে আপনার কি জঘন্য বদনাম রটেছে? সমাজে তো কান পাতবার যো নেই! কিন্তু আপনি জানবেন কোত্থেকে! অজয় যে অনাথ আশ্রমের কুড়ানো ছেলে, একথাও বোধ হয় জানেন না?

আলতা। জানি—তিনি নিজের মুখেই বলেছেন। আপনার আর কিছু বলবার আছে?

রণবীর। আছে বৈকি! জানেন, কেশববাবু আপনার যত টাকা শেয়ার মার্কেটে লোকসান দিয়েছেন, সব অজয়ের পকেটে গেছে! আপনাকে নিঃস্ব করে আজ সে বড়মানুষ।

আলতা। (উদ্ভাসিত মুখে) সত্যি! আমি জানতুম না। রণবীরবাবু, এত বড় সুখবর আপনি যে আমাকে দেবেন তা আমি প্রত্যাশা করিনি। কিন্তু আর বোধ হয় আপনার কিছু বলবার নেই! আমি তাহলে উঠলুম—নমস্কার।

রণবীর। (দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল) আলতা, বোসো। এখনো আমার আসল কথাই বলা হয়নি।

আলতা। আসল কথা!

রণবীর। হ্যাঁ—আসল কথা। আলতা, আমি তোমাকে ভালবাসি।

আলতা। রণবীরবাবু!

রণবীর। আলতা, আমি তোমাকে চাই। মরুভূমির তৃষ্ণায় পাগল হয়ে মানুষ যে ভাবে জল চায় আমি তেমনি তোমাকে চাই—(অগ্রসর)

আলতা। রণবীরবাবু! এ সব আপনি কী বলছেন! মিথ্যে ছল করে আমাকে এখানে এনে এ সব কথা বলতে আপনার সঙ্কোচ হচ্ছে না? আপনি না ভদ্রলোক!

রণবীর। ভদ্রলোক! পৃথিবীতে ভদ্রলোক নেই, সবাই পশু!— কেবল মুখের ওপর এক পোঁচ ভদ্রতার বার্নিশ মাখানো। আলতা—(অগ্রসর)

আলতা। পথ ছাড়ুন, আমি বাড়ি যাব।

রণবীর। বাড়ি যাবে, তোমার বাড়ি কোথায়? সে তো অজয়ের বাড়ি।

আলতা। সেই বাড়িই আমার বাড়ি।

রণবীর। সেখানে আর তুমি ফিরে যাবে না আলতা। আজ থেকে আমার বাড়িই তোমার বাড়ি। (নরম সুরে) আলতা, আমার কোনো কু-মতলব নেই, আমি তোমাকে বিয়ে করব।

আলতা। আপনি যদি আমাকে এখনি পথ ছেড়ে না দেন, আমি চেঁচামেচি করব।

রণবীর। চেঁচামেচি করবে! (কুটিল হাস্য) এ বাড়িতে আর কেউ নেই—শুধু তুমি আর আমি!

আলতা। (ভয়ার্ত কণ্ঠে) অ্যাঁ—

রণবীর। চেঁচামেচি কান্নাকাটি কিছুতেই কিছু হবে না—আট-ঘাট বেঁধে কাজ করেছি!—শোনো আলতা, আমি মরীয়া; যদি রাজী না হও, তোমার এমন অবস্থা হবে যে, তুমি—আমাকে বাধ্য—হয়ে—বিয়ে করবে। বুঝতে পারছ তার মানে?

আলতা অস্ফুট ত্রাসসূচক শব্দ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল

রণবীর। রাজী নও? রাজী নও? আচ্ছা তবে—(আলমারী হইতে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ আনিয়া) দেখছ? একটি ইন্‌জেকশানে আধমিনিটের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়বে। তারপর?

আলতা। (চিৎকার করিয়া) রক্ষে কর—কে আছ বাঁচাও!

রণবীর। বটে! তবে কে রক্ষে করে দেখি!

রণবীর আলতার হাত টানিয়া ইন্‌জেকশান দিতে উদ্যত হইল, কিন্তু সহসা বিকট হাসির শব্দে কশাহতের মত ফিরিয়া দেখিল, লাল মুখোস পরা একটি লোক দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রণবীর। লাল পাঞ্জা! (সিরিঞ্জ পড়িয়া গেল)

লাল পাঞ্জা রণবীরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিয়ৎকাল উভয়ের এইভাবে অবস্থান

লাল পাঞ্জা। (বিকৃত কণ্ঠে) পিছু ফের।

যন্ত্রচালিতবৎ রণবীর ফিরিল। লাল পাঞ্জা সিরিঞ্জ কুড়াইয়া লইল তাহার হাতে ইন্‌জেকশান দিল।

রণবীর। (জড়িত কণ্ঠে) লাল পাঞ্জা—চিনেছি—তোমাকে—

অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িল

আলতা এতক্ষণ মৃণ্মূর্তির মত দাঁড়াইয়া ছিল, লাল পাঞ্জা তাহার নিকট গেল

লাল পাঞ্জা। (কর্কশ স্বরে) এস।

আলতা মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল, লাল পাঞ্জা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল

কিছুক্ষণ পরে সতর্কভাবে ত্রিদিব ঢুকিল

ত্রিদিব। কোথায় গেল রণবীরটা! বাড়িতে কেউ নেই! (রণবীরকে দেখিয়া) এ কি! (পরীক্ষা করিতে করিতে) পটল তুলেছে নাকি? না, আছে।

আলমারি হইতে ব্রাণ্ডির বোতল টানিয়া মুখে দিল; রণবীর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

রণবীর। তুমি আবার কোত্থেকে এসে জুটলে বাবা! একটি একটি করে এসে হাজির হচ্ছ—তোমাদের কি আজ নৈশ ভোজনের নেমন্তন্ন করেছিলুম? কই, মনে পড়ছে না তো।

ব্রাণ্ডির বোতল এক নিশ্বাসে শেষ করিল

ত্রিদিব। কি হয়েছিল তোমার?

রণবীর। কিচ্ছু হয়নি বাবা, মুচ্ছো গিছলুম। 'চাঁদ মুখেতে রোদ লেগেছে ডালিম ফেটে পড়ে।'—ত্রিদিববাবু, তুমি কি জন্যে এসেছ জানা হল না, আমি চললুম। (উঠিয়া) বড় জবর খবর আছে—পুলিসকে দিতে যাচ্ছি! হাঃ—হাঃ—হাঃ! বলি লাল পাঞ্জাকে চেনো? —চললুম, একবার তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করে সটান থানার দিকে রওনা হব। তিনি অধমের ভিটেয় পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন কিনা। আমি তো মরেছি; কিন্তু বাবা মরবার আগে ঘটোৎকচের মতন কুরু বংশ চেপে মরব— (প্রস্থান)

ত্রিদিব কিয়ৎকাল ভ্রূকুঞ্চিত ললাটে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর দ্রুত প্রস্থান করিল।

তৃতীয় দৃশ্য

অজয়ের বহিঃকক্ষ; তক্তাপোশ ইত্যাদি পূর্ববৎ। একটি ডেক-চেয়ারে আলতা চক্ষু মুদিয়া শুইয়া আছে। অজয় তাহাকে বাতাস করিতেছে ও মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত কোমল কণ্ঠে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে।

আলতা ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তারপর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া ভীতচক্ষে চারিদিকে চাহিল।

অজয়। ভয় নেই আলতা, তুমি নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছ।

আলতা। তুমি! (দু'হাত দিয়া অজয়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া হাতের উপর কপাল রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, তারপর অশ্রুসিক্ত মুখ তুলিয়া) আর কক্ষনো তোমার অবাধ্য হব না।

অজয়। লক্ষ্মী মেয়ে। (সযত্নে চুলে হাত বুলাইয়া দিল।)

আলতা। কিন্তু—আমি কি করে এখানে ফিরে এলুম! লাল পাঞ্জা! লাল পাঞ্জা কই?

অজয়। (বিরস স্বরে) কই, এখানে তো দেখছি না।—তাকে আবার কেন?

আলতা। তিনি—তিনিই আমাকে উদ্ধার করেছিলেন। উঃ—সে সময় তিনি যদি না যেতেন তাহলে আমার কি হত—

অজয়। থাক—লাল পাঞ্জার বীরত্ব-কাহিনী শোনবার আমার আগ্রহ নেই।

আলতা। তিনি কে তাও যদি জানতে পারতুম, বুকের রক্ত দিয়ে তাঁর পুজো করতুম।

অজয়। হুঁ—ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে দেখছি।—কিন্তু মনে রেখো এখনি প্রতিজ্ঞা করেছ কখনো আমার অবাধ্য হবে না।

আলতা। তাতে কি হয়েছে?

অজয়। অর্থাৎ লাল পাঞ্জাকে যদি বিয়ে করতে চাও, হয়তো আমার অমত হতে পারে।

আলতা অজয়ের প্রতি একটি চকিত কটাক্ষ হানিল; তাহার মুখে অল্প হাসি স্ফুরিত হইয়া উঠিল।

আলতা। অমন হবে কেন! লাল পাঞ্জা কি সুপাত্র নয়?

অজয়। অতি বড় সুপাত্র হলেও আমার অমত হতে পারে।

আলতা। কেন অমত হবে সেই কথাই তো জানতে চাইছি।

অজয়। আমার স্বার্থ আছে।

আলতা। কি স্বার্থ?

অজয়। স্বার্থ কি একটা? ধর, বিয়ে হলেই তো তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, তখন আমাকে রেঁধে খাওয়াবে কে?

আলতা। (অর্ধ স্বগত) এ বাড়ি ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।

অজয়। অ্যাঁ! তবে কি লাল পাঞ্জাকে নিয়ে এইখানেই ঘর সংসার পাতবে মতলব করেছ না কি?—আর আমি?

আলতা। (মুখ টিপিয়া হাসিল) আপনিও থাকবেন। রেঁধে খাওয়ানোর জন্যেই তো আমাকে দরকার—তা রেঁধে খাওয়াব।

অজয়। অর্থাৎ এমন রান্না রাঁধবে যে দু'দিনে আমাকে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে। তখন তুমি আর লাল পাঞ্জা সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-কন্না করবে—এই তো?

আলতা। লাল পাঞ্জার ওপর কি হিংসে হচ্চে নাকি?

অজয়। হিংসে হবে কিসের জন্যে?

আলতা। তবে তাঁর ওপর আপনার এত রাগ কেন? (কাছে আসিয়া) আমার বিছানায় তিনি ফুল রেখেছিলেন বলে?

অজয়। (গর্জন করিয়া) হ্যাঁ! কেন তোমার বিছানায় ফুল রাখবে? কোন্ অধিকারে? আর তুমিই বা তাকে বিয়ে করতে চাইবে কেন?

আলতা। তাহলে সত্যিই হিংসে করেন! (আরো কাছে আসিয়া) আচ্ছা মনে করুন, আমি যদি লাল পাঞ্জাকে বিয়ে করতে না চাই, আর একজনকে বিয়ে করতে চাই—তাহলে আপনি কি করবেন?

অজয়। আর একজনকে? কাকে?

আলতা। যাকে আমি ভালবাসি; যে আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না; আমার সর্বস্ব ঠকিয়ে নিয়ে যে পকেটে পুরেছে;—

(গলা কাঁপিতে লাগিল)

অজয়। আলতা!—(আলিঙ্গনবদ্ধ)

টলিতে টলিতে রণবীর প্রবেশ করিল। আলতা তাড়াতাড়ি অজয়কে ছাড়িয়া দিয়া রণবীরকে দেখিয়া আবার সভয়ে অজয়ের বুকে মুখ লুকাইল।

রণবীর। তোফা! কেয়াবাৎ! একেবারে রাধাকৃষ্ণের মিলন, কেবল কদম গাছটি নেই। কিন্তু স্রেফ রাসলীলা করলেই তো চলে না অজয়বাবু, এবার যে গিরি-গোবর্ধন ধারণ করতে হবে।

অজয়। রণবীরবাবু, আপনি এখানে কি চান?

রণবীর। কিছু চাই না বাবা; যা চেয়েছিলুম তা তো বেহাত হয়ে গেছে। এখন পুলিসে যাচ্ছি!—হাঃ হাঃ হাঃ—লাল পাঞ্জা! খুঁজি খুঁজি নারি যে পায় তারি।

অজয়। আপনার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

রণবীর। মাথা মেজাজ চরিত্র—বিলকুল খারাপ হয়ে গেছে বাবা। কিন্তু তোমায় আমি চিনেছি। ভিজে বেড়ালটি সেজে থাকো, দেখলে মনে হয় ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জান না, কিন্তু এবার একেবারে নিঃযশ চিনেছি।

অজয়। আপনি বলতে চান কি?

রণবীর। বলতে চাই যে, তুমিই—লাল পাঞ্জা!

ত্রিদিব প্রবেশ করিল

ত্রিদিব। মিথ্যে কথা! রণবীর, লাল পাঞ্জা কে, দেখতে চাও! এই দ্যাখ—

উন্মুক্ত করতল দিয়া রণবীরের বুকে আঘাত করিল, তাহার বুকে রক্তবর্ণ পাঞ্জার ছাপ পড়িল।

রণবীর। অ্যাঁ—তুমি! (অভিভূত ভাবে একবার অজয়ের দিকে, একবার ত্রিদিবের দিকে তাকাইতে লাগিল) তবে কি আমি ভুল করলুম—

তক্তপোশের তলা হইতে লালচাঁদ বাহির হইল।

লালচাঁদ। ভুলই করেছ রণবীর ডাক্তার।

রণবীর। তুমি আবার কে, তক্তপোশের তলা থেকে বেরিয়ে এলে? আয়ান ঘোষ?

লালচাঁদ। না, আমি পুলিস ইন্সপেক্টর লালচাঁদ পাঞ্জা। (হুইসিল বাজাইল) ত্রিদিব-বাবু, আপনি নিজের মুখে স্বীকার করেছেন যে আপনি লাল পাঞ্জা?

ত্রিদিব। স্বীকার না করে আর উপায় কি? অনেকগুলি সাক্ষী গজিয়ে গেছে যে!

অজয়। ত্রিদিবদা, এ তুমি কি করছ?

ত্রিদিব। ঠিক করছি অজয়, তুমি কথা কয়ো না।

আলতা। ত্রিদিববাবু, আপনি—লাল পাঞ্জা!

ত্রিদিব। বিশ্বাস হচ্চে না? কিন্তু আমার লাল পাঞ্জা হওয়াই তো সব চেয়ে স্বাভাবিক! আমি জেলে গেলে কারুর কোনো অসুবিধা নেই—অতএব আমিই লাল পাঞ্জা!

অজয়। ত্রিদিবদা—

ত্রিদিব। চুপ—(স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ অজয় ও আলতার যুগ্মমূর্তির পানে চাহিয়া রহিল; তারপর লালচাঁদের দিকে ফিরিল) ইন্সপেক্টরবাবু, এবার আমাকে গ্রেপ্তার করুন।

দুইজন কনস্টেবল প্রবেশ করিল।

লালচাঁদ। আপনার হাতে হাতকড়া লাগাবার দরকার নেই, আমি জানি আপনি পালাবেন না। ত্রিদিববাবু, লাল পাঞ্জা আজ পর্যন্ত কোনও অন্যায় অত্যাচার করেনি, বরং যেখানে পুলিসের হাত নেই, সেখানে সে দুর্বৃত্তের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করেছে। কিন্তু তবু, দেশের আইনের চোখে সে অপরাধী; কারণ আইনকে ডিঙিয়ে নিজের হাতে দেশের আইনের ভার তুলে নেবার অধিকার কারুর নেই। তাই বাধ্য হয়ে আপনাকে আজ আমি গ্রেপ্তার করছি। আপনি অপরাধী কি না, এবং আপনার অপরাধের গুরুত্ব কতখানি সে বিচার আদালত করবেন।

ত্রিদিব। আলতা, চললুম তাহলে।—তোমাদের দু'জনের মধ্যে বেশ ভাব হয়ে গেছে তা' বুঝতে পারছি। আর ঝগড়াঝাঁটি করো না। অজয়, বিয়ের নেমন্তন্নটা বোধ হয় আমার ফস্কে গেল। যাহোক, তারপরে আর একটা শুভদিনে নিশ্চয় হাজির থাকতে পারব—বছর খানেকের বেশি জেলে থাকতে হবে না। চলুন লালচাঁদবাবু!

লালচাঁদ। দাঁড়ান! শুধু আপনি নন, আর একটি আসামী এখানে রয়েছে। রণবীর ডাক্তার, তোমাকেও যেতে হবে। (হাতে হাতকড়া পরাইল)

রণবীর। আমি! আমি কি করেছি?

লালচাঁদ। আজ রাত্রে যা করেছ সেটা ছেড়ে দিলুম, কারণ তাতে একটি সম্ভ্রান্ত মহিলার নাম জড়িয়ে আছে। কিন্তু তুমি যে বে-আইনী কোকেন বিক্রি কর এ খবরটা তো পুলিস মহলে চাপা নেই ডাক্তার। তিন দিন আগেই ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে—এখন চল। গিরি-গোবর্ধন ধারণ তোমাকেই করতে হবে।

ত্রিদিব ও রণবীরকে লইয়া কনস্টেবলদ্বয় প্রস্থান করিল।

লালচাঁদ একটু ইতস্তত করিল।

অজয়। ইন্সপেক্টরবাবু, আমায় কি কিছু বলবেন?

লালচাঁদ। হ্যাঁ, সামান্য একটা কথা!—অজয়বাবু, আমি পুলিস বটে কিন্তু নির্বোধ নই—কিছু কিছু বুঝি। আশা করি লাল পাঞ্জার জীবনে এইখানেই যবনিকা পড়ল। নমস্কার। (প্রস্থান)

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল।

আলতা।(অস্ফুটস্বরে) ত্রিদিববাবু—লাল পাঞ্জা!

অজয়। আলতা, এখনো বুঝতে পারনি?

আলতা। কি বুঝব?

অজয়। ত্রিদিবদা কতবড় আত্মত্যাগ করে জেলে চলে গেলেন।

আলতা। আত্মত্যাগ! কিন্তু উনিই তো লাল পাঞ্জা!

অজয়। না আলতা, উনি লাল পাঞ্জা নয়। শুধু, তোমার-আমার সুখে পাছে এতটুকু বিঘ্ন হয়, তাই উনি পরের অপরাধ নিজের ঘাড়ে তুলে নিলেন।

আলতা। লাল পাঞ্জা তবে কে?

অজয়। লাল পাঞ্জা—(খামখেয়ালী হাস্য) এই দ্যাখ—(আরক্ত করতল দেখাইল)

আলতা। তুমি—তুমি—তুমি—(দীর্ঘকাল মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল) তুমি আমার বিছানায় ফুল রেখেছিলে? (অজয় স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িল) তুমিই আজ আমায় উদ্ধার করেছ? (অজয় শুধু হাসিল) লাল পাঞ্জার ওপর তাহলে আর তোমার রাগ নেই?

অজয়। না। এখন তুমি স্বচ্ছন্দে তাকে বিয়ে করতে পার।

আলতা। দাঁড়াও। আগে তোমাকে—মানে—লাল পাঞ্জাকে প্রণাম করি।

নতজানু হইয়া গলায় আঁচল দিয়া অজয়কে প্রণাম করিল।

যবনিকা

কালিদাস

ফেড্ ইন্।

একটি হস্তীর হরিচন্দন চিত্রিত মস্তকের উপর ক্যামেরার চক্ষু উন্মোচিত হইল। ক্রমে হস্তীর পূর্ণ অবয়ব ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্য দেখা গেল।

একটি নগরীর জনাকীর্ণ পথ দিয়া হস্তী রাজকীয় মন্থরতায় হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। স্কন্ধে অঙ্কুশধারী মাহুত; পৃষ্ঠের মহার্ঘ কারু-খচিত বস্ত্রাবরণের উপর ঘোষক বসিয়া পটহ বাজাইতেছে। ঘোষকের দুই হস্তে দুইটি মুষলাকৃতি পটহ-দণ্ড দ্রুতচ্ছন্দে পটহচর্মের উপর আঘাত বৃষ্টি করিতেছে।

চারিদিকে নাগরিকের জনতা; সকলেই ঘোষকের জ্ঞাপনী শুনিবার জন্য উৎসুক ঊর্ধ্বমুখে হস্তীর সহগমন করিতেছে। পথপার্শ্বের দ্বিতল ত্রিতল হর্মগুলির গবাক্ষে অলিন্দে কুতূহলী পুরস্ত্রীগণের মুখ লোভনীয় পশ্চাৎপটের সৃজন করিয়াছে। জনতার কলরব ও পটহের রোল মিশিয়া বিচিত্র ধ্বনি-বিপ্লব উত্থিত হইতেছে।

ঘোষকের পটহ-ধ্বনি সহসা স্তব্ধ হইল। ঘোষক দৃপ্তভঙ্গীতে দক্ষিণ হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিতেই জনতার কল-মর্মরও শান্ত হইয়া গেল। ঘোষক তখন শঙ্খের মত গভীর স্বরে ঘোষণা আরম্ভ করিল।

ঘোষকঃ ভো ভোঃ! শোনো সবাই! !—মহারাষ্ট্র কুন্তলের কুমার-ভট্টারিকা পরম বিদুষী রাজকন্যা স্বয়ংবরা হবেন। সামন্ত-শ্রেষ্ঠী, চণ্ডাল-পামর, সকলে শ্রবণ কর...জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলে এই স্বয়ংবর সভায় যোগ দিতে পারবে—

জনতার এক অংশে অবধূত নামধারী একজন অতি স্থূলকায় ব্যক্তি ক্ষুদ্র ধামিতে মুড়ি লইয়া ভক্ষণ করিতে করিতে চলিয়াছিল, ঘোষণার শেষ অংশ শুনিয়া তাহার চরণ ও চর্বণ একসঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। সে বিস্ফারিত চক্ষে ঊর্ধ্বে ঘোষকের পানে চাহিয়া রহিল।

ঘোষক ইতিমধ্যে বলিয়া চলিয়াছে—

ঘোষকঃ...রাজকুমারী প্রত্যেক পাণিপ্রার্থীকে তিনটি প্রশ্ন করবেন—যে-ব্যক্তি যথার্থ উত্তর দিতে পারবে তারই গলায় কুমারী মালা দেবেন—

উপরোক্ত কথাগুলি শুনিবামাত্র অবধূত হন্তদন্তভাবে পিছু ফিরিয়া জনতা ভেদ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, যেন স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইতে তাহার আর বিলম্ব সহিতেছে না।

জনতার অন্যত্র, ঝাড়ু ও চুপ্‌ড়ি হস্তে একটি হরিজন সম্মোহিতের মত দাঁড়াইয়া ঘোষণা শুনিতেছিল; অকস্মাৎ সে সর্বাঙ্গে শিহরিয়া উচ্চ হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। তারপর ঝাড়ু চুপ্‌ড়ি সজোরে মাটিতে আছড়াইয়া সে তীরবেগে বিপরীত মুখে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। এদিকে ঘোষকের জ্ঞাপনী তখন শেষ হইতেছে।

ঘোষকঃ আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন কুন্তল রাজধানীতে স্বয়ংবরা সভা বসবে। অবহিত হও—সকলে অবহিত হও!

ঘোষণাশেষে ঘোষক আবার মন্দ্র-ছন্দে পটহ ধ্বনিত করিল।

ডিজল্‌ভ্।

পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া দীর্ঘ বঙ্কিম পথ চলিয়া গিয়াছে; পথের অপর পাশে বহু নিম্নে সমুদ্র। সহ্যাদ্রি ও আরব সাগরের মধ্যবর্তী বাণিজ্য-পথ।

পথের উপর সম্মুখেই একটি চতুর্দোলা; আটজন হৃষ্টপুষ্ট বাহক উহা স্কন্ধে বহন করিয়া চলিয়াছে। চতুর্দোলায় স্থূলকায় অবধূত উপবিষ্ট; সে উৎকণ্ঠ মুখে বসিয়া একছড়া কদলী ভক্ষণ করিতেছে।

পিছন হইতে এক সুবেশ অশ্বারোহী অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। তাহার অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনিতে পাইয়া শঙ্কিত অবধূত চতুর্দোলা হইতে গলা বাড়াইয়া দেখিল। অশ্বারোহী দন্ত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে অবধূতকে অতিক্রম করিয়া গেল। ইতিমধ্যে পিছনে আরও দুইজন অশ্বারোহী

আসিতেছে দেখা গেল।

আশঙ্কায় ও উত্তেজনায় অবধূত কদলী ভক্ষণ ভুলিয়া বুক চাপড়াইতে লাগিল।

অবধূতঃ (বাহকগণের প্রতি) ওরে—ওরে—! তোরা মানুষ না বলদ্।—জল্দি চল্ —জল্দি চল্—! সব বেটা এগিয়ে গেল!

নিম্নে সমুদ্রের কিনারা বাহিয়া একটি ময়ূরপঙ্খী ভরা-পালে চলিয়াছে। ঝিকিমিকি রৌদ্র-প্রতিফলিত নীল জলের উপর ময়ূরপঙ্খী মরালের মত ভাসিতেছে; পিছনে হাল ধরিয়া মাঝি দাঁড়াইয়া আছে।

ময়ূরপঙ্খী হইতে গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছে—

রূপ নগরীর রাজ-কুমারীর দেশে
চল্ রে ডিঙা মোর—চল্ রে ডিঙা ভেসে।
সোনার পালে বাতাস লেগেছে
পূর্ণিমাতে জোয়ার জেগেছে—
ভিড়্বে তরী রূপের ঘাটে
রূপনগরে এসে।
চল্ রে ডিঙা মোর—চল্ রে ডিঙা ভেসে।

ডিজল্ভ্।

নানা পথ দিয়া নানা জাতীয় যানবাহন বহু যাত্রীকে লইয়া কুন্তল-রাজধানীর অভিমুখে চলিয়াছে; রাজপুত্রদের মাথায় রাজকীয় শিরস্ত্রাণ আপন আপন স্বতন্ত্র গঠনের বিচিত্রতায় শিরস্ত্রাণ-ধারীদের পরিচয় নির্দেশ করিতেছে। উচ্চপদস্থ সেনানীগণের বক্ষে লৌহজালিক, কটিতে তরবারি। কাহারও সঙ্গে অনুচর আছে; কেহ একাকী যাইতেছে। এইরূপ কয়েকটি দৃশ্য দেখা গেল।

ডিজল্ভ্।

কানন মধ্যস্থ একটি জলাশয়। জলাশয়ের চারিপাশে কিছু দূর পর্যন্ত উন্মুক্ত ভূমি, তারপর একটি দুটি বড় বড় গাছ; অতঃপর নিবিড় বনানীর শাখায় শাখায় জড়াজড়ি। নিম্নে ছায়ান্ধকার; উপরে দূরপ্রসারী পল্লবপুঞ্জের উপর দ্বিপ্রহরের খর সূর্য-কিরণের প্রতিভাস।

জলাশয়ের অনতিদূরবর্তী একটি বৃক্ষ হইতে কাঠ্-ঠোকরা পাখির আওয়াজের মত একটি শব্দ আসিতেছে—ঠক্-ঠক্-ঠক্-ঠক্—

শব্দ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইলে দেখা যায়—বৃক্ষের নিম্নতন একটি স্থূল শাখার পা ঝুলাইয়া একটি মানুষ বসিয়া আছে এবং যে-শাখায় বসিয়া আছে তাহারই মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। মানুষটি অল্পবয়স্ক; কুড়ির বেশী বয়স হইবে না। অতি সুন্দর গৌরকান্তি যুবা; মুখে শিশু-সুলভ সরলতা; হাসিটি নব-বিস্ময় ও কৌতুকে ভরা—যেন এইমাত্র কোন্ দৈব দুর্বিপাকে এই বিস্ময়কর পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে। সাংসারিক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা তাহার বিন্দুমাত্র আছে বলিয়া মনে হয় না।

যুবকের ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন; কেবল স্কন্ধে উপবীত আছে। যুবক আপন মনের আনন্দে হাসিতেছে ও একটি ক্ষুদ্র কুঠারের সাহায্যে বৃক্ষ-শাখার গোড়া ঘেঁষিয়া কোপ মারিতেছে। কুঠার-দণ্ডের প্রান্তে একটি সূক্ষ্ম সূত্র সংলগ্ন।

যুবক মনের আনন্দে ডাল কাটিতেছে, সহসা অদূরে অন্য একপ্রকার শব্দ তাহার কানে আসিল; সে কুঠার নামাইয়া কৌতূহলভরে বাহিরের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিল। যে শব্দ যুবককে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহা বনভূমির শষ্পাস্তরণের উপর মন্দীভূত অশ্বক্ষুরধ্বনি।

যুবক দেখিল, জলাশয়ের পাশ দিয়া একটি অশ্বারোহী আসিতেছে: আসিতে আসিতে অশ্বারোহী ও ঘোটক উভয়েই সতৃষ্ণভাবে জলাশয়ের পানে ঘাড় বাঁকাইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। যেন ইচ্ছা, থামিয়া জল পান করে।

আরও নিকটবর্তী হইলে দেখা গেল, অশ্বারোহীর বেশভূষা ঘর্মাক্ত ও ধূলিধূসর হইলেও

রাজোচিত; অশ্বও তদনুরূপ। আরোহীর বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর; মাংসল দেহ, গোলাকৃতি মাংসল মুখ। মুখে শাসক-সম্প্রদায়সুলভ আত্মাভিমান সুপরিস্ফুট।

ঘোটকটি কতক নিজ ইচ্ছানুসারেই ক্রমশ মন্দবেগ হইয়া শেষে সরোবরের তীরে থামিয়া গিয়াছিল। আরোহীও মনে মনে বিচার করিতেছিল এখানে নামিয়া অজ্ঞাত জলাশয়ে জলপান করা সমীচীন হইবে কিনা। ওদিকে শাখারূঢ় যুবক পরম আগ্রহে তাহাদের পশ্চাৎ হইতে নিরীক্ষণ করিতেছিল। তন্ময়তাবশত তাহার কুঠার স্খলিত হইয়া ঝনৎকার শব্দে মাটিতে পড়িল।

চমকিয়া অশ্বারোহী ফিরিয়া দেখিল, গাছের উপর এক কাঠুরিয়া বসিয়া আছে। সে তখন অশ্বের মুখ ঘুরাইয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল।

যুবক ততক্ষণ সুত্রের সাহায্যে ভূপতিত কুঠারটি টানিয়া তুলিয়া লইয়াছে। তাহার কুঠার বোধ হয় প্রায়ই পড়িয়া যায়, তাই উহা বিনা পরিশ্রমে উম্ধার করিবার এই বালকোচিত কৌশল আবিষ্কার করিয়া যুবক গর্বপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

অশ্বারোহী বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া অশ্ব থামাইলেন। যুবকের কার্যকলাপ নিরুৎসুক অবজ্ঞা-ভরে নিরীক্ষণ করিয়া প্রশ্ন করিলেন—

অশ্বারোহীঃ তুই কে রে?

সরল হাস্যে কাঠুরিয়ার মুখ ভরিয়া গেল; সে সহজ অকপটতার
সহিত উত্তর দিল—

কাঠুরিয়াঃ আমি কালিদাস—জঙ্গলের ঐ-ধারে ছোট্ট গাঁ আছে, ওখানে আমি থাকি! মামা বললেন—বামুনের ঘরের এঁড়ে, লেখাপড়া শিখলি না—যাঃ, জঙ্গলে কাঠ কেটে আনুগে যা। তাই কাঠ কাটছি।

অশ্বারোহীর মুখভাব দেখিয়া মনে হইল তিনি কালিদাসকে পরিপক্ব বেকুব
বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি কপালের ঘাম মুছিলেন—

অশ্বারোহীঃ কুন্তল-রাজধানী এখান থেকে কতদূর জানিস?

কালিদাসঃ জানি। হেঁটে গেলে একদিনের পথ।

অশ্বারোহী যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন; অশ্ব হইতে নামিবার
উদ্যোগ করিয়া কতক নিজ মনেই বলিলেন—

অশ্বারোহীঃ তাহলে ঘোড়ার পিঠে দু'দণ্ডে যাওয়া যাবে—

কালিদাস বৃক্ষশাখায় বসিয়া সকৌতুকে আরোহীর অবরোহণ-ক্রিয়া
দেখিলেন; তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—

কালিদাসঃ তুমি কে—?

অশ্বারোহী ভূপৃষ্ঠ হইতে তাচ্ছিল্যভরে একবার কালিদাসের
পানে চোখ তুলিলেন।

অশ্বারোহীঃ আমি সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ।

কালিদাসের ভাগ্যে রাজপুত্রদর্শন এই প্রথম। উত্তেজনায় তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া সংহতস্বরে তিনি বলিলেন—

কালিদাসঃ রাজপুত্তুর! কিন্তু তোমার মন্ত্রিপুত্তুর কোটালপুত্তুর লোক-লস্কর—এরা সব কই?

যুবক ঈষৎ হাস্য করিলেন

যুবরাজঃ আমার লোক-লস্কর সব পাকা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে; দেরি হয়ে যাচ্ছিল বলে আমি জঙ্গলের রাস্তা ধরেছি—

কালিদাসঃ তুমি বুঝি স্বয়ংবর-সভায় যাচ্ছ?

যুবরাজ ঘাড় নাড়িলেন। ইতিমধ্যে তিনি ঘোড়াটিকে কালিদাসের ঠিক নীচে গাছের একটি উপশাখায় বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং মস্তক হইতে ধাতুময় শিরস্ত্রাণটি মোচন করিয়া গাছের আর একটি গোঁজের মত ডালে ঝুলাইয়া রাখিয়া ছিলেন। এখন ঘর্মার্দ্র কুর্তাটি খুলিতে খুলিতে তিনি তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন—

যুবরাজঃ নাইতে হবে—ঘামে ধুলোয় কাপড়-চোপড় সব নষ্ট হয়ে গেছে। তোদের ঐ পুকুরটার জল কেমন? ভাল?

কালিদাসঃ হ্যাঁ—খুব ভাল।

কুর্তা মাটিতে ফেলিয়া যুবরাজ নূতন বস্ত্রাদি বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোড়ার পিঠে কম্বলাসনের নীচে বহুবিধ উৎকৃষ্ট পট্টবস্ত্রাদি পাট করিয়া রাখা ছিল; কম্বল তুলিয়া সেগুলি একে একে বাহির করিয়া যুবরাজ ঘোড়ার পিঠের উপরেই সাজাইয়া রাখিতে লাগিলেন; উদ্দেশ্য স্নান সারিয়া সেগুলি পরিধান পূর্বক বরবেশে স্বয়ংবর-সভায় যাত্রা করিবেন।

যুবরাজঃ স্বয়ংবর-সভায় যেতে হবে, যা-তা প'রে গেলে তো চলবে না—আজকালকার মেয়েদের আবার পোশাকের ওপর নজর বেশী। আমার প্রথম রাণীকে যখন বিয়ে করেছিলুম তখন এত হাঙ্গামা ছিল না—

কালিদাস সহস্রচক্ষু হইয়া এই অপূর্ব বস্ত্র-বৈভব দেখিতেছিলেন, প্রশ্ন করিলেন—

কালিদাসঃ তোমার বুঝি অনেক রাণী?

যুবরাজ অবহেলাভরে বলিলেন—

যুবরাজঃ না—অনেক আর কই—সাতটি।

সোনালী জরির জুতাজোড়া গাছের তলায় খুলিয়া রাখিতে রাখিতে বলিলেন—

যুবরাজঃ হ্যাঁ দ্যাখ্—কি নাম তোর—কালিদাস? শোন্, আমি পুকুরে নাইতে চললুম। তুই এগুলোর ওপর নজর রাখিস—যেন জংলি কেউ এসে নিয়ে না পালায়—বুঝলি?

কালিদাস ঘাড় কাত করিয়া সম্মতি জানাইলেন; যুবরাজ আর বিলম্ব না করিয়া সরোবরের দিকে চলিলেন। কিন্তু কিছু দূর গিয়া তাঁহার গতিরোধ হইল। তিনি ইতস্তত করিয়া ফিরিয়া তাকাইলেন। জুতাজোড়া মাটিতে পড়িয়া রহিল; কি জানি যদি শৃগালে লইয়া পলায়ন করে! তিনি ফিরিয়া আসিয়া জুতা দুইটি শিরস্ত্রাণের সঙ্গে গাছে ঝুলাইয়া রাখিলেন।

গাছের উপর কালিদাস মুগ্ধ তন্ময়তার সহিত বিচিত্র সুন্দর আভরণগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। যুবরাজ প্রস্থান করিবার পর তাহার চোখদুটি যুবরাজের দিকে দূরে সঞ্চারিত হইল, আবার বস্ত্রগুলির দিকে ফিরিয়া আসিল, আবার যুবরাজের দিকে প্রেরিত হইল—তারপর কালিদাস সন্তর্পণে হাত বাড়াইয়া শিরস্ত্রাণটি তুলিয়া লইলেন। মহানন্দে কিছুক্ষণ শিরস্ত্রাণটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিবার পর তিনি সেটি নিজ মস্তকে পরিধান করিলেন। বাঃ, একটুও তো বড় হয় নাই, যেন তাহারই মাথার মাপে তৈয়ার হইয়াছিল। শাণিত কুঠার-ফলকে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া কালিদাসের সর্বাঙ্গে উল্লসিত শিহরণ খেলিয়া গেল। অতঃপর জুতাজোড়াও কালিদাসের শ্রীচরণেষু হইল। আরে! একটু আঁট হইয়াছে বটে কিন্তু বে-মানান্ হয় নাই।

ওদিকে যুবরাজ তখন এক-কোমর জলে দাঁড়াইয়া পরম আরামে স্নান করিতেছেন; নাক টিপিয়া জলে ডুব দিতেছেন; দুই হস্তে সবেগে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঘর্ষণ করিতেছেন। কালিদাসের দিকে তাঁহার নজর নাই।

কালিদাস কিন্তু ইতিমধ্যে—

ঘোড়ার পিঠের উপর বস্ত্রাভরণগুলি সাজানো ছিল, উর্ধ্ব হইতে একটি লোলুপ হস্ত আসিয়া বস্ত্রটি তুলিয়া লইয়া অন্তর্হিত হইল; কিছুক্ষণ পরে আবার উত্তরীয়টি অন্তর্হিত হইল; তারপর আঙ্রাখা—

যুবরাজ ওদিকে আপন মনে স্নান করিয়া চলিয়াছে।

সর্বাঙ্গে রাজবেশ পরিয়া কালিদাসের আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু রাজবেশ পরিয়া তো আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না; একটা কিছু করা চাই। শাখারূঢ় কালিদাস হঠাৎ কুঠারটি তুলিয়া লইয়া খটাখট্ ডাল কাটিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। নিম্নে ঘোড়াটি এই আকস্মিক শব্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

শাখাটি ইতিপূর্বেই বেশ জখম হইয়াছিল, এই দ্বিতীয় আক্রমণ আর সহ্য করিতে পারিল না। মুহূর্তমধ্যে অনেকগুলি ব্যাপার ঘটিয়া গেল। শাখাটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হইলেও মড়্ মড়্ শব্দে নীচে নামিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল; কালিদাসের হাত হইতে কুঠার ছিট্কাইয়া পড়িল। ঘোড়াটা নীচে লাফালাফি শুরু করিয়াছিল, শাখাচ্যুত কালিদাস তাহার পৃষ্ঠের উপর পড়িয়া ভল্লুকের মত তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। ভয়ার্ত ঘোড়া মুখের এক ঝট্কায় বন্ধন ছিঁড়িয়া তীরবেগে একদিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল। কালিদাস প্রাণপণে তাহাকে আঁকড়াইয়া রহিলেন।

স্নানরত যুবরাজের কর্ণে শব্দ প্রবেশ করিতেই তিনি উচ্চকিত হইয়া সেই দিকে তাকাইলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে ঘোর উদ্বেগে হাঁচোড়-পাঁচোড় করিয়া তিনি জল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সিক্তবস্ত্রে দৌড়াইতে দৌড়াইতে বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাঁহার অশ্ব কাঠুরিয়াকে পৃষ্ঠে লইয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

বনের মধ্যে কালিদাস অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যুবরাজ হতভম্ব হইয়া কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার সুবর্তুল মুখে ক্রোধ ও হতাশার মিশ্রণে এক অপূর্ব অভিব্যক্তি ব্যঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি সহসা ব্যাঘ্রের মত একটি গর্জন ছাড়িয়া দুই হস্ত ঊর্ধ্বে আস্ফালন করিতে করিতে যেন পলাতক ঘোটকের পশ্চাদ্ধাবন করিবার উদ্দেশ্যে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু তাঁহাকে এক পদও অগ্রসর হইতে হইল না। তাঁহার সিক্ত বস্ত্র হইতে জল ঝরিয়া মাটি কর্দমিত হইয়া উঠিয়াছিল, প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজ পা পিছলাইয়া সশব্দে মৃত্তিকার উপর উপবিষ্ট হইলেন।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

কুন্তল রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে সাধারণের উপভোগ্য নগরোদ্যান; উদ্যান ঘিরিয়া প্রশস্ত রাজপথ; রাজপথের অপর পার্শ্বে সারি সারি অট্টালিকা, বিপণি, মদিরাগৃহ—পতাকা ও তোরণমাল্যে ভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছে।

নগরোদ্যানের কেন্দ্রে একটি অতি সুদৃশ্য মর্মরনির্মিত কন্দর্প-মন্দির; মন্দিরের দেয়াল নাই, তাই বাহির হইতে কন্দর্প দেবের ধনুর্ধর মূর্তি দেখা যাইতেছে। স্থানে স্থানে নাগরিকদের উপবেশনের জন্য গোলাকৃতি প্রস্তর-বেদিকা। উদ্যানের চারি প্রান্তে চারিটি প্রস্রবণ; উহার জল গো-মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া বৃহৎ শ্বেত জলাধারে পড়িতেছে। এক ঝাঁক পারাবত উদ্যানের ভূমিতে বসিয়া নির্ভয়ে শস্য খুঁটিয়া খাইতেছে। কুঞ্জে বিতানে বাটিকায় নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়া নব বসন্তের জয় ঘোষণা করিতেছে।

আজ মদনোৎসব; তাহার উপর আবার রাজকন্যার স্বয়ংবর। নগরের উত্তেজনা চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। নানা দিগ্‌দেশ হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও রাজন্যবর্গের সমাগমে নগরে সমারোহের অন্ত নাই।

উদ্যান ও রাজপথের মাঝখানে অগণিত ফুলের দোকান বসিয়াছে। দারু নির্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, চারিটি দণ্ডের উপর অবস্থিত; তাহার মধ্যে রাশীকৃত ফুল। ফুলের রাশির মধ্যে এক একটি যুবতী মালিনী বসিয়া আছে; বিম্বাধরে হাসিয়া বিলাসী নাগরিকদের পুষ্পমালা পুষ্পের অঙ্গদ কুণ্ডল শিরোভূষণ বিক্রয় করিতেছে।

পথে জনস্রোত আবর্তিত। মাঝে মাঝে উষ্ট্রের সারি বাণিজ্যদ্রব্য বহন করিয়া উত্তুণ্ড অবজ্ঞা-ভরে চলিয়াছে। দোলা চতুর্দোলারও অভাব নাই; সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলাদের লইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়াছে।

সহসা এই পথের উপর ক্ষণকালের জন্য এক চাঞ্চল্যকর ব্যাপার ঘটিয়া গেল। প্রধান পথটি হইতে কয়েকটি সংকীর্ণতর পথ বাহির হইয়া গিয়াছিল; এইরূপ একটি পথ হইতে প্রচণ্ড বেগে একটি উন্মত্ত অশ্ব আসিয়া প্রবেশ করিল—অশ্বের পৃষ্ঠে একটি আরোহী কোনও ক্রমে জড়াইয়া আছে। ক্ষিপ্ত অশ্ব দেখিয়া পথের জনতা সভয়ে চারিদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। একটি ফুলের দোকানের সম্মুখ পর্যন্ত ছুটিয়া গিয়া অশ্ব দুই পায়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া গতিবেগ সম্বরণ করিল, তারপর উগ্রবেগে ছুটিয়া আর একটা পথ দিয়া দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল।

অশ্ব ও আরোহী আমাদের পূর্ব পরিচিত। তাহারা অন্তর্হিত হইলে পথের কোলাহল ও উত্তেজনা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। যে ফুলের দোকানটিকে অশ্ববর প্রায় বিমর্দিত করিয়া গিয়াছিল, তাহার অধিষ্ঠাত্রী মালিনী এতক্ষণে ফুলের স্তূপের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া চাহিল। দোকানের সম্মুখে তিনটি নাগরিক ছিলেন, অশ্বের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা কে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছিলেন; এখন তাঁহাদের মধ্যে দুইজন দোকানের নিম্নদেশ হইতে গুঁড়ি মারিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বেশভূষা কিছু অবিন্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার সংস্কার করিতে করিতে ও জানুর ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে এক ব্যক্তি সশব্দে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

প্রথম নাগরিকঃ বাবাঃ—রগ ঘেঁষে গেছে! আর একটু হলেই উচ্চৈঃশ্রবা বুকের ওপর পা চাপিয়ে দিয়েছিল আর কি!

দ্বিতীয় নাগরিক স্খলিত কর্ণভূষা আবার কর্ণে পরিধান
করিতেছিলেন, বিরক্তিভরে বলিলেন—

দ্বিতীয় নাগরিকঃ অনেক রাজা রাজকুমারই তো স্বয়ংবরে এসেছে কিন্তু এমন বেপরোয়া ঘোড়সোয়ার দেখিনি। ভাগ্যে শ্রীমতীর দোকানের তলায় ঢুকেছিলুম, নইলে মুণ্ডটি পিণ্ড ক'রে দিয়ে চলে যেতো!

দোকানের মালিনী এবার কথা কহিল, উৎসুকভাবে বলিল—

মালিনীঃ নিশ্চয় কোনও রাজকুমার! চিনতে পারলে না?

এতক্ষণে তৃতীয় নাগরিকটি, যেন কিছুমাত্র বিচলিত হ'ন নাই এমনিভাবে ফুলের পাখার বাতাস খাইতে খাইতে ফিরিয়া আসিলেন। মালিনীর প্রশ্নের উত্তর তিনিই দিলেন; অবজ্ঞায় ভ্রূ তুলিয়া অপর দুইজনের প্রতি দৃক্‌পাত করিয়া বিদ্রুপপূর্ণ স্বরে কহিলেন—

তৃতীয় নাগরিকঃ চোখ চেয়ে থাকলে তো চিনতে পারবে! ঘোড়া দেখেই শ্রীমানদের পদ্মপলাশ নেত্র কমল-কোরকের মত মুদিত হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় নাগরিকঃ আরে যাও যাও, তুমি তো দৌড় মেরেছিলে। সরু সরু একজোড়া পা আছে কিনা—

মালিনীর কিন্তু এই দেহতাত্ত্বিক আলোচনায় রুচি ছিল না, সে সাগ্রহে
তৃতীয় নাগরিককে জিজ্ঞাসা করিল—

মালিনী। তুমি চিনতে পেরেছ বুঝি?

তৃতীয় নাগরিক উচ্চাঙ্গের একটু হাস্য করিলেন—

তৃতীয় নাগরিকঃ চেনা আর শক্ত কি? একনজর দেখেই চিনেছি। মাথার শিরস্ত্রাণটা দেখলে না!

মালিনী। হ্যাঁ হ্যাঁ, শিরস্ত্রাণটা নতুন ধরণের—রোদ্দুরে ঝক্‌মক্‌ করে উঠল—

তৃতীয় নাগরিকঃ (গম্ভীরভাবে) আর্যাবর্তের দাক্ষিণাত্যের সমস্ত রাজার রাজকীয় লাঞ্ছনা আমার নখদর্পণে। ইনি হচ্ছেন সৌরাষ্ট্রের রাজকুমার!

মালিনীর চক্ষু বিস্ফারিত হইল—

মালিনীঃ নিশ্চয় স্বয়ংবর সভায় গেলেন। তাই এত তাড়া।

প্রথম নাগরিক হুঁ হুঁ করিয়া আনুনাসিক হাস্য করিলেন—

প্রথম নাগরিকঃ যতই তেড়ে যান, গুড় গুড় করে ফিরে আসতে হবে। সে বড় কঠিন ঠাঁই; রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারছে না।

তৃতীয় নাগরিকের নাসা অবজ্ঞায় স্ফুরিত হইল—

তৃতীয় নাগরিকঃ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বিদ্যা এবং বুদ্ধি দুইই দরকার—বুঝলে হে? অথচ যে-সব রাজা-রাজড়া রথী-মহারথ যাচ্ছেন, সত্যি কথা বলতে কি, তাঁদের কোনোটাই নেই।

দ্বিতীয় নাগরিকঃ (শ্লেষভরে) কিন্তু তোমার তো দুইই আছে—তুমি গিয়ে ঢুকে পড় না! চণ্ডাল পামর কারুর তো যেতে মানা নেই।

তৃতীয় নাগরিক ঈষৎ রুষ্টমুখে চাহিলেন; তারপর সগর্ব মর্যাদার সহিত বলিলেন—

তৃতীয় নাগরিকঃ যাব। আগে রাজা-রাজড়াগুলো শেষ হয়ে যাক, তারপর যাব।

দ্বিতীয় নাগরিক শ্লেষের অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। প্রথম নাগরিকের
মুখে কিন্তু একটু করুণতার ছায়া পড়িল—

প্রথম নাগরিকঃ (বিমর্ষকণ্ঠে) আমিও যেতুম—কিন্তু;—সদর দেউড়িতে যে দুটো আখাম্বা হাব্‌শী খোলা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—

ডিজল্‌ভ্‌।

রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ তোরণ ও প্রতীহার-ভূমি। অতি স্থূলে তোরণস্তম্ভের অভ্যন্তরে
প্রতীহারদের জন্য বিশ্রাম-কক্ষ আছে। স্তম্ভের পার্শ্ব হইতে উচ্চ কারুকার্য-
খচিত প্রাচীর প্রশস্ত প্রাসাদভূমিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

দুইজন নগ্নকায় ভীমকান্তি হাব্‌শী মুক্ত কৃপাণ হস্তে তোরণ-সম্মুখে প্রহরা দিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে প্রায় শতহস্ত দূরে রাজভবনের প্রথম মহল দেখা যাইতেছে। তাহার পশ্চাতে অন্যান্য যে সকল মহল আছে, সম্মুখ হইতে তাহা দেখা যায় না।

দূর রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একটি লোক তোরণের দিকে আসিতেছে দেখা গেল। লোকটি মহার্ঘ বেশভূষায় সজ্জিত, মস্তকে ধাতুময় শিরস্ত্রাণ আছে। তাহার হাঁটিবার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে।

তোরণ-সম্মুখে উপস্থিত হইয়া লোকটি ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়া রূক্ষস্বরে বলিল—

ব্যক্তিঃ নারীজাতি রসাতলে যাক। আমার ঘোড়া কোথায়?

মূক হাব্‌শীদ্বয় উত্তর দিল না, প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময় একটি অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া এক অশ্বপাল তোরণ-মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পূর্বোক্ত ব্যক্তি বিনা বাক্যব্যয়ে অশ্বপৃষ্ঠে লাফাইয়া উঠিয়া বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। অশ্বপাল মুচ্‌কি হাসিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল, যাইবার সময় হাব্‌শীদের দিকে একবার চোখ টিপিয়া গেল।

বোধ করি অশ্বের ক্ষুরশব্দে আকৃষ্ট হইয়া একটি প্রবীণ ব্যক্তি তোরণ-স্তম্ভের অভ্যন্তরস্থ প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ক্ষৌরিত মস্তকে একটি সুপুষ্ট শিখা আছে, কর্ণে হংসপুচ্ছের লেখনী, হস্তে একটি মোটা দপ্তর। ইনি রাজ্যের পুস্তপাল।

পুস্তপাল মহাশয় বিলীয়মান অশ্বারোহীর দিকে একবার দৃক্‌পাত করিলেন, নিরুৎসুক কণ্ঠে হাব্‌শীদের জিজ্ঞাসা করিলেন—

পুস্তপালঃ বিদর্ভ রাজকুমার চলে গেলেন?

বিশদ হাস্যে হাব্‌শীদ্বয়ের সুকৃষ্ণ বদন মণ্ডল দ্বিধা ভিন্ন হইয়া গেল। তাহারা যুগপৎ মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিল। পুস্তপাল মহাশয় গম্ভীরভাবে কর্ণ হইতে লেখনী লইয়া দপ্তরে লিখিতে লিখিতে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিলেন—

পুস্তপালঃ বিদর্ভকুমার। ঊনপঞ্চাশৎ সংখ্যা—

ডিজল্‌ভ্‌।

একটি বৃহৎ সভাগৃহ; এত বৃহৎ যে পাঁচশত লোক অনায়াসে তাহাতে বসিতে পারে। গোলাকৃতি কক্ষ; প্রাচীর সাধারণ কক্ষের চতুর্গুণ উচ্চ। প্রাচীরের নিম্নভাগে নানাবিধ পৌরাণিক ঘটনার চিত্র সারি সারি অঙ্কিত রহিয়াছে; ঊর্ধ্বে প্রায় ছাদের নিকটে আলিসার মত প্রশস্ত ব্যাল্‌কনি প্রাচীর হইতে বাহির হইয়া আছে। তাহার উপর শূলধারী দুইজন হাব্‌শী রক্ষী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পরস্পর সম্মুখীন হইবামাত্র তাহারা এক দ্বিচিত্র অভিনয়ের অনুষ্ঠান করিতেছেঃ স্কন্ধ হইতে শূল নামাইয়া পরস্পর যেন আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে; তারপর যেন উভয়ে উভয়কে মিত্র বলিয়া চিনিতে পারিয়া শূল স্কন্ধে তুলিয়া আবার বিপরীত মুখে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিতেছে। এই অভিনয় বস্তুত অহিংস হইলেও দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর।

সভাগৃহের নিম্নে মণিকুট্টিমের মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ চক্রাকার বেদী, ভূমি হইতে মাত্র এক ধাপ উচ্চ। মূলত ইহা রাজসভায় সিংহাসন রক্ষার জন্য পট্টবেদিকা; কিন্তু রাজসভা স্বয়ংবর সভায় রূপান্তরিত হওয়ায় সিংহাসন অন্তর্হিত হইয়াছে। এই বেদীর সম্মুখে অল্প দূরে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি আর একটি ক্ষুদ্র বেদিকা—ইহা রাজার সহিত ভাষণপ্রার্থী মান্য অতিথির জন্য নির্দিষ্ট। উপস্থিত এই বেদিকাটি শূন্য।

কিন্তু প্রধান পট্টবেদিকাটি শূন্য নহে, বরঞ্চ কিছু অধিক পরিমাণেই পূর্ণ। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি সুন্দরী সুবেশা তরুণী এই বেদীর উপর, পদ্মের উপর প্রজাপতির মত ইতস্তত সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। বেদীর উপর স্থানে স্থানে স্বর্ণস্থালীতে মালা পুষ্প চন্দন শঙ্খ লাজ ইত্যাদি সজ্জিত রহিয়াছে। তরুণীরা কলকণ্ঠে গল্প করিতেছে, হাসিতেছে, তাম্বূল চর্বণ করিতেছে; কেহ বা বেদীর উপর অর্ধশয়ান হইয়া অলস অঙ্গুলি সঞ্চালনে বীণার তন্ত্রীতে মৃদু আঘাত করিতেছে।

বেদীর উপর একটি দীর্ঘ স্বর্ণদণ্ডের শীর্ষে দুইটি শুক পক্ষী চরণে শৃঙ্খল পরিয়া বসিয়া আছে। একটি তরুণী মৃণাল বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া তাহাদের ধান্যের শীষ খাওয়াইতেছেন। এই তরুণীর মুখাবয়ব পশ্চাৎ হইতে দেখা না গেলেও তাঁহার গ্রীবা ও দেহের মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গিমা

হইতে অনুমান হয় যে ইনিই রাজকন্যা।

আর একটি যুবতী বেদীর কিনারায় বসিয়া গভীর মনঃসংযোগে কজ্জলমসী দিয়া ভূমির উপর আঁক কষিতেছে। অন্য কোনও দিকে তাহার দৃষ্টি নাই; মুখে উদ্বেগ ও শঙ্কা পরিস্ফুট। অবশেষে অঙ্ক শেষ করিয়া যুবতী হতাশাব্যঞ্জক মুখ তুলিল, হৃদয়ভারাক্রান্ত নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—

যুবতী: ঊনপঞ্চাশ!

যুবতীর কণ্ঠস্বরে রাজকুমারী পক্ষীদণ্ডের দিক হইতে ফিরিলেন। এতক্ষণে তাঁহার মুখ দেখা গেল। এতগুলি সম্ভ্রান্তকুলোদ্ভবা রূপসীর মধ্যে তিনিই যে প্রধানা, তাহা তাঁহার মুখের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলে আর সন্দেহ থাকে না। অভিমান তীক্ষ্নবুদ্ধি বৈদগ্ধ্য ও সৌকুমার্য মিশিয়া মুখে অপূর্ব লাবণ্য যেন ঝলমল করিতেছে।

প্রিয়সখী চতুরিকার হতাশ মুখভঙ্গী দেখিয়া রাজকুমারীও একটু বিষন্ন হাস্য করিলেন, তারপর অলসপদে তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজকুমারী: চতুরিকা, ঠিক জানিস ঊনপঞ্চাশটা? আমার তো মনে হচ্ছে, একশ' ঊনপঞ্চাশ—

চতুরিকা আবার হিসাবের দিকে দৃষ্টি নামাইল, মনে মনে হিসাব পরীক্ষা করিল, তারপর বিমর্ষভাবে মাথা নাড়িল।

চতুরিকা: উহুঁ, ঊনপঞ্চাশ। এই যে হিসেব—তের জন রাজকুমার, সতেরোটি সামন্ত, চৌদ্দজন শ্রেষ্ঠীপুত্র, আর পাঁচটি নাগরিক। কত হল?

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি সখী চতুরিকার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; একজন চট্ করিয়া জবাব দিল—

প্রথমা: সাতচল্লিশ!

দ্বিতীয়া: দূর মুখপুড়ি, তিপান্ন!

রাজকুমারী হাসিলেন—

রাজকুমারী: তোরা সবাই অঙ্কশাস্ত্রে বররুচি!

চতুরিকা সকৌতুক ভ্রূভঙ্গী করিয়া রাজকুমারীর পানে চোখ তুলিল—

চতুরিকা: শুধু তোমার বুঝি বরে রুচি নেই!

সকলে হাসিয়া উঠিল। রাজকুমারীও হাসিতে হাসিতে চতুরিকার পাশে উপবেশন করিলেন। আর সকলে তাঁহাদের ঘিরিয়া বসিল। রাজকন্যা মুখের একটি কৌতুক-করুণ ভঙ্গী করিয়া বলিলেন—

রাজকুমারী: রুচি থেকেই বা লাভ কি চতুরিকা? ঊনপঞ্চাশ জনের একজনও তো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে না—

চতুরিকা রাজকুমারীর সবচেয়ে প্রিয় সখী, তাঁহার মনের অনেক খবর জানে। সে মিটিমিটি হাসিয়া প্রশ্ন করিল—

চতুরিকা: আচ্ছা সত্যি বল পিয়সহি, এদের মধ্যে কেউ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে তুমি খুশী হতে?

রাজকুমারীও হাসিলেন—

রাজকুমারী: যদি বলি হতুম।

চতুরিকা মাথা নাড়িল—

চতুরিকা: তাহলে আমি বিশ্বাস করি না, ওদের মধ্যে একজনকেও তোমার মনে ধরেনি।

সখীদের মধ্যে একজন তরল কৌতুকচপলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

প্রথমা: শুধু রামছাগলটিকে ছাড়া!

হাসির লহরা উঠিল। একটি হতভাগ্য পাণিপ্রার্থীর ছাগ-সদৃশ চেহারা লইয়া ইতিপূর্বে অনেক রসিকতা হইয়া গিয়াছিল, রাজকুমারী একমুঠি ফুল ছুঁড়িয়া রহস্যকারিণীকে প্রহার করিলেন।

রাজকুমারী: রামছাগলটিকে মৃগশিরার ভারি মনে ধরেছে, ঘুরে ফিরে কেবল তারই কথা! তোর জন্যে চেষ্টা ক'রে দেখব না কি? এখনও হয়তো খুঁজলে পাওয়া যাবে।

মৃগশিরা রাজকুমারীর নিক্ষিপ্ত ফুলগুলি কবরীতে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল—

মৃগশিরাঃ তা মন্দ কি! আমি গররাজি নই—

আর একজন ফোড়ন কাটিল

দ্বিতীয়াঃ রাজযোটক হবে—মৃগশিরা আর রামছাগল—

চতুরিকা একটু গম্ভীর হইল

চতুরিকাঃ ঠাট্টা নয়, ভারি আশ্চর্য কথা। এতগুলো বড় বড় লোক, একটা প্রশ্নের কেউ জবাব দিতে পারলে না!

তৃতীয়াঃ যা বিদ্‌ঘুটে প্রশ্ন!

রাজকুমারী শান্তকণ্ঠে বলিলেন—

রাজকুমারীঃ প্রশ্ন বিদ্‌ঘুটে নয় মালবিকা, লোকগুলো বিদ্‌ঘুটে। ওদের যদি সহজ-বুদ্ধি থাকত তাহলে সহজেই উত্তর দিতে পারত।

একটি সখীর কৌতূহল দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল, সে রাজকুমারীর কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া আব্‌দারের সুরে বলিল—

চতুর্থীঃ বল না পিয়সহি, প্রথম প্রশ্নের উত্তর কি?

আর একজন তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিল—

পঞ্চমাঃ না না, আমরা সবাই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর শুনতে চাই—পৃথিবীতে সব চেয়ে মিষ্ট কি?

রাজকুমারী অন্য একটি সখীর পৃষ্ঠে নিজ পৃষ্ঠ অর্পণ করিয়া ঠেস দিয়া বসিলেন, একটু অলস হাসিয়া বলিলেন—

রাজকুমারীঃ তোরাই বল্ না দেখি।

সকলেই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল। একটি সরলা যুবতী উৎসাহভরে বলিল—

শিখরিণীঃ আমি বলব? আনারস। (ঝোল টানিয়া) আনারসের চেয়ে মিষ্টি পৃথিবীতে আর কিচ্ছু নেই।

মৃগশিরা মুখ তুলিল—

মৃগশিরাঃ আমি বুঝেছি—আক! ইক্ষুদণ্ড! আকের চেয়ে মিষ্টি আর কি আছে? আক থেকেই তো যত সব মিষ্টি জিনিস তৈরি হয়।

তৃতীয়া আপত্তি তুলিল—

তৃতীয়াঃ তাহলে মধু হবে না কেন? মধুই বা কি দোষ করেছে। হ্যাঁ পিয়সহি, মধু—না?

রাজকুমারী হাসিয়া উঠিলেন—

রাজকুমারীঃ দূর হ' পেটুকের দল! কিন্তু আর তো পারা যায় না। মাথার ওপর উনপঞ্চাশ বায়ুর নৃত্য হয়ে গেল; আর কি সহ্য হবে!

রাজকুমারী বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চতুরিকার পানে তাকাইলেন। বিদ্যুল্লতা সান্ত্বনার সুরে বলিল—

বিদ্যুল্লতাঃ এরই মধ্যে হাঁপিয়ে পড়লে চলবে কেন!—এখনও সমস্ত দিন পড়ে রয়েছে!

রাজকুমারী অধীরভাবে মাথা নাড়িলেন—

রাজকুমারীঃ তা নয় বিদ্যুল্লতা। কিন্তু আর্যাবর্তের এত অধঃপতন হয়েছে! এক অশিক্ষিতা মেয়ের তিনটে সামান্য প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারছে না!

চতুরিকা মুখভঙ্গী করিল—

চতুরিকাঃ তুমি অশিক্ষিতা মেয়ে! বাব্বাঃ!—চতুঃষষ্ঠিকলা শেষ করে বসে আছ!

বনজ্যোৎস্না রাজকুমারীকে আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিল—

বনজ্যোৎস্নাঃ হতাশ হয়ো না পিয়সহি, এখনও অনেক আস্‌বে, কেউ না কেউ ঠিক উত্তর দিয়ে ফেলবেই—

রাজকুমারীঃ উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায়—যাঁরা আসবেন তাঁরা সবাই ঐ রামছাগলের ভায়রা ভাই। তার চেয়ে যদি আমার শুকসারীকে প্রশ্ন করতুম, ওরা ঠিক উত্তর দিতে পারত।

চতুরিকাঃ তবে তাই কর, সব হাঙ্গামা চুকে যাক। ঘরের মেয়ে ঘরেই থাকবে, শ্বশুর-বাড়ি যেতে হবে না। তাহলে মহারাজকে তাই বলি গিয়ে? কি বল?

রাজকুমারী একটু মৃদু হাসিলেন।

কাট্।

তোরণ ও প্রতীহার-ভূমি। কৃপাণধারী হাব্‌শীদ্বয় পূর্ববৎ দাঁড়াইয়াছিল, সহসা সম্মুখে চাহিয়া তাহারা আরও সতর্ক হইয়া দাঁড়াইল।

যাহাকে দেখিয়া হাব্‌শীদ্বয় সতর্ক হইয়াছিল, সে আর কেহ নহে, আমাদের অশ্বারূঢ় কালিদাস। নগরের বহু স্থান ঘুরিয়া উন্মত্ত ঘোটক অবশেষে রাজপ্রাসাদের দিকে উল্কার বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। কালিদাস ঘোড়ার কেশর ধরিয়া কোন মতে টিঁকিয়া আছেন।

ঝড়ের বেগে ঘোড়া হাব্‌শীদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। হাব্‌শীরাও তৈয়ার ছিল, ডালকুত্তার মত লম্ফ দিয়া পড়িয়া দুই দিক হইতে ঘোড়ার বল্‌গা চাপিয়া ধরিল। হাব্‌শীদের দেহে অসুরের শক্তি, ঘোড়া আর অধিক আস্ফালন করিতে পারিল না, শান্ত হইয়া দাঁড়াইল। কালিদাস এই সুযোগই খুঁজিতেছিল, পিছ্‌লাইয়া ঘোড়ার ঘর্মাক্ত পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া পড়িলেন।

দীর্ঘকাল একটা উদ্দাম অসংযত ঘোড়ার পিঠে মরি-বাঁচি ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিবার পর কালিদাসের মানসিক ক্রিয়াকলাপ প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; তিনি কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে অশ্বপাল আসিয়া অশ্বটিকে লইয়া গিয়াছিল; পুস্তপাল মহাশয়ও ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। কালিদাসকে দেখিয়া তিনি সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন—

পুস্তপালঃ আসুন, আসুন কুমার—

কালিদাস থতমত খাইয়া গেলেন।

কালিদাসঃ আমি—আমি—

পুস্তপালঃ পরিচয় দিতে হবে না সৌরাষ্ট্রকুমার—আপনার শিরস্ত্রাণ কে না চেনে?—আসতে আজ্ঞা হোক—এইদিকে—মহামন্ত্রী প্রতীক্ষা করছেন—

পুস্তপাল আমন্ত্রণের ভঙ্গীতে দুই হস্ত ভিতরের দিকে প্রসারিত করিলেন। ভ্যাবাচাকা অবস্থায় কালিদাস পুস্তপাল মহাশয়ের সঙ্গে রাজতোরণ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ডিজল্‌ভ্।

রাজপুরীর প্রথম মহলে মহামন্ত্রী যুক্তকরে কালিদাসকে সংবর্ধনা করিলেন। শীর্ণকায় তীক্ষ্ণচক্ষু একটি বৃদ্ধ, তিনি মহা আড়ম্বর সহকারে সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন—

মহামন্ত্রীঃ স্বাগতম্—শুভাগতম্! অষ্টোত্তর শ্রীযুক্ত পরম-ভট্টারক পরম-ভাগবত সৌরাষ্ট্রকুমারের জয় হোক।

অভিভূত কালিদাস ফ্যাল্ ফ্যাল্ চক্ষে চাহিতে লাগিলেন; মহামন্ত্রী বলিয়া চলিলেন—

মহামন্ত্রীঃ আসুন মহাভাগ—আপনার পদদ্বন্দ্ব স্পর্শে—

কালিদাস এতক্ষণে কেবল 'পদ' শব্দটি বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু 'পদদ্বন্দ্ব' কি বস্তু?

কালিদাস ভ্রান্তভাবে নিজ পায়ের দিকে দৃষ্টি নামাইলেন—

কালিদাসঃ পদদ্বন্দ্ব?

মহামন্ত্রীঃ (স্মিতমুখে) পদযুগল—

কালিদাস তথাপি বিভ্রান্ত—

কালিদাসঃ পদযুগল?

মহামন্ত্রী সপ্রশংস মুখে একটু হাস্য করিলেন—

মহামন্ত্রীঃ কুমার দেখছি পরিহাসপ্রিয়। পদদ্বন্দ্ব অর্থাৎ পদযুগল—অর্থাৎ দুটি পা—।

কালিদাসের মুখের মেঘ কাটিয়া গেল—

কালিদাসঃ ওঃ! দ্বন্দ্ব মানে দুটি! তাই বুঝি পদদ্বন্দ্ব বলছেন—?

মহামন্ত্রী আসিয়া কালিদাসের বাহু ধরিলেন। রসিক ও কৌতুকী রাজপুত্র এ জগতে বড়ই বিরল। বৃদ্ধ স্নিগ্ধ হাস্যে বলিলেন—

মহামন্ত্রীঃ বৃদ্ধের সঙ্গে পরিহাস করবেন না কুমার, রসালাপের যোগ্যতর স্থান কাছেই আছে। আসুন, আপনাকে রাজকুমারীর কাছে নিয়ে যাই—

কাট্।

ওদিকে রাজকুমারীর স্বয়ংবর-সভায় বহুক্ষণ কোনও পাণিপ্রার্থীর শুভাগমন হয় নাই; এই অবকাশে সখীদের মধ্যে রঙ্গরস জমিয়া উঠিয়াছে। রাজকুমারী পূর্ববৎ একটি সখীর পৃষ্ঠে পৃষ্ঠভার অর্পণ করিয়া অলস ভঙ্গীতে বসিয়া আছেন; বিদ্যুল্লতা একটি সুদীর্ঘ ময়ূরপুচ্ছ হাতে লইয়া বেত্রের মত লীলায়িত করিতেছে ও রাজকুমারীকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহার গানের কথাগুলিতে যে মৃদু ব্যঙ্গ-রস রহিয়াছে, রাজকুমারী তাহা উপভোগ করিতেছেন। সখীরাও কেহ মুখ টিপিয়া হাসিতেছে, কেহ বা ব্যক্তভাবেই কুন্দ-দন্ত বিকশিত করিয়া আছে। একটি সখীর অলস অঙ্গুলি আঘাতে ভূমিশয়ান বীণার তন্ত্রী হইতে মুগ্ধ মূর্ছনা গুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে।

লাস্যের চটুল ছন্দে বিদ্যুল্লতা গাহিতেছে—

'আমি হব গুরুমশাই আমার নাগর হবে চেলা
বেত উঁচিয়ে বস্‌ব আমি সন্ধ্যে-সকাল বেলা—'

চতুরিকা মিটি-মিটি কণ্ঠে গান গাহিয়া প্রশ্ন করিল—

'আর রাত্তিরেতে সই—?'

বিদ্যুল্লতা ভ্রূবিলাস করিয়া বাঁকা হাসিয়া গাহিল—

'তখন থাক্‌বে না ক' পাততাড়ি সই থাক্‌বে না ক' বই।'

বনজ্যোৎস্না ভাষ্য করিয়া যোগ করিল—

'শুধু হৃদয় জুড়ে প্রেমের লহর করবে লো থৈ থৈ।'

বিদ্যুল্লতার লাস্যবিলাস আরও দ্রুতচঞ্চল ও মদোন্মত্ত হইয়া উঠিল; চৈতালী ঘূর্ণীর মত মহা উল্লাসে রাজকুমারীর চারি পাশে আবর্তন করিতে করিতে সে গাহিল—

'দুটি গুরু-চেলায় মনের মিলে খেলব প্রেমের খেলা।'

সহসা বাধা পড়িল। কয়েকটি সখী দূরে মহামন্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া বিদ্যুল্লতার দিকে উৎকণ্ঠ হইয়া সমস্বরে শীৎকার করিয়া উঠিল—স্ স্ স্—! স্ স্ স্!

বিদ্যুল্লতা ঘাড় ফিরাইয়া একবার দ্বারের দিকে ত্রস্ত দৃষ্টিপাত করিয়াই থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। রাজকুমারী ঈষৎ চকিতভাবে দ্বারের দিকে আয়ত চক্ষু ফিরাইলেন।

প্রধান দ্বার দিয়া মহামন্ত্রী কালিদাসকে লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। কালিদাসের চোখে মুখে অকুণ্ঠ বিস্ময়; মাঝে মাঝে কোনও একটি সুন্দর কারুকার্য দেখিয়া তাঁহার মন্থর গতি রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে; মহামন্ত্রী তাঁহার বাহু স্পর্শ করিয়া আবার তাঁহাকে সম্মুখে পরিচালিত করিতেছেন।

ক্রমে উভয়ে দ্বিতীয় বেদীর উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। কালিদাস সম্মুখস্থ যুবতীযূথের প্রতি সুস্মিত বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

সখীরাও ইতিমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সহস্রচক্ষু হইয়া এই শিরস্ত্রাণধারী পরম সুন্দর যুবাপুরুষকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। রাজকুমারী একবার চক্ষু তুলিয়া আবার চক্ষু নত করিয়া ফেলিয়াছিলেন; তাঁহার মুখের নিরুৎসুক ঔদাসীন্য যেন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এমন কান্তিমান পাণিপ্রার্থী ইতিপূর্বে স্বয়ংবর সভায় পদার্পণ করেন নাই।

মহামন্ত্রী মহাশয় একবার গলা-ঝাড়া দিয়া দক্ষিণ হস্তখানি অভয়মুদ্রার ভঙ্গীতে তুলিলেন।

মহামন্ত্রীঃ স্বস্তি।—পরম-ভট্টারক শ্রীমান সৌরাষ্ট্রকুমার রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে এসেছেন। শুভমস্তু।

রাজকুমারী দুই করতল যুক্ত করিয়া প্রণাম করিলেন; চোখ দুটি ঈষৎ উঠিয়া আবার নত হইল। বাহিরে কিছু প্রকাশ না পাইলেও তিনি যেন অন্তরে অন্তরে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন,

জোয়ারের জলস্পর্শে ঘাটে-বাঁধা তরণীর মত।

এদিকে মহামন্ত্রী কালিদাসকে চক্ষু-দ্বারা ইসারা করিতেছেন মাথা হইতে শিরস্ত্রাণটা খুলিয়া ফেলিতে; কিন্তু কালিদাস ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিতেছেন না। মহামন্ত্রী তখন তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে কথা বলিলেন; কালিদাস তাড়াতাড়ি শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ওটা রাখিবেন কোথায়? এদিক ওদিক স্থান না দেখিয়া শেষে মহামন্ত্রীর হাতে উহা ধরাইয়া দিয়া সহাস্য মুখে রাজকুমারীর দিকে ফিরিলেন।

কালিদাসের শিরস্ত্রাণ-মুক্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া যুবতীদের মুণ্ড ঘুরিয়া গেল, তাহারা নিশ্বাস সম্বরণ করিয়া দেখিতে লাগিল; এক ঝাঁক চঞ্চল খঞ্জন যেন কোন্ মায়াবীর মন্ত্রকুহকে স্থির চলৎশক্তিহীন হইয়া গিয়াছে। শেষে মৃগশিরা আর থাকিতে না পারিয়া পাশের সখীর কানে কানে বলিল—

মৃগশিরাঃ কী চমৎকার চেহারা ভাই, রাজকুমারের! যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প!—এমন আর কখনো দেখেছিস্?

আশেপাশের দুই-তিন জন চাপা গলায় বলিয়া উঠিল—স্-স্-স্—।

চতুরিকা রাজকুমারীর মনের ভাব বুঝিয়াছিল, তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—

চতুরিকাঃ মহেশ্বরের কাছে মানত কর, এবার যেন না ফস্কায়—

রাজকুমারী একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া তাহাকে পাশে সরাইয়া দিলেন। চতুরিকা বড় প্রগল্‌ভা।

প্রশ্ন করিতে বিলম্ব হইতেছে; সৌরাষ্ট্রকুমারকে কতক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখা যায়? মহামন্ত্রী আর একবার গলা-ঝাড়া দিয়া বলিলেন—

মহামন্ত্রীঃ রাজকুমারী, কুমার-ভট্টারক নিজের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, আপনার প্রশ্ন করুন।

রাজকুমারী মুখ তুলিলেন। কালিদাসের সহিত তিনি ঠিক মুখোমুখি ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন না, একটু পাশ ফিরিয়া ছিলেন। এখন মনোরম গ্রীবাভঙ্গী সহকারে তিনি একবার কালিদাসের দিকে মুখ ফিরাইলেন, তারপর আবার সম্মুখ দিকে চাহিয়া অনুচ্চ স্পষ্ট স্বরে বলিলেন—

রাজকুমারীঃ প্রথম প্রশ্ন হচ্চে—জগতে সব চেয়ে শক্তিমান কী?

সখীরা এতক্ষণ একদৃষ্টে রাজকুমারীর পানে চাহিয়াছিল, এখন যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিতবৎ একসঙ্গে কালিদাসের পানেও মুণ্ড ফিরাইল।

কালিদাস কিন্তু ইত্যবসরে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন; চারিদিকে এত মহার্ঘ বৈচিত্র্য ছড়ানো রহিয়াছে যে, চক্ষু বিভ্রান্ত হইলে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি কুমারীর প্রশ্ন করার ব্যাপারটা ভালরূপ অনুধাবন করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। মহামন্ত্রী তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে করিলেন ইহা সৌরাষ্ট্রদেশীয় রসিকতার একটা অঙ্গ। তিনি সসম্ভ্রমে প্রশ্নের পুনরুক্তি করিয়া কালিদাসের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন—

মহামন্ত্রীঃ কুমারীর প্রশ্ন হচ্চে, জগতে সব চেয়ে শক্তিমান কী?

কালিদাসের চক্ষুযুগল এই সময় বিস্ময়বিমুগ্ধ ভাবে উর্ধ্বে উঠিতেছিল; হঠাৎ তাঁহার মুখে ভয়ের ছায়া পড়িল। ত্রাসবিস্ফারিত নেত্র উর্ধ্বে রাখিয়াই তিনি একটি বাহু পাশে বাড়াইয়া বৃদ্ধ মহামন্ত্রীর কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিলেন। তারপর বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁহাকে দুই হস্তে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া আলিসার পানে তাকাইতে লাগিলেন।

উর্ধ্বে আলিসার উপর যে হাব্‌শী রক্ষীযুগলের ভয়ঙ্কর যুদ্ধাভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাহা দেখিয়াই যে কালিদাসের ইদৃশ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। বৃদ্ধ মহামন্ত্রী উত্যক্ত হইয়া ভাবিলেন, সৌরাষ্ট্রদেশের রাজকীয় রসিকতা ক্রমশ চরমে উঠিতেছে। গলা ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে তিনি বলিলেন—

মহামন্ত্রীঃ প্রশ্নের উত্তর দিন কুমার!—

ব্যাপার বেশীদূর গড়াইতে পাইল না; হাব্‌শী-যুগল ইতাবসরে দ্বন্দ্বাভিনয় শেষ করিয়া আবার শান্তভাবে বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কালিদাস কতকটা আশ্বস্ত হইয়া মহামন্ত্রীকে ছাড়িয়া দিলেন। ক্ষুব্ধ মহামন্ত্রী কণ্ঠের ঘর্ম মুছিতে মুছিতে পুনশ্চ বলিলেন—

মহামন্ত্রীঃ এইবার প্রশ্নের উত্তর, কুমার—।

কিন্তু কালিদাস বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার পূর্বেই রাজকুমারী কথা কহিলেন; বীণার ঝঙ্কারের মত ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—

রাজকুমারীঃ প্রথম প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পেয়েছি।

সকলে অবাক। উত্তেজিত সখীর দল রাজকুমারীকে ভাল করিয়া ঘিরিয়া ধরিল। চতুরিকা বলিয়া উঠিল—

চতুরিকাঃ অ্যাঁ—কি উত্তর পেলে?

কুমারীর গাল দুটি একটু অরুণাভ হইল। তিনি ঈষৎ গ্রীবা বাঁকাইয়া মৃদু অথচ স্পষ্টস্বরে বলিলেন—

রাজকুমারীঃ প্রশ্নের উত্তর হচ্চে—ভয়। কুমার অভিনয় দ্বারা যথার্থ উত্তর দিয়েছেন।

সখীগণ সশব্দে নিশ্বাস ছাড়িয়া কালিদাসের দিকে ফিরিল।

কালিদাস মহামন্ত্রীর পানে চাহিয়া ঈষৎ বিহ্বলভাবে হাসিতেছেন, কোন্ দিক দিয়া কি হইয়া গেল, যেন ঠিক ধারণা করিতে পারিতেছেন না। মহামন্ত্রীও কতকটা বোকা বনিয়া গিয়া ঘাড় চুলকাইতে লাগিলেন।

রাজকুমারী কথা কহিলেন। তাঁহার মুখচ্ছবিতে একটু উদ্বেগ দেখা দিয়াছে; কি জানি কুমার দ্বিতীয় প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারিবেন কি না! কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর তেমনি সংযত ও আবেগহীন রহিল।

রাজকুমারীঃ এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন—দ্বন্দ্ব হয় কাদের মধ্যে?

প্রশ্ন করিয়াই রাজকুমারী কালিদাসের দিকে একটি উৎকণ্ঠা-মিশ্র দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন।

কালিদাস এবার প্রস্তুত ছিলেন, প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি মহামন্ত্রীর প্রতি কৌতুক-কটাক্ষ পাত করিয়া তর্জনী তুলিলেন, যেন মহামন্ত্রীকে ইঙ্গিতে বলিতে চাহিলেন যে, এ প্রশ্নের সমাধান তো পূর্বেই হইয়া গিয়াছে! তারপর বিজয়দীপ্ত চক্ষে রাজকুমারীর দিকে ফিরিয়া দুইটি অঙ্গুলি ঊর্ধ্বে তুলিয়া কহিলেন—

কালিদাসঃ দ্বন্দ্ব—দুই!

সখীরা একাগ্র দৃষ্টিতে কালিদাসের দিকে চাহিয়াছিল, এখন যন্ত্র-চালিতবৎ রাজকুমারীর পানে দৃষ্টি ফিরাইল।

রাজকুমারীর চোখে চকিত আনন্দ খেলিয়া গেল; তিনি রুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করিলেন। চতুরিকা উত্তেজনা-বিকৃত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—

চতুরিকাঃ কি হ'ল—ঠিক হয়েছে?

রাজকুমারী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বোধ করি নিজের উদ্গত হৃদয়বৃত্তি সম্বরণ করিয়া লইলেন, তারপর ধীরস্বরে কহিলেন—

রাজকুমারীঃ কুমার দ্বিতীয় প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়েছেন—দ্বন্দ্ব হয় দুয়ের মধ্যে।

সভাকক্ষের ভিতর দিয়া একটা উত্তেজনার ঝড় বহিয়া গেল। সখীরা প্রায় সকলেই একসঙ্গে কলকূজন করিয়া উঠিয়া আবার তৎক্ষণাৎ 'স্-স্-স্—' শব্দের শাসনে নীরব হইল। উত্তেজনায় মৃগাশিরা ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল; বনজ্যোৎস্না ভূলুণ্ঠিত বীণাটার উপর পা চাপাইয়া দিয়া তাহার মর্মতন্তু হইতে যন্ত্রণাব কাকুতি বাহির করিল; বিদ্যুল্লতার নীবিবন্ধ খুলিয়া খসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, হঠাৎ সেইদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় সে ব্যাকুলভাবে বস্ত্র সম্বরণ করিয়া সকলের পিছনে লুকাইল। রাজকুমারী সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়া নীহারশুভ্র উর্ণাটি ভাল করিয়া নিজ দেহে জড়াইয়া লইলেন।

বুড়া মহামন্ত্রীর গায়েও বোধ হয় উত্তেজনার ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল, তিনি দুই হস্ত সহর্ষে ঘষিতে ঘষিতে বলিতে লাগিলেন—

মহামন্ত্রীঃ ধন্য কুমার! ধন্য কুমার! আপনি দুটি প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন! এবার শেষ প্রশ্ন! মাত্র একটি প্রশ্ন বাকি—

এই সব উত্তেজনা উদ্দীপনার মধ্যে কালিদাস কিন্তু অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে একদিকে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন। স্বর্ণদণ্ডের শীর্ষে শুক-সারী পক্ষী দুটি তাঁহার সকৌতুক মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। তাই রাজকুমারী যখন তৃতীয় প্রশ্ন উচ্চারণ করিলেন তখন তাহা কালিদাসের কানে গেল কিনা সন্দেহ।

যিনি প্রশ্নের উত্তর দিবেন তাঁহার কোনও উৎকণ্ঠাই নাই, কিন্তু রাজকুমারীর গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, বুকের ভিতর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ঠিক স্বাভাবিকভাবে চলিতেছিল না। কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ করা চলিবে না। কুমার যদি শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন অথচ রাজকুমারীর মনের পক্ষপাত প্রকাশ হইয়া পড়ে, সে বড় লজ্জার কথা হইবে। কুমারী যথাসম্ভব স্থিরকণ্ঠে কথা বলিলেন; তবু গলা একটু কাঁপিয়া গেল।

রাজকুমারীঃ শেষ প্রশ্ন—পৃথিবীতে সব চেয়ে মিষ্ট কি?

যুবতীবৃন্দ যুগপৎ কালিদাসের পানে চক্ষু ফিরাইল।

কালিদাস ফিক্ করিয়া হাসিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখে কথা নাই, চক্ষু সারী-শুকের উপর নিবদ্ধ। রাজকুমারী ঈষৎ বিস্ময়ে চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন—কালিদাস অন্যদিকে তাকাইয়া আছেন; তাঁহার মুখে ক্ষণিক ক্ষোভের ছায়া পড়িল। পরক্ষণেই কালিদাস সম্মুখে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

কালিদাসঃ দ্যাখো দ্যাখো—ঐ দ্যাখো—!

সকলেই একসঙ্গে তাঁহার অঙ্গুলি-সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া তাকাইলেন। ব্যাপার এমন কিছু গুরুতর নয়; দণ্ডের উপর বসিয়া সারী-শুক অর্ধমুদিত চক্ষে পরস্পর চঞ্চু-চুম্বন করিতেছে; তাহাদের কণ্ঠ হইতে গদগদ মৃদু কূজন নির্গত হইতেছে। যিনি ভবিষ্যকালে লিখিবেন—'মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াম্ স্বামনুবর্ত্তমানঃ—' তিনি এই দেখিয়াই বিহ্বল আত্ম-বিস্মৃত!

রাজকুমারীর চক্ষে কিন্তু আনন্দের বিজলী খেলিয়া গেল। তিনি কালিদাসের পানে সভ্রূভঙ্গ একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সলজ্জ রক্তিম মুখখানি নত করিয়া ফেলিলেন।

কালিদাস হাসিতে হাসিতে রাজকুমারীর দিকে ফিরিতেছিলেন; চমকিত হইয়া দেখিলেন, রাজকুমারী ধীরে ধীরে নতজানু হইতেছেন। যুক্তকরে শির অবনমিত করিয়া কুমারী অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—

রাজকুমারীঃ আর্যপুত্র শেষ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়েছেন; পৃথিবীতে সব চেয়ে মিষ্ট—প্রণয়।

ক্ষণকালের বিস্ময় বিমূঢ়তা ফাটিয়া যেন শতভিন্ন হইয়া গেল। সখীরা আর সম্ভ্রম শালীনতার শাসন মানিল না; চীৎকার হুড়াহুড়ি অঞ্চল-উত্তরীয় উৎক্ষেপে তাহাদের প্রমত্ত জয়োল্লাস একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। রাজকুমারী উঠিয়া দাঁড়াইতেই চার-পাঁচজন ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে একসঙ্গে জড়াইয়া ধরিল। কয়েকজন মুঠি মুঠি লাজ লইয়া সকলের মাথার উপর বৃষ্টি করিতে লাগিল। একজন ঘন ঘন শঙ্খ বাজাইয়া তুমুল শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করিল। যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরস্পর হাত ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল; অন্য কয়জন পরস্পর আঁচল ধরিয়া টানিয়া, কবরী খুলিয়া দিয়া কপট-কলহে হৃদয়াবেগ লাঘব করিতে প্রবৃত্ত হইল।

মহামন্ত্রী কালিদাসের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—

মহামন্ত্রীঃ ধন্য কুমার! ধন্য আপনার কূটবুদ্ধি!—আমি মহারাজকে সংবাদ দিতে চললাম।

বলিয়া তিনি দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

বিস্রস্তকুন্তলা চতুরিকা বেদীর কিনারায় ঊর্ধ্বমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত নাড়িয়া উপরি-স্থিত একজন হাব্শী রক্ষীকে ইসারা করিতেছিল; মুখের সম্মুখে সম্পুটিত করপল্লব যুক্ত করিয়া জানাইতেছিল—শিঙ্গা বাজাও, বিষাণ বাজাও—নগরীকে সংবাদ দাও রাজকুমারী পতি-বরণ করিয়াছেন!

হাব্শী হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া ঘন ঘন ঘাড় নাড়িল; তারপর ব্যস্তসমস্তভাবে বাহির হইয়া গেল।

কাট্।

সভাগৃহের বহিঃপ্রাচীরে বহু ঊর্ধ্বে একটি অলিন্দযুক্ত গবাক্ষ। গবাক্ষে হাব্শীরক্ষীকে দেখা গেল। সে তূর্য মুখে তুলিয়া মন্দ্র-রবে শুভবার্তা ঘোষণা করিল।

কাট্।

রাজভবনের তোরণ-শীর্ষে মন্দিরাকৃতি ঘটিকাগৃহ; ইহা রাজ্যের প্রধান মান-মন্দির। ঘটিকা-গৃহের এক বাতায়নে দাঁড়াইয়া একজন প্রহরী উৎকর্ণভাবে দূরাগত তূর্য-ধ্বনি শুনিতেছে।

তূর্য-ধ্বনি নীরব হইলে প্রহরী একটি বাঁকা বিষাণ মুখে তুলিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল।

বিষাণ হইতে যে শব্দ-তরঙ্গ নিঃসৃত হইল তাহা তূর্য-ধ্বনি অপেক্ষা গভীরতর ও দূর-ব্যাপক।

কাট্।

নগর মধ্যে একটি উচ্চ জয়স্তম্ভ। স্তম্ভ চূড়ায় চারিজন বংশীবাদক চতুর্দিকে মুখ ফিরাইয়া বংশীতে ফুৎকার দিতেছে, দিকে দিকে আনন্দবার্তা বিঘোষিত হইতেছে।

স্তম্ভমূলে মদনোৎসব-প্রমত্ত নাগরিক-নাগরিকা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছে ও বাহু আস্ফালন করিয়া জয়ধ্বনি করিতেছে।

কাট্।

সভাগৃহে সখীদের প্রমোদবিহ্বলতা ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। কয়েকটি প্রগল্ভা সখী ছুটিয়া গিয়া কালিদাসের দুই হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে আনিয়া রাজকুমারীর পাশে দাঁড় করাইয়া দিল; তারপর সকলে মিলিয়া সনৃত্য ভঙ্গীতে উভয়কে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে গাহিতে আরম্ভ করিল—

'ফাগুনের পূর্ণিমাতে
এ কি চাঁদের মেলা
নয়নের পিচ্‌কারিতে
সখি রঙের খেলা।'

কাট্।

নগরোদ্যানের দৃশ্য। চারিদিকে নানা জাতীয় উৎসব চলিয়াছে। একজন বাজীকর দীর্ঘ বংশ-দণ্ডের শিখরে উঠিয়া চক্রবৎ ঘূরপাক খাইতেছে। অন্যত্র দুইজন অসি-যোদ্ধা অসিক্রীড়ার বিচিত্র কৌশল দেখাইয়া চমৎকৃত নাগরিকদের আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। মদন-মন্দির ঘিরিয়া একদল তরুণী নাগরিকা গরবা নৃত্য করিতেছে; তাহাদের কটি-ধৃত ধাতু-কলসের উপর অঙ্গুরীয়ের সমকালীন আঘাত নৃত্যের তাল রক্ষা করিতেছে—

'অঙ্গে অঙ্গ হরষ জাগাও অনঙ্গ
বুকের মাঝে বহাও সুখ-তরঙ্গ—'

কাট্।

নগরোদ্যানবেষ্টনকারী পথের উপর দিয়া এক সুসজ্জিত হস্তী চলিয়াছে, চারিদিকে বিপুল জনতা। হস্তী-পৃষ্ঠে আসীন ঘোষক চীৎকার করিয়া দুই বাহু ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বোধ করি রাজকুমারীর স্বয়ংবর-সংক্রান্ত কোনও রাজকীয় বার্তা ঘোষণা করিতেছে; কিন্তু জনতার বিপুল আরাবে কিছুই শুনা যাইতেছে না। ঘোষকের পশ্চাতে বসিয়া দ্বিতীয় এক পুরুষ মুঠি মুঠি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া চারিদিকে ছড়াইতেছে। নিম্নে সোনা কুড়াইবার হুড়াহুড়ি মারামারি।

ডিজল্‌ভ্।

রাত্রি। আকাশে পূর্ণচন্দ্র, নিম্নে দীপান্বিতা নগরী। সৌধে সৌধে দীপমালা; গীতবাদ্যে, সুগন্ধি অগুরু ধূমে বাতাস আমোদিত।

সর্বাঙ্গে দীপালঙ্কার পরিয়া রাজপুরী সখীপরিবৃতা প্রধানা নায়িকার ন্যায় শোভা পাইতেছে। রাত্রি যত গভীর হইতেছে উৎসবের চাঞ্চল্য ততই মন্থর রসঘন হইয়া আসিতেছে; নায়ক-নায়িকার নিভৃত মিলনের আর বিলম্ব নাই।

নগরীর এক মদিরাগৃহের সম্মুখে একদল মশালহস্ত উৎসবকারী সৌরাষ্ট্রের প্রকৃত রাজ-কুমারকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল এবং প্রমত্ত রঙ্গ-কৌতুকের অঙ্কুশে বিঁধিয়া তাঁহাকে প্রায় পাগল করিয়া

তুলিয়াছিল। সৌরাষ্ট্রকুমার দীর্ঘ বনপথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া সবেমাত্র নগরে পৌঁছিয়াছেন; অঙ্গের বসন ছিন্ন কর্দমাক্ত, জঠরে জ্বলন্ত ক্ষুধা—তাঁহার মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে, কেহই তাঁহাকে সৌরাষ্ট্রকুমার বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে না।

সৌরাষ্ট্রকুমারঃ (উত্তপ্ত কণ্ঠে) আমি বল্‌ছি আমিই সৌরাষ্ট্রের রাজকুমার!

এক ব্যক্তিঃ (মুখে চট্‌কার শব্দ করিয়া) তা তো অনেকক্ষণ থেকেই বলছ—আমরাও শুনে আসছি, কিন্তু তার প্রমাণ কই বাছাধন?

রাজকুমার অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলেন, উদ্ধত স্বরে কহিলেন—

সৌরাষ্ট্রকুমারঃ প্রমাণ! প্রমাণ আবার কি?—দেখতে পাচ্ছ না আমি রাজকুমার?

বলিয়া তিনি বুক ফুলাইয়া গর্বিত ভঙ্গীতে দাঁড়াইলেন। সকলে হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে একজন সান্ত্বনার সুরে বলিল—

দ্বিতীয় ব্যক্তিঃ আচ্ছা, আচ্ছা, তুমিই সৌরাষ্ট্রের রাজকুমার।—কিন্তু যার সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হ'ল, সে তবে কে?

সৌরাষ্ট্রকুমার এবার একেবারে ক্ষেপিয়া গেলেন; ফেনায়িত মুখে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

সৌরাষ্ট্রকুমারঃ সে—সে একটা কাঠুরে। চোর—প্রতারক—বাট্‌পাড়; আমার কাপড়-চোপড় ঘোড়া—সব চুরি করে পালিয়েছে—

আবার উচ্চ হাস্যে তাঁহার কথা চাপা পড়িয়া গেল; রাজকুমার নিষ্ফল ক্রোধে দন্ত কিড়িমিড়ি করিতে লাগিলেন।—হাসি মন্দীভূত হইলে প্রথম ব্যক্তি মিটিমিটি চাহিয়া বলিল—

এক ব্যক্তিঃ সত্যি কথা বলতে কি চাঁদবদন, তোমাদের মধ্যে কাঠুরে যদি কেউ থাকে তো সে তিনি নয়—তুমি! বলি, ক'ঘড়া তালের রস চড়িয়েছ?

সকলে হাসিল। রাজকুমার দেখিলেন এখানে কিছু হইবে না; তিনি রূঢ়হস্তে ভিড় সরাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিলেন।

সৌরাষ্ট্রকুমার। ছেড়ে দাও—সরে যাও। আমি দেখে নেব সেই কাঠুরেটাকে—শূলে দেব! কোথায় যাবে সে?—একবার তাকে দেখতে চাই!

তাঁহার কন্ঠস্বর জনতার বাহিরে মিলাইয়া গেল। প্রথম ব্যক্তি নীরস মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—

এক ব্যক্তিঃ কী আর দেখবে যাদু! তিনি এতক্ষণ রাজকুমারীকে নিয়ে বাসরশয্যায় শুয়েছেন।

আবার হাসির লহর ছুটিল।

ওয়াইপ্‌।

রাজ-ভবনভূমির মধ্যে একটি সরোবর। সরোবরের দর্পণে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

বাঁধানো ঘাটের পাশে মর্মরবেদী; তাহার উপর কালিদাস ও রাজকন্যা পাশাপাশি বসিয়া আছেন। নব পরিণয়ের পীত সূত্র তাঁহাদের মণিবন্ধে জড়ানো রহিয়াছে। রাজকন্যার হাতে একটি ক্ষুদ্র রৌপ্যনির্মিত তীর—যাহা পরবর্তী কালে কাজললতায় পরিবর্তিত হইয়াছে।

রাজকুমারী নতমুখে বসিয়া তীরটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন; কালিদাস মুগ্ধ উন্মনা দৃষ্টিতে ঊর্ধ্বে চাঁদের পানে চাহিয়া আছেন। কিছুক্ষণ কোনও কথাবার্তা নাই। তারপর কালিদাস একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

কালিদাসঃ কী সুন্দর চাঁদ। ঠিক যেন—ঠিক যেন—

যে উপমাটি খুঁজিতেছিলেন কালিদাস তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। রাজকুমারী মুখখানি একটু তুলিয়া স্মিত সলজ্জ মুখে বলিলেন—

রাজকুমারীঃ ঠিক যেন—?

কালিদাস ক্ষুব্ধভাবে মাথা নাড়িলেন—

কালিদাসঃ জানি না—মনে আসছে, মুখে আসছে না—

রাজকুমারী ঈষৎ নিরাশ হইলেন; নব অনুরাগের আকাঙ্ক্ষায় যে সুমিষ্ট উপমাটি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহা কালিদাসের কণ্ঠে আসিল না।

এই সময় সহসা একটি বিকট শব্দ শুনিয়া রাজকুমারী চমকিয়া উঠিলেন।

শব্দটি আসিল প্রাসাদ বেষ্টনকারী প্রাচীরের পরপার হইতে। প্রাচীরের বাহিরে রাজপথ গিয়াছে; সেই পথ বাহিয়া এক শ্রেণী ভারবাহী উষ্ট্র চলিয়াছিল। একটি উষ্ট্র বোধ করি প্রাচীরের উপর হইতে গলা বাড়াইয়া অদূরে নবদম্পতীকে দেখিতে পাইয়া সহসা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল।

ভয় পাইয়া রাজকুমারী কালিদাসের হাত চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। কালিদাস ভারি কৌতুক অনুভব করিয়া উচ্চ হাসিয়া উঠিলেন। রাজকুমারীর শিরীষকোমল হস্তে একটু সস্নেহ চাপ দিয়া বলিলেন—

কালিদাসঃ ভয় নেই রাজকুমারী; ও একটা উট—যাকে সাধু ভাষায় বলে—উষ্ট্র!

সাধুভাষা বলিয়া কালিদাস উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু রাজকুমারীর মুখে সংশয়ের ছায়া পড়িল। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে কালিদাসের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—

রাজকুমারীঃ কি—কি বললেন আর্যপুত্র?

কালিদাস দেখিলেন ভুল হইয়াছে; তিনি তাড়াতাড়ি ভুল সংশোধন করিলেন—

কালিদাসঃ না না—উট্র নয়, উট্র নয়—উষ্ট!

রাজকুমারীর মুখ শুকাইয়া গেল; শঙ্কিত সন্দেহে কালিদাসের পানে চাহিয়া থাকিয়া তিনি আপনার অবশে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; অস্ফুট স্বরে বলিলেন—

রাজকুমারীঃ উট্র—উষ্ট—!

তারপর চকিতে তাঁহার মুখের মেঘ কাটিয়া গেল; কালিদাস আজ প্রথম হইতে
যে আচরণ করিয়াছেন তাহা মনে পড়িয়া গেল। তিনি স্বস্তির
নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

রাজকুমারীঃ ওঃ! আর্যপুত্র পরিহাস করছেন!—কী পরিহাস-প্রিয় আপনি!

কালিদাসও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি উত্তর দিলেন না, কেবল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

এই সময় তোরণের ঘটিকাগৃহ হইতে মধ্য রাত্রির প্রহর বাজিল। ক্ষণস্থায়ী রাগিণীর আলাপ বন্ধ হইলে কালিদাস সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন—

কালিদাসঃ ও কি?

রাজকুমারীর চোখে আবার বিস্ময়-মিশ্র সন্দেহ দেখা দিল। রাজপুরীতে প্রহর বাজে সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ তাহাও জানেন না? না, ইহাও পরিহাস?

রাজকুমারীঃ মধ্যরাত্রির প্রহর বাজল।

কালিদাসঃ ওহো—! বুঝেছি। রাত দুপুর হয়েছে।—এবার চল, ভেতরে যাই।

কালিদাস অকুণ্ঠ সহজতায় রাজকুমারীর দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন। রাজকুমারীর সংশয় আবার দূর হইল। এমন স্বচ্ছন্দ আভিজাত্য, এমন অনিন্দ্য কান্তি, রাজপুত্র নহিলে কি সম্ভব?

দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া শয়ন-ভবনের দিকে চলিলেন।

কাট্।

ঠিক এই সময় প্রাসাদের এক বহিঃকক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকারের অভিনয় চলিতেছিল। বক্রী পাপগ্রহের ন্যায় সৌরাষ্ট্রকুমার বক্রগতিতে কুন্তলরাজের সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

দীপোৎসব তখনও শেষ হয় নাই; সেই দীপের আলোকে কক্ষের মধ্যস্থলে চারিটি ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ছিলেন—সৌরাষ্ট্রকুমার, মহামন্ত্রী, পুস্তপাল মহাশয় এবং কুন্তলরাজ। সৌরাষ্ট্রকুমারের বেশবাস পূর্ববৎ, তিনি সংহত ক্রোধে ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন; মহামন্ত্রীর মনের ভাব বুঝিবার উপায় নাই; পুস্তপাল মহাশয় যে বিপন্ন ও ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন তাহা বুঝিতে কাহারও বেগ পাইতে হয় না। স্বয়ং কুন্তলরাজও যেন কিছু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন; তিনি গম্ভীরপ্রকৃতি দৃঢ়শরীর স্বল্পভাষী পুরুষ—বয়স অনুমান পঞ্চাশ; মাথার চুল ও গুম্ফ পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহার চোখের স্বাভাবিক শান্ত দৃষ্টি বর্তমানে আকস্মিক বিপৎপাতে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে।

পুস্তপাল মহাশয়ের প্রাণে ভয় ঢুকিয়াছে, হয়তো এই অনর্থের জন্য তাঁহাকেই দায়ী করা হইবে। তিনি করুণ স্বরে আপত্তি করিতেছেন—

পুস্তপালঃ কিন্তু মহারাজ, এ যে—এ যে একেবারেই অসম্ভব! এই লোকটা—অর্থাৎ ইনি—, এও কি সম্ভব!

প্রতিবাদে সৌরাষ্ট্রকুমার একটি অন্তর্গূঢ় গর্জন ছাড়িলেন। ক্রমাগত চীৎকার করিয়া তাঁহার গলা ভাঙিয়া গিয়াছিল, শরীরও একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; তবু দক্ষিণহস্তের মুষ্টি পুস্তপালের নাসিকার অনতিদূরে স্থাপন করিয়া তিনি বলিলেন—

সৌরাষ্ট্রকুমারঃ (দন্ত খিঁচাইয়া) সম্ভব! এই দ্যাখো সৌরাষ্ট্রের মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরী। —সম্ভব।

পুস্তপাল মহাশয় মুষ্টির সান্নিধ্য হইতে নাসিকা দ্রুত অপসারিত করিয়া দেখিলেন, তর্জনীতে সত্যই একটি মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরী রহিয়াছে। তিনি বার দুই তিন চক্ষু মিটিমিটি করিলেন।

পুস্তপালঃ কিন্তু—কিন্তু—আপনি যদি সত্যিই—, আপনার সহচর কই?

সৌরাষ্ট্রকুমারঃ বলছি না, সহচরদের ফেলে আমি এগিয়ে আসছিলুম, তোমাদের জঙ্গলে এক বাট্‌পাড়—

কুন্তলরাজ বাধা দিয়া বলিলেন—

কুন্তলরাজঃ দেখি অঙ্গুরীয়; সৌরাষ্ট্রের মুদ্রা আমি চিনতে পারব।

সৌরাষ্ট্রকুমার অঙ্গুরীয় খুলিয়া রাজার হাতে দিলেন। দেখা গেল, তর্জনীর মূলে নিত্য অঙ্গুরীয় পরিধানের চক্রচিহ্ন রহিয়াছে। এ ব্যক্তি যে অঙ্গুরীয় কুড়াইয়া পাইয়া বা চুরি করিয়া পরিধান করিয়াছে তাহা নয়।

রাজা মুদ্রাটি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া শেষে উহা প্রত্যর্পণ করিলেন; অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে গুম্ফের প্রান্ত টানিতে টানিতে অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—

কুন্তলরাজঃ হুঁ—মুদ্রা সৌরাষ্ট্রেরই বটে।

সৌরাষ্ট্রকুমার অঙ্গুরীয় পুনশ্চ পরিধান করিতে করিতে চারিদিকে বিজয়দীপ্ত চক্ষু ঘুরাইতে লাগিলেন। পুস্তপাল মহাশয়ের মুখ কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠিল।

মহামন্ত্রী মৃদু গলা-ঝাড়া দিলেন।

মহামন্ত্রীঃ ইনি যদি সৌরাষ্ট্রের যুবরাজই হন—তা হলেও তো এখন আর—

কুন্তলরাজঃ কোনও উপায় নেই।—সে-ব্যক্তি যে-ই হোক, অগ্নি সাক্ষী করে আমার কন্যাকে বিবাহ করেছে—

মহামন্ত্রীঃ তা ছাড়া, রাজকুমারীর প্রতিজ্ঞা ছিল, চণ্ডাল হোক পামর হোক, যে-কেউ তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে—

সৌরাষ্ট্রকুমার বিস্ফোরকের মত ফাটিয়া পড়িলেন।

সৌরাষ্ট্রকুমারঃ ভস্ম হোক প্রশ্ন আর তার উত্তর। কুন্তলরাজ, আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে চাই না। আমি চাই—বিচার। যে চোর আমার অশ্ব আর বস্ত্রাদি চুরি করেছে সে আপনার জামাতাই হোক, আর—

মহামন্ত্রীঃ ধীরে কুমার, সংযম হারাবেন না—

সৌরাষ্ট্রকুমারঃ আমি বিচার চাই। কুন্তলরাজ্যের সীমানায় এই চুরি হয়েছে, তস্করকে শূলে দেওয়া হোক। আর তা যদি না হয়, সৌরাষ্ট্র দেশ নিবীর্য নয়—একথা স্মরণ রাখবেন।

কুন্তলরাজ এই স্পর্ধিত উক্তি গলাধঃকরণ করিলেন। ক্রোধে তাঁহার মুখ আরক্ত হইলেও এই ব্যক্তি যে সত্যই রাজপুত্র, সে প্রত্যয়ও দৃঢ় হইল। তিনি সংযত স্বরে বলিলেন—

কুন্তলরাজঃ এ বিষয়ে পরিপূর্ণ অনুসন্ধান না ক'রে কিছুই হ'তে পারে না। আপনার অভিযোগ যদি সত্য হয়—

রাজা মহামন্ত্রীর পানে ফিরিলেন, চতুর মহামন্ত্রী রাজার প্রতি একটি গোপন কটাক্ষপাত করিয়া পরম আপ্যায়নের ভঙ্গীতে যুবরাজের দিকে ফিরিলেন—

মহামন্ত্রীঃ নিশ্চয় নিশ্চয়, সে কথা বলাই বাহুল্য।—কিন্তু শ্রীমন্, আপনি আজ রাত্রিটা রাজপ্রাসাদে বিশ্রাম করুন—রাত্রির মধ্য যাম অতীত হয়েছে—

মহামন্ত্রী পুস্তপালের পেটে গোপনে কনুয়ের এক গুঁতা মারিলেন।

পুস্তপালঃ হাঁ হাঁ—কুমার-ভট্টারক, আর কালক্ষয় করবেন না—সারা দিন অভুক্ত

আছেন—ক্লান্তিও কম হয়নি—আসুন কুমার—এই দিকে—এই যে বিশ্রান্তিগৃহ—

ক্লান্ত ক্ষুৎপিপাসাতুর যুবরাজের পক্ষে প্রলোভন প্রবল হইলেও তিনি সহজে নরম হইবার লোক নয়। তিনি বলিলেন—

সৌরাষ্ট্রকুমার: আমি বিচার চাই, ন্যায়দণ্ডও চাই, নইলে—

মহামন্ত্রী: অবশ্য অবশ্য—সে তো আছেই। উপস্থিত আপনার বস্ত্রাদি ত্যাগ করা প্রয়োজন—

পুস্তপাল: ওদিকে ময়ূর-মাংস, মাধ্বী, মাহিষ-দধি, দ্রাক্ষাসব—সমস্তই প্রস্তুত রয়েছে কুমার। আসুন, আর বিলম্ব করবেন না—

মহামন্ত্রী: আসুন কুমার—অশুভস্য কালহরণম্—

সৌরাষ্ট্রকুমার: কিন্তু প্রতিবিধান যদি না পাই—

তিনি আর লোভ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না, মহামন্ত্রী ও পুস্তপালের সাদর আহ্বানের অনুবর্তী হইয়া বিশ্রান্তিগৃহের অভিমুখে চলিলেন।

কুন্তলরাজ উদ্বিগ্নমুখে দাঁড়াইয়া গুম্ফের প্রান্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন।

কাট্।

ইত্যবসরে রাজকুমারী ও কালিদাস শয়নকক্ষে উপনীত হইয়াছেন। সখী কিঙ্করীরাও বিদায় লইয়াছে; আড়ি পাতিয়া বর-বধূকে বিরক্ত করিবার বিধি যদিচ সেকালেও ছিল, কিন্তু আজিকার দিনব্যাপী মাতামাতির পর সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তা ছাড়া বসন্তোৎসবের রাত্রে নিজস্ব সঙ্গমোৎকণ্ঠাও কম ছিল না।

নির্জন সুবৃহৎ শয়নকক্ষটি ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন। যূথী ও মল্লী মিলিয়া পালঙ্কের শুভ্র আস্তরণ রচনা করিয়াছে। পালঙ্কের চারি কোণে দীপদণ্ডের মাথায় সুরভি বর্তিকা জ্বলিতেছে।

প্রাচীর-গাত্রে হর-পার্বতী, রাম-জানকী প্রভৃতি আদর্শ দম্পতির মিথুন চিত্র। একটি স্থান পর্দায় আবৃত; পর্দার উপর রাজহংসের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে; হংসের চঞ্চুতে সনাল পদ্মকোরক।

রাজকুমারী কালিদাসকে লইয়া পর্দার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন; কালিদাসের দিকে মৃদু হাসিয়া পর্দা সরাইয়া দিলেন। দেখা গেল, প্রাচীরগাত্রে একটি কুলঙ্গী রহিয়াছে; কুলঙ্গীর থাকে থাকে অগণিত পুঁথি থরে থরে সাজানো।

কালিদাসের দৃষ্টি মুগ্ধ আনন্দে ভরিয়া উঠিল। পুঁথির প্রতি এই গ্রামীণ যুবকের একটি অহৈতুক আকর্ষণ ছিল; তিনি একবার রাজকুমারীর দিকে, একবার পুঁথিগুলির দিকে হর্ষোৎফুল্ল মুখে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তারপর সন্তর্পণে একখানি পুঁথি হস্তে তুলিয়া পরম স্নেহ ও শ্রদ্ধাভরে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পুঁথির মলাটের লিখন কালিদাস পড়িতে পারিলেন কিনা তিনিই জানেন; মলাটের উপর লেখা ছিল—

মৃচ্ছকটিকম্

কালিদাস: কত পুঁথি!—তুমি সব পড়েছ?

রাজকুমারী গ্রীবা ঈষৎ হেলাইয়া সায় দিলেন।

কালিদাসের মুখ একটু ম্লান হইল। তিনি হাতের পুঁথিটির দিকে বিষণ্ণভাবে চাহিয়া সেটি আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন; নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

কালিদাস: আমি একটিও পড়িনি। যদি পড়তে পারতুম, আজকের চাঁদ কিসের মত সুন্দর হয়তো বলতে পারতুম—

আবার রাজকুমারীর মুখ শুকাইল।

রাজকুমারী: কিন্তু—না না, পরিহাস করবেন না আর্যপুত্র! আপনি সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ—

কালিদাসের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কালিদাস: কিন্তু আমি তো রাজপুত্তুর নই!

রাজকুমারীর মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল।

রাজকুমারী: রাজপুত্র নয়! তবে—কে আপনি?

কালিদাস: আমি কালিদাস।—বনের মধ্যে কাঠ কাটছিলুম—এমন সময়—

রাজকুমারী বুদ্ধিভ্রষ্টের মত চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—

রাজকুমারী: কাঠ কাটছিলে! কাঠুরে! তুমি তবে সত্যিই বর্ণপরিচয়হীন মূর্খ!

সরলভাবে কালিদাস ঘাড় নাড়িলেন।

কালিদাস: হাঁ—আমি লেখাপড়া জানি না।—যখনই কোনও সুন্দর জিনিস দেখি, ইচ্ছে করে তার বাখান করি। কিন্তু পারি না—

রাজকুমারী আর শুনিলেন না; ঊর্ধ্বে মুখ তুলিয়া দুই চক্ষু সজোরে মুদিত করিয়া যেন একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন মনশ্চক্ষুর সম্মুখ হইতে দূর করিবার চেষ্টা করিলেন। তারপর টলিতে টলিতে পালঙ্কের পাশে গিয়া নতজানু হইয়া শয্যার প্রান্তরণের মধ্যে মুখ গুঁজিলেন। প্রবল হৃদয়োচ্ছ্বাসে তাঁহার দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গ উন্মথিত হইয়া উঠিল।

কালিদাস কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তারপর ঈষৎ সঙ্কোচে রাজকুমারীর পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজকুমারী জানিতে পারিলেন, কালিদাস পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি সহসা মুখ তুলিয়া তীব্রস্বরে প্রশ্ন করিলেন—

রাজকুমারী: তুমি রাজপুত্র সেজে এখানে কি করে এলে?

কুমারীর স্ফুরিতাধর মুখখানি দেখিয়া কালিদাস শঙ্কা ভুলিয়া গেলেন। ক্রোধেও মুখখানি কী সুন্দর—ঠিক যেন—ঠিক যেন—। তিনি ক্রোধ দেখিতে পাইলেন না, সৌন্দর্যই দেখিলেন। উপরন্তু ভারি মজার কাহিনীটা রাজকুমারীকে শুনাইতে হইবে। কালিদাসের মুখে হাসি ফুটিল। তিনি আস্তেব্যস্তে শয্যাপাশে বসিয়া সহাস্যে বলিলেন—

কালিদাস: সে ভারি মজার গল্প। শুনবে?—তবে বলি শোন—

কাট্।

রাজপ্রাসাদের বিশ্রান্তিগৃহে সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ এক খট্বার উপর পৃষ্ঠে বহু উপাধান দিয়া অর্ধশয়ান ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। সবেমাত্র বিপুল পানভোজন শেষ করিয়াছেন; খট্বার নিকটে একটি উচ্চ কাষ্ঠাসনের উপর এখনও উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি পড়িয়া আছে। যুবরাজের চক্ষু মুদিত হইয়া আসিতেছে, ঘুমাইয়া পড়িতে আর বেশী বিলম্ব নাই। একটি কিঙ্করী শিয়রে দাঁড়াইয়া তাঁহার মস্তকে বীজন করিতেছে।

পুস্তপাল মহাশয় স্ফটিকপাত্রে দ্রাক্ষাসব ভরিয়া যুবরাজের সম্মুখে ধরিলেন। যুবরাজ এক চুমুকে পাত্র নিঃশেষ করিয়া পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং জড়িতস্বরে কহিলেন—

সৌরাষ্ট্রকুমার: বিচার...জামাতাই হোক আর বিমাতাই হোক—শূলে দেওয়া চাই... নচেৎ—

তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার নাসিকা হঠাৎ ঘর্ঘর শব্দ করিয়া উঠিল।

পুস্তপাল কিঙ্করীকে ইঙ্গিতে হস্ত সঞ্চালন করিয়া জানাইলেন—আরও জোরে পাখা চালাও। তারপর কতক নিশ্চিন্ত হইয়া নিঃশব্দ বিড়ালগতিতে দ্বারের পানে চলিলেন।

দ্বারের ঠিক বাহিরেই কুন্তলরাজ ও মহামন্ত্রী উৎকণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন, পুস্তপালকে আসিতে দেখিয়া যুগপৎ ভ্রূ দ্বারা প্রশ্ন করিলেন। পুস্তপালও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা নিঃশব্দে বুঝাইয়া দিলেন যে যুবরাজ নিদ্রিত।

তিনজনে একত্র হইলে মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তা আরম্ভ হইল।

কুন্তলরাজ: আজ রাত্রির মত নিশ্চিন্ত। কিন্তু—তারপর?

মহামন্ত্রী: উভয় সংকট। এক, রাজ-জামাতাকে শূলে দিতে হয়—নচেৎ—

কুন্তলরাজ। সৌরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ—

তিনজনে পরস্পর চাহিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

মহামন্ত্রী: যদি যুদ্ধ হয়, সৌরাষ্ট্রের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় আমাদের কোনও আশা নেই—

কুন্তলরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

কুন্তলরাজঃ অর্থাৎ—রাজ্য ছারখার হবে—

তিনজনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন। সহসা ঘরের ভিতর হইতে সৌরাষ্ট্রকুমারের কণ্ঠস্বর আসিল; তিনি নিদ্রাবশে বিকৃত কণ্ঠে বলিতেছেন—

সৌরাষ্ট্রকুমারঃ প্রতিশোধ—শূল—

পুস্তপাল গলা বাড়াইয়া দেখিলেন, যুবরাজ ঘুমন্ত পাশ ফিরিতেছেন; পুস্তপাল কিঙ্করীকে জোরে পাখা চালাইবার ইসারা করিলেন। যুবরাজের গলার মধ্যে বাকি কথাগুলা অস্পষ্ট রহিয়া গেল—

সৌরাষ্ট্রকুমারঃ —চোরের দণ্ড—শূলে দণ্ড!

তিনজন পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিলেন। কুন্তলরাজ এতক্ষণ লৌহবলে নিজেকে সংযত রাখিয়াছিলেন, এইবার তিনি ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন। উদ্গত বাষ্পোচ্ছ্বাস কণ্ঠে রোধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

কুন্তলরাজঃ আমার কন্যা—

তাঁহার দুই চক্ষু সহসা জলে ভরিয়া উঠিল।

মহামন্ত্রী ও পুস্তপাল অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন। মহামন্ত্রীর মুখ দুরূহদুরূহ চিন্তায় ভ্রূকুটিকুটিল হইয়া উঠিল। একটা কিছু উপায় বাহির করিতেই হইবে—করিতেই হইবে—

তিনি সহসা রাজার দিকে ফিরিলেন; তাঁহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া রাজা ও পুস্তপাল সাগ্রহে আরও কাছাকাছি হইয়া দাঁড়াইলেন।

মহামন্ত্রীঃ রাজ-জামাতার প্রাণরক্ষার এক উপায় আছে—

তিনি সচকিতে বিশ্রান্তিগৃহের দিকে তাকাইলেন, তারপর গলা আরও খাটো করিয়া বলিলেন—

মহামন্ত্রীঃ আজ রাত্রেই তাঁকে চুপি চুপি রাজ্য থেকে—

বাক্য অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি এমন ভাবে হস্তটি সঞ্চালন করিলেন যাহাতে বুঝা যায় যে তিনি রাজ-জামাতাকে বহু দূরে প্রেরণ করিতে চাহেন; রাজা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিলেন; তারপর অস্ফুট স্বরে বলিলেন—

কুন্তলরাজঃ কিন্তু—বিবাহের রাত্রেই আমার কন্যা—

মহামন্ত্রীঃ অন্তত রাজকন্যা বিধবা তো হবেন না।

উভয়ে কিছুক্ষণ পূর্ণদৃষ্টিতে পরস্পর চাহিয়া রহিলেন; তারপর রাজা ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িলেন।

কাট্।

শয়ন-মন্দিরে কালিদাস গল্প বলা শেষ করিতেছেন। রাজকুমারী তেমনি শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া আছেন; ক্ষোভে হতাশায় তাঁহার চোখে যে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলিতেছে তাহা কালিদাস দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছেন না, তিনি হাসিতে হাসিতে কাহিনী শেষ করিলেন—

কালিদাসঃ তারপর এখানেও সকলে আমাকে সৌরাটের যুবরাজ বলে ভুল করলে—ভারি মজা হল—না?

রাজকুমারী বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন

রাজকুমারীঃ মজা—! হা অদৃষ্ট! আমার ললাটে বিধি এই লিখেছিলেন! একটা কাঠুরের সঙ্গে—তাতেও ক্ষতি ছিল না—কিন্তু তুমি মূর্খ—মূর্খ! পৃথিবীতে যা আমি সব চেয়ে ঘৃণা করি—তুমি তাই—

রাজকুমারী আবার শয্যায় মুখ লুকাইলেন। হাস্যরত বালকের গণ্ডে অকস্মাৎ চপেটাঘাত করিলে তাহার মুখভাব যেরূপ হয় কালিদাসেরও সেইরূপ হইল। কোথায় কি ভাবে তিনি কোন্ অপরাধ করিয়াছেন, কিছুই ধারণা করিতে পারিলেন না। রাজকুমারীর স্কন্ধ ও অংস ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে; কালিদাস ব্যথিত স্বরে বলিলেন—

কালিদাসঃ রাজকুমারী, তুমি আমার ওপর রাগ করলে? কিন্তু আমি তো কোনও দোষ করিনি! রাজকুমারী—

তিনি সঙ্কোচভরে কুমারীর স্কন্ধ স্পর্শ করিলেন। সেই স্পর্শে কুপিতা সর্পীর

মত রাজকুমারী তড়িদ্বেগে দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

রাজকুমারীঃ ছুঁয়ো না! কোন্ স্পর্ধায় তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ কর!—মূর্খ, নিরক্ষর, গ্রামীণ!

প্রত্যেকটি শব্দ নিষ্ঠুর কশাঘাতের মত কালিদাসের মুখে পড়িল; এই সময় দ্বারের কাছে শব্দ শুনিয়া রাজকুমারী জ্বলন্ত চক্ষু সেদিকে ফিরাইয়াই বলিয়া উঠিলেন—

রাজকুমারীঃ ওঃ পিতা!

বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে রাজা আসিতেছিলেন, কুমারী ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পায়ের কাছে পড়িলেন; জানু আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—

রাজকুমারীঃ রাজাধিরাজ, আমাকে রক্ষা করুন—এই নিরক্ষর গ্রামীণের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করুন—

রাজা বুঝিলেন কুমারীও সত্য কথা জানিতে পারিয়াছেন। তিনি কন্যার মস্তকের উপর হস্ত রাখিয়া কঠোর চক্ষে কালিদাসের পানে চাহিলেন।

কুন্তলরাজঃ হুঁ। এদিকে এস।

কালিদাস কুণ্ঠিত পদে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা ক্ষণকাল তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কঠিন স্বরে কহিলেন—

কুন্তলরাজঃ তুমি শঠতা করে কুমারীর পাণিগ্রহণ করেছ!

কালিদাসঃ শঠতা!

রাজার কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ মিশিল

কুন্তলরাজঃ প্রিয়দর্শন বালক, তোমার এ দুর্বুদ্ধি কেন হ'ল? তুমি চুরি করতে গেলে কেন?

পাণ্ডুর মুখে কালিদাস চাহিয়া রহিলেন; ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন—

কালিদাসঃ চুরি! কিন্তু আমি তো চুরি করিনি—

কুন্তলরাজঃ করেছ! শুধু তাই নয়, আমার রাজ্যের সর্বনাশ করতে বসেছ, কিন্তু সে তুমি বুঝবে না। এস আমার সঙ্গে!

কন্যার দিকে হেঁট হইয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন—

কুন্তলরাজঃ কন্যা, অধীর হয়ো না। তুমি রাজদুহিতা— বিদুষী। ধৈর্য হারিও না!

কন্যাকে ছাড়িয়া দিয়া রাজা কালিদাসকে সংক্ষিপ্ত আদেশ করিলেন—

কুন্তলরাজঃ এস।

রাজা ফিরিয়া চলিলেন; কালিদাস তন্দ্রাচ্ছন্নের মত অনুবর্তী হইলেন। দ্বার পর্যন্ত গিয়া কালিদাস একবার ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, রাজকুমারী তেমনি নতজানু হইয়া বসিয়া আছেন; তাঁহার ক্ষোভ-বিধ্বস্ত মুখখানি বুকের উপর নামিয়া পড়িয়াছে।

ডিজল্‌ভ্।

আকাশে চন্দ্র পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তোরণের দীপগুলি কতক নিবিয়া গিয়াছে, কতক নিব-নিব। নগরীর শব্দ-গুঞ্জন নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনটি অশ্ব তোরণ-সম্মুখে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া। দুই পার্শ্বের দুটি অশ্বের পৃষ্ঠে দুইজন রক্ষী; মধ্যে কালিদাস। কালিদাসের দুই হস্ত পৃথকভাবে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ; প্রত্যেক রক্ষী একটি করিয়া রজ্জুর প্রান্ত ধরিয়া আছে। প্রধান রক্ষী মস্তক সঞ্চালন দ্বারা ইঙ্গিত করিল। তখন তিনটি অশ্ব একসঙ্গে ছুটিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের সম্মিলিত ক্ষুরধ্বনি চন্দ্রালোকিত নিশীথের মৌন তন্দ্রা ক্ষণেকের জন্য সচকিত করিয়া তুলিল।

ওয়াইপ্।

নিবিড় বনের উপান্ত। অশোকস্তম্ভের ন্যায় একটি স্তম্ভ এই নির্জনে দাঁড়াইয়া কুন্তলরাজ্যের

সীমানা নির্দেশ করিতেছে। অস্তমান চন্দ্রের দূরপ্রসারী ছায়া ভূমির উপর কৃষ্ণ সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে।

তিনটি অশ্ব স্তম্ভের পাশে ছায়ারেখার কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। রক্ষী দুইজন কালিদাসের হাতের বন্ধন খুলিয়া দিল; প্রধান রক্ষী নিঃশব্দে কালিদাসকে অশ্ব হইতে নামিবার ইঙ্গিত করিল। কালিদাস নামিলেন। প্রধান রক্ষী সম্মুখের অরণ্যানীর দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিল—

রক্ষীঃ যাও, আর কখনও এ রাজ্যে পদার্পণ ক'রো না। মনে রেখো কুন্তলরাজ্যে প্রবেশ করলেই তোমার শূলদণ্ড—

কালিদাস বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া স্খলিত পদে বনের দিকে চলিলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, রক্ষীরা স্থিরভাবে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া রহিল। তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরাইয়া, শূন্যপৃষ্ঠ অশ্বটিকে মধ্যে লইয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে মন্থরগতিতে ফিরিয়া চলিল।

ফেড্ আউট্।
ফেড্ ইন্।

প্রভাত। বনের পাতায় পাতায় সোনালী সূর্যকিরণ লাগিয়াছে, মাকড়শা'র জালে শিশিরবিন্দু এখনও শুকাইয়া যায় নাই। পাখির কলধ্বনি ও বানরের কিচিমিচিতে বনস্থলী পূর্ণ।

একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ; তাহার স্থূল মূলগুলি স্থানে স্থানে মাটির গোপনতা ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ একটি মূলের উপর মাথা রাখিয়া কালিদাস উপুড় হইয়া ঘুমাইতেছেন। তাঁহার শয়নের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, রাত্রে অন্ধকারে যেখানে হোঁচট খাইয়া পড়িয়াছেন, সেইখানেই নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন।

একটি বানর-শিশু এই সময় এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে কালিদাসের কোল ঘেঁষিয়া বসিল এবং একটি বৃক্ষচ্যুত ফল তুলিয়া লইয়া সেটিকে পরম যত্নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ঘুমন্ত কালিদাসের অঙ্গে উষ্ণ স্পর্শ লাগিতেই তিনি একটি হাত দিয়া বানর-শিশুটিকে জড়াইয়া লইলেন। বানর-শিশু এই আলিঙ্গনের জন্য প্রস্তুত ছিল না; হঠাৎ ভয় পাইয়া কালিদাসের হাতে এক কামড় দিয়া দ্রুত পলায়ন করিল। কালিদাসের ঘুম ভাঙিগয়া গেল।

এক হাতে ভর দিয়া কালিদাস ক্লান্তভাবে উঠিয়া বসিলেন। বেশবাস ছিন্ন, অঙ্গ ধূলিমলিন; চোখের কোণে ও গণ্ডে অশ্রুর চিহ্ন শুকাইয়া আছে। দেহ অবসাদে ভাঙিগয়া পড়িয়াছে। তবু তিনি চক্ষু মার্জনা করিতে করিতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, তারপর দীর্ঘ একটি নিশ্বাস মোচন করিয়া শ্লথচরণে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

ডিজল্‌ভ্।

মরুভূমির অগ্নিবর্ষী দ্বিপ্রহর। বালুকণা উড়িয়া আকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। এই তপ্ত বালুঝটিকার ভিতর দিয়া উন্মত্ত দিগ্‌ভ্রান্তের মত কালিদাস চলিয়াছেন। তাঁহার মুখে চোখে কোন্ এক দুর্লভ দুরাকাঙ্ক্ষা জ্বলিতেছে; বহিঃপ্রকৃতির প্রচণ্ডতায় প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই।

বালু-কুজ্‌ঝটিকার ভিতর দিয়া একটি ভগ্ন দেবায়তনের বহিঃপ্রাচীর দেখা গেল। কালিদাস সেইদিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন; প্রাচীরের নিকটবর্তী হইয়া তিনি একটি প্রস্তরখণ্ডে পা লাগিয়া পড়িয়া গেলেন।

প্রাচীর ধরিয়া কোনও ক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনি ক্ষণকাল ক্লান্তিভরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। তারপর চোখ খুলিয়া দেখিলেন তিনি যেস্থানে বাহুর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন উহা একটি মূর্তির উরুস্থল। কালিদাস ঊর্ধ্বে চাহিলেন; প্রাচীরে খোদিত বিশাল শঙ্কর-মূর্তি যেন এই বহ্নি-শ্মশানে তপস্যা-রত। কালিদাস নতজানু হইয়া মূর্তির পদমূলে মাথা রাখিলেন; তারপর গলদশ্রু চক্ষু দেবতার মুখের পানে তুলিয়া ব্যাকুল প্রার্থনা করিলেন—

কালিদাসঃ দেবতা, বিদ্যা দাও!

ডিজল্‌ভ্।

দিগন্তহীন প্রান্তরে সূর্যাস্ত হইতেছে। কালিদাস একাকী সেইদিকে মুখ
করিয়া দাঁড়াইয়া যুক্তকরে বলিতেছেন—

কালিদাসঃ সূর্যদেব, তুমি জগতের অন্ধকার দূর কর, আমার মনের অন্ধকার দূর করে দাও। বিদ্যা দাও!

ডিজল্‌ভ্।

মহাকালের মন্দির। কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত মন্দির আকাশে চূড়া তুলিয়াছে; চূড়ার
স্বর্ণ-ত্রিশূলে দিনান্তের অস্তরাগ অঙ্গে মাখিয়া জ্বলিতেছে। সন্ধ্যারতির
শঙ্খ-ঘণ্টা ঘোর রবে বাজিতেছে। মন্দির অঙ্গনে লোকারণ্য। স্ত্রী-পুরুষ
সকলেই জোড়হস্তে তদ্‌গতমুখে দাঁড়াইয়া আছে। আরতি শেষ
হইলে সকলে অঙ্গনের উপর সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণত হইল।
প্রাঙ্গণের এক কোণে এক বৃদ্ধ প্রণাম শেষ করিয়া উঠিয়া
দাঁড়াইল, যুক্তকরে মন্দিরের পানে চাহিয়া প্রার্থনা
করিল—

বৃদ্ধঃ মহাকাল, আয়ু দাও!

অনতিদূরে একটি নারী নতজানু অবস্থায় মন্দির উদ্দেশ করিয়া কহিল—

নারীঃ মহাকাল, পুত্র দাও—

বর্ম-শিরস্ত্রাণধারী এক সৈনিক উঠিয়া দাঁড়াইল।

সৈনিকঃ মহাকাল, বিজয় দাও—

বিনতভ্রূভর্নবিজয়ীনয়না একটি নবযুবতী লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল—

যুবতীঃ মহাকাল, মনোমত পতি দাও—

দীনবেশী শীর্ণমুখ কালিদাস দাঁড়াইয়া উঠিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—

কালিদাসঃ মহাকাল, বিদ্যা দাও!

ডিজল্‌ভ্।

পাতা-ঝরা একটি কানন। নিষ্পত্র বৃক্ষশাখাগুলি আকাশে জাল রচনা করিয়াছে। নির্বিঘ্ন আলোক বনতলের কুণ্ঠিত লজ্জা হরণ করিয়া লইয়া ভূ-লুণ্ঠিত শুষ্ক পল্লবের মধ্যে সকৌতুক ক্রীড়া করিতেছে।

একটি আট-নয় বছরের গৌরাঙ্গী বালিকা এই বনভূমির উপর দিয়া নাচিতে নাচিতে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। তাহার পরিধানে শুভ্র বস্ত্র ও উত্তরীয়, কণ্ঠে কুন্তলে বাহুতে শ্বেত পুষ্পের আভরণ। বালিকা থাকিয়া থাকিয়া বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী করিয়া পিছনে তাকাইতেছে, আবার নাচিতে নাচিতে আগে চলিয়াছে।

বালিকাঃ নীল সরসী জলে সিত কমলদলে
আমি নাচিয়া ফিরি আমি গাহিয়া ফিরি।

লাস্যচপলচরণে বালিকা দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল; তাহার গানের
ধ্বনিও ক্ষীণ হইয়া আসিল।

কাট্।

বনের অন্য অংশ। কালিদাস মোহগ্রস্তের মত বালিকার সঙ্গীতধ্বনি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার মুখ বিশীর্ণ, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট; এক দুরন্ত উৎকণ্ঠা তাঁহাকে ঐ অশরীরী সঙ্গীতের পিছনে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

কাট্।

বালিকা গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

বালিকাঃ হিম তুষার গলা আমি নির্ঝরিণী
মোর নূপুর বাজে রুম্ রিন্কি ঝিনি
আমি নাচিয়া ফিরি আমি গাহিয়া ফিরি।

উপলবন্ধিমগতি একটি শীর্ণ জলধারা লঙ্ঘন করিয়া বালিকা নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল।

তাহার গানের রেশ মিলাইয়া যাইবার পূর্বেই কালিদাসকে আসিতে দেখা গেল। ব্যগ্রচক্ষে চাহিতে চাহিতে তিনি আসিতেছেন। কোথায় গেল সে সংগীতময়ী? জলধারার তীরে দাঁড়াইয়া তিনি ক্ষণেক উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, তারপর স্রোত উত্তীর্ণ হইয়া চলিতে লাগিলেন।

কাট্।

বালিকা গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া যাইতেছে। দূরে পশ্চাৎপটে একটি কমলপূর্ণ সরোবর; বালিকা সেইদিকে চলিয়াছে—

বালিকাঃ যেথা মরাল চাহে—ফিরি ফিরি
যেথা কপোত গাহে—ধীরি ধীরি—
তীর বনে—নিরজনে
আমি নাচিয়া ফিরি আমি গাহিয়া ফিরি।

বালিকা দূরে চলিয়া গিয়াছে; কালিদাস তাহাকে দেখিতে পাইয়া উন্মাদের মত তাহার পশ্চাতে চলিয়াছেন। সরোবরের ঘাটে দাঁড়াইয়া বালিকা একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল; তারপর মৃদু হাসিয়া সোপান অবতরণ করিতে লাগিল।

কালিদাস যখন ঘাটে পৌঁছিলেন তখন বালিকা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। ঘাটের সম্মুখে একদল কমল বায়ুভরে হেলিতেছে দুলিতেছে, যেন বালিকা এইমাত্র জলে ডুব দিয়া ঐখানে অদৃশ্য হইয়াছে। ঘাটের নিম্নতন সোপানে দাঁড়াইয়া কালিদাস পাগলের মত জলের পানে চাহিলেন—

কালিদাসঃ কোথায় গেলে? দেবি, তুমি কোথায় গেলে?—

বাষ্পোচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল; চঞ্চল পদ্মগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া তিনি ভগ্নস্বরে বলিলেন—

কালিদাসঃ দেবি, শুনেছি তুমি পদ্মবনে থাকো—আমাকে দয়া কর, বিদ্যা দাও—নইলে—নইলে—

কালিদাস মূর্চ্ছিত হইয়া ঘাটের উপর পড়িয়া গেলেন।

ডিজল্ভ্।

মূর্চ্ছিত কালিদাস অনুভব করিলেন, সরোবরের স্বচ্ছ জলতলে তিনি শুইয়া আছেন; দিক্-আলো-করা এক পূর্ণযৌবনবতী দেবীমূর্তি শুচিস্মিত হাস্যে তাঁহার শিয়রে আসিয়া বসিলেন, তাঁহার মস্তকে হস্ত রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন—

দেবীঃ কালিদাস।

কালিদাসের ভাবাতুর নেত্র নিমীলিত; তিনি যুক্তকরে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন—

কালিদাসঃ মা!

দেবীঃ তুমি আমার বরপুত্র, তোমার কাব্য জগতে অমর হয়ে থাকবে। বারাণসী যাও. সেখানে আচার্য পাবে। ওঠ বৎস।

কালিদাস হর্ষোৎফুল্ল মুখে উঠিবার চেষ্টা করিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া কেবল উচ্চারিত হইল—

কালিদাসঃ মা মা মা—

দেবী অবনত হইয়া কালিদাসের শিরশ্চুম্বন করিলেন। তারপর অপূর্ব সুন্দর জ্যোতিরুৎসবের মধ্যে দেবী-মূর্তি অদৃশ্য হইয়া গেল।

ফেড্ আউট্।

মধ্য বিরাম

ফেড্ ইন্।

ন্যূনাধিক পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে।

কুন্তল রাজপুরীতে রাজকুমারীর মহল। একটি কক্ষে রাজকুমারী ভূমির উপর অজিনাসনে বসিয়া আছেন; তাঁহার সম্মুখে নিম্ন কাষ্ঠাসনের উপর একটি উন্মুক্ত পুঁথি। রাজকুমারী তন্ময় হইয়া পাঠ করিতেছেন।

পাঁচ বৎসরে রাজকুমারীর দেহলাবণ্যের অতি অল্পই পরিবর্তন হইয়াছে। তাঁহার দেহে সূক্ষ্ম শুভ্র কার্পাসবস্ত্র, কেশ একটিমাত্র বেণীতে আবদ্ধ, ললাটে আয়তির চিহ্ন কেবল একটি কস্তুরীর টিপ—অলঙ্কার নাই বলিলেও চলে। চুলের ঈষৎ রুক্ষতায়, চোখের কোলে ছায়ার নিবিড়তায়, দেহের অল্প কৃশতায় তাঁহার রূপ যেন বাহুল্যবর্জন করিয়া নিষ্কলুষ হইয়া উঠিয়াছে—বর্ষার অন্তে স্বচ্ছসলিলা শরতের স্রোতস্বিনীর মত।

পুঁথি পড়িতে পড়িতে তাঁহার মনে প্রবল ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল; তিনি কম্পিতকণ্ঠে কাব্যের শেষ পংক্তি আবৃত্তি করিলেন—

রাজকুমারী: 'মাভূদ্ এবং ক্ষণমপি চতে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ॥'

গবাক্ষপথে বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টি বাহিরে প্রেরণ করিয়া রাজকুমারী ধীরে ধীরে পুঁথি বন্ধ করিলেন। দেখা গেল পুঁথির মলাটের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

মেঘদূতম্—কালিদাস বিরচিতম্

পুঁথির উপর হাত রাখিয়া রাজকুমারী উন্মনা হইয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার চক্ষু পুঁথির উপর ফিরিয়া আসিল। কালিদাসের নামের উপর ললাট নত করিয়া তিনি শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিলেন।

রাজকুমারী: ধন্য কবি—

নামের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার মুখের ভাব আবার উন্মনা হইল; তিনি অর্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন—

রাজকুমারী: কালিদাস! কে তিনি?

তাঁহার অধর কাঁপিয়া উঠিল, তিনি বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িলেন।

রাজকুমারী: না না...সে তো মূর্খ ছিল—

তিনি অঞ্চলে চোখ মুছিলেন। পরে দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইতেই চোখে পড়িল, দ্বারের চৌকাঠে হাত রাখিয়া বিষন্ন-গম্ভীর মুখে রাজা দাঁড়াইয়া আছেন। তাড়াতাড়ি মুখে হাসি আনিবার চেষ্টা করিয়া রাজকন্যা বলিয়া উঠিলেন—

রাজকুমারী: পিতা!

কুন্তলরাজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কুমারী আসন ছাড়িয়া উঠিবার উদ্যোগ করিয়া বলিলেন—

রাজকুমারী: আসুন আর্য!

রাজা হাত তুলিয়া কন্যাকে নিবৃত্ত করিলেন।

কুন্তলরাজ: বোসো বোসো বৎসে—

রাজা আসিয়া কন্যার নিকটে দ্বিতীয় অজিনে আসন গ্রহণ করিলেন। সহজভাবে বলিলেন—

কুন্তলরাজ: কী পড়ছিলে?

রাজকুমারী ঈষৎ লজ্জিতভাবে পুঁথিটি নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলেন—

রাজকুমারী: কিছু নয় পিতা।—একটি নতুন কাব্য—মেঘদূত।

রাজা প্রীতভাবে ঘাড় নাড়িলেন। সেকালে পিতাপুত্রীতে কাব্য আলোচনা, এমন কি আদিরসঘটিত কাব্যের আলোচনা, কেহ দূষণীয় মনে করিতেন না; আদিরসের প্রতি তাঁহাদের সম্ভ্রম ছিল।

কুন্তলরাজঃ মেঘদূত—বিরহী যক্ষ আর বিরহিনী যক্ষপত্নী! আমি পড়েছি। সুন্দর কাব্য!

রাজকুমারী পিতার দিকে উদ্দীপ্ত চক্ষু ফিরাইলেন; যে কাব্য পাঠ করিয়া তাঁহার মন আষাঢ়ের মেঘের মতই দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে, তাহার এইটুকু প্রশংসা তাঁহার মনঃপূত হইল না—

রাজকুমারীঃ সুন্দর কী বলছেন পিতা—অপূর্ব। ভাষায় এর প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আমি বারবার পড়েছি, তবু আবার পড়তে ইচ্ছা করে—

কুন্তলরাজ কন্যার উৎসাহ দেখিয়া স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িলেন।

কুন্তলরাজঃ সত্যই অপূর্ব! কাব্যজগতে এক নূতন সৃষ্টি!—(কন্যার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া) তুমি যে কাব্যশাস্ত্রের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছো, এতে আমার মনে একটু শান্তি হচ্ছে—

রাজকুমারীর চোখের দীপ্তি নিবিয়া গেল; তিনি মুখ নত করিলেন। রাজা একটি নিশ্বাস মোচন করিয়া কতকটা নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন—

কুন্তলরাজঃ পাঁচ বছর হয়ে গেল...সেই রাত্রে চুপি চুপি তাকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছিলুম, তারপর কিছুই জানি না। গোপনে গোপনে কত খোঁজ করিয়েছি—

রাজকুমারী মুখ তুলিলেন, কিন্তু পিতার প্রতি না চাহিয়াই ধীরকণ্ঠে বলিলেন—

রাজকুমারীঃ প্রয়োজন কি পিতা! আমি তো বেশ আছি—ভালই আছি—

রাজা বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িলেন

কুন্তলরাজঃ না বৎসে! ভালই যদি থাকবে তো মাঝে মাঝে তোমার চোখে জল দেখি কেন? এই তো এখনই—

রাজকুমারীঃ ও কিছু নয় পিতা, কাব্য পড়তে পড়তে—

তিনি আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল।

কুন্তলরাজঃ মা, আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা ক'রো না। তুমি এখনও তাকে ভুলতে পারনি। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন) আমিও পারিনি।—কি জানি কী ছিল তার সেই সরল সুকুমার মুখে! যদি তাকে পাই, ফিরিয়ে নিয়ে আসি—

রাজকুমারী সহসা পুঁথির উপর মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া উঠিলেন, রুদ্ধস্বরে বলিলেন—

রাজকুমারীঃ না না পিতা—সে মূর্খ—নিরক্ষর!—

রাজা বুঝিলেন কন্যার মনে প্রেম ও অভিমানে কী দ্বন্দ্ব চলিতেছে; তিনি শান্তস্বরে বলিলেন—

কুন্তলরাজঃ সে তোমার স্বামী।

কাট্।

সিপ্রা নদীর বুকের উপর দিয়া একটি মধ্যমাকৃতি মহাজনী নৌকা পালের ভরে তর-তর করিয়া চলিয়াছে। পাশে সিপ্রার তীরে মালব রাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনী মহানগরী তাহার অসংখ্য ঘাট মন্দির সৌধ লইয়া দ্বিপ্রহরের প্রদীপ্ত আলোকে জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। নগরীর সীমান্তে শষ্প-হরিত প্রান্তর; মাঝে মাঝে দুই-একটি কুটির; জলের কিনারায় সৈকতলীন হংস-মিথুন—

নৌকার ছাদের উপর পালের ছায়ায় একটি পুরুষ বসিয়া যন্ত্র সহযোগে গান করিতেছেন। পরিধানে অতি সাধারণ শুভ্র বস্ত্র ও উত্তরীয়; ললাটে শ্বেত চন্দনের তিলক। পাঁচ বৎসরে তাঁহার বহিরাকৃতির কোনও পরিবর্তনই হয় নাই, তেমনি সরল হাসিটি মুখে লাগিয়া আছে; কিন্তু তবু মনে হয় এ-ব্যক্তি সে-ব্যক্তি নয়—অন্তর্লোকে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে।

কালিদাস যে-যন্ত্রটি বাজাইয়া গান করিতেছেন উহা সম্ভবত নাবিকদের কাহারও স্বরচিত সম্পত্তি—একটি বক্রকৃতি তুম্বের শূন্যগর্ভ খোলসের উপর তিনটি তার চড়ানো। কালিদাস তাহারই সাহায্যে অলসকণ্ঠে গাহিতেছেন; নৌকার মাঝি হাল ধরিয়া পিছনে বসিয়া আছে এবং মাথাটি গানের তালে তালে আন্দোলিত করিতেছে। নৌকার অন্যান্য নাবিকেরা বোধ করি নিম্নে

আহারাদি সম্পন্ন করিতেছে।

কালিদাসঃ আমার মন-তরণী ভাসল দরিয়ায়
মরি হায়, মরি হায় রে।
দখিন বায়ে রূপলহরে, চলছে তরী পালের ভরে
কিনার ডাকে কলস্বরে, আয় রে তরি আয়।
মরি হায়, মরি হায় রে!
কোন্ ঘাটেতে পথিক-বধূ, আছে রে পথ চেয়ে
সেই কিনারে বৈঠা তুলে, ভিড়াস তরী, নেয়ে—
যেথা কমল চোখে সজল হাসি, আঝোর ঝরি যায়।
মরি হায়, মরি হায় রে।

গান শেষ হইলে কালিদাস যন্ত্রটি নামাইয়া রাখিয়া ফিরিয়া বসিলেন; অমনি উজ্জয়িনীর রবিকরোজ্জ্বল দৃশ্যটি তাঁহার বিস্ময়োৎফুল্ল দৃষ্টি টানিয়া লইল—তিনি মুগ্ধচক্ষে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তারপর কতক আত্মগত ভাবে বলিলেন—

কালিদাসঃ বাঃ—কী চমৎকার নগরী! যেন আমার কল্পলোকের অলকাপুরী—

কবি মাঝির দিকে মুখ ফিরাইলেন

কালিদাসঃ ভাই মাঝি, এটা কোন্ রাজ্য?

মাঝি একবার তীরের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল।

মাঝিঃ ঠাকুর, এটা অবন্তী রাজ্য। আমরা এখন উজ্জয়িনীর সামনে দিয়ে যাচ্ছি—

কালিদাসঃ (তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে চাহিয়া) অবন্তী! উজ্জয়িনী! এতদিন শুধু কল্পনাই করেছি!—এর পর?

মাঝিঃ এর পরই কুন্তলরাজ্য।

কালিদাসের মুগ্ধ তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল; তিনি সজাগ হইয়া উঠিলেন।

কালিদাসঃ কুন্তলরাজ্য?

মাঝিঃ হ্যাঁ। কিন্তু কুন্তলরাজ্য অবন্তীর কাছে লাগে না।—এখানকার রাজা বিক্রমাদিত্য একজন মহাবীর; হিঙ্গুভোজী হূণদের উনিই যুদ্ধে হারিয়েছিলেন—ভারী তেজী রাজা। শুনেছি নাকি পণ্ডিতদেরও খুব আদর করেন—

মাঝি যতক্ষণ বিক্রমাদিত্যের পরিচয় দিতেছিল কালিদাস ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার মুখে দৃঢ় সংকল্প স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল; মাঝি থামিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন—

কালিদাসঃ ভাই মাঝি, আমাকে তুমি এখানেই নামিয়ে দাও।

মাঝি ঈষৎ বিস্ময়ে মুখ তুলিল।

মাঝিঃ এইখানেই?—

কালিদাসের দৃষ্টি সিপ্রার তীরভূমি চুম্বন করিয়া চলিয়াছিল; তিনি মাঝির দিকে না ফিরিয়াই বেদনা-বিদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—

কালিদাসঃ হ্যাঁ—এইখানেই! আমার কাছে সব রাজ্যই তো সমান। এই উজ্জয়িনীর উপকণ্ঠে নদীর তীরে কুটির বেঁধে আমি থাকব।

মাঝি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—

মাঝি। তা বেশ, আপনার যা ইচ্ছে ঠাকুর।—ওরে ওরে পাল নামা—

মাঝি হালের মুখ ফিরাইয়া ধরিল।

ফেড্ আউট্।
ফেড্ ইন্।

উজ্জয়িনীর সীমান্তে সিপ্রার উপকূল। তীরভূমি ঢালু হইয়া জলে মিশিয়াছে। তীরে দূরে দূরে দু-একটি উপবন বেষ্টিত কুটির। যাহারা ফুলের চাষ করে তাহাদের নগরের বাহিরেই সুবিধা, তাই মালাকরেরা এই দিকেই পুষ্পোদ্যান রচনা করিয়াছে।

জলের কিনারা দিয়া যে হাঁটা-পথ গিয়াছে, সেই পথে মালিনী নগরের দিকে চলিয়াছিল। তাহার বিশেষ তাড়া ছিল না, সূর্যাস্তের এখনও বিলম্ব আছে। বাঁ হাতের মণিবন্ধ হইতে ফুলের সাজি ঝুলিতেছে, ডান হাতে সূচী ও সূত্রের সাহায্যে মালা গড়িয়া উঠিতেছে; মালিনী গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল।

মালিনীর বয়স ষোলো-সতেরো বছর—শ্যামকান্তি পল্লবিতা লতার মতন; মনে ও দেহে দুই-একটি কুঁড়ি ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। (মালব দেশের মালিনীদের যৌবন যেমন বিলম্বে আসে, তেমনি বিলম্বে যায়)। মালিনী দেখিতে ছোট-খাট, চঞ্চলা, হাস্যময়ী; চুলগুলি চিকণ করিয়া বাঁধা। পরিধানে বাসন্তী রঙ শাড়ি, কাছা দিয়া খাটো করিয়া পরা; ঊর্ধ্বাঙ্গে বাসন্তী-রঙ আঙরাখা আঁট হইয়া গায়ে বসিয়া আছে।

মালিনী চলিতে চলিতে মালা গাঁথিতেছে, তাহার চক্ষু তাহাতেই নিবদ্ধ। যে গানটি ঈষদুন্মুক্ত অধর হইতে নিঃসৃত হইতেছে তাহাও বেশী দূরে যাইতেছে না, ফুলের চারিপাশে ভ্রমরের মত মালিনীকে ঘিরিয়া গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে।

মালিনীঃ মালা গাঁথব না আর চাঁপায়।

ওরে দেখলে আমার নয়ন ভরে' অশ্রু কেন ছাপায়।

মালা গাঁথব না আর চাঁপায়॥

ও যে বুকে লাগায় দোলা, প্রাণ করে উতলা

মোর মরমবীণার তারগুলিরে কাঁপায়।

মালা গাঁথব না আর চাঁপায়॥

মালিনীর চরণ ভঙ্গীতে একটু নৃত্যের সংস্পর্শ ছিল; গানের শেষে সে এক পাক ঘুরিয়া চোখ তুলিয়াই সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া পড়িল। এ কি, হঠাৎ একটা নূতন কুটির কোথা হইতে আসিল? সাতদিন আগেও তো কিছু ছিল না!

নদীতীর হইতে পঞ্চাশ হাত ব্যবধানে উঁচু জমির উপর সত্যই একটি নূতন কুটির নির্মিত হইয়াছে। ঘনসন্নিবিষ্ট পাহাড়ী বেত্রের উপর মাটির প্রলেপ দিয়া দেয়াল; উপরে কুশের ছাউনি। সম্মুখের খানিকটা স্থানে ছিটা-বেড়ার বেষ্টনী; তাহার মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র বেদিকা।

কুটির সম্পূর্ণ হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার প্রসাধন ও অঙ্গশোভা এখনও বাকি আছে। স্বয়ং গৃহস্বামী অধুনা এই কার্যে ব্যাপৃত। এক হাতে পিটুলিপূর্ণ ভাঁড় ও অন্য হাতে দাঁতনের মত একটি তুলি লইয়া তিনি অভিনিবেশ সহকারে গৃহদ্বারের উপর শঙ্খচক্র প্রভৃতি চিত্রলেখায় প্রবৃত্ত।

দূর হইতে দেখিয়া মালিনী কৌতূহলবশে সেই দিকে অগ্রসর হইল। পা টিপিয়া কালিদাসের পিছনে গিয়া উপস্থিত হইল; কালিদাস চিত্র রচনায় এতই নিমগ্ন যে কিছুই জানিতে পারিলেন না—

চিত্র-বিদ্যায় কবির পটুত্ব কিছু কম। দ্বারের একটি কবাটে তিনি যে শঙ্খটি আঁকিয়াছেন তাহা যে শঙ্খই এমন কথা জোর করিয়া বলা শক্ত, কুণ্ডলায়িত বিষধর সর্পও হইতে পারে। এই জন্য কবি তাহার নিম্নে স্পষ্টাক্ষরে চিত্রপরিচয় লিখিয়া দিয়াছেন—"শঙ্খ"। উপস্থিত যে চক্রটি আঁকিতেছেন তাহাও আশানুরূপ আকার গ্রহণ করিতেছে না। সুদর্শন চক্র গোলাকার হওয়াই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু কবির হস্তে উহা ডিম্বের আকৃতি ধারণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তা ছাড়া তুলিটাও ভদ্র ব্যবহার করিতেছে না; অতর্কিতে কবির মুখে চোখে রঙ্ ছিটাইয়া দিতেছে।

কালিদাস শেষে উত্যক্ত হইয়া তুলির দ্বারা চক্রের মাঝখানে একটা খোঁচা দিলেন। তুলির রঙ্ অমনি ধারার মত গড়াইয়া পড়িল। মালিনী এতক্ষণ কালিদাসের পিছনে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে দেখিতেছিল, এখন খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

চমকিয়া কালিদাস ফিরিলেন। হাতের তুলিটা কেমন একভাবে ছিটকাইয়া উঠিয়া মালিনীর মুখে চোখে রঙ্ ছিটাইয়া দিল।

মালিনী মুখখানি একবার কুঞ্চিত করিয়া আবার হাসিয়া উঠিল—

মালিনীঃ কেমন মানুষ গা তুমি? আমার মুখেও চিত্তির আঁকবে নাকি?

কালিদাস অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন।

কালিদাসঃ দেখতে পাইনি—ভারি অন্যায় হয়েছে। তা—এ চুন নয়, পিটুলি গোলা—তোমার মুখের কোনও ক্ষতি হবে না—বরং—বেশ দেখাচ্ছে—

মলিনীর মুখে শ্বেত বিন্দুগুলি তিলকের মত ফুটিয়া উঠিয়া সত্যই সুন্দর দেখাইতেছিল; সে স্মিতমুখে এই কান্তিমান তরুণ ব্রাহ্মণকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল; লোকটি দেখিতেও

ভাল, কথাও বলে বেশ মিষ্ট।

মালিনীঃ তুমি নতুন এসেছ—না? সাত দিন আগেও এ পথে গেছি, তোমার কু'ড়েঘর তো ছিল না!

কালিদাসঃ নাঃ, এই তো ক'দিন হ'ল এসেছি। (সগর্বে গৃহের পানে তাকাইয়া) নিজের হাতে ঘর তৈরি করেছি। কেমন, চমৎকার হয়নি?

মালিনীঃ বেশ হয়েছে।—ওটা কি হচ্ছিল?

মালিনীর তর্জনীনির্দেশ অনুসরণে দ্বারের শঙ্খচক্রের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া কালিদাস লজ্জিত হইলেন। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন—

কালিদাসঃ মঙ্গলচিহ্ন আঁকছিলুম। তা ঐ হয়েছে।

বলিয়া নিজেই হাসিয়া ফেলিলেন। মালিনীও হাসিল। ফুলের মালা সাজির মধ্যে রাখিয়া সর্বসুদ্ধ কালিদাসের হাতে ধরাইয়া দিয়া বলিল—

মালিনীঃ তুমি সাজি ধর, আমি এ'কে দিচ্ছি। আল্‌পনা দেওয়া কি পুরুষের কাজ!

ভাঁড় হাতে লইয়া মালিনী দ্বারের নিকটে গেল; কালিদাস পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

কালিদাসঃ তুমি এ'কে দেবে!—বাঃ, তাহলে তো কথাই নেই।—আমরা পুরুষেরা শুধু মোটা কাজ করতে পারি, সূক্ষ্ম কাজ মেয়েরা না হ'লে হয় না—

মালিনী হাস্যমুখে স্বজাতির এই প্রশংসা আত্মসাৎ করিয়া আল্‌পনা অঙ্কনে মন দিল; পূর্বের অঙ্কন মুছিয়া দক্ষহস্তে নূতন করিয়া শঙ্খ আঁকিতে লাগিল। কালিদাস সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

কালিদাসঃ ভাল কথা, তুমি কে তা তো বললে না?

মালিনী ভ্রূভঙ্গী করিয়া একবার ঘাড় ফিরাইল; তারপর আবার আল্‌পনায় মন দিয়া বলিল—

মালিনীঃ ফুলের সাজি দেখে বুঝ্‌লে না?—মালিনী।

কালিদাসঃ ও, তা বটে। কিন্তু তোমার একটা নাম আছে তো?

মালিনী মুখ না ফিরাইয়াই মাথা নাড়িল।

মালিনীঃ না, সবাই আমাকে মালিনী ব'লে ডাকে।—আমার কেউ নেই কিনা।—গুরুবারে গুরুবারে আমি রাজবাড়িতে যাই, রাণী ভানুমতীকে ফুল যোগাতে। রাণী ভানুমতী আমাকে খু—ব ভালবাসেন।—সবাই আমাকে ভালবাসে।—আমার কেউ নেই কিনা—

কালিদাস ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে শুনিতেছিলেন; হঠাৎ মালিনী মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল—

মালিনীঃ তুমি কে?

কালিদাস একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন—

কালিদাসঃ আমার নাম কালিদাস।

মালিনী পরিতুষ্ট ভাবে ঘাড় নাড়িল।

মালিনীঃ বেশ নাম। তুমি কি কাজ কর?

কালিদাস একটু চিন্তা করিলেন।

কালিদাসঃ কাজ?...আমিও মালা গাঁথি—

উজ্জ্বল চক্ষে মালিনী ফিরিয়া দাঁড়াইল।

মালিনীঃ ও মা সত্যি! কিন্তু—কিন্তু তোমার গলায় পৈতে রয়েছে; তুমি তো মালাকর নও!

কালিদাস মৃদু হাসিলেন

কালিদাসঃ আমি—কথার মালাকর।—কবি।

চিবুকে একটি অঙ্গুলি ঠেকাইয়া মালিনী কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল; তারপর রুদ্ধশ্বাসে বলিল—

মালিনীঃ কবি! তুমি গান বাঁধতে পার?

কালিদাস হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন। মালিনীর চক্ষু বিস্ময়ে
আরও বর্তুলাকার হইল।

মালিনীঃ তবে, তবে তুমি এখানে কুঁড়েঘর বেঁধেছ যে! রাজসভায় যাও না কেন? রাজা কবিদের ভারি ভালবাসেন; তাদের কত সোনাদানা দেন, থাকবার বাড়ি দেন—

কালিদাসের মুখে ঈষৎ তিক্ততার আভাস খেলিয়া গেল; তিনি
আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

কালিদাসঃ রাজারাণীর সোনাদানা আমার দরকার নেই। নিজের হাতে তৈরি এই কুঁড়েই আমার অট্টালিকা—

মালিনী একটুক্ষণ জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া হাসিল; তারপর
আবার আল্পনা দিতে দিতে সদয় কণ্ঠে বলিল—

মালিনীঃ বুঝেছি; তুমি রাজারাণীদের সঙ্গে কখনও মেশোনি কিনা, তাই ভয় করছে। ভয় পেও না; ওরা খুব ভাল লোক হয়। আমার রাণী ভানুমতী—খুব ভাল লোক—আর কী সুন্দর! চোখ ফেরানো যায় না—

কালিদাস মৃদু হাসিলেন

কালিদাসঃ তুমিও তো ভাল লোক; জানাশোনা নেই, তবু আমার কত কাজ ক'রে দিচ্ছ। আর দেখতেও সুন্দর—যেন প্রতিমাটি। তবে তোমাকে ফেলে রাজরাণীর পিছনে ছোটবার দরকার কি?

আহ্লাদে বিগলিত হইয়া মালিনী কবির দিকে ফিরিল; মুখেচোখে
সলজ্জ আনন্দ; কিন্তু তাহা গোপন করিবার চেষ্টা নাই।

মালিনীঃ আমি সুন্দর! যাঃ—! (হাসিয়া উঠিল) তুমি কবি কিনা, তাই মিছিমিছি বলছ।—এবার দ্যাখো দেখি, কেমন আল্পনা হয়েছে।

কবি সহজ কৃতজ্ঞতায় বলিলেন—

কালিদাসঃ ভাল হয়েছে, যেমনটি হওয়া উচিত ছিল তেমনটি হয়েছে। নারীই গৃহকে গৃহের রূপ দিতে পারে; সে গৃহদেবতা।

মালিনী মাথা হেলাইয়া কিছুক্ষণ কবির পানে চাহিয়া রহিল; এধরনের
কথাবার্তার সহিত সে পরিচিত নয়। পরে একটু হাসিল।

মালিনীঃ তোমার কথার মানে বুঝেছি। শুনতে হেঁয়ালির মত লাগে, কিন্তু ভাবলে মানে পাওয়া যায়।—আচ্ছা, সব কবিই কি হেঁয়ালির ছন্দে কথা বলেন?

কালিদাস হাসিয়া উঠিলেন।

কালিদাসঃ স—ব।

ইতিমধ্যে সূর্যদেব সিপ্রার পরপারে অস্তচূড়া স্পর্শ করিয়াছিলেন; এখন নগর
হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিল। মালিনী চকিতে
দিগন্তের পানে চাহিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল—

মালিনীঃ ওমা, কি হবে! সূয্যি যে পাটে বস্লেন!—আজকেই আমি মরেছি; রাণী-মা'র ফুল যোগান দিতে দেরি হয়ে যাবে।—দাও দাও, সাজি দাও, আমি চললুম—

কালিদাসের হাতে ভাঁড় ধরাইয়া দিয়া ও সাজিটি প্রায় কাড়িয়া লইয়া
মালিনী ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে
একবার কিছু ফিরিয়া বলিল—

মালিনীঃ আবার যেদিন আসব তোমার ঘর গুছিয়ে দিয়ে যাব।

কালিদাস স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।
তারপর মৃদুস্বরে আত্মগতভাবে বলিলেন—

কালিদাসঃ মালিনী! যেন সাক্ষাৎ মালিনী ছন্দ!—চপল-চরণ-ছন্দা—নন্দিনী—পুষ্পগন্ধা—

ডিজল্‌ভ্‌।

অবন্তীর বিশাল রাজপুরী; প্রাকারবেষ্টিত একটি নগর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিস্তৃত বিহারভূমির উপর কুঞ্জবাটিকা, উপবন, মধ্যে মধ্যে এক একটি অট্টালিকা; কোনটি মন্ত্রগৃহ, কোনটি শস্ত্রাগার, কোনটি যন্ত্রভবন—এইরূপ আরও অনেক।

পুরভূমির সর্ব পশ্চাতে মহাদেবী ভানুমতীর অবরোধ—নগরের ভিতর ক্ষুদ্র নগর। অবরোধের ভূভাগ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; প্রাচীরের কোল ঘেঁষিয়া সংকীর্ণ পরিখা। এখানে প্রবেশের একটিমাত্র দ্বার; তাহাও এত সংকীর্ণ যে দুইজন পাশাপাশি প্রবেশ করিতে পারে না।

যে-সময়ের কাহিনী সে-সময়ে রাজপুরীর মহিলাদের প্রাকার-পরিখার অন্তরালে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রথা ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি কয়েক বৎসর পূর্বে দেশে হূণ বর্বরদের উৎপাত হইয়াছিল, সেই সময় পুরস্ত্রীদের সম্ভ্রম রক্ষার মানসে "হূণহরিণকেশরী" মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই অবরোধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তারপর হূণ উৎপাত দূর হইয়াছিল; কিন্তু প্রথা একবার গড়িয়া উঠিলে সহজে ভাঙিতে চায় না। অবরোধ ও তৎসংক্রান্ত বিধি রহিয়া গিয়াছিল।

একজন সশস্ত্র রক্ষী সংকীর্ণ প্রবেশ-পথের সম্মুখে পাহারায় নিযুক্ত ছিল। রক্ষীর বয়স কম, উনিশ-কুড়ি; কিন্তু ভারী জোয়ান। হাতের লৌহশূল অবহেলাভরে ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে দ্বারের সম্মুখে পদচারণ করিতেছিল। কেহ কোথাও নাই। দ্বারপথে অবরোধের প্রাসাদভূমির কিয়দংশ দেখা যাইতেছে; বাহিরে বকুল তমাল পিয়াল শোভিত মুক্ত ভূমি জনশূন্য। সন্ধ্যা সমাগত।

দূরে মালিনীকে আসিতে দেখিয়া রক্ষী থমকিয়া দাঁড়াইয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর একটু গদ্‌গদ হাসি তাহার মুখে দেখা দিল। মালিনীর প্রতি তাহার মনে যে বেশ প্রীতির ভাব আছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

মালিনী কিন্তু তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই তাড়াতাড়ি দ্বার প্রবেশের উদ্যোগ করিল। রক্ষী এজন্য প্রস্তুত ছিল, মালিনীর অবজ্ঞা তাহার পক্ষে নূতন নয়; তাহার বল্লম অর্গলের মত পড়িয়া মালিনীর পথ রোধ করিয়া দিল।

চমকিয়া মালিনী অধীর রুষ্ট মুখে রক্ষীর পানে তাকাইল।

মালিনীঃ কি হচ্ছে!—পথ ছেড়ে দাও।

মালিনীর ভ্রূকুটি দেখিয়া রক্ষী ঘাব্‌ড়াইয়া গেল। সে নূতন প্রেম করিতে শিখিতেছে, এখনও আনাড়ী; অথচ একটু রসিকতা না করিয়াও মালিনীকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। তাই বোকার মত হাসিয়া বলিল—

রক্ষীঃ বিনা প্রশ্নে তোমাকে রাণীর মহলে ঢুকতে দিই কি বলে? কণ্চুকী মশায়ের হুকুম—

মালিনীঃ ঢের হয়েছে, এবার বল্লম নামাও। আমার দেরি হয়ে গেছে—

রক্ষীঃ কণ্চুকী মশায়ের হুকুম—পুরুষ ঢুকতে দেবে না। এখন তুমি যে মেয়ের ছদ্মবেশে পুরুষ নও—

মালিনীঃ আবার!—আচ্ছা বেশ, রঙ্গই কর তাহলে।

মালিনী অদূরস্থ বেদীর আকারের ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের উপর সাজি কোলে লইয়া বসিল, আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া নীরস কণ্ঠে বলিল—

মালিনীঃ আমার কি! রাণীমা'র এতক্ষণ চুল-বাঁধা গা-ধোয়া হয়ে গেছে—ফুল আর মালার জন্যে হা-পিত্যেশ ক'রে বসে আছেন। বেশ তো, বসে থাকুন। যত দেরি হবে ততই তাঁর রাগ বাড়বে। তা আমি কি করব?—আমাকে যখন তলব হবে, আমি বলব—

রক্ষী এবার রীতিমত ভয় পাইয়া গেল। ত্বরিতে দ্বার হইতে বল্লম সরাইয়া মিনতির কণ্ঠে বলিল—

রক্ষীঃ না না, মালিনী, আমি কি তোমাকে আট্‌কেছি? আমি একটু—ইয়ে—রস করছিলুম। নাও—তুমি ভেতরে যাও—

মালিনী উঠিল না; মুখ কঠিন করিয়া বলিল—

মালিনীঃ আগে নিজের হাতে কান মলো।

রক্ষীর বয়স অল্প, তাহার কান দুটি রক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু

উপায় কি? সে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—

রক্ষীঃ আচ্ছা, এই নাও—বলছি।—কিন্তু এ শুধু তোমাকে—ইয়ে—ভালবাসি বলে—

মালিনী ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; গ্রীবার একটি লীলায়িত ভঙ্গী করিয়া বলিল—

মালিনীঃ উঃ—! ভালবাসা!

সহসা গম্ভীর হইয়া মালিনী প্রশ্ন করিল—

মালিনীঃ জানো, নারীই গৃহকে গৃহের রূপ দিতে পারে? সে গৃহদেবতা। জানো?

রক্ষী অবোধের মত ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া ঘাড় চুলকাইল।

রক্ষীঃ কই, না তো।

মালিনীঃ তবে তুমি কিছু জানো না।

মালিনী সদর্পে দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া ভিতরে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ডিজল্ভ্।

মহাদেবী ভানুমতীর মহল। প্রসাধন-কক্ষের একটি শিঙার-বেদিকার উপর অপরূপ রূপবতী প্রগাঢ়-যৌবনা রাণী অর্ধশয়ানভাবে অবস্থান করিতেছেন। চারি-পাঁচটি কিঙ্করী তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে। একজন ভানুমতীর আলুলায়িত কুন্তল দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া ধূপের ধোঁয়ায় সুরভিত করিতেছে। দ্বিতীয়া পদপ্রান্তে নতজানু বসিয়া লাক্ষারসে চরণপ্রান্ত রঞ্জিত করিতেছে। অবশিষ্ট কিঙ্করীরা প্রসাধনদ্রব্য হাতে লইয়া সাহায্য করিতেছে।

দ্রুত ব্যস্তপদে মালিনী প্রবেশ করিল; বাক্যব্যয় না করিয়া ভানুমতীর দেহ পুষ্পাভরণে সাজাইতে লাগিয়া গেল। রাণী মদালসনেত্র মালিনীর দিকে ফিরাইয়া একটু হাসিলেন।

ভানুমতীঃ আমার কচি মালিনী মেয়ের আজ এত দেরি যে!

মালিনী ক্ষিপ্রহস্তে ভানুমতীর মৃণাল-ভুজে ফুলের অঙ্গদ বাঁধিতে বাঁধিতে হ্রস্বকণ্ঠে বলিতে লাগিল—

মালিনীঃ কার মুখ দেখে যে আজ উঠেছিলুম—দেরি হয়ে গেল রাণিমা। ফুল নিয়ে নদীর ধার দিয়ে আসছি, চোখ তুলে দেখি—ওমা, এক কবি! বল তো রাণিমা, অবাক কাণ্ড না?

রাণী অধরপ্রান্ত একটু কুঞ্চিত করিলেন।

ভানুমতীঃ এ আর অবাক কাণ্ড কী! মহারাজের প্রসাদে উজ্জয়িনীতে এত কবি জুটেছে যে বর্ষাকালে ইন্দ্রগোপ কীটও এত জন্মায় না।

মালিনীঃ ওমা না গো না, এ তোমার ন্যাড়ামাথা নাকলম্বা চিম্সে কবি নয়।—কি বলব তোমায় রাণিমা, চেহারা যেন ঠিক—কুমার কার্তিক! গায়ের রঙ্ ডালিম ফেটে পড়ছে——কী নাক, কী চোখ! বয়স কতই বা হবে? বড় জোর চব্বিশ-পঁচিশ।

ঈষৎ ভ্রূভঙ্গ করিয়া ভানুমতী মালিনীকে নিরীক্ষণ করিলেন।

ভানুমতীঃ হুঁ?

মালিনী উৎসাহভরে বলিয়া চলিল—

মালিনীঃ হ্যাঁ গো রাণিমা। বললে বিশ্বাস করবে না, এত সুন্দর কবি আমি জন্মে দেখিনি।—নদীর পাড়ে কুঁড়েঘর তৈরি করেছে, সেইখানেই থাকবে। (সহসা হাসিয়া উঠিয়া) দরজায় আল্পনা দিচ্ছিল—কিবা আল্পনার ছিরি! হাত থেকে পিট্লির ভাঁড় কেড়ে নিয়ে আমি আল্পনা এঁকে দিলুম। তাই না এত দেরি হ'ল। কবির নাম—কালিদাস। বেশ মিষ্টি নাম, না? আর তেমনি কি মিষ্টি কথা,—কথা শুনলে কান জুড়িয়ে যায়—

ভানুমতী মন দিয়া শুনিতেছিলেন; তাঁহার মুখের গূঢ় হাসি গভীর হইতেছিল। মালিনী থামিতেই তিনি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন—

ভানুমতীঃ সত্যি?—নদীর ধারে খাসা কবি কুড়িয়ে পেয়েছিস তো! তা—কি বল্লে

তোর কবিটি? কানের কাছে ভোমরার মত গুনগুন ক'রে গান শুনিয়েছে বুঝি?

মালিনী রাণীর কথার ব্যঙ্গার্থ বুঝিল না; সে এখনও অতশত
বুঝিতে শেখে নাই, সরলভাবে বলিল—

মালিনীঃ না রাণিমা, গান করেনি, শুধু কথা কয়েছে।—কিন্তু কী মিষ্টি কথা, ঠিক যেন মধু ঢেলে দিচ্ছে—

ভানুমতী ফিক্ করিয়া হাসিয়া কিঙ্করীদের মুখের পানে চাহিলেন; তাহারাও
মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। রাণী অলসহস্তে মালিনীর চিবুক
তুলিয়া ধরিয়া তাহার কাঁচ মুখখানি দেখিলেন, তারপর তরল
কৌতুকের স্বরে বলিলেন—

ভানুমতীঃ আমার মালিনী-কুঁড়িটি এতদিনে সত্যিই ফুট্‌বে-ফুট্‌বে করছে—ভোমরাও ঠিক এসে জুটেছে। দেখিস মালিনী, তুই যেমন ভালমানুষ, তোর কবি-ভোমরা সব মধুটুকু শুষে নিয়ে উড়ে না পালায়—

কিঙ্করীরা হাসিতে লাগিল। মালিনী ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া
সকলের মুখের পানে তাকাইতে লাগিল। রাণী হাসিতে হাসিতে
উঠিয়া দাঁড়াইয়া মালিনীর দুই স্কন্ধের উপর হাত রাখিলেন,
স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিলেন—

ভানুমতীঃ বোকা মেয়ে! এখনও ঘুম ভাঙ্গেনি।—ভয় নেই, একদিন ঘুম ভাঙ্গবে; হঠাৎ সব বুঝতে পারবি।—তোর কবি বুঝি ঘুম ভাঙ্গাতেই এসেছে!

ফেড্ আউট্।
ফেড্ ইন্।

প্রভাত। কালিদাসের কুটির-প্রাঙ্গণ। বেদীর উপর কবি বসিয়া আছেন; সম্মুখে মৃত্তিকার মসীপাত্র, খাগের কলম ও একতাড়া তালপত্র। কবি রচনায় নিমগ্ন; কিন্তু যত না রচনা করিতেছেন, চিন্তা করিতেছেন তাহার দশগুণ। ললাট চিন্তা-চিহ্নিত; কোথাও যেন আটকাইয়া গিয়াছে। কবি কয়েকবার মুখে বিড়্‌বিড়্ করিতে করিতে করাগ্রে গণনা করিলেন; তারপর অন্যমনস্কভাবে লেখনী মসীপাত্রে ডুবাইলেন। কিন্তু মনে মনে যাহা গড়িয়াছিলেন তাহা মনঃপূত হইল না, তিনি আবার কলম রাখিয়া দিলেন। তালপত্রে একটি অসমাপ্ত শ্লোক লেখা ছিল; তালপত্রটি তুলিয়া লইয়া জানুর উপর রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন—যেন উহার ধ্বনি হইতে পরবর্তী অলিখিত পংক্তির ইঙ্গিত ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন।

কালিদাসঃ অবচিতবলিপুষ্পা বেদিসম্মার্গদক্ষা
নিয়মবিধিজলানাং বর্হিষাঞ্চোপনেত্রী
গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা—ভবানী!

শেষ শব্দটি তিনি সংশয়সঙ্কুল কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন—'ভবানী' শব্দটি পত্রে
লেখা ছিল না, কবি পাদপূরণের জন্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। ক্ষণকাল
চিন্তা করিয়া তিনি মাথা নাড়িলেন—

কালিদাসঃ উঁহু—ভবানী চলবে না; এখনও তো দেবী ভবানী হননি। কৃশাঙ্গী—? উঁহু...মৃগাক্ষী...উঁহু উঁহু—

কবির ভাবাবিষ্ট চক্ষু এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে প্রাঙ্গণের দ্বারের কাছে গিয়া সহসা রুদ্ধ হইল; কবি ভাবতন্দ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলেন। প্রাঙ্গণের দ্বারপথে হাসিতে হাসিতে মালিনী প্রবেশ করিতেছে। সদ্যঃস্নাতা; হাতে তাম্রের থালিতে একরাশ ফুল; মাথার সিক্ত চুলগুলি বুকে-অংসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রভাতের শিশিরবিন্দুর মত চৌদিকে আনন্দের রশ্মি বিকীরণ করিতে করিতে মালিনী কালিদাসের দিকে অগ্রসর হইল। কালিদাস চকিত বিস্ফারিত নেত্রে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। এ কি! এ যে গিরিকন্যারই মর্ত্য-প্রতিমূর্তি! যে শব্দটির অভাবে তাঁহার শ্লোক এবং কাব্যের প্রথম সর্গ সমাপ্ত হইতেছে না সেই শব্দটি বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত তাঁহার মস্তিষ্কে জ্বলিয়া উঠিল। ত্বরিতে লেখনী ধরিয়া কবি লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। (সেকালে মুষ্টিতে লেখনী ধরিয়া লিখিবার রীতি ছিল) খস্ খস্ করিয়া তালপত্রের উপর কলম চলিতে লাগিল।

ফুলের থালি হাতে মালিনী বেদীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কবি অন্যদিনের মত তাহাকে সম্ভাষণ করিলেন না, মুখ তুলিয়া দেখিলেন না। মালিনীর হাসিভরা মুখখানি ম্লান হইয়া গেল; অভিমানে চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। কবি ব্যগ্রভাবে লিখিয়া চলিলেন, যেন মুহূর্তের জন্য অন্যদিকে মন দিলেই শব্দগুলো মস্তিষ্কের পিঞ্জর খুলিয়া উড়িয়া যাইবে। মালিনী ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ভারী গলায় বলিল—

মালিনীঃ এত কাজ—আমার পানে চোখ তুলে চাইবারও সময় নেই! বেশ।—

কালিদাস মুখ না তুলিয়াই চাপা সুরে বলিলেন—

কালিদাসঃ স্‌স্‌স্‌—একটু দেরি কর...এটা শেষ ক'রে ফেলি...(লিখিতে লিখিতে) নিয়মিত পরি...

মুখে অসমাপ্ত কথা মিলাইয়া গেল, কবি লিখিয়া চলিলেন। ক্রমে লেখা শেষ হইল। লেখার নীচে কলমের একটি সাড়ম্বর আঁচড় টানিয়া কালিদাস হাস্যোজ্জ্বল মুখে মালিনীর পানে চাহিলেন।

কালিদাসঃ ব্যস—ইতি প্রথমঃ সর্গঃ।

মালিনী মুখভার করিয়া রহিল; কালিদাস সোৎসাহে বলিয়া চলিলেন—

কালিদাসঃ একটা শব্দ কিছুতেই মাথায় আসছিল না; তোমাকে দেখেই মনে পড়ে গেল—তোমার ঐ কালো কালো কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল দেখে—

মালিনীর পক্ষে আর অভিমান করিয়া থাকা সম্ভব হইল না; কৌতূহলী দীপ্ত চোখে সে কালিদাসের পানে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—

মালিনীঃ কী কথা?—বল না!

কালিদাসঃ কথাটি হচ্ছে—সুকেশী। তোমার সুন্দর ভিজে চুলগুলি দেখে মনে পড়ে গেল।

মালিনী বেদীর একপাশে বসিয়া পড়িল। কৌতূহলের সীমা নাই। ফুলের পাত্রটি নামাইয়া রাখিয়া সে এক অঞ্জলি ফুল কবির কোলের উপর ঢালিয়া দিল; তারপর লেখনী মসীপাত্র তালপত্রের উপর দুই চারিটি ফুল ছড়াইয়া দিতে দিতে বলিল—

মালিনীঃ কিসের গান লিখছ বল না? শিবের গীত বুঝি?

কালিদাসঃ হ্যাঁ। শিব আর পার্বতীর গল্প। শিবের সঙ্গে পার্বতীর তখনও বিয়ে হয়নি। শিব তপস্যা করছেন—কঠিন তপস্যা; আর গিরিকন্যা উমা রোজ এসে তাঁর সেবা করেন—ফুল সমিধ আহরণ করে এনে দেন, পুজার জন্যে বেদী মার্জন করে দেন।—তারপর এইসব কাজ ক'রে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন শিবের ললাট-চন্দ্রের কিরণের তলায় বসে ক্লান্তি দূর করেন—শুনবে শেষ শ্লোকটা—

মালিনী অবহিত চিত্তে শুনিতেছিল; কেবল সাগ্রহে ঘাড় নাড়িল। কালিদাস তালপত্র তুলিয়া লইয়া পড়িলেন—

কালিদাসঃ অবচিতবলিপুষ্পা বেদিসম্মার্গদক্ষা
নিয়মবিধিজলানাং বর্হিষাঞ্চোপনেত্রী
গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা সুকেশী
নিয়মিতপরিখেদা তচ্ছিরশ্চন্দ্রপাদৈঃ।

কিছুক্ষণ দুইজনে নীরব। কালিদাস ধীরে ধীরে তালপত্রটি নামাইয়া রাখিলেন, মালিনীর দিকে মৃদু সস্নেহ হাসিয়া বলিলেন—

কালিদাসঃ এ ছন্দের নাম জানো?

মালিনীঃ না। কী?

কালিদাসঃ মালিনী ছন্দ—তোমার নামের ছন্দ।—প্রত্যেক সর্গের শেষে একটি করে তোমার নামের ছন্দের শ্লোক লিখব ঠিক করেছি। আমার কাব্য যদি বেঁচে থাকে মালিনীর নামও কেউ ভুলবে না; আমার কাব্যে তোমার নাম গাঁথা থাকবে।

মালিনীর মুখ লজ্জায় আনন্দে গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কালিদাস হাসিতে হাসিতে বেদীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরম বিলাসভরে

আলস্য ত্যাগ করিতে করিতে অঙ্গন-বেষ্টনীর বাহিরে সিপ্রার
তীরে তাঁর দৃষ্টি পড়িল। তাঁহার হাস্য-আলস্য-ভরা
মুখে সহসা ভাবান্তর দেখা গেল।

সিপ্রার তীররেখা ধরিয়া একশ্রেণী উট চলিয়াছে। আর একদিনের কথা কালিদাসের
মনে পড়িয়া গেল—পূর্ণিমার নিথর রাত্রি, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাজোদ্যান,
পার্শ্বে স্ফুটযৌবনা রাজকুমারী, প্রাকার-বেষ্টনীর পরপারে
এক সারি উট চলিয়াছে, তারপর...

স্মৃতির বেদনা কালিদাসের মুখে করুণ ছায়াপাত করিল। মালিনী ঊর্ধ্বমুখী
হইয়া কালিদাসের পানে চাহিয়া ছিল, সে তাঁহার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য
করিল। ঈষৎ বিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে প্রাঙ্গণ-বেষ্টনীর
ওপারে দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দেখিতে পাইল
না। তখন সেও বেদীর উপর উঠিতে
উঠিতে বলিল—

মালিনীঃ কি দেখছ?

কালিদাস উত্তর দিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। মালিনী তাঁহার
সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডিঙি মারিয়া দেখিল—উটের সারি।
সে ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—

মালিনীঃ আ কপাল—উট। আমি বলি, না জানি কী! (কবির দিকে ফিরিয়া) বলি হ্যাঁগা কবি, উট দেখে তোমার ভয় হ'ল না কি?

কালিদাস ম্লান হাসিলেন—

কালিদাসঃ ভয় নয় মালিনী, দুঃখ হ'ল। ঐ উটের সঙ্গে একটা বড় দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

কালিদাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। মালিনী সপ্রশ্ন নেত্রে তাঁহার মুখের
পানে চাহিয়া রহিল; কিন্তু কবি আর কিছু বলিলেন না।

ডিজল্‌ভ্‌।

অবন্তীর রাজসভা। কুন্তল রাজসভার সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও এ আরও
বৃহৎ ব্যাপার। উপরন্তু অবরোধের মহিলাগণের জন্য
প্রাচীরগাত্রে প্রেক্ষামঞ্চের ব্যবস্থা আছে।

মধ্যাহ্ন কাল। প্রধান বেদিকার উপর মহারাজ বিক্রমাদিত্য আসীন। পঁয়ত্রিশ বৎসরের দৃপ্তকায় পুরুষ; দণ্ডমুকুটাদির আড়ম্বর নাই, তিনি বেদীর মার্জিত কুট্টিমের উপর কেবল মাত্র একটি স্থূল উপাধান আশ্রয় করিয়া অর্ধশয়ান ছিলেন। চারিপাশে কয়েকটি অন্তরঙ্গ সভাসদ নিকটে দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। বরাহমিহির ও অমরসিংহ একত্র বসিয়া নিম্নস্বরে কথা কহিতেছিলেন ও মাঝে মাঝে তুড়ি দিয়া হাই তুলিতেছিলেন। একটি শীর্ণকায় মুণ্ডিত চিকুর কবি দন্তহীন মুখ রোমন্থনের ভঙ্গীতে নাড়িতে নাড়িতে একাগ্র মনে শ্লোক রচনা করিতেছিলেন। প্রবীণ মহামন্ত্রী একপাশে বসিয়া পারাবতপুচ্ছের সাহায্যে কর্ণকুহর কণ্ডূয়ন করিতেছিলেন। তাঁহার অনতিদূরে পশ্চাতে স্থূলকায় বিদূষক চিৎ হইয়া উদর উদ্ঘাটিত করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল।

মহারাজের শিয়রের কাছে বসিয়া এক তাম্বূল-করঙ্ক-বাহিনী যুবতী একমনে তাম্বূল রচনা করিয়া সোনার থালে রাখিতেছিল। আর একটি যবনী সুন্দরী শীতল ফলাম্লরসের ভৃঙ্গার হস্তে লইয়া চিত্রার্পিতার মত একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল।

কর্মহীন দ্বিপ্রহরের আলস্য সকলকে চাপিয়া ধরিয়াছিল। মহারাজ উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ একটা রসের কথা পর্যন্ত বলিতেছিল না। সভাটা যেন নিতান্ত ব্যাজার হইয়াই শেষ পর্যন্ত ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে বরাহমিহির ও অমরসিংহের মৃদু জল্পনা ঝিল্লি-

গর্জনের মত শুনাইতেছিল।

বরাহমিহির প্রকাণ্ড একটি হাই তুলিয়া হস্তদ্বারা উহা চাপা দিলেন; তারপর ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—

বরাহমিহির: রবি এবার মকর রাশিতে প্রবেশ করবেন।—

বিক্রমাদিত্য একটু উৎসুকভাবে সেইদিকে তাকাইলেন।

বিক্রমাদিত্য: কী বললেন মিহির ভট্ট?

বরাহমিহির: আমি বলছিলাম মহারাজ যে, রবি এবার মকর রাশিতে গিয়ে ঢুকবেন।

মহারাজ আবার উপাধানে হেলান দিয়া বসিলেন; ব্যঙ্গ-বঙ্কিম মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য: হুঁ—ঢুকবেন তো এত দেরি করছেন কেন? তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেই পারেন। আমার তো এই আলস্য আর নৈষ্কর্ম্য অসহ্য হয়ে উঠেছে। এ রাজ্যে কেউ যেন কিছু করছে না, কেবল বসে বসে ঝিমচ্ছে। ইচ্ছে করে, সৈন্য সামন্ত নিয়ে আবার যুদ্ধ-যাত্রা করি। তবু তো একটা কিছু করা হবে!

মহামন্ত্রী কর্ণকণ্ডূয়নে ক্ষণকাল বিরতি দিয়া মিটি-মিটি হাস্য করিলেন, গূঢ় পরিহাসের কণ্ঠে বলিলেন—

মহামন্ত্রী: কার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন মহারাজ?—শত্রু তো একটিও অবশিষ্ট নেই।

বিরক্তি সত্ত্বেও মহারাজের মুখে হাসি ফুটিল।

বিক্রমাদিত্য: তাও বটে। বড় ভুল হয়ে গেছে মন্ত্রী! সবগুলো শত্রুকে একেবারে বিনাশ ক'রে ফেলা উচিত হয়নি। অন্তত দু-একটাকে এই রকম দুর্দিনের জন্য রাখা উচিত ছিল।

এই সময় রচনা-রত কবি গলার মধ্যে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ করিয়া উঠিবার উপক্রম করিলেন; তাঁহার রচনা শেষ হইয়াছে। রাজা তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন।

বিক্রমাদিত্য: কী হয়েছে কবি, আপনি ওরকম করছেন কেন? হাতে ওটা কি?

গলা পরিষ্কার করিয়া কবি বলিলেন—

কবি: শ্লোক, মহারাজ। আপনার একটি প্রশস্তি রচনা করেছি—

বিক্রমাদিত্য নিরুপায়ভাবে একবার চারিদিকে চাহিলেন; তারপর গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য: হুঁ। বেশ পড়ুন—শুনি।

মহারাজের প্রশস্তি-পাঠ হইতেছে, সুতরাং অন্য সকলেও সেদিকে মন দিল। কবি শ্লোক পাঠ করিলেন--

কবি: শত্রুণাং অস্থিমুণ্ডানাং শুভ্রতাং উপহাস্যতী।
হে রাজন্ তে যশোভাতি শরচ্চন্দ্রমরীচিবৎ॥

সকলে অবিচলিত মুখচ্ছবি লইয়া বসিয়া রহিলেন, কেবল অমরসিংহ ভ্রূকুটি করিয়া কবির দিকে তাকাইলেন, বোধ হয় শব্দপ্রয়োগে কিছু ভুল হইয়া থাকিবে।

এই জাতীয় শুষ্ক কবিত্বহীন প্রশস্তি শুনিতে শুনিতে রাজার কর্ণজ্বর উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তবু কবির প্রাণে আঘাত দিতে তাঁহার মন সরিতেছিল না। অথচ সাধুবাদ করাও চলে না। রাজা বিপন্নভাবে চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী এই সময় তাম্বূলপূর্ণ থালি রাজার সম্মুখে ধরিল।

রাজা চকিত হইয়া তাহার পানে চাহিলেন; মৃদুস্বরে বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য: মদনমঞ্জরী, তুমিই এই কবিতার বিচারক হও। একে কবিতা বলা চলে? মোট কথা, কবিকে পান দেওয়া যেতে পারে কিনা?

মদনমঞ্জরী অতি অল্প হাস্য করিল, তাহার অধর একটু নড়িল।

মদনমঞ্জরী: পারে মহারাজ।—কারণ কবিতা যেমনই হোক, তাতে আপনার গুণগান করা হয়েছে—

মহারাজ একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; তারপর একটি পান লইয়া
মুখে পুরিতে পুরিতে বলিলেন—

বিক্রমাদিত্যঃ (মৃদুস্বরে) ভাল, তোমার বিচারই শিরোধার্য। (উচ্চস্বরে) তাম্বুল-করঙ্কবাহিনী, কবিকে তাম্বুল উপহার দাও। তাঁর কবিতা শুনে আমরা প্রীত হয়েছি।

মদনমঞ্জরী উঠিয়া গিয়া তাম্বুলের থালি কবির সম্মুখে ধরিল। কবি লুব্ধ-হস্তে
একটি পান তুলিয়া লইয়া মুখে পুরিলেন। বিক্রমাদিত্য সদয়কণ্ঠে বলিলেন—

বিক্রমাদিত্যঃ কবি, আজ আপনার যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে; এবার গৃহে গিয়ে বিশ্রাম করুন।

কবিঃ জয়োস্তু মহারাজ—

কবি রাজসভা হইতে প্রস্থান করিলেন। বিক্রমাদিত্য আর একবার
উপাধানের উপর এলাইয়া পড়িয়া সনিশ্বাসে কহিলেন—

বিক্রমাদিত্যঃ আমার বয়স্যটি কোথায়, কেউ বলতে পার?

মহামন্ত্রী পশ্চাদ্দিকে একটি বক্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—

মহামন্ত্রীঃ এই যে এখানে মহারাজ, অকাতরে ঘুমচ্ছে।

মহারাজ আবার উঠিয়া বসিলেন।

বিক্রমাদিত্যঃ ঘুমচ্ছে। আমরা সকলে জেগে আছি—অন্তত জেগে থাকবার চেষ্টা করছি—আর পাষণ্ড ঘুমচ্ছে।—তুলে দাও মন্ত্রী।

আদেশ পাইবামাত্র মন্ত্রী নিজের পারাবতপুচ্ছটি বিদূষকের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট
করাইয়া পাক দিলেন। বিদূষক ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

বিদূষকঃ আরে রে মন্ত্রি-শাবক! মহারাজ, আপনার এই অল্পায়ু অস্থিচর্মসার মন্ত্রীটা আমার নাকে বিষ প্রয়োগ করেছে।

মন্ত্রীর ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি পূর্ববৎ কানে কাঠি দিতেছেন; রাজা
গম্ভীর ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন—

বিক্রমাদিত্যঃ বয়স্য, রাজসভায় তুমি ঘুমচ্ছিলে?

বিদূষক কটমট করিয়া মন্ত্রীর পানে তাকাইল।

বিদূষকঃ কে বলে ঘুমচ্ছিলাম—কোন উচ্চিংড়িগ বলে? মহারাজ, আমি মনে মনে আপনার প্রশস্তি রচনা করছিলাম।

মহারাজের অধর-কোণে একটু হাসি দেখা দিল। তিনি পুনশ্চ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—

বিক্রমাদিত্যঃ প্রশস্তি রচনা করছিলে? বটে! ভাল—শোনাও তোমার প্রশস্তি। কিন্তু মনে থাকে যেন, যে প্রশস্তি আমরা এখনি শুনেছি, তার চেয়ে যদি ভাল না হয়—তোমাকে শূলে যেতে হবে।

বিদূষকঃ তথাস্তু।

বিদূষক আসিয়া মহারাজের সম্মুখে পদ্মাসনে বসিল।

বিদূষকঃ শ্রূয়তাং মহারাজ—

তাম্বুলং যৎ চর্ব্বয়ামি সর্ব্বং তে রিপুমুণ্ডবঃ
পিক্ ত্যজামি পুচুং কৃত্বা তদেব শত্রুশোণিতম্।

প্রাকৃত ভাষায় অস্যার্থ হচ্চে—আমরা যে পান খাই, তা সর্বৈব মহারাজের শত্রুদের মুণ্ডু: আর পুচ্ করে যে পিক্ ফেলি তা নিছক শত্রুশোণিত!

মহারাজের আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই বিদূষক সুবর্ণ থালি হইতে এক খাম্চা পান তুলিয়া মুখে পুরিল এবং সাড়ম্বরে চিবাইতে লাগিল। মহারাজ হাসিলেন। অন্য সকলেও মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিলেন।

ডিজল্ভ্।

কালিদাসের কুটির-প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের বেষ্টনীতে লতা
উঠিয়াছে। লতায় ফুল ধরিয়াছে।

কালিদাস গৃহে নাই। মালিনী পরম স্নেহভরে আঁচল দিয়া কবির বেদিকাটি মুছিয়া দিতেছে। মার্জন শেষ হইলে সে কুটিরে প্রবেশ করিয়া কবির পুঁথি লেখনী মসীপাত্র লইয়া আসিল; সযত্নে সেগুলি বেদীর উপর সাজাইয়া রাখিল। তারপর ফুল দিয়া বেদীর চারিপাশ সাজাইল। অবশেষে একটি তৃপ্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রাঙ্গণদ্বারের পানে উৎসুক নেত্রে তাকাইল।

মালিনীর মুখ দেখিয়া বুঝিতে বাকি থাকে না যে, সে মরিয়াছে। প্রাঙ্গণদ্বার দিয়া কালিদাস স্মিতমুখে সিক্ত-বস্ত্র নিঙড়াইতে নিঙড়াইতে প্রবেশ করিলেন। তিনি পূজা ও স্নানের জন্য সিপ্রার তীরে গিয়াছিলেন।

মালিনীঃ আসা হ'ল? বাবাঃ, পুজো আর স্নান যেন শেষই হয় না।—নাও, বোসো। কি হচ্ছিল এতক্ষণ?

কালিদাস ভালমানুষটির মত বেদীর উপর বসিলেন; মৃদু হাসিয়া বলিলেন—

কালিদাসঃ পুজো আর স্নান।

মালিনী কবির হাত হইতে সিক্ত বস্ত্রটি লইয়া নিজের কাঁধের উপর ফেলিল; তারপর এক রেকাবি ফল লইয়া কালিদাসের কোলের কাছে ধরিয়া দিয়া বলিল—

মালিনীঃ আচ্ছা, এবার এগুলো মুখে দেওয়া হোক—

কালিদাস ফলগুলির পানে চাহিয়া রহিলেন।

কালিদাসঃ এ কোথা থেকে এল?

মালিনীঃ এল কোথাও থেকে। সে খোঁজে তোমার দরকার?

কালিদাসঃ (মৃদুহাস্যে) আমার ভাণ্ডারে তো যত দূর মনে পড়ছে—

মালিনীঃ চারটি আতপ চাল আর দুটি ঝিঙে ছাড়া আর কিছু নেই।—আচ্ছা, খাবার সামিগ্রি ঘরে এনে রাখতে মনে না থাকে, আমাকে বল না কেন?—দুপুরবেলা না হয় দুটি ভাত ফুটিয়ে নিলেই চলে যাবে—বামুন মানুষের কথাই আলাদা, কিন্তু সকালে স্নান-আহ্নিক ক'রে কিছু মুখে দিতে হয় না? দুটো বাতাসা কি একছড়া কলাও ঘরে রাখতে নেই?

কালিদাসঃ ভুল হয়ে যায় মালিনী।

মালিনীঃ ভুল—সব তাতেই ভুল। এমন মানুষও দেখিনি কখনও—খাবার কথা ভুল হয়ে যায়।

কালিদাসঃ ঐ তো মালিনী, কবি জাতটাই ঐরকম। পৃথিবীতে যে-কাজ সবচেয়ে দরকারি তাতেই তাদের ভুল হয়ে যায়। আমার এক তুমিই ভরসা।

অনির্বচনীয় প্রীতিতে মালিনীর মুখ ভরিয়া উঠিল। তবু সে তিরস্কারের ভঙ্গীতেই বলিল—

মালিনীঃ আচ্ছা হয়েছে, এবার খাওয়া হোক।—মনে থাকে যেন, গল্প যে-পর্যন্ত শুনেছি তার পর থেকে পড়ে শোনাতে হবে—

মালিনী সিক্তবস্ত্রটি বেড়ার উপর শুকাইতে দিতে গেল; কালিদাস প্রীতমুখে আহারে মন দিলেন।

ওয়াইপ্।

আহার শেষ করিয়া কালিদাস সম্মুখে রক্ষিত পুঁথিখানি তুলিয়া লইলেন। মালিনী ইত্যবসরে বেদীর নীচে আসিয়া বসিয়াছিল এবং বেদীর উপর একটি বাহু রাখিয়া কালিদাসের মুখের পানে চাহিয়া পরম তৃপ্তিভরে প্রতীক্ষা করিয়াছিল। কবি পুঁথির পাতাগুলি সাজাইতে সাজাইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন—

কালিদাসঃ আচ্ছা শোনো এবার। ইন্দ্রসভা থেকে বিদায় নিয়ে মদন আর বসন্ত হিমালয়ে মহাদেবের তপোবনে উপস্থিত হলেন। অমনি হিমালয়ের বনে উপত্যকায় অকাল-বসন্তের আবির্ভাব হ'ল। শুক্‌নো অশোকের ডালে ফুল ফুটে উঠ্‌ল—আমের মঞ্জরীতে ভোমরা এসে জুট্‌ল—শোনো—

অসূতে সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি
পাদেন নাপেক্ষত সুন্দরীণাং সম্পর্কমাশিঞ্জিতনূপুরেণ।

কালিদাস একটু সুর করিয়া শ্লোকের পর শ্লোক পড়িয়া চলিলেন; মালিনী মুগ্ধ তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে তাহার চোখ দুটি কখনও আবেশভরে মুকুলিত হইয়া আসিল; কখনও বা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল; নিশ্বাস কখনও দ্রুত বহিল, কখনও স্তব্ধ হইয়া রহিল। মন্ত্রমুগ্ধ সর্পীর মত দেহ ছন্দের তালে তালে দুলিতে লাগিল। এ কি অনির্বচনীয় অনুভূতি! প্রতি শব্দ যেন মূর্তিমান হইয়া চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। কল্পনার অলৌকিক লীলাবিলাসে, ভাবের অগাধ গভীরতায়, ছন্দের অনাহত মন্দ্র মহিমায় মালিনী আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। এমন গান সে আর কখনও শুনে নাই। মালিনী জানিত না যে এমন গান মানুষ পূর্বে আর কখনও শুনে নাই—সে-ই প্রথম শুনিল।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত করিয়া কালিদাস ধীরে ধীরে পুঁথি বন্ধ করিলেন।

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব। তারপর মালিনী গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাষ্পাকুলনেত্র কালিদাসের মুখের পানে তুলিল, ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলিল—

মালিনীঃ কবি, স্বর্গ বুঝি এমনিই হয়?—কোন্ পুণ্যে আমি আজ স্বর্গ চোখে দেখলুম!—না না, আমি এর যোগ্য নই, এ গান আমাকে শোনাবার জন্যে নয়...এ গান রাজাদের জন্যে, দেবতাদের জন্যে—

সহসা মালিনী কালিদাসের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—

মালিনীঃ কবি, একটা কথা শুনবে? আমার রাণীমা'কে তোমার গান শোনাবে?

কালিদাসের মুখে বেদনার ছায়া পড়িল।

কালিদাসঃ মালিনী, রাজা-রাণীদের আমাদের গান শুনিয়ে কি লাভ? তোমার ভাল লেগেছে, এই যথেষ্ট।

মালিনীঃ (ব্যাকুলভাবে) না না, কবি—আমার ভাল লাগা কিছু নয়, আমার ভাল লাগা তুচ্ছ। অমি কতটুকু? আমার বুকে আমি—(এইখানে মালিনী দু'হাতে বুক চাপিয়া ধরিল)—এত ভাল-লাগা ধরে রাখতে পারি না। কবি, বলো আমার কথা শুনবে? রাজাকে শোনাতে না চাও, শুনিও না, কিন্তু রাণীকে তোমার গান শোনাতেই হবে। বলো শোনাবে! আমার রাণী ভানুমতী—ওগো কবি, তুমি জানো না—তাঁর মত মানুষ আর হয় না। তিনিই তোমার গানের মরম বুঝবেন, তিনি তোমার গানে ডুবে যাবেন—

কালিদাসের বিমুখতা ক্রমে দূর হইতেছিল, তবু তিনি আপত্তি তুলিয়া বলিলেন—

কালিদাসঃ কিন্তু কাব্য যে এখনও শেষ হয়নি—

মালিনীঃ তা হোক। যা হয়েছে তাই শোনাবে।

কালিদাস তখন নিরুপায় হইয়া বলিলেন—

কালিদাসঃ তা—ভাল। রাণী যদি শুনতে চান্— .

কালিদাসের কথা শেষ হইবার পূর্বেই মালিনী সোল্লাসে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ওয়াইপ্।

রাণী ভানুমতীর মহলে একটি কক্ষ। মেঝের উপর স্থানে স্থানে মৃগচর্ম বিস্তৃত। একটি গজ-দন্তের পালঙ্কের উপর ভানুমতী অর্ধশয়ান রহিয়াছেন। বক্ষের নিচোল কিছু শিথিল; চুলের কুল আতপ্ত দ্বিপ্রহরে মুরঝাইয়া পড়িয়াছে। রাণীর কাছে দাসী-কিঙ্করী কেহ নাই, কেবল মালিনী পালঙ্কের পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ব্যগ্র-হ্রস্ব কণ্ঠে কথা বলিতেছে।

মালিনীঃ হ্যাঁগো রাণীমা, সত্যি বলছি তোমাকে, এমন গান তুমিও শোনোনি কখনও! শুনতে শুনতে মনে হয় যেন—যেন—(মালিনী দুই হাত নাড়িয়া নিজের মনের অবস্থাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না)—কি বলে বোঝাব তোমাকে ভেবে পাই না। চোখে জল আসে, বুক ভরে ওঠে—নাঃ বলতে পারছি না। তুমি একবার নিজের কানে

শোনো না, রাণীমা! দেখো তখন, সব ভুলে যাবে, সংসার মনে থাকবে না।

মালিনীর উদ্দীপনা দেখিয়া ভানুমতী একটু হাসিলেন।

ভানুমতীঃ বড় সরলা তুই মালিনী। সংসার ভুলিয়ে দিতে পারে এমন কবি আজকাল আর জন্মায় না। আমি সব আধুনিক কবির গান শুনেছি; তারা সব স্তাবক—চাটুকার; কেবল ইনিয়ে-বিনিয়ে রাজার প্রশস্তি লিখতে জানে—

মালিনীঃ ওগো রাণীমা, আমার কবি তেমন নয়—সে কারুর খোশামোদ করে না; সে কেবল ঠাকুর-দেবতার গান লেখে। মহাদেব পার্বতী—মদন বসন্ত—এই সব—

ভানুমতি আলস্যজড়িত কণ্ঠে বলিলেন—

ভানুমতীঃ যাই হোক, আমার মালিনীটিকে যে-কবি এমন ক'রে পাগল করেছে তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে—

মালিনী উৎসাহে আহ্লাদে রাণীর উপর একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িল।

মালিনীঃ দেখবে তাকে রাণীমা? দেখবে?

ভানুমতীঃ দেখতে পারি। কিন্তু কি ক'রে তা সম্ভব, ভেবে পাচ্ছি না।—তোর কবি তো রাজসভায় যাবে না—আর আমার মহলে আনা, সেও অসম্ভব।

মালিনীঃ অসম্ভব কেন হবে রাণিমা। তোমার হুকুম পেলে আমি সব ঠিক করতে পারি।

ভানুমতীঃ কী ঠিক করতে পারিস?

মালিনীঃ এই—আমার কবি চুপি চুপি মহলে এসে তোমাকে গান শুনিয়ে যাবে—কেউ কিছু জানতে পারবে না। তুমি শুধু তোমার চেড়িদের একটু তফাতে রেখো—আর বাকি যা করবার তা আমি করব।

ভানুমতী ঊর্ধ্বে চক্ষু তুলিয়া একটু ভ্রূকুটি করিলেন, একটু হাসিলেন; ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—

ভানুমতীঃ মন্দ হয় না—নতুন রকমের হয়। আর্যপুত্রকে—

এক যবনী প্রতিহারী প্রবেশ করিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। নীল চক্ষু, সোনালী চুল, বক্ষে লৌহজালিক। ভাঙা ভাঙা উচ্চারণ।

প্রতীহারীঃ দেবপাদ মহারাজ আসছেন—সঙ্গে কঞ্চুকী মহাশয়।

বার্তা ঘোষণা করিয়া প্রতীহারী অপসৃতা হইল। রাণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া উত্তরীয় দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিলেন। তাঁহার চোখের ইসারা পাইয়া মালিনী চুপি চুপি ঘরের এক কোণে গিয়া দাঁড়াইল।

বিক্রমাদিত্য প্রবেশ করিলেন; পশ্চাতে কঞ্চুকী। কঞ্চুকী নপুংসক; কৃশকায়, মুণ্ডিতশীর্ষ, কদাকার। চক্ষের দৃষ্টিতে সন্দেহ ও অসন্তোষ স্থায়ীভাব ধারণ করিয়াছে; নিম্ব ভক্ষণের অব্যবহিত পরে মুখের আকৃতি যেরূপ হয়, কঞ্চুকীর মুখের সহজ অবস্থাই সেইরূপ।

ভানুমতী দাঁড়াইয়া উঠিয়া অঞ্জলিবদ্ধহস্তে স্মিতমুখে আর্যপুত্রের সংবর্ধনা করিলেন; উভয়ের চোখে-চোখে যে প্রসন্নতার বিনিময় হইল তাহা হইতে অনুমান হয় যে এই রাজ-দম্পতীর মধ্যে প্রণয়ের উৎসধারা এখনও মন্দবেগ হয় নাই।

রাণীর দিকে আসিতে আসিতে রাজা একবার পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—

বিক্রমাদিত্যঃ তুমি এখন যেতে পারো কঞ্চুকী—

কঞ্চুকী পশ্চাৎ হইতে রাজ-দম্পতীকে নমস্কার করিয়া ফিরিয়া চলিল। দ্বারের কাছে পৌঁছিয়া সে একবার তাহার সতর্ক সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ঘরের চারিদিকে ফিরাইল; ঘরের কোণে দণ্ডায়মানা মালিনীর প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল।

ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া কঞ্চুকী সেইদিকে তাকাইয়া রহিল; তারপর
নিঃশব্দে মুণ্ডসঞ্চালন করিয়া তাহাকে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত
হইবার ইঙ্গিত করিল। মালিনী শঙ্কিত মুখে পা
টিপিয়া টিপিয়া কঞ্চুকীর অনুবর্তিনী হইল।

কক্ষ শূন্য হইয়া গেলে ভানুমতী দুই বাহু দিয়া স্বামীর কণ্ঠ আলিঙ্গন
করিয়া স্নিগ্ধ কৌতুকের স্বরে বলিলেন—

ভানুমতীঃ আজ বুঝি আমার সতীন আমার পতিদেবতাকে ধরে রাখতে পারল না?

মহারাজ স্মিতমুখে ভ্রূ তুলিলেন

বিক্রমাদিত্যঃ তোমার সতীন! সে আবার কে?

ভানুমতীঃ তাকে আপনি চেনেন না আর্যপুত্র?—পুরুষ জাতি এমনিই কপট।—আমার সতীনের নাম রাজসভা; যাকে ছেড়ে আপনি একদন্ড থাকতে পারেন না।

রাজা ভানুমতীর কুন্তল হইতে একটি ফুল তুলিয়া লইয়া আঘ্রাণ গ্রহণ করিলেন,
আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। ভানুমতী বলিয়া চলিলেন—

ভানুমতীঃ শুনেছি কনিষ্ঠা ভার্যার প্রতি পুরুষের অনুরাগ বেশী হয়; মহারাজের কিন্তু সব বিপরীত—জ্যেষ্ঠার প্রতিই তাঁর আসক্তি প্রবল। রাজ্যশ্রী চির-যৌবনা—তাই বুঝি তাকে এত ভালবাসেন মহারাজ?

বিক্রমাদিত্যের মুখ হইতে কৌতুকের ছায়া অপসৃত হইল; তিনি ভানুমতীর মুখ দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ গভীর অনুরাগ ভরে চাহিয়া রহিলেন; তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—

বিক্রমাদিত্যঃ তা জানি না। রাজ্যশ্রী যদি যায়, তবু তুমি আমার বুক জুড়ে থাকবে। কিন্তু তুমি যদি যাও, আমার চোখে রাজ্যশ্রীর এ সম্মোহন রূপ কি থাকবে? রাজলক্ষ্মী যে তোমারই ছায়া ভানুমতী।

বাষ্পাকুল চক্ষে ভানুমতী পতির বক্ষের উপর ললাট রাখিলেন,
গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন—

ভানুমতীঃ ও কথা বলতে নেই প্রিয়তম। রাজলক্ষ্মীই প্রধানা, আমি কেউ নই। মহাকাল করুন, রাজলক্ষ্মীর কোলে আপনাকে তুলে দিয়ে যেন যেতে পারি।

কিছুক্ষণ উভয়ে তদবস্থায় রহিলেন।

বাহিরে মানমন্দির হইতে দিবা তৃতীয় প্রহর ঘোষণা করিয়া বাঁশী বাজিয়া উঠিল।
রাণীর একজন সখী মঞ্জীর বাজাইয়া কক্ষের দ্বার পর্যন্ত আসিয়া রাজ-দম্পতীকে
আশ্লেষবদ্ধ দেখিয়া জিহ্বা কর্তনপূর্বক লঘুচরণে পলায়ন করিল।

রাজা-রাণী পরস্পরকে ছাড়িয়া দিয়া পালঙ্কের উপর পাশাপাশি বসিলেন।
ভানুমতী হাসিমুখে বলিলেন—

ভানুমতীঃ কিন্তু আজ মহারাজ তিন প্রহরের আগেই সভা থেকে পালিয়ে এলেন কেন তা তো বললেন না! সভা-কবিরা কি চিত্ত-বিনোদন করতে পারল না?

বিক্রমাদিত্য মুখের ভাব করুণ করিয়া বলিলেন—

বিক্রমাদিত্যঃ চিত্ত-বিনোদন! সভা-কবিদের ভয়েই তো তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি ভানুমতী!

হাস্য গোপন করিয়া রাণী কপট-ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন—

ভানুমতীঃ ছি মহারাজ, আপনি বীরকেশরী—আর, কয়েকজন নির্জীব হংসপুচ্ছ-ধারী কবির ভয়ে পালিয়ে এলেন!

বিক্রমাদিত্যঃ উপায় কি! কবি দিঙ্‌নাগ সংবাদ পাঠালেন যে, তিনি 'কুম্ভকর্ণ-সংহার' নামে কাব্য শেষ করেছেন, আমাকে শোনাবার জন্যে উটের পিঠে কাব্য বোঝাই করে সভায় নিয়ে আসছেন। শুনে অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, বররুচি—যাঁরা সভায় ছিলেন, সকলেই উঠে দ্রুত প্রস্থান করলেন। আমিও আর বিলম্ব করা অনুচিত বিবেচনা ক'রে অন্তঃপুরের

দিকে চলে এলাম। এখানে অন্তত দিঙ্নাগ ঢুকতে পারবে না।

ভানুমতী কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন—

বিক্রমাদিত্য: এবার এস—পাশা খেলা যাক।

ভানুমতী হাস্য সম্বরণ করিয়া ডাকিলেন—

ভানুমতী: সুজাতা! মধুশ্রী!

দুইটি কিঙ্করী দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল

ভানুমতী: খেলার আয়োজন কর। মহারাজ পাশা খেলবেন।

সখিদ্বয় ত্বরিতে কাজে লাগিয়া গেল। সুজাতা কুট্টিমের মধ্যস্থল হইতে মৃগচর্ম অপসারিত করিতেই মর্মরের উপর অঙ্কিত অক্ষবাট বাহির হইয়া পড়িল। মধুশ্রী দুইটি পক্ষ্মল আসন তাহার দুই পাশে বিছাইয়া দিল, তারপর ঘরের কোণ হইতে গজদন্তের একটি ক্ষুদ্র পেটিকা আনিয়া অক্ষবাটের পাশে রাখিল।

রাজা ও রাণী উঠিয়া গিয়া আসনে বসিলেন। রাজা পেটিকাটি অক্ষবাটের উপর উজাড় করিয়া দিয়া পাশ্টি তিনটি হাতে তুলিয়া লইলেন; রাণী রঙীন গুটিকাগুলি সাজাইতে লাগিলেন।

রাজা পাশ্টিগুলি সশব্দে ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য: আজ তোমাকে নিশ্চয় হারাব।

তাঁহার কথার ভাবে মনে হয় রাণীকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত করা তাঁহার ভাগ্যে বড় একটা ঘটিয়া ওঠে না। রাণী মুখ টিপিয়া হাসিলেন—

ভানুমতী: ভাল কথা মহারাজ। কিন্তু যদি হেরে যান, কী পণ দেবেন?

বিক্রমাদিত্য: যা চাও। অঙ্গদ কুণ্ডল দণ্ড মুকুট—কিছুতেই আপত্তি নেই।—জয় কৈতবনাথ!

মহারাজ ঘর্ঘর শব্দে পাশা ফেলিলেন। খেলা আরম্ভ হইল।

ওয়াইপ্।

খেলা জমিয়া উঠিয়াছে। আরও কয়েকটি সখী কিঙ্করী আসিয়া জুটিয়াছে এবং চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া স-কুতূহলে খেলা দেখিতেছে। রাজার পাশে সুরা-ভৃঙ্গার ও পানপাত্র, রাণীর পাশে তাম্বূলকরঙ্ক। দুজনেই খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছেন; খেলার মত্ততায় কখনও কলহ করিতেছেন, কখনও উচ্চ হাস্য করিতেছেন। মুখের অর্গলও ঘুচিয়া গিয়াছে; প্রগল্ভ শাণিত বাক্যবাণে পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতেছেন। সখীরা পরম কৌতুকে এই রঙ্গ উপভোগ করিতেছে।

ওয়াইপ্।

খেলা শেষ হইতেছে। মহারাজের মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার অবস্থা ভাল নয়। তবু তিনি বীরের ন্যায় শেষ পর্যন্ত লড়িতেছেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না; বিজয়লক্ষ্মী রাণী ভানুমতীকেই কৃপা করিলেন। বাজি শেষ হইল।

উচ্ছলিত হাস্যে ভানুমতী বলিলেন—

ভানুমতী: মহারাজ, আবার আপনি হেরে গেলেন!

বিক্রমাদিত্য অত্যন্ত বিমর্ষভাবে এক পাত্র সুরা পান করিয়া ফেলিলেন। তারপর কপট ক্রোধের ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন—

বিক্রমাদিত্য: অয়ি দর্পিতা বিজয়িনি, তোমার বড় অহঙ্কার হয়েছে! আচ্ছা, আর একদিন তোমার গর্ব খর্ব করব।—এখন তোমার পণ দাবী কর।

ভানুমতী মৃদু হাসিতে লাগিলেন; তাঁহার চক্ষু দুটি অর্ধ-নিমীলিত হইয়া আসিল। কুহক-মধুর স্বরে বলিলেন—

ভানুমতী: এখন নয় আর্যপুত্র। আজ রাত্রে—নিভৃতে—আমার বর ভিক্ষা চেয়ে নেব।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের চক্ষু দুটিও প্রীতহাস্যে ভরিয়া উঠিল।

ফেড্ আউট্।

ফেড ইন্।

পুরঃসীমার অন্তর্ভুক্ত বিহারভূমি; অদূরে অবরোধের
তোরণদ্বার দেখা যাইতেছে।

বৃক্ষগুল্মাদিশোভিত বিহারভূমির উপর দিয়া কালিদাস ও মালিনী অবরোধের পানে চলিয়াছেন। কালিদাসের বাহুতলে অসমাপ্ত কুমারসম্ভবের পুঁথি। মালিনী সাবধান সতর্ক চক্ষে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছে।

কবি মৃদু হাসিতেছেন, তাঁহার ভাবভঙ্গীতেও বিশেষ সতর্কতা নাই; তিনি যেন মালিনীর এই ছেলেমানুষী কাণ্ডে লিপ্ত হইয়া একটু আমোদ উপভোগ করিতেছেন মাত্র। ক্রমে দু'জনে অবরোধ দ্বারের অনতিদূরে এক বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মালিনী সংহতকণ্ঠে বলিল—

মালিনীঃ আস্তে! সাম্নেই দেউড়ি।

কালিদাস উঁকি মারিয়া দেখিলেন। আমাদের পূর্বপরিচিত নবযুবক শাস্ত্রীটি
শূলহস্তে পাহারায় নিযুক্ত—আর কেহ নাই।

মালিনী দ্রুত-অনুচ্চকণ্ঠে কালিদাসকে কিছু উপদেশ দিয়া একাকিনী তোরণের দিকে অগ্রসর হইল। কালিদাস বৃক্ষকাণ্ডের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রক্ষী দ্বারের সম্মুখে পরিক্রমণ করিতেছিল, মালিনীকে আসিতে দেখিয়া একগাল হাসিল। মালিনী পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, তারপর সন্ত্রস্তভাবে এদিক-ওদিক চাহিয়া নিজ ঠোঁটের উপর তর্জনী রাখিল।

রক্ষী ঘোর বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—

রক্ষীঃ কি হয়েছে! অমন করছ কেন?

মালিনীঃ চুপ্—চেঁচিও না। তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি—

রক্ষীঃ কী জিনিস?

মালিনীঃ (রহস্যপূর্ণভাবে) লাড়ু!

কোঁচড়ের উপর হাত রাখিয়া মালিনী ইঙ্গিতে জানাইল যে লাড়ু ঐখানে
লুকাইত আছে। রক্ষীর মুখের ভাব আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিল।

রক্ষীঃ অ্যাঁ! লাড়ু!—আমার জন্যে এনেছ! দেখি দেখি!

মালিনী মাথা নাড়িল

মালিনীঃ এখানে নয়। খাবে তো ওদিকে চল—ঐ মল্লিকা ঝাড়ের আড়ালে।

লাড়ু খাইবার জন্য মল্লিকা-ঝাড়ের আড়ালে যাইবার কী প্রয়োজন? কিংবা মালিনীর মনে আরও কিছু আছে! উৎসাহে রক্ষী ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু দ্বার ছাড়িয়াই বা যায় কি করিয়া?

রক্ষীঃ তা—তা—দেউড়ি খালি থাকবে?

মালিনীঃ তাতে কি হয়েছে? এ সময় কেউ আস্‌বে না।

রক্ষীঃ তা আসে না বটে—কিন্তু কণ্চুকী মশাই—কাজ নেই মালিনী, তুমি লাড়ু দাও, আমি এখানে দাঁড়িয়েই খাই।

মালিনী ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল

মালিনীঃ দেউড়িতে দাঁড়িয়ে লাড়ু খাবে? কেউ যদি দেখে ফেলে কি ভাব্‌বে বল দেখি!—

রক্ষীঃ তাও বটে। কিন্তু উপায় কি বলো? দেউড়ি ছাড়া যে বারণ।

মালিনী রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল

মালিনীঃ বেশ, কাজ নেই তোমার লাড়ু খেয়ে—আমি আর কাউকে খাওয়াব। এত যত্ন করে নিজের হাতে তৈরি করেছিলুম—

রক্ষীঃ না না মালিনী, তোমার লাড়ু খাচ্ছি—চল কোথায় যাবে।

দেয়ালের গায়ে বল্লম হেলাইয়া রাখিয়া রক্ষী মালিনীর পিছনে চলিল। ওদিকে কালিদাস গাছের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতেছিলেন। তোরণ হইতে প্রায় বিশ কদম দক্ষিণে একটি

মল্লিকার ঝোপ ছিল, মালিনী ও রক্ষী তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। সাবধানে একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া মালিনী রক্ষীকে দ্বারের দিকে পিছন করিয়া দাঁড় করাইল। রক্ষী ব্যাপার না বুঝিয়া বিস্ময়ভরে মালিনীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

মালিনীঃ হয়েছে। এবার তুমি চোখ বোজো।

রক্ষীঃ চোখ বুজ্‌ব? কেন?

মালিনী ধমক দিয়া বলিল—

মালিনীঃ যা বলছি কর। আর, যতক্ষণ হুকুম না দিই, চোখ খুল্‌বে না।

রক্ষী চক্ষু মুদিত করিল। না করিয়াই বা উপায় কী? লাড়ুর লোভ যতটা না হোক, মালিনীকে প্রসন্ন রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। সে আবার একটুতেই চটিয়া যায়।

মালিনীর কিন্তু রক্ষীকে বিশ্বাস নাই; কে জানে হয়তো চোখের পাতার ফাঁকে দেখিতেছে। মালিনী তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। না, চোখ বুজিয়াই আছে, দেখিতেছে না। তখন মালিনী হাত তুলিয়া কালিদাসকে ইসারা করিল।

কালিদাস বৃক্ষতল হইতে বাহির হইয়া গুটি গুটি অরক্ষিত দ্বারেব দিকে চলিলেন

ওদিকে রক্ষী চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া ক্রমে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল, বলিল—

রক্ষীঃ কি হ'ল? লাড়ু কই?

মালিনী চকিতে তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—

মালিনীঃ এই যে। হাঁ কর।

রক্ষী হাঁ করিল, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুদুটিও খুলিয়া গেল। কালিদাস তখনও অর্ধপথে; মালিনী ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল—

মালিনীঃ ও কি করছ! চোখ বন্ধ কর—চোখ বন্ধ কর!

রক্ষী চোখ বন্ধ করিল, সঙ্গে সঙ্গে হাঁ'টিও বুজিয়া গেল। মালিনী গলা বাড়াইয়া দেখিল কালিদাস নির্বিঘ্নে তোরণ প্রবেশ করিলেন। তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সে রক্ষীর মুখের পানে চাহিল; হাসিয়া বলিল—

মালিনীঃ নাও—এবার মুখ খোলো।

রক্ষী যুগপৎ চক্ষু ও মুখ খুলিল

মালিনীঃ দূর! হ'ল না। চোখ বন্ধ, মুখ খোলা—এই রকম—বুঝলে?

মালিনী প্রক্রিয়া দেখাইয়া দিল। কিন্তু কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও রক্ষী কৃতকার্য হইল না; হাঁ করিলেই চক্ষু খুলিয়া যায়। মালিনী হাসিতে লাগিল। রক্ষী কাতর স্বরে বলিল—

রক্ষীঃ কি করি—হচ্চে না যে!

মালিনীঃ তাহলে লাড়ু পেলে না—

হাসিতে হাসিতে মালিনী দ্বারের দিকে চলিল, অর্ধপথে থামিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—

মালিনীঃ তুমি ততক্ষণ অভ্যেস কর। ফিরে এসে যদি দেখি ঠিক হয়েছে তখন লাড়ু পাবে।

মালিনী অবরোধের ভিতর অন্তর্হিত হইয়া গেল। রক্ষী বিমর্ষমুখে ফিরিয়া আসিয়া বল্লমটি তুলিয়া লইল; তারপর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গভীর মনঃসংযোগে চক্ষু মুদিয়া রাখিয়া মুখব্যাদান করিবার দুরূহ সাধনায় আত্মনিয়োগ করিল।

কাট্।

অবরোধের অভ্যন্তরে একটি উদ্যান। মহাদেবী ভানুমতীর সখী কিঙ্করীর সংখ্যা কম নয়—প্রায় গুটি-পঞ্চাশ। তাহারা সকলেই আজ উদ্যানে আসিয়া জমিয়াছে। কেহ বৃক্ষশাখা লম্বিত ঝুলায় ঝুলিতে ঝুলিতে গান গাহিতেছে, এক ঝাঁক যুবতী ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে; কোথাও দুইটি সখী পাশাপাশি বসিয়া মালা গাঁথিতেছে এবং মৃদুকণ্ঠে জল্পনা করিতেছে।

দূর হইতে কালিদাস তাহাদেব দেখিতে পাইয়া সেইদিকেই চলিয়াছিলেন; পিছন হইতে মালিনী ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। আর একটু হইলেই সর্বনাশ হইয়াছিল;

অবরোধের মধ্যে পুরুষ প্রবেশ করিয়াছে সখীরা কেহ দেখিয়া ফেলিলে আর রক্ষা থাকিত না! মালিনী দৃঢ়ভাবে কালিদাসের হাত ধরিয়া তাঁহাকে অন্য পথে টানিয়া লইয়া চলিল।

ওয়াইপ্।

রাণী ভানুমতীর কক্ষ। লূতাজালের মত সূক্ষ্ম একটি তিরস্করিণীর দ্বারা ঘরটি দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এক ভাগে রাণীর বসিবার আসন, অন্য ভাগে কালিদাসের বসিবার জন্য একটি মৃগচর্ম ও তাহার সম্মুখে পুঁথি রাখিবার নিম্ন কাষ্ঠাসন। ভানুমতী নিজ আসনে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। কক্ষে অন্য কেহ নাই।

ত্বরিত অথচ সতর্ক পদক্ষেপে মালিনী দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; একবার ঘরের চারিদিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাত করিয়া মস্তক সঞ্চালনে রাণীকে জানাইল যে কালিদাস আসিয়াছেন। রাণীও বেশবাস সম্বরণপূর্বক ঘাড় নাড়িয়া অনুমতি দিলেন। তখন মালিনী পাশের দিকে হাতছানি দিয়া ডাকিল।

কালিদাস অলিন্দে অপেক্ষা করিতেছিলেন, দ্বারের সম্মুখে আসিলেন; উভয়ে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মালিনী ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

রাণীকে দেখিতে পাইয়া কালিদাস হাত তুলিয়া সংযতকণ্ঠে কেবল বলিলেন—

কালিদাসঃ স্বস্তি।

কালিদাসের প্রশান্ত অপ্রগল্ভ মুখচ্ছবি, তাঁহার অনাড়ম্বর হ্রস্বোক্তি ভানুমতীর ভাল লাগিল; মনের ঔৎসুক্যও বৃদ্ধি পাইল। তিনি স্মিতমুখে হস্ত প্রসারণ করিয়া কবিকে বসিবার অনুজ্ঞা জানাইলেন।

কালিদাস আসনে উপবেশন করিয়া পুঁথির বাঁধন খুলিতে লাগিলেন; মালিনী
অনতিদূরে মেঝের উপর বসিল।

কাট্।

অবরোধের উদ্যানে রাণীর সখীরা পূর্ববৎ গান গাহিতেছে, ঝুলায় ঝুলিতেছে, ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে। একটি সখী কোমরে আঁচল জড়াইয়া নাচিতেছে, অন্য কয়েকটি তরুণী তাহাকে ঘিরিয়া কর-কঙ্কণ বাজাইয়া গান ধরিয়াছে—

'ও পথে দিস্‌নে পা
দিস্‌নে পা লো সই
মনে তোর রইবে না
(সুখ) রইবে না লো সই—
যদি বা মন বাঁচে,
কালো তোর হবে সোনার গা লো সই—'

কাট্।

ভানুমতীর কক্ষে কুমারসম্ভব' পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। ভানুমতী করলগ্ন-কপোলে শুনিতেছেন; প্রতি শ্লোকের অনুপম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া মাঝে মাঝে বিস্ময়োৎফুল্ল চক্ষু কবির মুখের পানে তুলিতেছেন। কোথা হইতে আসিল এই অখ্যাতনামা ঐন্দ্রজালিক! এই তরুণ কথা-শিল্পী!

কালিদাস পড়িতেছেন—উমার রূপবর্ণন—

"দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা—"

কাট্।

উপরি উক্ত কক্ষের পাশে একটি গুপ্ত অলিন্দ—দেখিতে কতকটা সুড়ঙ্গের মত। প্রাচীরগাত্রে মাঝে মাঝে রন্ধ্র আছে; সেই রন্ধ্রপথে কক্ষের অভ্যন্তর পর্যবেক্ষণ করা যায়। অবরোধের প্রতি

কক্ষে যাহাতে কণ্চুকী নিজে অলক্ষ্যে থাকিয়া লক্ষ্য রাখিতে পারে এইজন্য এইরূপ ব্যবস্থা।

রাণীর একটি সহচরী—নাম ভ্রমরী—পা টিপিয়া অলিন্দ পথে আসিতেছে। একটি রন্ধ্রের নিকটে আসিয়া সে কান পাতিয়া শুনিল—কক্ষ হইতে একটানা গুঞ্জনধ্বনি আসিতেছে। তখন ভ্রমরী সন্তর্পণে রন্ধ্রপথে উঁকি মারিল।

রন্ধ্রটি নীচের দিকে ঢালু। ভ্রমরী কক্ষের কিয়দংশ দেখিতে পাইল। কালিদাস কাব্য পাঠ করিতেছেন—স্বচ্ছ তিরস্করিণীর অন্তরালে রাণী উপবিষ্টা। মালিনী রন্ধ্রের দৃষ্টিচক্রের বাহিরে ছিল বলিয়া ভ্রমরী তাহাকে দেখিতে পাইল না।

কিছুক্ষণ একাগ্রভাবে নিরীক্ষণ করিয়া ভ্রমরী রন্ধ্রমুখ হইতে সরিয়া আসিল; উত্তেজনা-বিবৃত চক্ষে চাহিয়া নিজ তর্জনী দংশন করিল; তারপর লঘু দ্রুতপদে ফিরিয়া চলিল।

ওয়াইপ্।

[অতঃপর কয়েকটি মণ্টাজ দ্বারা পরবর্তী ঘটনার পরিব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইবে]

উদ্যানের এক অংশ। ভ্রমরী তাহার প্রিয় বয়স্যা মধুশ্রীকে একান্তে লইয়া গিয়া উত্তেজিত হ্রস্বকণ্ঠে কথা বলিতেছে। নেপথ্যে আবহ যন্ত্রসংগীত চলিয়াছে। ভ্রমরীর কথা শেষ হইলে মধুশ্রী গণ্ডে হস্ত রাখিয়া বিস্ময় জ্ঞাপন করিল।

ওয়াইপ্।

উদ্যানের অন্য অংশ। একটি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া মধুশ্রী তাহার প্রিয়সখী মঞ্জুলাকে সদ্য-প্রাপ্ত সংবাদটি শুনাইতেছে। নেপথ্যে আবহসংগীত চলিয়াছে।

ওয়াইপ্।

প্রাসাদমূলে এক নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া মঞ্জুলা রাজভবনের একটি বর্ষীয়সী পরিচারিকাকে গোপন খবরটি দিতেছে। নেপথ্যে যন্ত্রসংগীত।

ওয়াইপ্।

কণ্চুকীর কক্ষ। পরিচারিকা কণ্চুকী মহাশয়ের নিকট সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। সম্ভবত পরিচারিকা কণ্চুকীর গুপ্তচর। কণ্চুকীর স্বাভাবিক তিক্ত মুখভাব সংবাদ শ্রবণে যেন আরও তিক্ত হইয়া উঠিল। সে কুণ্চিত চক্ষে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

[মণ্টাজ্ এইখানে শেষ হইবে]

কাট্।

ভানুমতীর কক্ষে কালিদাস রতিবিলাপ নামক চতুর্থ সর্গ পাঠ শেষ করিতেছেন। এই পর্যন্তই লেখা হইয়াছে। রতির নব-বৈধ্যব্যের মর্মান্তিক বর্ণনা শুনিয়া ভানুমতী কাঁদিয়াছেন; তাঁহার চক্ষু দুটি অরুণাভ। মালিনীর গণ্ডস্থলও অশ্রুধারায় অভিষিক্ত।

পাঠ শেষ করিয়া কালিদাস ধীরে ধীরে পুঁথি বন্ধ করিলেন। অণ্চলে চক্ষু মুছিয়া ভানুমতী আর্দ্র তদ্গত কণ্ঠে বলিলেন—

ভানুমতীঃ ধন্য কবি! ধন্য মহাভাগ!

কাট্।

গুপ্ত অলিন্দ। কণ্চুকী রন্ধ্রমুখে উঁকি মারিতেছে। কক্ষ হইতে কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল; রাণী বলিতেছেন—

ভানুমতীঃ আবার কতদিনে দর্শন পাব?

কালিদাসঃ দেবি, আপনার অনুগ্রহ লাভ ক'রে আমি কৃতার্থ; যখন আদেশ করবেন তখনই আসব। কিন্তু কাব্য শেষ হতে এখনও বিলম্ব আছে—

কাট্।

ভানুমতীর কক্ষ। কালিদাস পুঁথি লইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছেন
ভানুমতী আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন—

ভানুমতীঃ না না, শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারব না—

কালিদাসঃ (স্মিতমুখে) বেশ, পরের সর্গ শেষ করে আমি আবার আসব।

যুক্ত করে শির অবনত করিয়া কালিদাস ভানুমতীকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন
করিলেন; তারপর মালিনীর দিকে ফিরিলেন।

কাট্।

গুপ্ত অলিন্দ। কঞ্চুকী রন্ধ্রমুখে উঁকি মারিতেছে; কিন্তু কক্ষ হইতে আর কোনও শব্দ আসিল না। তখন সে রন্ধ্রমুখ হইতে সরিয়া আসিয়া ক্ষণকাল ভ্রূবদ্ধ ললাটে চিন্তা করিল। তারপর শিখার গ্রন্থি খুলিয়া আবার তাহা বাঁধিতে বাঁধিতে প্রস্থান করিল।

ডিজল্‌ভ্।

বিক্রমাদিত্যের অস্ত্রাগার। একটি বৃহৎ কক্ষ; নানাবিধ বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্রে প্রাচীরগুলি সুসজ্জিত। এই অস্ত্রগুলির উপর মহারাজের যত্ন ও মমতার অন্ত নাই; তিনি স্বহস্তে এগুলিকে প্রতিনিয়ত মার্জন করিয়া থাকেন।

বর্তমানে, কক্ষের মধ্যস্থলে একটি বেদিকার প্রান্তে বসিয়া তিনি তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় তরবারিটি পরিষ্কার করিতেছেন। তাঁহার পাশে ঈষৎ পশ্চাতে কঞ্চুকী দাঁড়াইয়া নিম্নস্বরে কথা বলিতেছে। রাজার মুখ বৈশাখী মেঘের মত অন্ধকার; চোখে মাঝে মাঝে বিদ্যুদ্বহ্নির চমক খেলিতেছে। তিনি কিন্তু কঞ্চুকীর মুখের পানে তাকাইতেছেন না।

কঞ্চুকী বার্তা শেষ করিয়া বলিল—

কঞ্চুকীঃ যেখানে স্বয়ং মহাদেবী—এ°—লিপ্ত রয়েছেন সেখানে আমার স্বাধীনভাবে কিছু করবার অধিকার নেই। এখন দেবপাদ মহারাজের যা অভিরুচি।

মহারাজ তাঁহার চক্ষু তরবারি হইতে তুলিয়া ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া কঞ্চুকীর পানে চাহিলেন; কয়েক মুহূর্ত তাঁহার খরধার দৃষ্টি কঞ্চুকীর মুখের উপর স্থির হইয়া রহিল। তারপর আবার তরবারিতে মনোনিবেশ করিয়া রাজা সংযত ধীর কণ্ঠে কহিলেন—

বিক্রমাদিত্যঃ এখন কিছু করবার দরকার নেই। শুধু লক্ষ্য রাখবে। সে—সে-ব্যক্তি আবার যদি আসে, তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দেবে।

কঞ্চুকী মাথা ঝুঁকাইয়া সম্মতি জানাইল। তাহার বিকৃত মনোবৃত্তি যে এই ব্যাপারে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার স্বভাব-তিক্ত মুখ দেখিয়াও বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

ডিজল্‌ভ্।

স্ফটিক নির্মিত একটি বালু-ঘটিকা। ডমরুর ন্যায় আকৃতি; উপরের গোলক হইতে নিম্নতন গোলকে বালুর শীর্ণ ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে।

উপরের ঘটনার পর কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে।

ডিজল্‌ভ্।

ভানুমতীর কক্ষ। কবির জন্য মৃগচর্ম ও পুঁথি রাখিবার কাষ্ঠাসন যথাস্থানে ন্যস্ত হইয়াছে।

ভানুমতী নতজানু হইয়া পরম শ্রদ্ধাভরে কাষ্ঠাসনটি ফুল দিয়া সাজাইয়া দিতেছেন। কক্ষে অন্য কেহ নাই।

মালিনী দ্বারের নিকটে প্রবেশ করিয়া মস্তক-সঞ্চালনে ইঙ্গিত করিল। প্রত্যুত্তরে ভানুমতী ঘাড় নাড়িলেন, তারপর তিরস্করিণীর আড়ালে নিজ আসনে গিয়া বসিলেন।

মালিনী হাতছানি দিয়া কবিকে ডাকিল। কবিও পুঁথিহস্তে আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

কাট্।

বিক্রমাদিত্যের অস্ত্রাগার। রাজা একাকী বসিয়া একটি চর্মনির্মিত গোলাকৃতি ঢাল পরিষ্কার করিতেছেন।

কঞ্চুকী বাহির হইতে আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল; মহারাজ তাহার দিকে মুখ তুলিলেন। কঞ্চুকী কিছুক্ষণ স্থিরনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া, যেন রাজার অকথিত প্রশ্নের উত্তরে ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িল।

রাজা ঢাল রাখিয়া দ্বারের কাছে গেলেন। দ্বারের পাশে প্রাচীরে একটি কোষবদ্ধ তরবারি ঝুলিতেছিল, কঞ্চুকী সেটি তুলিয়া লইয়া অত্যন্ত অর্থপূর্ণভাবে রাজার সম্মুখে ধরিল। রাজা একবার কঞ্চুকীকে তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন; তারপর তরবারি স্বহস্তে লইয়া কক্ষের বাহির হইলেন। কঞ্চুকী পিছে পিছে চলিল।

কাট্।

রাণীর কক্ষে কালিদাস পার্বতীর তপস্যা অংশ পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন। কপোল-ন্যস্ত-হস্তা ভানুমতী অবহিত হইয়া শুনিতেছেন; তাঁহার দুই চক্ষে নিবিড় রস-তন্ময়তার স্বপ্নাভাস।

কাট্।

গুপ্ত অলিন্দ। কোষবদ্ধ তরবারি হস্তে মহারাজ আসিতেছেন, পশ্চাতে কঞ্চুকী। রন্ধ্রের সম্মুখে আসিয়া মহারাজ দাঁড়াইলেন; রন্ধ্রপথে একবার দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। তারপর সেইদিকে কর্ণ ফিরাইয়া রন্ধ্রাগত স্বর-গুঞ্জন শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ পূর্ববৎ কঠিন ও ভয়াবহ হইয়া রহিল।

রন্ধ্রপথে ছন্দোবদ্ধ শব্দের অস্পষ্ট গুঞ্জরণ আসিতেছে। শুনিতে শুনিতে রাজা প্রাচীরে স্কন্ধভার অর্পণ করিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু হাতের তরবারিটা অস্বস্তিদায়ক; সেটা কয়েকবার এহাত-ওহাত করিয়া শেষে কঞ্চুকীর হাতে ধরাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কঞ্চুকী মহারাজের দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিল; কিন্তু তাঁহার বজ্র কঠিন মুখ দেখিয়া মানসিক ক্রিয়া অনুমান করিতে পারিল না। সে ঈষৎ উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল—কী আশ্চর্য! মহারাজ এখনও ক্ষেপিয়া যাইতেছেন না কেন?

ডিজল্ভ্।

রাণীর কক্ষ। কালিদাস পাঠ শেষ করিয়া পুঁথি বাঁধিতেছেন। রাণীর দিকে মুখ তুলিয়া স্মিত-হাস্যে বলিলেন—

কালিদাসঃ এই পর্যন্তই হয়েছে মহারাণী।

ভানুমতী প্রশ্ন করিলেন—

ভানুমতীঃ কবি, বাকিটুকু কতদিনে শুনতে পাব? আমার মন যে আর ধৈর্য মান্‌ছে না? কবে কাব্য শেষ হবে?

কালিদাসঃ মহাকাল জানেন। তিনিই স্রষ্টা, আমি অনুলেখক মাত্র। এবার অনুমতি দিন আর্যা।

কবি উঠিবার উপক্রম করিলেন।

কাট্।

গুপ্ত অলিন্দ। রাজা এতক্ষণ দেওয়ালে ঠেস দিয়া ছিলেন, হঠাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। কঞ্চুকী মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, তাড়াতাড়ি তরবারিটি বাড়াইয়া দিল। রাজা তরবারির পানে আরক্ত দৃষ্টিপাত করিয়া সেটি নিজ হস্তে লইলেন; এক ঝট্‌কায় উহা কোষমুক্ত করিয়া, কোষ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দীর্ঘ পদক্ষেপে বাহিরে চলিলেন।

কঞ্চুকীর মনে আশা জাগিল, এতক্ষণে রাজার রক্ত গরম হইয়াছে। উৎফুল্ল মুখে কোষটি কুড়াইয়া লইয়া সে তাঁহার অনুবর্তী হইল।

কাট্।

রাণীর কক্ষ। কালিদাস উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন; ভানুমতীও দাঁড়াইয়া যুক্তকরে কবিকে বিদায় দিতেছেন। মালিনী দ্বারের দিকে চলিয়াছে; কবিকে অবরোধের বাহির পর্যন্ত সাবধানে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

সহসা প্রবল তাড়নে দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। মুক্ত তরবারি হস্তে বিক্রমাদিত্য সম্মুখে দাঁড়াইয়া। মালিনী সভয়ে পিছাইয়া আসিয়া একটি আর্ত চীৎকার কণ্ঠমধ্যে রোধ করিল।

রাজা প্রবেশ করিলেন; পশ্চাতে কঞ্চুকী। রাজার তীব্রোজ্জ্বল চক্ষু একবার কক্ষের চারিদিকে বিচরণ করিলঃ মালিনী এক কোণে মিশিয়া গিয়া থরথর কাঁপিতেছে; কালিদাস তাঁহার নিজের ভাষায় 'চিত্রার্পিতারম্ভ' ভাবে দাঁড়াইয়া; মহাদেবী ভানুমতী প্রশান্তনেত্রে রাজার পানে চাহিয়া আছেন, যেন তাঁহার মন হইতে কাব্যের ঘোর এখনও কাটে নাই।

কবির দিকে একবার কঠোর দৃক্‌পাত করিয়া রাজা ভানুমতীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন; দুইজন নিষ্পলক স্থির দৃষ্টিতে পরস্পর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে রাণীর মুখে ঈষৎ কৌতুক হাস্য দেখা দিল। রাজা অন্তর্গূঢ় চাপা গর্জনে বলিলেন—

বিক্রমাদিত্যঃ মহাদেবি ভানুমতি, এই কি তোমার উচিত কাজ হয়েছে!

ভানুমতীঃ কী কাজ আর্যপুত্র?

বিক্রমাদিত্যঃ এই দেবভোগ্য কবিতা তুমি একা-একা ভোগ করছ! আমাকে পর্যন্ত ভাগ দিতে পারলে না! এত কৃপণ তুমি!

কক্ষ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কালিদাসের মুখে-চোখে নবোদিত বিস্ময়। কঞ্চুকী হঠাৎ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া খাবি খাওয়ার মত শব্দ করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ তাহার দিকে পরুষ দৃষ্টি ফিরাইলেন; কঞ্চুকীর অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, সে ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া উঠিল—

কঞ্চুকীঃ মহারাজ,আমি—আমি বুঝতে পারিনি—

বিক্রমাদিত্য ঈষৎ চিন্তা করিবার ভাণ করিলেন।

বিক্রমাদিত্যঃ সম্ভব। তুমি জানতে না যে পাশার বাজি জিতে মহাদেবী আমার কাছ থেকে এই পণ চেয়ে নিয়েছিলেন। যাও, তোমাকে ক্ষমা করলাম। কিন্তু—ভবিষ্যতে মহাদেবী ভানুমতী সম্বন্ধে মনে মনেও আর এমন ধৃষ্টতা কোরো না।

বিক্রমাদিত্য হাতের তরবারিটা কঞ্চুকীর দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। মসৃণ মেঝের উপর পড়িয়া তরবারি পিছলাইয়া কঞ্চুকীর দুই পায়ের ফাঁক দিয়া গলিয়া গেল। কঞ্চুকী লাফাইয়া উঠিল; তারপর তরবারি কুড়াইয়া লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

রাজার মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল। তিনি কালিদাসের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন; কবির স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিলেন—

বিক্রমাদিত্যঃ তরুণ কবি, তোমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করা আমার পক্ষে আরও কঠিন। তুমি আমাকে উপেক্ষা করে রাণীকে তোমার কাব্য শুনিয়েছ! তোমার কি বিশ্বাস বিক্রমাদিত্য শুধু যুদ্ধ করতেই জানে, কাব্যের রসাস্বাদ গ্রহণ কতে পারে না?

কালিদাস ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন—

কালিদাসঃ মহারাজ—আমি—

বিক্রমাদিত্য কপট ক্রোধে তর্জনী তুলিলেন—

বিক্রমাদিত্যঃ কোনো কথা শুনব না। তোমার শাস্তি, আবার তোমার কাব্য গোড়া থেকে শোনাতে হবে। আড়াল থেকে যতটুকু শুনেছি তাতে অতৃপ্তি আরো বেড়ে গেছে—

রাণীর দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন—

এস দেবি, আমরা দু'জনে কবির পায়ের কাছে বসে আজ দেব-দম্পতির মিলন-গাথা শুনব।

রাজা ও রাণী পাশাপাশি ভূমির উপর উপবেশন করিলেন; কালিদাস ঈষৎ লজ্জিতভাবে নিজ আসনে বসিবার উপক্রম করিলেন।

মালিনী এতক্ষণ এক কোণে লুকাইয়া কাঁপিতেছিল, এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন অনুভব করিয়া দ্বিধাজড়িত পদে বাহির হইয়া আসিল। কবিকে অক্ষতদেহে আবার কাব্যপাঠের উদ্যোগ করিতে দেখিয়া তাহার মন নির্ভয় হইল—বিপদ বুঝি কাটিয়াছে।

রাজা মালিনীকে দেখিতে পান নাই, কালিদাসকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—

বিক্রমাদিত্যঃ কবি, কাব্যপাঠ আরম্ভ করবার আগে তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। আজ থেকে তুমি আমার সভার সভাকবি হ'লে।

কালিদাস বিব্রত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

কালিদাসঃ না না মহারাজ, আমি এ সম্মানের যোগ্য নই।

বিক্রমাদিত্যঃ সেকথা বিশ্ববাসী বিচার করুক। আগামী বসন্তোৎসবের দিন আমি মহাসভা আহ্বান করব, দেশ দেশান্তরের রাজা পণ্ডিত রসজ্ঞদের নিমন্ত্রণ করব—তাঁরা এসে তোমার গান শুনবেন।

কালিদাস অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিলেন; রাজা পুনশ্চ বলিলেন—

বিক্রমাদিত্যঃ কিন্তু বসন্তের কোকিলের মত তুমি কোথা থেকে এলে কবি? কোথায় এতদিন লুকিয়ে ছিলে? কোথায় তোমার গৃহ?

মালিনী এতক্ষণে রাজার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; কালিদাস ইতস্তত করিতেছেন দেখিয়া সে আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল—

মালিনীঃ উনি যে নদীর ধারে কুঁড়েঘর তৈরি করেছেন, সেইখানেই থাকেন।

রাজা ঘাড় ফিরাইয়া মালিনীকে দেখিলেন, তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া পাশে বসাইলেন—

বিক্রমাদিত্যঃ দূতী! দূতী! তুমি ফুলের বেসাতি কর, না—ভোমরার?

মালিনীঃ (ঈষৎ ভয় পাইয়া) ফু-ফুলের, মহারাজ।

বিক্রমাদিত্যঃ হুঁ। ভেবেছ তোমার কথা আমি কিছু জানি না! সব জানি। আর শাস্তিও দেব তেমনি। কঞ্চুকীর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব—তখন বুঝবে।

পরিহাস বুঝিতে পারিয়া মালিনী হাসিল। রাজা কালিদাসের পানে ফিরিলেন—

বিক্রমাদিত্যঃ কিন্তু নদীর তীরে কুঁড়েঘর! তা তো হতে পারে না কবি। তোমার জন্যে নগরে প্রাসাদ নির্দিষ্ট হবে, তুমি সেখানেই থাকবে।

কালিদাস হাত জোড় করিলেন

কালিদাসঃ মহারাজ, আপনার অসীম কৃপা। কিন্তু আমার কুটিরে আমি পরম সুখে আছি।

বিক্রমাদিত্যঃ কিন্তু কবিকে বিষয় চিন্তা থেকে মুক্তি দেওয়া রাজার কর্তব্য। নইলে কবি কাব্য রচনা করবেন কি করে? অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ!

কালিদাসঃ মহারাজ, আমার কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই। মহাকাল আমাকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে অধিক আমি কামনাও করি না। মনের অভাবই অভাব মহারাজ।

বিক্রমাদিত্যঃ ধন সম্পদ চাও না?

কালিদাসঃ না মহারাজ। আমি মহাকালের সেবক। আমার দেবতা চির-নগ্ন, তাই তিনি চিরসুন্দর। আমি যেন চিরদিন আমার এই নগ্নসুন্দর দেবতার উপাসক থাকতে পারি।

রাজা মুগ্ধ প্রফুল্ল নেত্রে কিছুকাল চাহিয়া রহিলেন, তারপর অস্ফুটস্বরে কহিলেন—

বিক্রমাদিত্যঃ ধন্য কবি! তুমিই যথার্থ কবি!—কিন্তু—(মালিনীর দিকে ফিরিয়া) মালিনী, তুমি বলতে পার, কবি তাঁর কুটিরে মনের সুখে আছেন?

মালিনী কালিদাসের পানে চাহিল; তাহার চক্ষু রসনিবিড় হইয়া আসিল। একটু হাসিয়া সে বলিল—

মালিনীঃ হ্যাঁ মহারাজ, মনের সুখে আছেন।

বিক্রমাদিত্য একটি নিশ্বাস ফেলিলেন

বিক্রমাদিত্যঃ ভাল। এবার তবে কাব্যপাঠ আরম্ভ হোক!

কালিদাস পুঁথি খুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

অবন্তীর বিশাল রাজমন্ত্রণাগারের একটি বৃহৎ কক্ষ। প্রায় পঞ্চাশজন মসীজীবী অনুলেখক সারি দিয়া ভূমির উপর বসিয়াছে। প্রত্যেকের সম্মুখে একটি করিয়া ক্ষুদ্র অনুচ্চ কাষ্ঠাসন; তদুপরি মসীপাত্র ভূর্জপত্রের কুণ্ডলী প্রভৃতি।

স্বয়ং জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ একটি লিখিত পত্র হস্তে লইয়া অনুলেখকগণের সম্মুখে পাদচারণ করিতেছেন এবং পত্রটি উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিতেছেন; অনুলেখকগণ শুনিয়া শুনিয়া লিখিয়া চলিয়াছে—

জ্যেষ্ঠ-কায়স্থঃ ...আগামী মধু-পূর্ণিমা তিথিতে মদন মহোৎসববাসরে—হুম্ হুম্—সভাকবি শ্রীকালিদাস বিরচিত—অহহ—কুমারসম্ভবম্ নামক মহাকাব্য অবন্তীর রাজসভায় পঠিত হইবে। অথ শ্রীমানের—বিকল্পে শ্রীমতীর অহহহ—চরণ-রেণুকণা স্পর্শে অবন্তীর রাজসভা পবিত্র হোক—হুম্—

ওয়াইপ্।

মন্ত্রগৃহ। বিক্রমাদিত্য বসিয়া আছেন। তাঁহার একপাশে স্তূপীকৃত নিমন্ত্রণলিপির কুণ্ডলী; মহামন্ত্রী একটি করিয়া লিপি রাজার সম্মুখে ধরিতেছেন, দ্বিতীয় একটি কর্মিক দ্রবীভূত জতু একটি ক্ষুদ্র দর্বীতে লইয়া পত্রের উপর ঢালিয়া দিতেছে, মহারাজ তাহার উপর অঙ্গুরীয়-মুদ্রার ছাপ দিতেছেন।

বিক্রমাদিত্যঃ ...উত্তরাপথে দক্ষিণাপথে যেখানে যত জ্ঞানী গুণী রসজ্ঞ আছেন—পুরুষ নারী—কেউ যেন বাদ না পড়ে—

ওয়াইপ্।

উজ্জয়িনী নগরীর পূর্ব তোরণ। তোরণ হইতে তিনটি পথ বাহির হইয়াছে; দুইটি পথ প্রাকারের ধার ঘেঁষিয়া উত্তরে ও দক্ষিণে গিয়াছে, তৃতীয়টি তীরের মত সিধা পূর্বমুখে গিয়াছে।

পঞ্চাশজন অশ্বারোহী রাজদূত তোরণ হইতে বাহিরে আসিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইল। পৃষ্ঠে আমন্ত্রণ-লিপির বস্ত্র-পেটিকা ঝুলিতেছে, অস্ত্রশস্ত্রের বাহুল্য নাই।

গোপুরশীর্ষ হইতে দুন্দুভি ও বিষাণ বাজিয়া উঠিল। অমনি অশ্বারোহীর শ্রেণী তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল; দুই দল উত্তরে ও দক্ষিণে চলিল, মাঝের দল ময়ূরসঞ্চারী গতিতে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইল।

ডিজল্ভ্।

কুন্তলের রাজভবন ভূমি। পূর্বোল্লিখিত সরোবরের মর্মর সোপানের উপর রাজকুমারী একাকিনী বসিয়া আছেন। মুখে চোখে হতাশা ও নৈরাশ্য পদাঙ্ক মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে; কেশবেশ অযত্ন-

বিন্যস্ত।' বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন যেন তাঁহার শেষ হইয়া গিয়াছে।

সরোবরের জল বায়ুস্পর্শে কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে; রাজকুমারী লীলাকমলের পাপ্ড়ি ছিঁড়িয়া জলে ফেলিতেছেন; কোনটি নৌকার মত ভাসিয়া যাইতেছে, কোনটি ডুবিতেছে।

অদূরে একটি তরুশাখায় হেলান দিয়া বিদ্যুল্লতা গান গাহিতেছে; তাহার গীত কতক রাজকুমারীর কানে যাইতেছে, কতক যাইতেছে না।

বিদ্যুল্লতাঃ

ভাস্‌ল আমার ভেলা—
সাগর-জলে নাগর-দোলা ওঠা-নামার খেলা
সেথা ভাস্‌ল আমার ভেলা।
অকূলে—কূল পাবে কিনা—কে জানে!
বাতাসে—বাজবে প্রলয় বীণা?—কে জানে?
কে জানে আসবে রাতি, হারাবে সাথের সাথী
আঁধারে ঝড়-তুফানের বেলা
—ভাস্‌ল আমার ভেলা।

গান শেষ হইয়া গেল। রাজকুমারী তাঁহার ভাসমান পদ্মপলাশগুলির পানে চাহিয়া ভাবিতেছেন—

রাজকুমারীঃ দিনের পর দিন...আজকের দিন শেষ হল...আবার কাল আছে...তারপর আবার কাল...কালের কি অবধি নেই—?

রাজকুমারীর পশ্চাতে অনতিদূরে চতুরিকা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহার হাতে কুণ্ডলিত নিমন্ত্রণ-লিপি। ক্ষুব্ধমুখে একটু ইতস্তত করিয়া সে রাজকুমারীর পাশে আসিল, সোপানের পৈঠার উপর পা মুড়িয়া বসিতে বসিতে বলিল—

চতুরিকাঃ পিয়সহি, অবন্তী থেকে আমন্ত্রণ এসেছে—তোমার জন্যে স্বতন্ত্র লিপি—

নিরুৎসুকভাবে লিপি লইয়া রাজকুমারী উহার জতুমুদ্রা দেখিলেন, তারপর খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। চতুরিকা বলিয়া চলিল—

চতুরিকাঃ মহারাজ সভা থেকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরও আলাদা নিমন্ত্রণ-লিপি এসেছে কিন্তু তিনি যেতে পারবেন না। বলে পাঠালেন, তুমি যদি যেতে চাও তিনি খুব খুশী হবেন।

লিপি পাঠ শেষ করিয়া রাজকুমারী আবার উহা কুণ্ডলাকারে জড়াইতে লাগিলেন; যেন চতুরিকার কথা শুনিতে পান নাই এমনিভাবে জলের পানে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঈষৎ তিক্ত হাসি তাঁহার মুখে দেখা দিল; তিনি লিপি জলে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু ফেলিলেন না। চতুরিকার দিকে ফিরিয়া অবসন্ন কণ্ঠে কহিলেন—

রাজকুমারীঃ পিতা সুখী হবেন? বেশ—যাব।

ডিজল্‌ভ্‌।

উজ্জয়িনীর পূর্ব দ্বার; পুষ্প, পল্লব ও তোরণমাল্যে শোভা পাইতেছে। আজ মদন মহোৎসব।

তিনটি পথ দিয়া পিপীলিকাশ্রেণীর মত মানুষ আসিয়া তোরণের রন্ধ্রমুখে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। রাজন্যগণ হস্তীর গলঘণ্টা বাজাইয়া মন্দ-মন্থর গমনে আসিতেছেন; যোদ্ধৃবেশধারী পদাতি, অশ্ব, এমন কি উষ্ট্রও আছে। মাঝে মাঝে দু'একটি চতুর্দোলা আসিতেছে; সূক্ষ্ম আবরণের ভিতর লঘু মেঘাবৃত শরচ্চন্দ্রের ন্যায় সম্ভ্রান্ত আর্যমহিলা।

একটি দোলা তোরণ মধ্যে প্রবেশ করিল; সঙ্গে সহচর কেহ নাই। দোলার ক্ষীণাবরণের মধ্যে এক সুন্দরী বিমনাভাবে করতলে কপোল রাখিয়া বসিয়া আছেন; দূর হইতে দেখিয়া অনুমান হয়—ইনি কুন্তলের রাজকুমারী।

কাট্।

রাজসভার প্রবেশদ্বার। দ্বারে মহামন্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজন উচ্চ কর্মচারী দাঁড়াইয়া আছেন। অতিথিগণ একে একে দুয়ে দুয়ে আসিতেছেন, মহামন্ত্রী তাঁহাদের পদোচিত অভ্যর্থনাপূর্বক তিলক চন্দন ও গন্ধমাল্যে ভূষিত করিয়া সভার অভ্যন্তরে প্রেরণ করিতেছেন।

নেপথ্যে বসন্তরাগে মধুর বাঁশী বাজিতেছে।

কাট্।

সভার অভ্যন্তর। বক্তার বেদী ব্যতীত অন্য সব আসনগুলি ক্রমশ ভরিয়া উঠিতেছে। সন্নিধাতা কিংকরগণ সকলকে নির্দিষ্ট আসনে লইয়া গিয়া বসাইতেছে। ঊর্ধ্বে মহিলাদের মঞ্চেও অল্প শ্রোত্রী সমাগম হইতে আরম্ভ করিয়াছে; তবে মহাদেবীর আসন এখনও শূন্য আছে।

কাট্।

কালিদাসের কুটির প্রাঙ্গণ। কালিদাস সভায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, মালিনী তাঁহার ললাটে চন্দন পরাইয়া দিতেছে। মালিনীর চোখদুটি একটু অরুণাভ। যেন সে লুকাইয়া কাঁদিয়াছে। সে থাকিয়া থাকিয়া দন্তদ্বারা অধর চাপিয়া ধরিতেছে।

কুমারসম্ভবের পুঁথি বেদীর উপর রাখা ছিল; তাহা কালিদাসের হাতে তুলিয়া দিতে দিতে মালিনী একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—

মালিনীঃ এতদিন তুমি আমার কবি ছিলে, আজ থেকে সারা পৃথিবীর কবি হলে। কত লোক তোমার গান শুনবে, ধন্যি ধন্যি করবে—

কালিদাস সলজ্জে একটু হাসিলেন।

কালিদাসঃ কী যে বল! আমার কাব্য লেখার চেষ্টা বামন হয়ে চাঁদের পানে হাত বাড়ানো।—সবাই হয়তো হাসবে।

তাঁহার বিনয়-বচনে কান না দিয়া মালিনী বলিল—

মালিনীঃ আজ পৃথিবীর যত জ্ঞানী-গুণী সবাই তোমার গান শুনবে, কেবল আমিই শুনতে পাব না—

কালিদাস সবিস্ময়ে চোখ তুলিলেন।

কালিদাসঃ তুমি শুনতে পাবে না!—কেন?

মালিনীঃ সভায় কত রাজা রাণী, কত বড় বড় লোক এসেছেন, সেখানে আমাকে কে জায়গা দেবে কবি?

কালিদাসের মুখের ভাব দৃঢ় হইয়া উঠিল; তিনি মালিনীর একটি হাত নিজের হাতে তুলিয়া ধীর স্বরে কহিলেন—

কালিদাসঃ রাজসভায় যদি তোমার জায়গা না হয়, তাহলে আমারও জায়গা হবে না। এস।

মালিনীর চক্ষুদুটি সহসা-উদ্গত অশ্রুজলে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অধর কাঁপিয়া উঠিল।

রাজসভা। সকলে স্ব স্ব আসনে বসিয়াছেন, সভায় তিল ফেলিবার স্থান নাই। রাজ বৈতালিক প্রধান বেদীর উপর যুক্ত করে দাঁড়াইয়া মহামান্য অতিথিগণের সাদর সম্ভাষণ গান করিতেছে। কিন্তু সেজন্য সভার জল্পনা গুঞ্জন শান্ত হয় নাই। সকলেই প্রতিবেশীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছে, চারিদিকে ঘাড় ফিরাইয়া সভার অপূর্ব শিল্পশোভা দেখিতেছে, স্বেচ্ছামত মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে।

উপরে মহিলামঞ্চও কলভাষিণী মহিলাপুঞ্জে ভরিয়া উঠিয়াছে। কেন্দ্রস্থলে মহাদেবীগণের স্বতন্ত্র আসন কিন্তু এখনও শূন্য।

বৈতালিক স্তবগান গাহিয়া চলিয়াছে।

মহিলামঞ্চের দ্বারের কাছে মহাদেবী ভানুমতীকে আসিতে দেখা গেল। তিনি কুন্তলরাজ-কুমারীর হাত ধরিয়া হাস্যালাপ করিতে করিতে আসিতেছেন। কুন্তলকুমারীও সময়োচিত প্রফুল্লতার সহিত কথা কহিতেছেন। মনে হয় উৎসবের আবহাওয়ায় আসিয়া তাঁহার অবসাদ কিয়ৎপরিমাণে দূর হইয়াছে।

তাঁহারা স্বীয় আসনে গিয়া পাশাপাশি বসিলেন। রাজবংশজাতা আর কোনও মহিলা বোধ হয় আসেন নাই, একা কুন্তলকুমারীই আসিয়াছেন। সেকালের মহিলা-মহলে বিদ্যা-চর্চার সমধিক অসদ্ভাব ছিল বলিয়া অনুমান হয়। তাই যে দুই চারিটি বিদুষী নারী দেখা দিতেন, তাঁহারা অতিমাত্রায় সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া উঠিতেন।

বৈতালিকের স্তুতিগান শেষ হইয়া আসিতেছে।

মালিনী ভীরু-সসঙ্কোচপদে মহিলামঞ্চের দ্বারের কাছে আসিয়া ভিতরে উঁকি মারিল। ভিতরে আসিয়া অন্যান্য মহিলাগণের সহিত একাসনে বসিবার সাহস নাই; সে দ্বারের কাছেই ইতস্তত করিতে লাগিল। তাহার হাতে একটি ফুলের মালা ছিল; অশোক ও যূথী দিয়া গঠিত; খানিকটা লাল, খানিকটা সাদা। মালাগাছি লইয়াও বিপদ—পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে, পাছে কেহ হাসে। অবশেষে মালিনী মালাটি কোঁচড়ের মধ্যে লুকাইয়া দ্বারের পাশেই মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। এখান হইতে গলা বাড়াইলে নিম্নে বক্তার বেদী সহজেই দেখা যায়।

বৈতালিকের গান শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোর রবে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়া সভাগৃহ মধ্যে তুমুল শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করিল।

ওয়াইপ্।

সভা একেবারে শান্ত হইয়া গিয়াছে, পাতা নড়িলে শব্দ শোনা যায়।

কালিদাস বেদীর উপর বসিয়াছেন; সম্মুখে উন্মুক্ত পুঁথি। তিনি একবার প্রশান্ত চক্ষে সভার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তারপর মন্দ্র কণ্ঠে পাঠ আরম্ভ করিলেন—

কালিদাসঃ কুমারসম্ভবম্।—

'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়োনাম নগাধিরাজঃ—'

মহিলামঞ্চের মধ্যস্থলে কুন্তলকুমারী নির্নিমেষ বিস্ফারিত নেত্রে নিম্নে কালিদাসের পানে চাহিয়া আছেন। এ কে? সেই মূর্তি, সেই কণ্ঠস্বর! তবে কি—তবে কি—?

কালিদাসের উদাত্ত কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে—হিমালয়ের বর্ণনা—

কালিদাসঃ 'পূর্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।'

ডিজল্ভ্।

তুষারমৌলী হিমালয়ের কয়েকটি দৃশ্য। দূর হইতে একটি অধিত্যকা দেখা গেল; তথায় একটি ক্ষুদ্র কুটির ও লতাবিতান। পতিনিন্দা শুনিয়া সতী প্রাণ বিসর্জন দিবার পর মহেশ্বর এই নির্জন স্থানে উগ্র তপস্যায় রত আছেন।

কালিদাস শ্লোকের পর শ্লোক পড়িয়া চলিয়াছেন, তাঁহার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর এই দৃশ্যগুলির উপর সঞ্চারিত হইতেছে।

কাট্।

রাজসভার দৃশ্য। বিশাল সভা চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া আছে; কালিদাসের কণ্ঠস্বর এই নীরব একাগ্রতার মধ্যে মৃদঙ্গের ন্যায় মন্দ্রিত হইতেছে।

মহিলামঞ্চে কুন্তলকুমারী তন্দ্রাহতার মত বসিয়া শুনিতেছেন; বাহ্যজ্ঞান বিরহিত, চক্ষু নিষ্পলক; কখনও বক্ষ ভেদ করিয়া নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিতেছে, কখনও গণ্ড বহিয়া অশ্রুর ধারা নামিতেছে; তিনি জানিতেও পারিতেছেন না।

ওয়াইপ্।

হিমালয়ের অধিত্যকায় মহেশ্বরের কুটির। লতাগৃহদ্বারে নন্দী প্রকোষ্ঠে হেমবেত্র লইয়া দণ্ডায়মান। বেদীর উপর যোগাসনে বসিয়া মহেশ্বর ধ্যানমগ্ন।

মহেশ্বরের আকৃতির সহিত কালিদাসের আকৃতির কিছু সাদৃশ্য থাকিবে; কাব্যে কবির নিজ বৃত্তান্ত যে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ করিয়াছে ইহা তাহারই ইঙ্গিত।

বনপথ দিয়া গিরিকন্যা উমা কুটিরের পানে আসিতেছেন; দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া কুন্তল-কুমারী বলিয়া ভ্রম হয়। হস্তে ফুল জল সমিধপূর্ণ পাত্র।

বেদীপ্রান্তে পৌঁছিয়া উমা নতজানু হইয়া মহেশ্বরকে প্রণাম করিলেন। শঙ্কর ধ্যানমগ্ন।

ডিজল্‌ভ্।

মেঘলোকে ইন্দ্রসভা। ইন্দ্র ও দেবগণ মুহ্যমানভাবে বসিয়া আছেন। মদন ও বসন্ত প্রবেশ করিলেন। মদনের কণ্ঠে পুষ্পধনু; বসন্তের হস্তে চূত-মঞ্জরী।

ইন্দ্র সাদরে মদনের হাত ধরিয়া বলিলেন—

ইন্দ্রঃ এস বন্ধু, আমাদের দারুণ বিপদে তুমিই একমাত্র সহায়।

কৈতববাদে স্ফীত হইয়া মদন সদর্পে বলিলেন—

মদনঃ আদেশ করুন দেবরাজ, আপনার প্রসাদে, অন্যে কোন ছার, স্বয়ং পিণাক-পাণির ধ্যানভঙ্গ করতে পারি।

দেবতাগণ সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। মদন ঈষৎ ত্রস্ত ও চকিত হইয়া সকলের মুখের পানে চাহিলেন। সত্যই মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে হইবে নাকি?

কাট্।

রাজসভা। কালিদাস কাব্য পাঠ করিয়া চলিয়াছেন,
সকলে রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছে।
মহিলামঞ্চে কুন্তলকুমারীর অবস্থা পূর্ববৎ—বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ভানুমতী তাহা লক্ষ্য
করিলেন, কিন্তু কিছু না বলিয়া কাব্য-শ্রবণে মন দিলেন।

ওয়াইপ্।

হিমালয়। সমস্ত প্রকৃতি শীতজর্জর, তুষার-কঠিন। বৃক্ষ নিষ্পত্র,
প্রাণীদের প্রাণ-চঞ্চলতা নাই।

মহেশ্বরের তপোবনের সন্নিকটে একটি শাখাসর্বস্ব বৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে। মদন ও বসন্তের সূক্ষ্ম দেহ এই বৃক্ষের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। অমনি সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষটি পুষ্পপল্লবে ভরিয়া উঠিল।

দূরে সহসা কোকিল-কাকলি শুনা গেল। হিমালয়ে
অকাল-বসন্ত আবির্ভাব হইয়াছে।

সহসা-হরিতায়িত বনভূমির উপর কিন্নর মিথুন নৃত্যগীত আরম্ভ করিল, পশু-পক্ষী ব্যাকুল বিস্ময়ে ছুটাছুটি ও কলকূজন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রমথগণ প্রমত্ত উদ্দাম হইয়া উঠিল।

নন্দী এই আকস্মিক বিপর্যয়ে বিব্রত হইয়া চারিদিকে কঠোর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; তারপর ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি রাখিয়া যেন জীবলোককে শাসন করিতে চাহিল—'চপলতা করিও না, মহেশ্বর ধ্যানমগ্ন!'

মহেশ্বর বেদীর উপর যোগাসনে উপবিষ্ট। চক্ষু ভ্রূমধ্যে স্থির, শ্বাস নাসাভ্যন্তরচারী; নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত দেহ নিশ্চল।

রুম ঝুম মঞ্জীরের শব্দ কাছে আসিতেছে; উমা যথানিয়ত পূজার উপকরণ লইয়া আসিতেছেন। নন্দী সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল।

মহেশ্বরের ধ্যাননিদ্রা ক্রমে তরল হইয়া আসিতেছে; তাঁহার নয়ন পল্লব ঈষৎ স্ফুরিত হইল।

লতাবিতানের এক কোণে লুকাইয়া মদন ধনুর্বাণ হস্তে সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে। পার্বতী আসিতেছেন—এই উপযুক্ত সময়।

পার্বতী আসিয়া বেদীমূলে প্রণাম করিলেন, তারপর নতজানু অবস্থায় স্মিত-সলজ্জ চক্ষু দুটি মহেশ্বরের মুখের পানে তুলিলেন। মদনের অদৃশ্য উপস্থিতি উভয়ের অন্তরেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল; মহাদেবের অরুণায়ত নেত্র পার্বতীর মুখের উপর পড়িল।

মদন এই অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সাবধানে লক্ষ্য স্থির করিয়া সম্মোহন বাণ নিক্ষেপ করিল।

মহেশ্বরের তৃতীয় নয়ন খুলিয়া গিয়া ধক্ ধক্ করিয়া ললাটবহ্নি নির্গত হইল— কে রে তপোবিঘ্নকারী! তিনি মদনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

হরনেত্রজন্মা বহ্নিতে মদন ভস্মীভূত হইল।

ভয়াব্যাকুলা উমা বেদীমূলে নতজানু হইয়া আছেন। মহেশ্বর বেদীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে একবার রুদ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

তারপর তাঁহার প্রলয়ংকর মূর্তি সহসা শূন্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কাট্।

মদনভস্ম নামক সর্গ শেষ করিয়া কালিদাস ক্ষণেকের জন্য নীরব হইলেন; সভাও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। এতগুলি মানুষ যে সভাগৃহে বসিয়া আছে শব্দ শুনিয়া তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

কালিদাস পুঁথির পাতা উল্টাইলেন; তারপর আবার নূতন সর্গ পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

রতি বিলাপ শুনিয়া কুন্তলকুমারীর চক্ষে অশ্রুর ধারা বহিল। ভানুমতী আবার নূতন করিয়া কাঁদিলেন। দ্বারপার্শ্বে মেঝেয় বসিয়া মালিনীও কাঁদিল। প্রিয়-বিয়োগে ব্যথা কাহাকে বলে এতদিনে সে বুঝিতে শিখিয়াছে।

ক্রমে কবি উমার তপস্যা অধ্যায়ে পৌঁছিলেন।

ডিজল্ভ্।

হিমালয়ের গহন গিরিসংকটের মধ্যে কুটির রচনা করিয়া রাজনন্দিনী উমা কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। পতিলাভার্থ তপস্যা; পর্ণ—অর্থাৎ আপনা হইতে ঝরিয়া পড়া গাছের পাতা— তাহাও পার্বতী আর আহার করেন না, তাই তাঁহার নাম হইয়াছে—অপর্ণা।

কৃচ্ছ্রসাধন বহুপ্রকার। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে তপঃকৃশা পার্বতী চারি কোণে অগ্নি জ্বালিয়া মধ্যস্থ আসনে বসিয়া প্রচণ্ড সূর্যের পানে নিষ্পলক চাহিয়া থাকেন। ইহা পঞ্চাগ্নি তপস্যা। আবার শীতের হিম-কঠিন রাত্রে সরোবরের জলের উপর তুষারের আস্তরণ পড়ে; সেই আস্তরণ ভিন্ন করিয়া উমা জলমধ্যে প্রবেশ করেন; আকণ্ঠ জলে ডুবিয়া শীতরাত্রি অতিবাহিত হয়। সারা রাত্রি চন্দ্রের পানে চাহিয়া উমা চন্দ্রশেখরের মুখচ্ছবি ধ্যান করেন।

এই ভাবে কল্প কাটিয়া যায়। তারপর একদিন—

উমার কুটিরদ্বারে এক তরুণ সন্ন্যাসী দেখা দিলেন; ডাক দিলেন—

সন্ন্যাসীঃ অয়মহং ভোঃ!

উমা কুটিরে ছিলেন; তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া সন্ন্যাসীকে পাদ্য অর্ঘ্য দিলেন।

সন্ন্যাসীর চোখের দৃষ্টি ভাল নয়; লোলুপনেত্রে পার্বতীকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—

সন্ন্যাসীঃ সুন্দরি, তুমি কি জন্য তপস্যা করছ?

পার্বতী নতনয়নে অনুচ্চ কণ্ঠে বলিলেন—

পার্বতীঃ পতি লাভের জন্য।

সন্ন্যাসী বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

সন্ন্যাসীঃ কী আশ্চর্য! তোমার মত ভুবনৈকা সুন্দরীকেও পতিলাভের জন্য তপস্যা

করতে হয়!—কে সেই মূঢ় যে নিজে এসে তোমার পায়ে পড়ে না? তার নাম কি?

পার্বতী সন্ন্যাসীর চটুলতায় বিরক্ত হইলেন, গম্ভীর মুখে বলিলেন—

পার্বতীঃ তাঁর নাম—শঙ্কর চন্দ্রশেখর শিব মহেশ্বর।

সন্ন্যাসী বিপুল বিস্ময়ের অভিনয় করিয়া শেষে উচ্চ ব্যঙ্গ-হাস্য করিয়া উঠিলেন।

সন্ন্যাসীঃ কী বল্‌লে—শিব মহেশ্বর! সেই দিগম্বর উন্মাদটা—যে একপাল প্রেত-প্রমথ নিয়ে শ্মশানে মশানে নেচে বেড়ায়। তাকে তুমি পতিরূপে কামনা কর। হাঃ হাঃ হাঃ!

সন্ন্যাসীর ব্যঙ্গ-বিস্ফুরিত অট্টহাস্য আবার ফাটিয়া পড়িল। পার্বতীর মুখ ক্রোধে রক্তিম হইয়া উঠিল; সন্ন্যাসীর প্রতি একটি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—

পার্বতীঃ কপট সন্ন্যাসী, তোমার এত স্পর্ধা তুমি শিবনিন্দা কর!—এখানে আর আমি থাকব না—

পার্বতী কুটিরের পানে পা বাড়াইলেন।

পিছন হইতে শান্ত কোমল স্বর আসিল—

মহেশ্বরঃ উমা, ফিরে চাও—দেখ, আমি কে!

উমা ফিরিয়া চাহিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার রোমাঞ্চিত তনু থরথর কাঁপিতে লাগিল। শিলারুদ্ধগতি তটিনীর মত তিনি চলিয়া যাইতেও পারিলেন না, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেও পারিলেন না।

সন্ন্যাসীর স্থানে স্বয়ং মহেশ্বর। তিনি মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। পার্বতীর কণ্ঠ হইতে ক্ষীণ বাষ্পরুদ্ধ স্বর বাহির হইল—

পার্বতীঃ মহেশ্বর—!

ডিজল্‌ভ্‌।

গিরিরাজ গৃহে হর-পার্বতীর বিবাহ

মহা আড়ম্বর; হুলস্থূল ব্যাপার। পুরন্ধ্রীগণ হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি করিতেছেন; দেবগণ অন্তরীক্ষে স্তুতিগান করিতেছেন; ভূতগণ কলকোলাহল করিয়া নাচিতেছে।

বিবাহ মণ্ডপে বর-বধূ পাশাপাশি বসিয়াছেন। রতি আসিয়া মহেশ্বরের পদতলে পড়িল। গৌরী একবার মহেশ্বরের পানে অনুনয়-ব্যঞ্জক অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

আশুতোষ প্রীত হইয়া রতির মস্তকে হস্ত রাখিলেন; অমনি মদন পুনরুজ্জীবিত হইয়া যুক্তকরে দেব-দম্পতির সম্মুখে আবির্ভূত হইল।

বাদ্যোদ্যম, দেবতাদের স্তবগান ও প্রমথদের কলনিনাদ আরও গগনভেদী হইয়া উঠিল।

দীর্ঘ ডিজল্‌ভ্‌।

অবন্তীর রাজসভা। উপরিউক্ত কলকোলাহল রাজসভার জয়ধ্বনিতে পর্যবসিত হইয়াছে। কালিদাস কুমারসম্ভব পর্ব শেষ করিয়াছেন।

কালিদাসের মস্তকে মালা বর্ষিত হইতেছে; ক্রমশ তাঁহার কণ্ঠে মালার স্তূপ জমিয়া উঠিল। তিনি যুক্তকরে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া এই সংবর্ধনা গ্রহণ করিতেছেন।

উপরে মহিলামঞ্চেও চাঞ্চল্যের অন্ত নাই। কুঙ্কুম লাজাঞ্জলি পুষ্পাঞ্জলি কবির মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইতেছে। মহিলাদের রসনাও নীরব নাই, সকলেই একসঙ্গে কথা কহিতেছেন। সভা ভাঙিয়াছে; তাই মহিলারাও নিজ নিজ আসন ছাড়িয়া উঠিয়াছেন কিন্তু আশু সভা ছাড়িয়া যাইবার কোনও লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। ভানুমতীও মাতিয়া উঠিয়াছেন, পরম উৎসাহভরে সকলের সহিত আলাপ করিতেছেন।

এই প্রমত্ত আনন্দ-অধীর জনতার এক প্রান্তে কুন্তলকুমারী মূর্ছাহতার মত বসিয়া আছেন। তাঁহার বিস্ফারিত চক্ষে দৃষ্টি নাই, কেবল অধরোষ্ঠ যেন কোন অর্ধোচ্চারিত কথায় থাকিয়া থাকিয়া নড়িয়া উঠিতেছে।

কুন্তলকুমারীঃ আমার স্বামী—আমার স্বামী—

মালিনীর অবস্থাও বিচিত্র; সে একসঙ্গে হাসিতেছে কাঁদিতেছে; একবার ছুটিয়া মঞ্চের প্রান্ত পর্যন্ত যাইতেছে, আবার দ্বারের কাছে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহার দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। মালিনী একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর সাবধানে কোঁচড় হইতে মালাটি বাহির করিয়া কালিদাসের শির লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিল।

মালাটি চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে কালিদাসের মাথা গলিয়া গলায় পড়িল। কবি একবার সুস্মিত চক্ষু উপর দিকে তুলিলেন।

ডিজল্ভ্।

রাজসভা শূন্য হইয়া গিয়াছে। নীচে একটিও লোক নাই; উপরে একাকিনী কুন্তলকুমারী বসিয়া আছেন, আর মালিনী দ্বারে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বমুখে কোন দুর্গম চিন্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছে।

সহসা চমক ভাঙ্গিয়া কুন্তলকুমারী দেখিলেন তিনি একা, সকলে চলিয়া গিয়াছে। তিনি উঠিয়া দ্বারের দিকে চলিলেন; সকলে হয়তো তাঁহার ভাব-বিহ্বলতা লক্ষ্য করিয়াছে; কে কী ভাবিয়াছে কে জানে!

দ্বারের কাছে পৌঁছিতেই মালিনী চট্‌কা ভাঙিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, সসম্ভ্রমে বলিল—

মালিনীঃ দেবি, আমার ওপর মহাদেবী ভানুমতীর আজ্ঞা আছে, আপনি যেখানে যেতে চাইবেন সেখানে নিয়ে যাব!

কুন্তলকুমারী নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন। কিছুদূরে গিয়া কিন্তু তাঁহার গতি হ্রাস হইল; ইতস্তত করিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, তারপর মালিনীর দিকে ফিরিয়া আসিলেন।

কুন্তলকুমারীঃ তুমি কি মহাদেবী ভানুমতীর কিঙ্করী?

মালিনীঃ হাঁ দেবি, আমি তাঁর মালিনী।

কুন্তলকুমারী আসল প্রশ্নটি সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গলা বুজিয়া গেল; অতিকষ্টে উচ্চারণ করিলেন—

কুন্তলকুমারীঃ তুমি—তুমি—কবি শ্রীকালিদাস কোথায় থাকেন তুমি জানো?

মালিনী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল; কিন্তু সহজ সম্ভ্রমের সুরেই বলিল—

মালিনীঃ হ্যাঁ দেবি, জানি।

আগ্রহের কাছে সঙ্কোচ পরাভূত হইল, কুন্তলকুমারী আর
একা পা কাছে আসিলেন

কুন্তলকুমারীঃ কোথায় থাকেন তিনি?

মালিনীর মুখে একটু হাসি খেলিয়া গেল

মালিনীঃ সিপ্রা নদীর ধারে নিজের হাতে কুঁড়েঘর তৈরি করেছেন, সেইখানেই তিনি থাকেন। তাঁর খবর নিয়ে আপনার কি লাভ দেবি? কবি বড় গরীব—দীনদরিদ্র, কিন্তু তিনি বড় মানুষের অনুগ্রহ নেন না।

কুন্তলকুমারী আর এক পা কাছে আসিলেন

কুন্তলকুমারীঃ তবে কি—তুমি কি—তাঁর সঙ্গে কি তোমার পরিচয় আছে?

তিক্ত হাসিতে মালিনীর অধরপ্রান্ত নত হইয়া পড়িল

মালিনীঃ আছে দেবি—সামান্যই। তিনি মহাকবি, আমি মালিনী—তাঁর সঙ্গে আমার কতটুকু পরিচয় থাকতে পারে।

কুন্তলকুমারী কিছু শুনিলেন না, প্রবল আবেগভরে সহসা মালিনীর
হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন—

কুন্তলকুমারীঃ তুমি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পার?

মালিনীর চোখ হইতে যেন ঠুলি খসিয়া পড়িল। এতক্ষণ সে ভাবিয়াছিল রাজকুমারীর জিজ্ঞাসা কেবলমাত্র কৌতূহল-প্রসূত। এখন সে সন্দেহ-তীক্ষ্ণ চক্ষে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল; তারপর সহসা প্রশ্ন করিল—

মালিনীঃ তুমি কে? কবি তোমার কে?

অধরে অধর চাপিয়া কুন্তলকুমারী দুরন্ত বাষ্পোচ্ছ্বাস দমন করিলেন—

কুন্তলকুমারী: তিনি—আমার স্বামী।

অতর্কিতে মস্তকে প্রবল আঘাত পাইয়া মানুষ যেমন ক্ষণেকের জন্য বুদ্ধিভ্রষ্ট
হইয়া যায়, মালিনীরও তদ্রূপ হইল। সে বিহ্বলভাবে চাহিয়া বলিল—

মালিনী: স্বামী—স্বামী!

তারপর ধীরে ধীরে তাহার উপলব্ধি ফিরিয়া আসিল। সে ঊর্ধ্বমুখে চক্ষু
মুদিত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—

মালিনী: ও—স্বামী! তাই! বুঝতে পেরেছি—এবার সব বুঝতে পেরেছি। দেবি, তিনি আপনার স্বামী, বুঝতে পেরেছি। তা, আপনি তাঁর কাছে যেতে চান?

কুন্তলকুমারী: হ্যাঁ, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল।

মালিনীর বুকের ভিতরটা শূলবিদ্ধ সর্পের মত মুচড়াইয়া উঠিতেছিল;
সে একটু ব্যঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারিল না—

মালিনী: দেবি, আপনি রাজার মেয়ে, সেখানে যাওয়া কি আপনার শোভা পাবে? সে একটা খড়ের কুঁড়েঘর...সেখানে কবি নিজের হাতে রেঁধে খান। এসব কি আপনি সহ্য করতে পারবেন রাজকুমারী?

রাজকুমারীর ভয় হইল মালিনী বুঝি তাঁহাকে লইয়া যাইবে না। তিনি
ব্যগ্রভাবে হাতের কঙ্কণ খুলিতে খুলিতে বলিলেন—

কুন্তলকুমারী: তুমি বুঝতে পারছ না—আমি যে তাঁর স্ত্রী—সহধর্মিণী। এই নাও পুরস্কার। দয়া করে আমাকে তাঁর কুটিরে নিয়ে চল।

কুন্তলকুমারী কঙ্কণটি মালিনীর হাতে গুঁজিয়া দিতে গেলেন, কিন্তু মালিনী
লইল না, বিতৃষ্ণার সহিত হাত সরাইয়া লইল; ফিকা হাসিয়া বলিল—

মালিনী: থাক, দরকার নেই; এইটুকু কাজের জন্যে আবার পুরস্কার কিসের? আসুন আমার সঙ্গে।

রাজকুমারীর জন্য প্রতীক্ষা না করিয়াই মালিনী চলিতে আরম্ভ করিল।

ওয়াইপ্।

কালিদাসের কুটির প্রাঙ্গণ। কুন্তলকুমারীকে সঙ্গে লইয়া মালিনী বেদীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কালিদাস নাই; কেবল বেদীর উপর মালার স্তূপ পড়িয়া আছে, যেন কবি ক্লান্তভাবে এই সম্মানের বোঝা এখানে ফেলিয়া গিয়াছেন।

মালিনী নিজেকে অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছে, তাহার মুখের ভাব দৃঢ়।
কুন্তলকুমারী যেন স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছেন।
মালিনী ঘরের উদ্দেশ্যে ডাকিল—

মালিনী: কবি—ওগো কবি, তুমি কোথায়?

ঘরের ভিতর হইতে কিন্তু সাড়া আসিল না। কুন্তলকুমারী শঙ্কিত দীননেত্রে মালিনীর পানে চাহিলেন।

মালাগুলি জড়াজড়ি হইয়া বেদীর উপর পড়িয়াছিল। তাহার মধ্য হইতে
মালিনী নিজের মালাটি বাহির করিয়া লইল; পর-পর লাল ও সাদা
ফুলে গাঁথা মালা—চিনিতে কষ্ট হইল না।
মালাটি রাজকুমারীর হাতে ধরাইয়া দিয়া মালিনী সহজ স্বরে বলিল—

মালিনী: নাও—আমার সঙ্গে এস। উনি ঘরেই আছেন, হয়তো পুজোয় বসেছেন।

মালিনী অগ্রবর্তিনী হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল; রাজকুমারী কম্প্রবক্ষে
দ্বিধাজড়িত পদে তাহার পিছনে চলিলেন।

কুটিরে একটি মাত্র কক্ষ; আয়তনেও ক্ষুদ্র। এক পাশে কালিদাসের দীন শয্যা গুটানো রহিয়াছে; আর এক কোণে একটি দীপদণ্ড, তাহার পাশে অনুচ্চ কাষ্ঠাসনের উপর লেখনী মসীপাত্র ও কুমারসম্ভবের পুঁথি রহিয়াছে। কিন্তু কালিদাস ঘরে নাই।

কুন্তলকুমারীর দেহের সমস্ত শক্তি যেন ফুরাইয়া গিয়াছিল। তিনি পুঁথির
সম্মুখে জানু ভাঙিয়া বসিয়া পড়িলেন, অস্ফুট স্বরে বলিলেন—

কুন্তলকুমারীঃ কোথায় তিনি?

মালিনী সবই লক্ষ্য করিয়াছিল; বুঝি তাহার মনে একটু অনুকম্পাও জাগিয়াছিল। সে আশ্বাস দিবার ভঙ্গীতে কথা বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল।

মালিনীঃ তুমি থাক, আমি দেখছি। বুঝি নদীতে স্নান করতে গেছেন।

মালিনী চলিয়া গেলে রাজকুমারী হাতের মালাটি কুমারসম্ভবের পুঁথির উপর রাখিলেন; তারপর আর আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া পুঁথির উপর মাথা রাখিয়া সহসা কাঁদিয়া উঠিলেন।

কাট্।

সিপ্রার তীর। কালিদাস একাকী জলের ধারে বসিয়া আছেন; মাঝে মাঝে একটি নুড়ি কুড়াইয়া লইয়া অলস-হস্তে জলে ফেলিতেছেন। রাজসভার উত্তেজনা কাটিয়া গিয়া নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতার অনুভূতি তাঁহার অন্তরকে গ্রাস করিয়া ধরিয়াছে। তাহার অন্তর্লোকে শ্রান্ত বাণী ধ্বনিত হইতেছে—

কেন? কিসের জন্য? কাহার জন্য?

মালিনী নিঃশব্দে তাঁহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল; কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হ্রস্ব-কণ্ঠে ডাকিল—

মালিনীঃ কবি!

কালিদাস চমকিয়া মুখ তুলিলেন।

কালিদাসঃ মালিনী!

মালিনীঃ কি ভাবা হচ্ছিল?

কালিদাস একটু চুপ করিয়া রহিলেন।

কালিদাসঃ ভাবছিলাম—অতীতের কথা।

মালিনী কালিদাসের পাশে বসিল।

মালিনীঃ কিন্তু ভাবনা সুখের নয়—কেমন?

কালিদাসঃ (ম্লান হাসিয়া) না, সুখের নয়। কিন্তু এ জগতে সকলে সুখ পায় না মালিনী।

মালিনী বহমানা সিপ্রার জলে একটি নুড়ি ফেলিল।

মালিনীঃ না, সকলে পায় না; কিন্তু তুমি পাবে।

কালিদাস ভ্রূ তুলিয়া মালিনীর পানে চাহিলেন, তারপর মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িলেন

কালিদাসঃ কীর্তি যশ সম্মান—তাতে সুখ নেই মালিনী, সুখ আছে শুধু—প্রেমে।

মালিনীর মুখে বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে কালিদাসের পানে একবার চোখ পাতিয়া যেন তাঁহাকে দৃষ্টি-রসে অভিষিক্ত করিয়া দিল। তারপর মুখ টিপিয়া বলিল—

মালিনীঃ প্রেমে জ্বালাও আছে কবি। নাও, ওঠ এখন; তোমাকে ডাকতে এসেছিলুম। একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—

মালিনী উঠিয়া দাঁড়াইল।

কালিদাসঃ ও—কে তিনি?

মালিনীঃ আগে চলই না, দেখতে পাবে।

কালিদাসও উঠিবার উপক্রম করিলেন।

সিপ্রার পরপারে সূর্যদেব তখন দিগ্বলয় স্পর্শ করিতেছেন।

কাট্।

প্রাঙ্গণ-দ্বারে পৌঁছিয়া কালিদাস দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন; মালিনী কিন্তু ভিতরে আসিল না, চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। কালিদাস তাহার দিকে ফিরিয়া চক্ষের সপ্রশ্ন ইঙ্গিতে তাহাকে ভিতরে আসিবার অনুজ্ঞা জানাইলেন, মালিনী কিন্তু অধর চাপিয়া একটু ফিকা হাসিয়া মাথা নাড়িল।

এই সময় কুটিরের ভিতর হইতে শঙ্খধ্বনি হইল। কালিদাস মহাবিস্ময়ে সেই দিকে ফিরিলেন।

মালিনী এই অবকাশে ধীরে ধীরে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল; তাহার মুখের ব্যথা-বিদ্ধ হাসি কবাটের অ.ড়ালে ঢাকা পড়িয়া গেল।

ওদিকে কালিদাস দ্রুত অনুসন্ধিৎসায় কুটিরের পানে চলিয়াছিলেন—তাঁহার ঘরে শঙ্খ বাজায় কে? সহসা সম্মুখে এক মূর্তি দেখিয়া তিনি স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। এ কি!

কুটির হইতে রাজকুমারী বাহির হইয়া আসিতেছেন; গললগ্নীকৃত অঞ্চলপ্রান্ত, এক হস্তে প্রদীপ, অন্য হস্তে মালা। কালিদাসকে দেখিয়া তাঁহার গতি শ্লথ হইল না; স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া তিনি কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চোখ দুটিতে এখন আর জল নাই; অধর যদিও থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, তবু অধরপ্রান্তে যেন একটু হাসির আভাস নিদাঘ-বিদ্যুতের মত স্ফুরিত হইতেছে। তিনি প্রদীপটি বেদীর উপর রাখিলেন; তারপর দুই হাতে স্বামীর গলায় মালা পরাইয়া দিয়া নতজানু হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন; অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—

কুন্তলকুমারীঃ আর্যপুত্র –

কালিদাস জড়মূর্তির মত দাঁড়াইয়া ছিলেন; যাহা কল্পনারও অতীত তাহাই চক্ষের সম্মুখে ঘটিতে দেখিয়া তাঁহার চিন্তা করিবার শক্তিও প্রায় লোপ পাইয়াছিল। এখন তিনি চমকিয়া চেতনা ফিরিয়া পাইলেন; নত হইয়া কুমারীকে দুই হাত ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া বিহ্বলকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

কালিদাসঃ দেবি—দেবি—না না এ কি—পায়ের কাছে নয় দেবি—

কুন্তলকুমারী স্বামীর মুখের পানে মুখ তুলিয়া দেখিলেন, সেখানে ক্ষমা ও প্রীতি ভিন্ন আর কিছুরই স্থান নাই, এতটুকু অভিমান পর্যন্ত নাই। যে অশ্রুকে তিনি এত যত্নে চাপিয়া রাখিয়া ছিলেন তাহা আর বাঁধন মানিতে চাহিল না, বাঁধ ভাঙিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল।

কালিদাস তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিতেই দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাকালের মন্দির হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

কিছুক্ষণ কাটিয়াছে। ভাব-প্লাবনের প্রথম উদ্দাম উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইয়াছে। উভয়ে বেদীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন; তাঁহাদের হাত এখনও পরস্পর নিবদ্ধ।

কালিদাস মিনতি করিয়া বলিতেছেন—

কালিদাসঃ কিন্তু দেবি, এ যে অসম্ভব। এই দীন কুটিরে—না না তা হতে পারে না—

কুন্তলকুমারীঃ যেখানে আমার স্বামী থাকতে পারেন সেখানে আমিও থাকতে পারব।

কালিদাসঃ না না, তুমি রাজার মেয়ে—

কুন্তলকুমারীঃ আমার ও পরিচয় আজ থেকে মুছে গেছে—এখন আমি শুধু মহাকবি কালিদাসের স্ত্রী।

কালিদাসের মুখে ক্ষোভের সহিত আনন্দও ফুটিয়া উঠিল

কালিদাসঃ কিন্তু—এই দারিদ্র্য—তুমি সহ্য করতে পারবে কেন? চিরদিন বিলাসের মধ্যে পালিত হয়েছ—রাজদুহিতা তুমি—

কুন্তলকুমারী ঈষৎ ভ্রূভঙ্গ করিয়া চাহিলেন

কুন্তলকুমারীঃ আর্যপুত্র, আপনার উমাও তো রাজদুহিতা—গিরিরাজ সুতা; কিন্তু কৈ তাঁকে মহেশ্বরের দীনকুটিরে পাঠাতে আপনার তো আপত্তি হয়নি! তবে?

কালিদাসের মুখে আর কথা রহিল না...রাজকুমারীর দক্ষিণ হস্তটি ধীরে ধীরে
উঠিয়া আসিয়া তাঁহার বামস্কন্ধের উপর আশ্রয় লইল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে; সিপ্রার পরপারে দিগন্তের অস্তচ্ছটা ক্রমশ মেদুর হইয়া আসিতেছে। সেই দিকে চাহিয়া কালিদাস সহসা নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। কুমারীও কালিদাসের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

এক শ্রেণী উষ্ট্র সিপ্রার কিনারা ধরিয়া চলিয়াছে।

কুমারী কালিদাসের পানে একটি অপাঙ্গ দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন; নিরীহভাবে প্রশ্ন করিলেন—

কুন্তলকুমারীঃ ও কী আর্যপুত্র?

কালিদাসের মুখেও একটু হাসি খেলিয়া গেল; তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন—

কালিদাস: ওর নাম—উষ্ট!

কুন্তলকুমারী: কি—কি বললেন আর্যপুত্র?

কালিদাস তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করিলেন।

কালিদাস: না না উষ্ট নয়, উষ্ট নয়—উষ্ট্র!!

উভয়ে একসঙ্গে কলহাস্য করিয়া উঠিলেন। রাজকুমারীর যে-হস্তটি স্কন্ধ পর্যন্ত উঠিয়াছিল তাহা ক্রমে কালিদাসের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া লইল। কালিদাসও কুমারীর মাথাটি নিজের বুকের উপর সবলে চাপিয়া ধরিয়া ঊর্ধ্বে আকাশের পানে চাহিলেন।

পূর্ব দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তখন বসন্তপূর্ণিমার চাঁদ উঠিতেছে।

এইরূপে এক মধুপূর্ণিমার তিথিতে স্বয়ম্বর সভায় যে কাহিনী আরম্ভ হইয়াছিল, আর এক পূর্ণিমার সন্ধ্যায় সিপ্রাতীরের পর্ণকুটিরে তাহা পরিসমাপ্তি লাভ করিল।

যবনিকা

বিজয়লক্ষ্মী

ফেড্ ইন্।

সকালবেলার কলিকাতা। বেলা আন্দাজ ন'টা। চায়ের দোকানের ভিড় কমিয়া গিয়াছে; মনিহারীর দোকানপাট খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। মেস্-হোস্টেলের ঠাকুর-চাকর ব্যস্ত-সমস্তভাবে বাজার করিয়া ফিরিতেছে। শ্রাবণ মাস: কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া আবার রোদ উঠিয়াছে। ভিজা ফুটপাথ পথচারীর পায়ে পায়ে শুকাইয়া উঠিতেছে।

কলেজ স্ট্রীটের মত বড় রাস্তার উপর প্রকাণ্ড একটি দোকান। বাড়িটি ত্রিতল. দুইতলার মাঝখানে কার্নিসের উপর তিন ফুট উঁচু সোনালী অক্ষরে লেখা আছে—মনোহর ভাণ্ডার। উপরে সারি সারি জানালা; নীচে দরজার দুই পাশে দুইটি জানালা। সদর দরজাটি খুব চওড়া; ঘষা কাচের কবাট, দরজা হইতে দুই ধাপ নামিয়া ফুটপাথ।

ঠিক দরজার সামনে ফুটপাথের উপর একটি ক্ষুদ্র গর্ত আছে। এই গর্তটিকে গাবু করিয়া নিম্নশ্রেণীর কয়েকটি ছেলে মার্বেল খেলিতেছে। তাহাদের সকলেরই বয়স পনেরো বছরের নীচে; গায়ে ময়লা ছেঁড়া জামা-কাপড়, কেউ বা স্রেফ একটি হাফ-প্যাণ্ট পরিয়া আছে। কাহারও মুখে হাসি নাই; সকলে গম্ভীরভাবে খেলায় মগ্ন।

যে ছেলেটি এই দলের সর্দার তাহার নাম কার্তিক। কালো শীর্ণ ছেলেটি, দেখিলে মনে হয় দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না; কিন্তু মুখেচোখে চোখা বুদ্ধি জ্বলজ্বল করিতেছে। সে গভীর মনঃসংযোগে মার্বেল খেলিতেছে. দলের ছেলেদের প্রয়োজন মত শাসন করিতেছে, আর তাহার মুখ দিয়া চাপা আওয়াজ বাহির হইতেছে—চিকা চিকা বুম্! কবে কোন্ গ্রামোফনের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে বিলাতী রেকর্ড শুনিয়াছিল, সেই গানের একটি পদ তাহার মস্তিষ্কে ছাপ মারিয়া দিয়াছে—চিকা চিকা বুম্!

ইতিমধ্যে মনোহর ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়াছে: কাউণ্টারে যে সব কর্মচারী কাজ করে তাহারা একে একে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। একজন উর্দিপরা চাকর, কাঁধে ঝাড়ন ও হাতে পিজবোর্ডের কয়েকটি ফলক লইয়া বাহির হইয়া আসিল: অত্যন্ত অবহেলাভরে দরজার কাচের উপর ঝাড়ন চালাইয়া ফলকগুলি টাঙাইয়া দিয়া অদৃশ্য হইল। ফলকগুলির কোনটিতে লেখা আছে—'বিলাতী প্রসাধন দ্রব্য', কোনটিতে—'ফাউণ্টেন পেনের কালি অমাবস্যা', কোনটিতে—'বিলাতী কাচের বাসন' ইত্যাদি।

কার্তিকের দল খেলিয়া চলিয়াছে; পথিকদের যাতায়াতের ভিতর দিয়া তাহাদের পাথরের গুলি ছুটিতেছে; গুলি খেলার বিচিত্র পরিভাষা মাঝে মাঝে তাহাদের মুখ দিয়া বাহির হইতেছে—'গাবু!' 'পিল!' 'নট্ কিচ্ছু!' কার্তিকের গলায় অন্তর্গূঢ় আওয়াজ হইতেছে—চিকা চিকা বুম্!!

মনোহর ভাণ্ডারের ম্যানেজার নীলাম্বরবাবু বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহার হাতে একটি পিজবোর্ডের ফলক। নীলাম্বরের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, ঘিয়ে ভাজা চেহারা —অত্যন্ত ঝানু লোক। তাঁহার একটি স্নায়বিক দুর্বলতা আছে, থাকিয়া থাকিয়া বাম চক্ষুটি নাচিয়া উঠিয়া বন্ধ হইয়া যায়, মনে হয় তিনি চোখ টিপিতেছেন।

ফলকটি তিনি দরজার গায়ে টাঙাইয়া দিলেন। দেখা গেল তাহাতে লেখা আছে—

নূতন কর্মচারী চাই।

ভিতরে অনুসন্ধান করহ।

ফলক ঝুলাইয়া দিয়া নীলাম্বর ক্রীড়ারত বালকদের দিকে ফিরিলেন, ঘোর বিদ্বেষপূর্ণ চক্ষে তাহাদের নিরীক্ষণ করিয়া খিঁচাইয়া উঠিলেন—

নীলাম্বরঃ আরে গেল যা! ঠিক দরজার সামনে তোদের খেলবার জায়গা! বেরো বেরো, দুনিয়ার জঞ্জাল সব। ধাপার গাড়ি তোদের এখনও নিয়ে যায়নি কেন—অ্যাঁ! (নীলাম্বর চক্ষু স্পন্দিত করিলেন) বেরো দূর হ' ছোটলোকের ছোঁড়া সব—

কার্তিক ও তাহার দল নিজ নিজ গুলি হাতে লইয়া এমন সতর্কভাবে দাঁড়াইয়া রহিল যে নীলাম্বর যদি কেবলমাত্র বাক্যবল প্রয়োগে সন্তুষ্ট না হইয়া বাহুবল প্রয়োগে অবতীর্ণ হন তাহা হইলে তাহারা অচিরাৎ সরিয়া পড়িবে, কিন্তু তাহা না করা পর্যন্ত এমন সুন্দর গাবু ছাড়িয়া তাহারা কিছুতেই অন্যত্র যাইবে না। যা হোক, নীলাম্বর আর অধিক হাঙ্গামা না করিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। ছেলেরা তখন কার্তিকের পানে তাকাইল। উত্তরে কার্তিক দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িল।

আবার খেলা আরম্ভ হইল।

ক্যামেরা তখন দরজা দিয়া দোকানের ভিতর প্রবেশ করিল।

ডিজল্ভ্।

দোকান ঘরটি খুব বড়, এমপোরীয়ম জাতীয় বিলাতী দোকানের মত সাজানো। তিনটি দেয়াল ঘিরিয়া কাঠের কাউন্টার চলিয়া গিয়াছে, পিছনে প্রায় ছাদ পর্যন্ত উঁচু আলমারি —পণ্যদ্রব্যে ঠাসা। ঘরের মাঝখানেও ইতস্তত কাচের শো-কেসে শৌখিন পণ্যদ্রব্য সাজানো রহিয়াছে। সদর দরজার বাম পাশে স্বত্বাধিকারীর অফিস ঘর; ডান পাশ দিয়া প্রশস্ত সিঁড়ি উপরে উঠিয়া গিয়াছে। সিঁড়ির রেলিংয়ের নিম্নতম স্তম্ভে ইংরেজীতে লেখা— Proprietor. স্তম্ভের নীচে মেঝের উপর কয়েকটি চায়ের প্যাকেট উপরাউপরি সাজানো, তাহার উপর দিয়া কেবল ঐ Proprietor কথাটি জাগিয়া আছে।

দোকানে এখনও খরিদ্দার আসিতে আরম্ভ করে নাই; কাউন্টারের পিছনে গুটিচারেক কর্মচারী একত্র হইয়া নিজেদের মধ্যে গুজগুজ্ করিতেছে।

প্রথম কর্মচারী: আর কি, এবার পাততাড়ি গুটোও। আমাদের অন্ন উঠল।

দ্বিতীয় কর্মচারী: কী—নতুন কিছু হয়েছে নাকি?

প্রথম কর্মচারী: দেখোনি? বাইরে ইস্তাহার টাঙানো হয়েছে—নতুন কর্মচারী চাই। বুড়ো কর্তার আমলের সাবেক যারা ছিল তারা তো সব বিদেয় হয়েছে, এবার আমাদের পালা—

তৃতীয় কর্মচারী: নতুন মালিক, চাকরও রোজ নতুন চাই। তা আমার তো মোটে এক মাসের চাকরি। যায় যাবে।

এই সময় সদর দরজা দিয়া একটি বৃদ্ধ খরিদ্দার প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধের বেশভূষা একটু অদ্ভুত—গায়ে একটি প্রাচীন ওয়াটার প্রুফ, মাথায় মাঙ্কিক্যাপ, চোখের কালো চশমা মুখের ঊর্ধ্বভাগ প্রায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কর্মচারীরা তাহাকে লক্ষ্য করিল, কিন্তু গ্রাহ্য না করিয়া পূর্ববৎ ফুসফুস্ করিয়া চলিল। একজন বয়স্থ কর্মচারী মাথা নাড়িয়া বলিল—

চতুর্থ কর্মচারী: বিলিদ্বপত্তর দেখছি আমাকেই শোকাবে। আমিই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো, তিন' মাস চাকরি করছি।

দ্বিতীয় কর্মচারী: কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম!

প্রথম কর্মচারী: কর্তা না হাতী—ও গোবর গণেশের মাথায় কি কিছু আছে। আসলে ঐ মিটমিটে শয়তান, ঐ ভিজে বেরালটি, যিনি কথায় কথায় চোখ মারেন (চোখ টিপিয়া দেখাইল) সব তাঁরই প্যাঁচ। এই বলে দিলুম দেখো তোমরা, ম্যানেজার হয়ে ঢুকেছে— ফাল হয়ে বেরুবে।

সকলেই গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িল।

চতুর্থ কর্মচারী: আশ্চর্য নয়। এই যে ঘন ঘন লোক বদল করছে এর মধ্যে কোনও মাচ্‌কোফের আছে। পুরোনো লোক থাকলেই তো জানতে পারবে, কোথায় কি কারচুপি হচ্ছে ধরা পড়ে যাবে—তাই কাউকে আর পুরোনো হ'তে দিচ্ছে না।

এই সময় কাউন্টারের উপর ঠক্ ঠক্ শব্দ হইল। কিছু দূরে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ খরিদ্দারটি অধীরভাবে কাউন্টারের উপর একটি পয়সা দিয়া টোকা দিতেছেন।

প্রথম কর্মচারী মুখ ব্যাজার করিয়া তাঁহার দিকে গেল; বৃদ্ধ পয়সাটি তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কড়া সুরে বলিলেন—

বৃদ্ধঃ এক পয়সার নস্যি।

ক্যারমের ঘুঁটির মত আঙ্গুল দিয়া পয়সাটি বৃদ্ধের দিকে ফিরাইয়া দিয়া কর্মচারী তাচ্ছিল্যভরে মুখ বিকৃত করিল।

প্রথম কর্মচারীঃ এক পয়সার জিনিস এখানে পাওয়া যায় না।

বৃদ্ধের মাথায় বোধ করি ছিট আছে; তিনি চশমা কপালে তুলিয়া ক্ষণেক কর্মচারীর পানে কট্ মট্ করিয়া তাকাইলেন, তারপর আবার চশমা যথাস্থানে নামাইলেন।

বৃদ্ধঃ কী! পাওয়া যায় না। আমি চল্লিশ বছর ধ'রে এই মনোহর ভাণ্ডার থেকে নস্যি নিচ্ছি আর বললে কি না পাওয়া যায় না?

বিরক্তি দমন করিয়া ধৈর্য সহকারে কর্মচারী বলিল—

প্রথম কর্মচারীঃ আরে মশায়, সেদিন আর নেই। আগে শুনেছি বুড়ো মালিকের আমলে এক পয়সার নস্যি, দু'পয়সার পেন্‌সিল্, তিন পয়সার জুতোর ফিতে পাওয়া যেত; এখন নতুন কর্তার আমলে সে সব বদলে গেছে। দু'চার পয়সা দামের মাল দোকানে আর রাখা হয় না।

বৃদ্ধ আবার চশমা তুলিয়া কর্মচারীকে তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর চশমা নামাইয়া ক্রুদ্ধভঙ্গীতে পয়সা তুলিয়া লইলেন।

কাট্।

মনোহর ভাণ্ডারের বাহিরে রাস্তার অপর পারে একটি লাল রঙের ফায়ার-অ্যালার্ম স্তম্ভ আছে; সেই স্তম্ভের পাশে দাঁড়াইয়া একটি যুবক একদৃষ্টে মনোহর ভাণ্ডারের দিকে তাকাইয়া আছে। তাহার পিছনে এক সারি ছোট ছোট দোকান ঘর বন্ধ রহিয়াছে; তাহাদের মাথার উপর লম্বা বোর্ড টাঙানো—'দোকান ভাড়া দেওয়া যাইবে'।

যুবকের নাম বিজয়। সুদর্শন চেহারা কিন্তু বেশবাস অত্যন্ত মামুলি, এমন কি দারিদ্র্যের পরিচায়ক বলিলেও চলে। সে দ্রুতপদে রাস্তা পার হইয়া মনোহর ভাণ্ডারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কার্তিকের দল তখনও অনন্য মনে মারবেল খেলিয়া চলিয়াছে।

কর্মখালির ফলকটি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া বিজয় সচকিতভাবে চারিদিকে তাকাইল, তারপর চট করিয়া ফলকটি উল্টাইয়া দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল। দেখা গেল, ফলকের উল্টা পিঠে লেখা আছে—

বাদশাহী সাবু
স্বয়ং বাদশা আলমগীর ব্যবহার করিতেন।

বিজয় যে সময় দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল ঠিক সেই সময় বৃদ্ধ খরিদ্দারটি সবেগে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন; দুজনের ঠোকাঠুকি হইয়া গেল। বিজয় মাপ চাহিল, কিন্তু বৃদ্ধ কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া চলিয়া গেলেন।

ভিতরে গিয়া বিজয় দরজার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া পড়িল। প্রকাণ্ড ঘর; দূরে খরিদ্দার সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন কর্মচারীরা নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফাস্ করিতেছে। কাহার কাছে অনুসন্ধান করিতে হইবে বুঝিতে না পারিয়া বিজয় চারিদিকে তাকাইল। সিঁড়ির স্তম্ভে Proprietor' কথাটি তাহার চোখে পড়িল।

বিজয় একটু দ্বিধা করিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল, ভাবিল একেবারে মালিকের সঙ্গে দেখা করাই ভাল। কয়েক ধাপ উঠিবার পর সে দেখিল, সিঁড়ি দিয়া একটি তরুণী নামিয়া আসিতেছেন। তরুণীটি দেখিতে সুন্দরী; হাতে দুখানি বই; পরিধানের কাপড়-চোপড় দেখিতে সাদাসিধা হইলেও মূল্যবান। তরুণী বিজয়কে সোপান আরোহণ করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন।

বিজয় ভাল ছেলে, সে তরুণীকে এক নজর দেখিয়া লইয়া সম্ভ্রমের সহিত পাশ কাটাইয়া উপরে উঠিতে লাগিল। তরুণী কিন্তু বড় বড় চক্ষু মেলিয়া তাহাকে দেখিতেই লাগিলেন; বিজয় যখন তাহাকে ছাড়াইয়া উপরে উঠিল তখন তিনিও ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

বিজয় সিঁড়ির মোড় ঘুরিয়া দু'ধাপ উঠিয়াছে এমন সময় তরুণীর কণ্ঠস্বর আসিল—

তরুণীঃ শুনুন—

বিজয় থামিয়া নীচের দিকে তাকাইল। তরুণীর দৃষ্টি যে অস্বস্তিকরভাবে তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে তাহা সে সর্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতেছিল। ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া সে বলিল—

বিজয়ঃ আমাকে বলছেন?

তরুণীঃ হ্যাঁ। আপনি কোথায় চলেছেন?

বিজয়ঃ (বিরসকণ্ঠে) দেখতেই পাচ্ছেন ওপরে যাচ্ছি।

তরুণীর দৃষ্টি খর হইয়া উঠিল।

তরুণীঃ তা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ওপরে আপনার কি দরকার?

বিজয়ের একটু রাগ হইল; সে ভাবিল তরুণীটি দোকানের একজন বড়-মানুষ ক্রেতা. তাহার দীনবেশ দেখিয়া অনধিকার স্পর্ধা প্রকাশ করিতেছে। তাহার কণ্ঠস্বর তিক্ত হইয়া উঠিল।

বিজয়ঃ দরকার কিছু আছে বৈকি। কিন্তু সে খবরে আপনার কি দরকার জানতে পারি কি?

তরুণীঃ আমার দরকার এই যে ওপর তলায় আমি থাকি।

বিজয় কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল. তারপর কয়েক ধাপ নামিয়া আসিয়া তরুণীর কাছে দাঁড়াইল।

বিজয়ঃ মাপ করবেন. আমার ধারণা ছিল দোকানের মালিক ওপরে থাকেন।

তরুণীঃ আমি দোকানের মালিকের মেয়ে।

বিজয় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল: দোকানের মালিকের যে কন্যা থাকিতে পারে ইহা তাহার কল্পনায় আসে নাই। কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়। বিজয় বুদ্ধিমান ছেলে. সে বুঝিল কথাটা মিথ্যা না হইতে পারে। সে কখনও দেখে নাই বলিয়া দোকানদারের মেয়ে থাকিবে না এমন কোন কথা নাই। তরুণী ইতিমধ্যে বলিয়া চলিয়াছেন—

তরুণীঃ আমার বাবা রায় বাহাদুর ধনেশ রায় এই দোকানের মালিক। ওপর তলাটা দোকান কিম্বা অফিস নয়. ওখানে আমরা থাকি—Private—

বিজয়ঃ (কুণ্ঠিত কণ্ঠে) কিন্তু সিঁড়ির থামে লেখা রয়েছে—

তরুণীঃ কি লেখা রয়েছে চলুন তো দেখি।

দুজনে পাশাপাশি নামিয়া আসিল: বিজয় ঈষৎ বিজয় গর্বের সহিত অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া Proprietor লেখা দেখাইল।

বিজয়ঃ এই দেখুন।

তরুণী একটু হাসিয়া অধর কুঞ্চিত করিলেন. তারপর উপরের চায়ের প্যাকেটটি তুলিয়া লইলেন; তখন দেখা গেল. Proprietor-এর নীচে লেখা আছে Private. বিজয় কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া তরুণীর দিকে ফিরিল. সবিনয়ে হাত জোড় করিয়া বলিল—

বিজয়ঃ আমারই ভুল—চায়ের প্যাকেট তুলে অনুসন্ধান করার কথা আমার মনে হয়নি। ক্ষমা করবেন।

চায়ের প্যাকেটটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া তরুণী হাসিলেন। এই দীনবেশী যুবকটি যে সহজে পরাভব স্বীকার করিবার লোক নয় তাহা তিনি বুঝিলেন. সহজ শিষ্টতার কণ্ঠে বলিলেন—

তরুণী: আপনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে চান?

বিজয়: (শুষ্কস্বরে) ইচ্ছে ছিল, কিন্তু—আজ বোধ হয় আমার যাত্রাটা বড় খারাপ হয়েছিল। দোকানে ঢুকতে গিয়ে এক বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল, তারপর আপনার সঙ্গে এই ঠোকাঠুকি!—কাজ নেই ফিরেই যাই।

তরুণী: না না, দেখা না ক'রে ফিরে যাবেন কেন? যদি কোনও জরুরী দরকার থাকে—

বিজয়: আমার পক্ষে জরুরী দরকারই বটে। আপনার বাবা নতুন কর্মচারী চান—তাই—

কথাটা বিজয় অসমাপ্ত রাখিয়া দিল। তরুণী হঠাৎ একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন; বিজয়কে দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে চাকরি-ভিক্ষার্থী বলিয়া মনে হয় না, স্বাধীনচেতা শিক্ষিত লোক বলিয়া মনে হয়। তরুণী একটু ঢোক গিলিয়া বলিলেন—

তরুণী: তা যান না—ঐ যে বাবার অফিস—

তিনি অফিস ঘরের দ্বার অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দিলেন। বিজয় একটু ইতস্তত করিল।

বিজয়: আপনি বলছেন যখন দেখা করেই যাই। মরার বাড়া তো গাল নেই।—ধন্যবাদ।

তরুণীকে নমস্কার করিয়া বিজয় অফিস ঘরের দিকে চলিল। তরুণী কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কাট্।

সদর দরজার সম্মুখে ইতিমধ্যে একটি দামী বড় মোটর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কার্তিকের দল ফুটপাথে পূর্ববৎ খেলিয়া চলিয়াছে।

তরুণী আবির্ভূতা হইতেই মোটরের চালক ঝুঁকিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল। গাড়ি শূন্যই ছিল, তরুণী প্রবেশ করিয়া বসিলেন। চালক গাড়িতে স্টার্ট দিল, কিন্তু গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিবার পূর্বেই তরুণী বলিয়া উঠিলেন—

তরুণী: ইয়ে—মহেশ, একটু অপেক্ষা কর, এখনও কলেজের দেরি আছে—

মহেশ: আজ্ঞে।

মহেশ ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া দিল। তরুণী তখন একখানি বই খুলিয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার চক্ষু দুটি বই ছাড়িয়া দোকানের দরজার দিকে ফিরিতে লাগিল। সদ্য দেখা যুবকটির ভাগ্য সম্বন্ধে তাঁহার মন কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ভাগ্যে চাকরি জুটিল কিনা তাহা না দেখিয়া তিনি কলেজে যাইতে পারিতেছেন না।

কাট্।

ওদিকে বিজয় অফিস ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইতেই এক তক্‌মা-আঁটা চাপরাশি দেখা দিল; বিজয়ের বেশভূষা দেখিয়া, শিষ্টতার কোনও চেষ্টা না করিয়া বলিল—

চাপরাশি: ক্যা মাংতা?

বিজয়: মালিকসে মুলাকাৎ মাংতা।

চাপরাশি: ক্যা কাম?

বিজয়: নোকরি।

চাপরাশির চোখের অবজ্ঞা আরও বাড়িয়া গেল।

চাপরাশি: ঠাহ্‌রো—রায় বাহাদুরকো এত্তালা দেনা হোগা।—বৈঠো বিরিঞ্চ্ পর।

চাপরাশি মালিকের সম্মুখে আবির্ভূত হইবার পূর্বে দেয়াল সংলগ্ন একটা আরসির সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের পাগড়িটা ঠিক করিয়া লইতে লাগিল। বিজয় দাঁড়াইয়া রহিল। চাপরাশির কথা তাহার অঙ্গে সুধাবৃষ্টি করে নাই; কিন্তু সে প্রার্থী—করিবার কিছু নাই।

কাট্‌।

অফিস ঘরের প্রকাণ্ড টেবিলের সম্মুখে বিপুলকায় রায় বাহাদুর ধনেশ রায় বসিয়া আছেন। আহ্লাদী পুতুলকে পাম্প্‌ করিয়া বড় করিলে যেরূপ দেখিতে হয় তাঁহার চেহারাটি সেইরূপ। সর্বাঙ্গে থাকে থাকে চর্বির থর নামিয়াছে; মুখে বুদ্ধির চিহ্ন যদি বা কখনও ছিল এখন তাহা চর্বির অন্তরালে গা-ঢাকা দিয়াছে। রায় বাহাদুর ধনেশ বসিয়া বসিয়া পরম তৃপ্তির সহিত একটি আপেল ভক্ষণ করিতেছেন। ডাক্তার তাঁহাকে দিনে তিনটি করিয়া আপেল ভক্ষণ করিবার বিধান দিয়াছে, তিনি ডাক্তারের আদেশ চতুর্গুণ পালন করিয়া চলেন—এক ডজন আপেল খান। টেবিলের ওপর থরে থরে আপেল সাজানো রহিয়াছে।

অফিস ঘরটি মাঝারি আয়তনের; খুব ফিট্‌ফাট্‌ সাজানো। টেলিফোন আছে। রাস্তার দিকে একটা বড় জানালা; সেই জানালার গরাদ ধরিয়া নীলাম্বর বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছেন। রাস্তার অপর পারে যে দোকানঘরগুলা ভাড়া দেওয়া যাইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সেগুলো এই জানালা দিয়া স্পষ্ট দেখা যায়।

ধনেশ আপেলের জাবর কাটিতে কাটিতে তৃপ্তি-মন্থর কণ্ঠে বলিলেন—

ধনেশ: চার মাসে মনোহর ভাণ্ডারের চেহারা বদলে দেওয়া গেছে, কি বল নীলাম্বর —অ্যাঁ?

নীলাম্বর ধনেশের দিকে ফিরিয়া একটি তৈলাক্ত হাসি মুখে ফুটাইয়া তুলিলেন।

নীলাম্বর: সে কথা আর বলতে। তুমি যা করেছ তাকে তো ফ্রেঞ্চ রেভলুশন বলা চলে —নল্‌চে খোল সব বদলে দিয়েছ।

নীলাম্বরের দুষ্ট চক্ষুটি স্পন্দিত হইয়া উঠিল; ইহা সম্পূর্ণ নিরর্থক স্নায়বিক ক্রিয়াও হইতে পারে, আবার অর্থপূর্ণও হইতে পারে। ধনেশ তাহা দেখিতে পাইলেন না, গদগদ মুখে হাসিলেন।

ধনেশ: বাবা যদি এখন এসে দেখেন, দোকান চিনতেই পারবেন না।—কিন্তু একথাও বলতে হবে, তুমি সাহায্য না করলে আমি একলা কিছুই করতে পারতুম না।

নীলাম্বর: আরে না না, আমি আর কী করেছি—কাঠবেড়ালীর সাগর বন্ধন। তবে যেটুকু করেছি প্রাণের টানে করেছি। ইস্কুলের বন্ধু আমি তোমার, আমি যদি না করি কে করবে বল? বরং তুমি যে ভালবেসে আমাকে ম্যানেজার করেছ এইটেই তোমার মহত্ত্ব।

পরস্পরের পিঠ চুল্‌কানি হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলিত; কিন্তু এই সময় দ্বারে টোকা পড়িল এবং চাপরাশি সসম্ভ্রমে প্রবেশ করিল।

চাপরাশি: হুজুর, এক আদমি নোকরিকে লিয়ে মুলাকাৎ মাংতা হ্যায়।

ধনেশ: ও—আসতে শুরু করেছে! আচ্ছা—তাহলে নীলাম্বর—?

ধনেশ সপ্রশ্নভাবে নীলাম্বরের পানে চাহিলেন। সকল কার্যের আরম্ভে তিনি এইভাবে নীলাম্বরের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন; নীলাম্বর এমন মোলায়েমভাবে তাহার পথনির্দেশ করিয়া দেন যে, ধনেশ ভাবেন, তিনি নিজেই পথ চিনিয়া লইয়াছেন।

নীলাম্বর: হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়, তাড়াতাড়ি কিসের? (চাপরাশিকে) এই, তুম্‌ আদমিকে বসতে বল। সাহেব যখন ঘণ্টি বাজাঙ্গে তখন পাঠিয়ে দিও।

চাপরাশি: হুজুর।

চাপরাশি বাহির হইয়া গেল। নীলাম্বর যে ধনেশের ইচ্ছাটাই প্রকাশ করিয়াছেন এমনিভাবেই বলিলেন—

নীলাম্বর: সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি তুমি কি চাও। ঠিকই তো! চাকরির উমেদারী করতে এসেছে খানিক বসুক, মাটি ভাপাক। নইলে চট্‌ করে ডাকলে ভাববে, আমাদেরই বুঝি গরজ—

ধনেশ বুঝিতে পারিলেন, তিনি অজ্ঞাতসারে একটি বুদ্ধির কাজ করিয়াছেন, তাঁহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল।

ধনেশ: হুম্—

নীলাম্বর: যাই বল ধনেশ, পাকা ব্যবসাদার বটে তুমি! কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় এইটেই তো ব্যবসার গোড়ার কথা। আমি বলতে পারি কলকাতা শহরে যত ব্যবসাদার আছে সব্বায়ের তুমি কান কেটে নিতে পার।

ধনেশ আর আত্মশ্লাঘা চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না।

ধনেশ: সে কি আমি জানি না! কিন্তু বাবার ধারণা আমি ব্যবসার কিছুই বুঝি না। গবর্মেণ্টকে চাঁদা দিয়ে রায় বাহাদুর হলুম, আর আমি ব্যবসা বুঝি না—বল তো নীলাম্বর!

নীলাম্বর: তোমার বাবা সেকেলে মানুষ, আধুনিক ব্যবসার ধরণ-ধারণ তো কিছু বোঝেন না। যা হোক, শেষ পর্যন্ত দোকানের ভার তোমাকে দিয়ে যে কাশীবাসী হয়েছেন, শেষ বয়সে এই একটি মাত্র বুদ্ধির কাজ করেছেন।

ধনেশ: আমিও দেখিয়ে দেব এবার Modern Styleয়ে ব্যবসা কি করে চালাতে হয়।

বলিয়া ধনেশ টেবিলের উপর একটি কিল মারিলেন। দৈবক্রমে টেপা-ঘণ্টিটা ঐখানেই ছিল, আচমকা কিল খাইয়া বাজিয়া উঠিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিজয় ঘরে প্রবেশ করিল। ধনেশের কাছে কার্যকারণ সম্বন্ধটা ধরা পড়ে নাই; তিনি চমকিয়া উঠিলেন—

ধনেশ: অ্যাঁ, একি! কে তুমি? বলা নেই কওয়া নেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লে!—নীলাম্বর!

নীলাম্বর ব্যাপার বুঝিয়াছিলেন, তিনি টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, নিম্নস্বরে কহিলেন—

নীলাম্বর: ঘণ্টি শুনে এসেছে। যাক্—কী চাও তুমি?

বিজয়ের মাথার ভিতরটা গরম হইয়া ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। প্রথমে দারোয়ানের অবহেলা, তারপর দীর্ঘ প্রতীক্ষা, শেষে এই অশিষ্ট সম্ভাষণ তাহার স্বাভাবিক নম্র প্রকৃতিকে রূঢ় করিয়া তুলিল। সে একবার ধনেশের দিকে একবার নীলাম্বরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া শ্লেষ-তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল—

বিজয়: আপনাদের মধ্যে মালিক কোনটি? তাঁকেই জবাব দেব।

ধনেশ এই উক্তি ঘোর অপমানকর বলিয়া মনে করিলেন; এ কেমন ছোকরা, তাঁহাকে দেখিয়াও মালিক বলিয়া চিনিতে পারে না? তিনি উগ্র একটা কিছু বলিবার ভূমিকা স্বরূপ টেবিলের উপর একটা চাপড় মারিলেন, কিন্তু তিনি বাক্য নিঃসরণ করিবার পূর্বেই নীলাম্বর তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন—

নীলাম্বর: ইনি মালিক—রায় বাহাদুর ধনেশ রায়। কী দরকার তোমার চট্‌পট ব'লে বিদেয় হও, নষ্ট করবার মত সময় নেই আমাদের।

বিজয়: আমারও নেই। কাজ করে যারা খেতে চায় তাদের সময় আপনাদের চেয়েও কম।—(ধনেশকে) আপনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন কর্মচারী চাই, তাই এসেছি। ভিক্ষার্থী মনে করবেন না, কারণ আপনি যেমন আমায় পয়সা দেবেন আমিও তেমনি আমার পরিশ্রম আপনাকে দেব।

ধনেশ থ হইয়া বসিয়া রহিলেন, কারণ এ ধরণের কথাবার্তায় তিনি অভ্যস্ত নন।

নীলাম্বরের বক্র চক্ষু বিদ্রূপে নাচিয়া উঠিল।

নীলাম্বর: খুব যে কমরেডি বুলি ঝাড়ছ ছোকরা। শূন্য কলসিই বেশী ঢন্ ঢন্ করে। চাকরি করবার যোগ্যতা কিছু আছে? কি qualification তোমার?

বিজয়: বি.এ. পাস করেছি।

নীলাম্বর নাকি সুরে হাসিয়া উঠিলেন।

নীলাম্বর: বি.এ. পাস? তবে তো তুমি অপদার্থ।

ধনেশ এতক্ষণে বলিবার মত একটা বিষয় পাইলেন।

ধনেশ: Worthless Worthless. তোমার মত লোক আমি চাই না। কলেজে যারা

ঢুকেছে, তারা তো—অ্যাঁ নীলাম্বর?

নীলাম্বরঃ ষাঁড়ের গোবর। তুমি যেতে পার।

বিজয়ের মুখে একটা খরশান হাসি খেলিয়া গেল।

বিজয়ঃ বুঝতে পারছি আপনারা কেউই কলেজের চৌকাট পার হননি; সেটা তেমন দুঃখের বিষয় নয়, কারণ বিদ্যা-বুদ্ধি সকলের সমান হয় না। কিন্তু আপনারা ভদ্রতা-শিক্ষার স্কুলেও ঢোকেননি এইটেই লজ্জার কথা।—নমস্কার!

বিজয় বাহির হইয়া গেল। ধনেশ ও নীলাম্বর হতবাক হইয়া দ্বারের পানে চাহিয়া রহিলেন।

কাট্।

দোকানের সদরে মোটর এখনও দাঁড়াইয়া আছে। তরুণী মাঝে মাঝে পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া দ্বারের পানে তাকাইতেছেন। ফুটপাথে ছেলেরা খেলিয়া চলিয়াছে। মহেশ ড্রাইভার গাড়ির পিছন দিকে দাঁড়াইয়া সতর্কভাবে একটা বিড়ি টানিয়া লইতেছে।

বিজয় বাহির হইয়া আসিল; মুখে চোখে অবরুদ্ধ ক্রোধের উষ্মা। মনের এরূপ অবস্থা বিপজ্জনক, কারণ এ সময় বহির্জগতের দিকে দৃষ্টি থাকে না। বিজয় ফুটপাথে নামিয়াই কার্তিকের গুলির উপর পা দিল। সঙ্গে সঙ্গে সড়াৎ! পা পিছলাইয়া বিজয় সশব্দে ফুটপাথে আছাড় খাইল।

মোটরের ভিতর হইতে একটি তরুণ কণ্ঠের কলহাস্য সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ছেলের দল কোলাহল করিয়া উঠিয়া নিজ নিজ মার্‌বেল কুড়াইয়া মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিজয় বেদনা-বিকৃত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না, অর্ধেক উঠিয়া পায়ের গোছ ধরিয়া বসিয়া পড়িল। কার্তিক পলায়ন করে নাই; সে বিজয়কে উৎসাহ দিয়া বলিল—

কার্তিকঃ উঠে পড়ুন স্যার—কিছু লাগেনি—

মোটরে বসিয়া তরুণী প্রথমটা হাসিয়া উঠিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিজয়ের ব্যথা-বিদ্ধ মুখ দেখিয়া তাঁহার হাসি থামিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিবার উপক্রম করিলেন।

ওদিকে কার্তিক দু'হাতে বিজয়ের বাহু ধরিয়া টানিয়া তুলিবার উপক্রম করিতেছে।

কার্তিকঃ উঠুন স্যার—এ'ইয়ো! চিকা চিকা বুম্!

বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার স্কন্ধে ভর দিল, হাসিবার ক্লিষ্ট চেষ্টা করিয়া বলিল,—

বিজয়ঃ দুম্।

কার্তিকঃ আজ্ঞে?

বিজয়ঃ চিকা চিকা বুম্ নয়—চিকা চিকা দুম্।

যে ব্যক্তি এমন গুরুতর পতনের পরও রসিকতা করিতে পারে, তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকা যায় না। কার্তিক শ্রদ্ধাভরে আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসিল। এই সময় তরুণী বিজয়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তরুণীঃ বেশী লাগেনি তো?

তরুণীকে দেখিয়া বিজয় মুখ গম্ভীর করিল।

বিজয়ঃ বিশেষ কিছু নয়, পা মচকে গেছে।

কার্তিকের স্কন্ধে ভর দিয়া সে সন্তর্পণে পা বাড়াইল।

কার্তিকঃ কিছু ভাববেন না স্যার, আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব। কোন দিকে আপনার বাড়ি স্যার?

বিজয়ঃ নেবুতলার দিকে।

বিজয় আর এক-পা অগ্রসর হইল; তরুণী তখন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন—

তরুণীঃ দেখুন, আমার একটা কথা শুনবেন? আমার গাড়িতে আসুন, আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।

বিজয় ঊর্ধ্বদিকে চক্ষু তুলিয়া উদাসকণ্ঠে বলিল—

বিজয়ঃ ধন্যবাদ, আমি হেঁটেই বাড়ি পৌঁছুতে পারব, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।

তরুণীঃ আপনার বাড়ি নেবুতলায় তো? আমি ঐদিক দিয়েই কলেজ যাই, আপনাকে শুধু নামিয়ে দিয়ে যাব।

বিজয় তরুণীর প্রতি একটি শুষ্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

বিজয়ঃ আপনার অসীম দয়া। কিন্তু একজন অপরিচিতকে এত অনুগ্রহ কেন করছেন, বুঝতে পারছি না।

তরুণীঃ (ঈষৎ হাসিয়া) হয়তো একটু স্বার্থ আছে। জানেন তো মেয়েদের কৌতূহল বেশী হয়। আপনার চাকরির কি হল জানবার জন্যে মন ছট্‌ফট্‌ করছে।

বিজয়ঃ ও তা সে তো এককথায় বলা যায়—

তরুণীঃ না না এখানে নয়—গাড়িতে—

বিজয় আর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না—কার্তিক ও তরুণীর সাহায্যে গাড়িতে উঠিয়া বসিল। গাড়ি চলিয়া গেল। কার্তিক কোমরে হাত দিয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তারপর দীর্ঘ শিস্‌ দিয়া বলিল—

কার্তিকঃ চিকা চিকা বুম্‌।

কাট্‌।

চলন্ত মোটরে দুজনে পাশাপাশি বসিয়া আছে। বিজয়ের পশ্চাদ্ভাগে একটা কিছু ফুটিতেছিল, সে সেটা বাহির করিয়া দেখিল একখানা ইংরেজি বই। বিরসমুখে সে বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল। তরুণী স্মিতনয়নে তাহাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া তরলকণ্ঠে বলিলেন—

তরুণীঃ একটা কথা বলবেন? আপনি বিদ্বান লোক, না? অন্তত বি.এ. পাস করেছেন।

বিজয়ঃ বি.এ. পাস করলে যদি বিদ্বান হয়, তবে আমিও বিদ্বান। কিন্তু বুঝলেন কি করে?

তরুণীঃ (মুখ টিপিয়া হাসিয়া) বই দেখলে আপনার মুখের ভাব বদলে যায়।—কিন্তু যাক, আপনার চাকরির কি হল বলুন।

বিজয়ঃ কি আর হবে—যা আশা করেছিলুম তাই! আপনার বাবা এবং আর একজন ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া হল, তারপর চলে এলুম।

তরুণী কিছুক্ষণ কথা বলিলেন না, তারপর সুদীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

তরুণীঃ আমি খুশি হয়েছি।

বিজয় ভ্রূকুটি করিয়া তরুণীর দিকে চাহিল, তাহার মুখে ক্রমে একটা কঠিন হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বিজয়ঃ খুশি হয়েছেন। তা তো হবেনই। চাকরি পেলে গরীবের অন্নসংস্থান হত, কিন্তু তাতে আপনার কি আসে যায়! (তরুণী হাসিলেন)—হাসছেন! অর্থাৎ এত আনন্দ হয়েছে যে, চেপে রাখতে পারছেন না। এই ড্রাইভার, গাড়ি থামাও আমি এখানেই নাম্‌ব।

তরুণীঃ কেন, আপনার বাড়ি এসে পড়ল?

বিজয়ঃ না, কিন্তু আমি হেঁটেই যেতে চাই। আমার পা এখন ঠিক হয়ে গেছে।

মহেশ গাড়ির গতিবেগ হ্রাস করিয়াছিল, তরুণী মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন—

তরুণীঃ থামাবার দরকার নেই মহেশ।—আপনি তো ভারী রাগী লোক; আমি খুশি

হয়েছি বলে আমার গাড়িতেই আর থাকবেন না! রাগ না করে খুশির কারণটা জিগ্যেস করলেও তো পারতেন।

বিজয় উত্তর না দিয়া গোঁজ হইয়া বইয়ের পাতায় চক্ষু নিবন্ধ করিয়া রাখিল। তরুণী মিটি মিটি হাসিলেন।

তরুণীঃ কি পড়ছেন এত? ওটা গল্প উপন্যাসের বই নয়।

খোঁচা দিবার সুযোগ পাইয়া বিজয় মুখ তুলিল।

বিজয়ঃ না, ইকনমিক্সের বই। কিন্তু আপনার এ বই পড়বার কি দরকার? আপনার পড়া উচিত কবিতার বই, রূপকথার বই—

তরুণীঃ তাও পড়ি। এটা কলেজের পাঠ্য কিনা, তাই পড়তে হয়। কিন্তু ওকথা যাক, আপনি একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, সামান্য চাকরির জন্যে এমন ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন কেন বলুন তো?

বিজয়ঃ কি করতে বলেন? চুরি-ডাকাতি?

তরুণীঃ চুরি-ডাকাতি আর গোলামী ছাড়া জীবিকা উপার্জনের আর কি পথ নেই?

বিজয়ঃ আর কি আছে আপনিই বলুন?

তরুণীঃ ব্যবসা আছে—স্বাধীন ব্যবসা।

বিজয় ক্ষণেক কৃপাপূর্ণনেত্রে তরুণীকে পরিদর্শন করিল।

বিজয়ঃ অর্থনীতির ছাত্রীর পক্ষে আপনার কথাটা একটু—ইয়ে হয়ে গেল। ব্যবসা—স্বাধীন ব্যবসা করতে গেলে মূলধন চাই, বুঝেছেন? মূলধন।

তরুণীঃ বুঝেছি।

সহসা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বিজয় নিজ পকেটে হাত দিল।

বিজয়ঃ আমার কত মূলধন আছে জানেন?—পকেট হইতে হাত বাহির করিয়া সে তরুণীর সম্মুখে মেলিয়া ধরিল।

বিজয়ঃ এই দেখুন, এক টাকা সাড়ে তিন আনা আমার মূলধন। আমার পারিবারিক অবস্থাটাও তাহলে খুলে বলি—বাড়িতে মা আছেন, আর আমি। দাদা মফঃস্বলে সেরেস্তাদারের কাজ করেন, মাসে মাসে টাকা পাঠান। তাতেই খরচ চলে। আজ মাসের সাতাশে অর্থাৎ আরও চারদিন এই এক টাকা সাড়ে তিন আনায় আমাকে সংসার চালাতে হবে। (টাকা পকেটে রাখিয়া) এখন কি বলেন? স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট, কেমন?

তরুণী কিন্তু মোটেই দমিয়া গেলেন না, বরং কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। বিজয়ের মুখ লাল হইয়া উঠিল।

বিজয়ঃ ও আপনার হাসি পাচ্ছে। আমার দারিদ্র্যের ইতিহাস আপনার হাসির খোরাক জুগিয়েছে—ভাল। আচ্ছা, নমস্কার। এই ড্রাইভার—

তরুণী হাসি থামাইয়া বিজয়ের বাহু স্পর্শ করিলেন।

তরুণীঃ আপনি বড় উল্টো বোঝেন। হাসলুম কেন জানেন? স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করার জন্যে এক টাকা সাড়ে তিন আনা শুধু যথেষ্টই নয়—অপর্যাপ্ত।

বিজয়ঃ ও—তাই নাকি?

তরুণীঃ হ্যাঁ। এখন আপনাকে একটা গল্প বলি—শুনুন।

বিজয়ঃ এর পরেও গল্প বলবেন? (হৃদয়ভারাক্রান্ত নিশ্বাস ফেলিয়া) বেশ, বলুন।

বিজয় পিছনে ঠেস দিয়া বসিল। তরুণীর মুখে গাম্ভীর্য; তিনি ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তরুণীঃ আমাদের দোকানটা আজ দেখলেন তো—বেশ বড় দোকানই বলতে হবে, প্রায় দশ লাখ টাকার কারবার। পঁয়তাল্লিশ বছর আগে আমার ঠাকুরদা এই মনোহর ভাণ্ডারের পত্তন করেছিলেন। তখন তাঁর মূলধন ছিল—আট আনা।

বিজয়ঃ অ্যাঁ—আট আনা?

তরুণীঃ হ্যাঁ। অনেকবার দাদুর মুখে গল্প শুনেছি। ভারী গরীব ছিলেন, কলকাতা

শহরে মাথা গোঁজবার জায়গা ছিল না। প্রথমে এক উড়িয়ার দোকানে তেলে-ভাজা বিক্রি করতেন আর তার দোকানের বারান্দায় পড়ে থাকতেন। ক্রমে আট আনা পয়সা জমল, তখন তিনি স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করলেনঃ চুলের কাঁটা, কাপড় কাচা সাবান, ছেলেদের কাঠের খেলনা—এই সব সস্তা জিনিস বাড়ি বাড়ি ফিরি করে বেড়াতেন।

বিজয় বিস্ফারিত নেত্রে তরুণীর পানে চাহিয়া রহিল। তরুণী একটু হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুটি অবরুদ্ধ আবেগে বাষ্পোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

তরুণীঃ আপনি হয়তো বিশ্বাস করছেন না যে, ভদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে এতটা কৃচ্ছ্রসাধন কি করে সম্ভব হল। কিন্তু আমার দাদু জীবনে কখনও মিছে কথা বলেননি; সত্যিই এসব কাজ তিনি করেছিলেন। দুর্জয় সাহস ছিল তাঁর, আর ছিল স্বাধীনতার দুর্দম পিপাসা। পরের গোলামী করে জীবন কাটাবার মত মনের দীনতা হীনতা তাঁর ছিল না—

বিজয়ঃ আপনার বৃদ্ধ দাদু তো ভারী তেজী লোক ছিলেন।

তরুণীঃ যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় দাদু বৃদ্ধ ছিলেন না, আপনারই মত নব-যুবক ছিলেন।

বিজয়ঃ আর লজ্জা দেবেন না, তারপর বলুন—

তরুণীঃ তখন দাদুর দৈনিক আহারের খরচ ছিল চার পয়সা—যেদিন লাভ না হত, সেদিন একবেলা খেতেন। এমনি করে দীর্ঘ দু-বছর ধরে একটি একটি করে টাকা জমতে লাগল। শেষে দু'শো টাকা জম্‌ল। তখন দাদু ছোট্ট একটি সিঁদুর-কৌটোর মত দোকান খুললেন—নাম দিলেন মনোহর ভাণ্ডার। তারপর পঁয়তাল্লিশ বছরে সেই মনোহর ভাণ্ডার আজ এই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিজয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তরুণী গোপনে চোখ মুছিলেন। শেষে বিজয় তরুণীর দিকে ফিরিয়া সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে বলিল—

বিজয়ঃ ধন্যবাদ। আপনার দাদু বেঁচে থাকলে তাঁর পায়ের ধুলো নিতুম।

তরুণীঃ কিন্তু—দাদু বেঁচে আছেন। (কুণ্ঠিতস্বরে) অনেক বয়স হয়েছে, তাই বাবার হাতে দোকানের ভার দিয়ে কাশীবাস করছেন—

বিজয় তরুণীর পানে চকিতে দৃষ্টিপাত করিল; তাহার মনে হইল তরুণীর মনে যেন একটু ক্ষোভ আছে, যেন তাঁহার দাদু দোকানের ভার তাঁহার পিতার হস্তে অর্পণ করায় তিনি সুখী নন।

বিজয়ঃ ও!—আচ্ছা, এবার আমাকে সত্যিই নামতে হবে। ঐ যে সামনে গলিটা, ওটা আমার গলি—

তরুণীঃ মহেশ, বাঁ-দিকের গলি।

বিজয়ঃ না না, মোড়ের ওপর নামিয়ে দিলেই হবে। ও গলিতে আপনার গাড়ি ঢুকবে না—

তরুণীঃ খুব ঢুক্‌বে।

মোটর গলিতে ঢুকিল।

বিজয়ঃ ঐ যে পাঁচরঙা বেড়ালের মত বাড়িটা, ওর দোতলায় আমি থাকি—

গাড়ি দাঁড়াইল। বিজয় রাস্তায় দাঁড়াইয়া দুই হাত জোড় করিল। তাহার পায়ের বেদনা প্রায় দূর হইয়াছে।

বিজয়ঃ ধন্যবাদ—অনেক অনেক ধন্যবাদ।

তরুণীও সহাস্যে দুই করতল যুক্ত করিলেন।

তরুণীঃ গল্প মনে থাকবে তো?

বিজয়ঃ থাকবে।

কাট্।

দুইটি ঘর লইয়া বিজয়ের বাসা। সদর ঘরটির একমাত্র আসবাব একটি তক্তপোষ; দিনের বেলায় ইহা বসিবার ঘর, রাত্রে বিজয়ের শয়নকক্ষে পরিণত হয়। দেয়াল চিত্রাদি বাহুল্য-বর্জিত, কেবল একটি এস্রাজ তক্তপোষের পিছনের দেয়ালে ঝুলিতেছে; মনে হয় ঘরের নিরাভরণ দীনতা দেখিয়া অভিমানী শৌখিন যন্ত্র গলায় দড়ি দিয়াছে।

তক্তপোষের উপর বিজয়ের দাদা প্রতাপবাবু কাৎ হইয়া কনুইয়ে ভর দিয়া অবস্থান করিতেছেন; তাঁহার সম্মুখে একটি রুপার পান-কৌটা। প্রতাপবাবুর বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ; নাদুস-নুদুস্ চেহারা; দিনে প্রায় একশ খিলি পান খান; চিবাইয়া চিবাইয়া কথা বলেন। তিনি যে সদ্য বিজয়ের বাসায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ, একটি গ্ল্যাড্স্টোন ব্যাগ মেঝেয় রাখা রহিয়াছে; দ্বিতীয় প্রমাণ তাঁহার জননী শিয়রে দাঁড়াইয়া তাঁহার মাথায় বাতাস করিতেছেন।

জননীটি বাংলাদেশের বহুলক্ষ বর্ষীয়সী বিধবা জননীর মতই, শান্ত ভীরু পুত্রমুখাপেক্ষী। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অপ্রত্যাশিত আগমনে তাঁহার মুখে অজ্ঞাত আশঙ্কার ছায়া পড়িয়াছে। উপার্জনক্ষম স্বাধীন বিবাহিত পুত্রকে ভয় করিয়া চলেন না, এমন জননী বাংলাদেশে কয়টি আছেন?

প্রতাপ পান-কৌটা হইতে কয়েকটি খিলি মুখে দিয়া খানিকটা চুন আঙুলের ডগায় তুলিয়া লইলেন।

প্রতাপঃ এক দিনের ছুটি; তা একটু যে জিরোবো, তার কি যো আছে। সারারাত ট্রেনে হট্রাতে হট্রাতে আসতে হল। গরজ আমারই কিনা মা; তোমাদের আর কি বল না। মাস গেলে মাসোহারার টাকা আসে—ব্যাস্—নিশ্চিন্দি। সেই টাকা যে আমাকে গায়ের রক্ত জল করে রোজগার করতে হয়, তা তো আর তোমরা ভাব না—

মাঃ বাবা প্রতাপ—

প্রতাপঃ থাক মা, তুমি যা বলবে, আমি জানি। কিন্তু আমার দিকটাও একটু ভেবে দেখো। লাখপতি নই, ছা-পোষা মানুষ, তবু এই চার বছর খরচ দিয়ে তোমাদের কলকাতায় রেখেছি। কিসের জন্যে। আখেরের কথা ভেবেই না? (চুন মুখে দিলেন) যা হোক, বিজয় বি.এ. পাস করল, ভাবলুম খরচ সার্থক হল, এবার বুঝি সে পয়সা রোজগারে মন দেবে। হায় হরি কোথায় কি। তিন মাস হয়ে গেল বিজয়ের কোন গরজই নেই। বৌ তো সেই কথাই বলে—'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।' কিন্তু মা, আমিই বা দুটো সংসার কদ্দিন ঘাড়ে করে থাকি? নিজের সংসারটি কম নয়—দিন দিন মা-ষষ্ঠির কৃপায় বেড়েই যাচ্ছে। ওদিকে মেয়েটা বড় হয়ে উঠল, আজ নয় কাল তার বিয়ে দিতে হবে। আমি একা কোন্ দিক সামলাই? তুমিই বল তো, বিজয়ের কি উচিত নয় চাকরি-বাকরি করে আমাকে দুপয়সা সাহায্য করা? তা সাহায্য চুলোয় যাক, নিজের আর তোমার ভারটাও সে নিতে পারল না। তাকে বি.এ. পাস করিয়ে কি লাভটা আমার হল তাহলে?

মাঃ ঠিক কথাই বলেছ বাবা প্রতাপ—কিন্তু সে চুপ করে বসে নেই। পাস করার পর থেকে রোজ সকাল বিকেল চাকরির খোঁজে বেরোয়—

প্রতাপঃ মা, তোমার কোলের ছেলেটি যা বলে, তাই তুমি বিশ্বাস কর। কিন্তু আমি তো আর ঘাস খাই না। তিন মাস ধরে চাকরি খুঁজলে কলকাতা শহরে চাকরি পাওয়া যায় না? তা নয়, দাদার ভাতে আছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছে—কি দরকার ওর জোয়াল ঘাড়ে নেবার? যতদিন এইভাবে গায়ে ফুঁ দিয়ে চলে, ততদিনই ভাল—এই আর কি।

মাঃ না বাবা প্রতাপ, বিজয় তেমন ছেলে নয়—সে সত্যিই কাজের চেষ্টা করছে—

প্রতাপঃ যাকগে মা, তুমি বুঝবে না যখন বলে লাভ কি? মোট কথা, এবার আমি একটা হেস্তনেস্ত করে যাব। বৌ বলে, 'যা করেছ ঢের করেছ—আর কেন? নিজের অপোগণ্ডদের দিকেও তো তাকাতে হবে। ভাই তো আর স্বগ্গে বাতি দেবে না।'

মা কিছু না বলিয়া কেবল চক্ষু মুদিলেন।

দ্বারের কাছে শব্দ হইল; ভেজানো দ্বার ঠেলিয়া বিজয় প্রবেশ করিল। প্রতাপকে দেখিয়া স্মিত-বিস্ময়ে তাড়াতাড়ি আসিয়া সে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

বিজয়ঃ দাদা—তুমি কখন এলে?

প্রতাপ চৌকির উপর আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিলেন। দুই ভাইয়ের অনেকদিন পরে দেখা —প্রতাপের মুখে কিন্তু বিজয়ের আনন্দের প্রতিবিম্ব পড়িল না। গম্ভীর মুখে দুখিলি পান তুলিয়া লইয়া তিনি মুখে দিলেন।

প্রতাপঃ আমি তো অনেকক্ষণ এসেছি. কিন্তু তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়? কার বাড়িতে আড্ডা জমেছিল?

বিজয় অবাক হইয়া দাদার মুখের পানে তাকাইল. তাঁহার প্রশ্নটা ঠিক ধরিতে পারিল না।

বিজয়ঃ আড্ডা?

প্রতাপঃ হ্যাঁ হ্যাঁ—কিসের আড্ডা বসেছিল? তাসের না গানের?

বিজয়ের মনের ভিতরটা শক্ত হইয়া উঠিল। দাদার স্বভাব সে জানিত কিন্তু অনেকদিন পরে দেখা হওয়ার আনন্দে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। সে ক্ষণেক নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

বিজয়ঃ তাস-পাশা গান-বাজনার কি সময় আছে দাদা. চাকরির খোঁজে বেরিয়েছিলুম।

প্রতাপ যে বিশ্বাস করিলেন না তাহা তাঁহার কণ্ঠস্বরেই প্রকাশ পাইল।

প্রতাপঃ অ—! তা যোগাড় হল কিছু?

বিজয়ঃ কিছু অপমান. কিছু উপদেশ. আর কিছু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ—এছাড়া কিছুই যোগাড় হল না। একদল আছে তারা লেখাপড়া জানা লোক চায় না। আর একদল চায় ত্রিশ টাকা মাইনেতে এম.এ., পি-আর-এস।—কাজেই আমার চাকরি জুটবে কোত্থেকে?

প্রতাপ বিরক্তভাবে পান-কৌটা তুলিয়া পকেটে পুরিলেন।

প্রতাপঃ হুঁ। কিন্তু আমি তো মুখ্যুও নই.—এম্.এ., পি.আর. এস-ও নই—আমার চাকরি জুটেছিল কি করে?

মা এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন. এবার দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে কথা কহিলেন—

মাঃ বাবা প্রতাপ. আমি একটা কথা বলি। তুমি তো বাবা ভাল চাকরি করছ, সরকারী চাকরি করছ.—তা তুমি বাবা ওকে নিজের অফিসে ঢুকিয়ে নাও না—

প্রতাপ স্তম্ভিত বিস্ময়ের অভিনয় করিয়া এমন ভাবে মায়ের পানে তাকাইলেন যে ভয়ে মায়ের বুক শুকাইয়া গেল।

প্রতাপঃ মা! তুমি মা হয়ে এই কথা বললে! আমার চাকরিটাও খাবে? হুজুর যদি জানতে পারেন—আর জানতে পারবেনই—যে আমি নিজের ভাইকে অফিসে ঢুকিয়েছি তাহলে কি আর রক্ষে থাকবে! সেই দিনই আমার চাকরি যাবে।

মাঃ (ভয়ে) না না. তাহলে কাজ নেই বাবা—আমি বুঝতে পারিনি।

প্রতাপ কিন্তু একটা সূত্র পাইয়াছেন. সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়; তাঁহার কথার ভঙ্গী আরও নাটকীয় হইয়া উঠিল।

প্রতাপঃ কি সর্বনেশে কথা! আমি নিজের অফিসে ওকে ঢোকাব! ছেলেপুলের হাত ধরে আমাকে পথে দাঁড় করাতে চাও তোমরা!

মায়ের নিগ্রহ দেখিয়া বিজয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—

বিজয়ঃ যাকগে দাদা, আমি ঠিক করেছি চাকরি করব না।

প্রতাপ তাঁহার বিস্ময়-স্তম্ভিত দৃষ্টি বিজয়ের দিকে ফিরাইলেন; বিজয় তাড়াতাড়ি বলিয়া চলিল—

বিজয়ঃ আমি ব্যবসা করব—স্বাধীন ব্যবসা। দাদা, চাকরি পেলেও আমি রাখতে পারব না—পদে পদে লাঞ্ছনা আর অপমান, ও আমার সহ্য হবে না। তার চেয়ে স্বাধীন ব্যবসা ভাল, যত সামান্যই হোক, তবু তো কারুর গোলামী করতে হবে না—

প্রতাপের তাম্বূলপূর্ণ মুখ এতক্ষণ বন্ধ ছিল, এবার হাঁ হইয়া গেল।

প্রতাপঃ ব্যবসা—তুমি স্বাধীন ব্যবসা করবে!

বিজয়ঃ হ্যাঁ দাদা, তুমি অনুমতি দাও, আমার মন বলছে আমি পারব।

প্রতাপঃ পাগল তুমি—মাথা খারাপ! একটি চাকরি যোগাড় করতে পার না, তুমি ব্যবসা করবে! রামছাগলে চড়বার ক্ষমতা নেই, তুমি ঘোড়ায় চড়বে! কে এসব কুবুদ্ধি দিয়েছে তোমাকে?

বিজয়ঃ কুবুদ্ধি নয়, এতদিনে আমার সুবুদ্ধি হয়েছে। মিছে ক'মাস চাকরি চাকরি করে দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়েছি—ও কাজ আমার নয়। দাদা, তুমি অমত কোরোনো, আমি ব্যবসা করব। দেখো, যদি লক্ষ্মী কোনও দিন আমাদের ঘরে আসেন, ব্যবসার পথ দিয়েই আসবেন।

প্রতাপঃ পাগল, উন্মাদ—মতিচ্ছন্ন হয়েছে তোমার। ব্যবসা করতে হলে মূলধন চাই, তার খবর রাখো?

বিজয়ঃ জানি মূলধন চাই। কিন্তু আমার বেশী মূলধন দরকার নেই দাদা। তুমি আমাকে পাঁচশো টাকা দাও, তাতেই আমি কাজ আরম্ভ করতে পারব—

অতর্কিত পদাঘাতে ফুটবল যেমন লাফাইয়া ওঠে, প্রতাপ তেমনি ছিটকাইয়া চৌকি হইতে মেঝেয় নামিলেন।

প্রতাপঃ কী বললে তুমি! পাঁচশো টাকা! আমি তোমাকে পাঁচশো টাকা দেব আর তুমি ব্যবসা করবে। উঃ, খুনে সব—খুনে! মা, শুনলে তোমার আদুরে ছেলের কথা? আমাকে জবাই করতে চায়—

বিজয়ঃ দাদা, এমনি না দাও, ধার বলে দাও—আমি তোমার টাকা ফেরৎ দেব—

প্রতাপঃ মাথায় পা দিয়ে আমায় ডোবাতে চায়। না—আর এখানে নয়। (ব্যাগ তুলিয়া লইয়া) ইস্টিশানে বসে থাকব, তবু এখানে নয়। আমাকে ফতুর করতে চায়! পাঁচশো টাকায় একটা মেয়ের বিয়ে হয়, সেই টাকা আমি লুটিয়ে দেব! মা, আমি চললুম—

মা ছেলের ব্যাপার দেখিয়া একেবারে কাঠ হইয়া গিয়াছিলেন; বিজয় আসিয়া প্রতাপের হাত ধরিয়া ফেলিল।

বিজয়ঃ দাদা! তোমার পায়ে ধরছি বোসো এসে, এমন করে চলে যেও না। পাঁচশো টাকা না দিতে পার, যা পার দিও। দুশো টাকা—

প্রতাপঃ দুশো টাকা! দু'পয়সা দেবনা আর তোমাকে। অনেক দোহন করেছ, আর নয়। এখন আমাকে কাটলে রক্ত নেই, কুটলে মাংস নেই। আমি গেরস্ত মানুষ, খেটে খাই; তুমি ব্যবসা কর, বাণিজ্য কর, ঘোড়দৌড় খেল—আমি কিছুতে নেই তোমার, আজ থেকে তুমি আলাদা, আমি আলাদা। মা, এই পেন্নাম করছি তোমাকে; তোমার আদুরে গোপালকে নিয়ে থাকো, আমার কাছে আর কিছু পিত্যেশ কোরো না—চললুম।

বিজয়ঃ দাদা—

বিজয় আবার তাঁহার হাত ধরিল, তিনি ঝটকা মারিয়া হাত ছাড়াইয়া ব্যাগ হস্তে বাহির হইয়া গেলেন।

মাঃ প্রতাপ! ওরে অমন করে চলে যাসনি বাবা—

মা দ্বার পর্যন্ত ছুটিয়া গেলেন, কিন্তু প্রতাপ আর ফিরিলেন না। বিজয় ক্লান্ত ভাবে চৌকির উপর বসিয়া পড়িল।

মাঃ বিজয়, কি সর্বনাশ করলি রে! প্রতাপ যে সত্যিই চলে গেল। যা—ওকে ধরে নিয়ে আয়।

বিজয়ের ক্লিষ্ট মুখে একটা কঠিন হাসি খেলিয়া গেল।

বিজয়ঃ কি হবে মা, দাদা আর আসবে না। একটা ছুতো খুঁজছিল, সেই ছুতো পেয়ে চলে গেল।

মাও বোধ হয় তাহা বুঝিয়াছিলেন; তিনি একান্ত অসহায় ভাবে চৌকিতে গিয়া

বসিলেন।

মাঃ কিন্তু কি হবে বিজয়?

বিজয়ের শিরদাঁড়া এবার সোজা হইয়া উঠিল।

বিজয়ঃ কী আর হবে? তুমি ভয় পেয়োনা মা, এ ভালই হল যে দাদা আমাদের ছেড়ে চলে গেল—দাদার উপর নির্ভর করে এতদিন যেন মনে কোনও জোরই পাচ্ছিলুম না। আজ আমি স্বাধীন, আজ আমাকে নিজের অন্ন নিজে সংগ্রহ করতে হবে। ভগবান শরীরটা দিয়েছেন, আর কিছু না পারি, মুটে-মজুরের কাজ তো পারব।

মায়ের চোখ দিয়া নিঃশব্দে জল পড়িতে লাগিল।

মাঃ তুই চাকরি করবি না? ব্যবসাই করবি?

বিজয়ঃ হ্যাঁ মা, ব্যবসাই করব। আজ একটা বড় সুন্দর উদাহরণ পেয়েছি। খাটব—মুটেগিরি করব—বেগুনি ফুলুরি বিক্রি করব। তোমার ছেলে আর ভদ্রলোক থাকবে না মা, ভদ্রতার মুখোস তার খসে গেছে। এমনি করে একটি একটি করে টাকা জমাব; তারপর যখন দু'শো টাকা জমবে তখন ছোট্ট একটি দোকান খুলব—সেই দোকান ক্রমে বড় করে তুলব—

মাঃ দু'শো টাকা পেলেই তুই দোকান খুলতে পারবি?

বিজয়ঃ পারব, একটু টানাটানি হবে কিন্তু পারব। একটি ছোট্ট দোকান ঘর দেখছি—

মা বিজয়ের বাহুর উপর কম্পিত হাত রাখিলেন।

মাঃ বিজয়, আমার মুখের দিকে তাকা। ঠিক বলছিস পারবি এ কাজ করতে? ভুল করছিস না?

বিজয়ঃ না মা, আমার অন্তর্যামী বলছেন আমি পারব। তুমি পায়ের ধুলো দাও, তোমার পায়ের ধুলো কখনও নিষ্ফল হবে না।

বিজয় মায়ের পদধুলি লইল; মা তাহার চিবুকে করাঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন।

মাঃ তবে আয় আমার সঙ্গে—

মা উঠিয়া পাশের ঘরে গেলেন, বিজয় সঙ্গে সঙ্গে গেল। মা তোরঙ্গ খুলিয়া একটি ছেঁড়া কাপড়ে বাঁধা পুটলি বাহির করিলেন; পুটলির মধ্যে একটি সিন্দুর কৌটা ও সেকেলে ধরনের ভারী সোনার হার ছিল। হারটি তুলিয়া লইয়া মা বিজয়ের হাতে দিলেন।

মাঃ আমার শেষ গয়না। তোর বৌকে দেব বলে রেখেছিলুম। তা তুই-ই নে, বিক্রি করলে দু'শো টাকার বেশীই হবে। আমার ঘরের লক্ষ্মীর জন্যে তোলা গয়না যেন মা লক্ষ্মীকে ঘরে আনতে পারে।

বিজয়ঃ মা!

দুর্দম আবেগে বিজয় মাকে জড়াইয়া ধরিল।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

হপ্তা দুই অতীত হইয়াছে।

বেলা অনুমান দশটা। ধনেশের অফিসঘরে নীলাম্বর ও ধনেশ খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া আছেন। জানালা দিয়া রাস্তার অপর পারে ভাড়াটে দোকান ঘরগুলি দেখা যাইতেছে; একটি দোকান ঘরের দ্বার খোলা, মাথার উপর সাইন্‌বোর্ড ঝুলিতেছে—লক্ষ্মী ভাণ্ডার। দ্বারের নিম্নার্ধ তক্তা দিয়া ভরাট করিয়া কাউণ্টার তৈয়ার হইয়াছে। ঘরের ভিতরটা যতদূর দেখা যায় পণ্যদ্রব্যে ভরা।

নীলাম্বর তাচ্ছিল্যভরে আনুনাসিক হাস্য করিলেন।

নীলাম্বরঃ কার কপাল পুড়েছে কে জানে—আমাদের দোকানের সামনে দোকান খুলেছে!

ধনেশ নীলাম্বরের দিকে ফিরিলেন; দেখা গেল তাহার হাতে একটি অর্ধভুক্ত আপেল

রহিয়াছে।

ধনেশ: বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! আস্পর্ধা কম নয়, মনোহর ভাণ্ডারের সামনে দোকান খোলে!

নীলাম্বর: পিঁপড়ের পালক উঠেছে। ভেবেছে মনোহর ভাণ্ডার ছেড়ে লোকে ঐ ফোতো দোকানে জিনিস কিনতে যাবে! দু'দিনে বাছাধনকে ঘটি-বাটি বিক্রি করে পালাতে হবে।

ধনেশ নিজের চেয়ারে আসিয়া বসিলেন।

ধনেশ: আবার দোকানের নাম রাখা হয়েছে—লক্ষ্মী ভাণ্ডার! যেন মা-লক্ষ্মীর আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, ঐ এঁদো কুঠুরীতে গিয়ে ঢুকবেন! হ্যাঃ!

দ্বারে সশঙ্ক হস্তের টোকা পড়িল; একটি কেরানী কবাট ঈষৎ ফাঁক করিয়া মুণ্ড বাড়াইল।

কেরানী: হুজুর—

আপেলে দংশনোদ্যত ধনেশ ভ্রূকুটি করিয়া আপেল টেবিলে রাখিলেন।

ধনেশ: কি চাও?

সাহস পাইয়া কেরানী দ্বারের ভিতর প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতে একটি ফাইল।

কেরানী: আজ্ঞে রায় বাহাদুর, বকেয়া বিলের হিসেব আমাকে করতে দেওয়া হয়েছিল—তা ক'রে এনেছি।

নীলাম্বর জানালার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষু একবার নাচিয়া উঠিল। ধনেশ অভ্যাসমত তাঁহার পানে তাকাইলেন।

নীলাম্বর: হিসেব—ও—তা এখন কেন? অন্য সময় আমাকে দেখালেই তো হ'ত। সব কাজ যদি রায় বাহাদুরই করবেন তাহলে আমি রয়েছি কি করতে?

কেরানী দোকানের পুরানো লোক; হিসাব-নিকাশে পোক্ত বলিয়া নীলাম্বর তাহাকে তাড়াইতে সাহস করেন নাই; কেরানীও অবস্থা বুঝিয়া সাধ্যমত মালিকের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করে; অথচ নীলাম্বরের দুর্দান্ত দাপটে বেশী কথা বলার সাহসও তাহার হয় না। সে অধর লেহন করিয়া কাঁচুমাচুভাবে বলিল—

কেরানী: আজ্ঞে, তা—যেমন হুকুম করেন। আপনারা দু'জনেই আছেন, তাই ভাবলুম—

হঠাৎ ধনেশের সুবুদ্ধি হইল; তিনি যে হিসাব-নিকাশে কাঁচা নহেন তাহাও বোধ করি কেরানীকে দেখাইতে চাহিলেন—

ধনেশ: নিয়ে এস দেখি—কী হিসেব করেছ।

কেরানী ত্বরিতে আসিয়া টেবিলের উপর ফাইল মেলিয়া ধরিল; ফাইলের মধ্যে অনেক পুরাতন বিল ও হিসাবের কাগজপত্র রহিয়াছে।

কেরানী: এই যে হুজুর—(হিসাবের কাগজ দেখাইয়া) এতগুলি বিল আদায় হয়নি—সবসুদ্ধ বকেয়া পড়েছে পঁচিশ হাজার ন'শো ছিয়াশী টাকা পাঁচ আনা—

বকেয়ার পরিমাণ শুনিয়া ধনেশ সক্রোধে টেবিলের উপর এক কিল মারিলেন; অর্ধভুক্ত আপেলটা থেঁতো হইয়া গেল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ধনেশ গর্জন ছাড়িলেন—

ধনেশ: কী—পঁচিশ হাজার টাকা বাকী! কেন আদায় করনি তুমি?

কেরানী: আজ্ঞে রায় বাহাদুর, আমি একাউণ্ট ক্লার্ক—হিসেবের কেরানী। বিল আদায়ের জন্যে অন্য লোক আছে—

ধনেশ: (নরম হইয়া) ও—আচ্ছা, তোমাকে ক্ষমা করলুম। কিন্তু এত টাকা বাকী থাকে কেন? নীলাম্বর!

নীলাম্বরের চক্ষু একবার স্ফুরিত হইল, কিন্তু তিনি সহজ কণ্ঠেই বলিলেন—

নীলাম্বর: বড় কারবারে দশ বিশ হাজার বকেয়া থাকেই—দেনাতেও থাকে পাওনাতেও থাকে। Business মানেই তো credit—credit না থাকলে কি বড় business চলে? মনোহর ভাণ্ডার তো আর ঐ (জানালা দিয়া লক্ষ্মী ভাণ্ডার দেখাইলেন) পুঁচকে দোকান নয় যে দু'টাকা বকেয়া পড়লেই দেউলে হবে যাবে! (কেরানীকে) তুমি যেতে পার।

কেরানী ফাইল গুটাইয়া লইয়া দ্বার পর্যন্ত গেল, তারপর দ্বিধাভরে ফিরিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল—

কেরানীঃ হুজুর, আমি পুরোনো চাকর, অনুমতি হয়তো বলি—বড়কর্তার আমলে পাঁচ হাজার টাকার বেশী বকেয়া থাকত না—কর্তা বলতেন—

ধনেশ চোখ পাকাইয়া দ্বারের দিকে অঙ্গুলি দেখাইলেন।

ধনেশঃ যাও—

কেরানী আর দ্বিধা না করিয়া বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হইল।

নীলাম্বর মৃদু কণ্ঠে হাস্য করিলেন—

নীলাম্বরঃ বড় কর্তার আমল—!

তিনি আবার জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার দুষ্ট চক্ষুটি কয়েকবার নাচিয়া উঠিল।

জানালার ভিতর দিয়া লক্ষ্মী ভাণ্ডার দেখা যাইতেছে।

কাট্।

ক্যামেরা রাস্তা হইতে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের বহির্ভাগ পরিদর্শন করিয়া দোকানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

ঘরটি ছোট, কিন্তু নূতন পণ্যদ্রব্যে পরিপাটিরূপে সাজানো। ঘরের মাঝখানে একটি কাচের শো-কেস, তাহার মধ্যে এসেন্সের শিশি প্রভৃতি শৌখিন দ্রব্য সাজানো রহিয়াছে। শো-কেসটি প্রায় চার ফুট উঁচু; তাহার মাথার উপর একটি ঝুঁটা ফুলের ফুলদানী ও একটি প্লাস্টারের ক্ষুদ্র ভীনাস ডি মিলো শোভা পাইতেছে। ঘরের এক কোণে একটি ছোট টেবিল ও টুল—টেবিলের উপর হিসাবের নূতন খাতাপত্র। ঘরের অন্য কোণে একটি কুলুঙ্গির মধ্যে গণেশের ক্ষুদ্র মূর্তি বিরাজ করিতেছে, কুলুঙ্গির ভিতর হইতে মৃদু মৃদু ধূপের ধুঁয়া বাহির হইতেছে।

বিজয় জোড়হস্তে গণেশ মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, চক্ষু মুদিত করিয়া অত্যন্ত ভক্তিভরে বিড় বিড় করিয়া বোধ করি সিদ্ধিদাতার স্তবস্তুতি করিতেছে। স্তোত্র শেষ হইলে কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বিজয় চোখ খুলিল। তারপর কাউণ্টারের দিকে ঘাড় ফিরাইতেই দেখিল একটি লোক তাহার কাউণ্টারের দিকে আসিতেছে। সে দ্রুত সেই দিকে ধাবিত হইল —ঐ বুঝি তাহার প্রথম খদ্দের আসিতেছে।

ছাতা হস্তে একটি ভদ্রলোক হন্তদন্তভাবে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দিকে আসিতেছেন। কাউণ্টারে পোঁছিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে দোকানের ভিতর গলা বাড়াইয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন। বিজয় সম্ভ্রমভরে তাঁহাকে সম্বোধন করিল—

বিজয়ঃ আসতে আজ্ঞে হোক—কী চাই আপনার?

ভদ্রলোকঃ শীগ্গির—শীগ্গির—অফিসের দেরি হয়ে গেছে—

বিজয়ঃ কি চাই বলুন এখুনি দিচ্ছি।

ভদ্রলোকঃ আরে মশাই ক'টা বেজেছে? ঘড়ি কৈ আপনার?

বিজয়ঃ ঘড়ি! ঘড়ি তো নেই।

ভদ্রলোকঃ (খিঁচাইয়া) দোকান করেছেন আর একটা ঘড়ি রাখতে পারেননি। খুব দোকানদার তো আপনি। মিছি মিছি আমার দেরি করিয়ে দিলেন।

ছাতা বগলে চাপিয়া ভদ্রলোক ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। বিজয় কিছুক্ষণ বোকার মত দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর চমকিয়া উঠিল।

বিজয়ঃ ঘড়ি! ঠিক। দোকানে ঘড়ি রাখা দরকার। ক'টা বেজেছে দেখতে এসে লোকে জিনিস কিনে ফেলতে পারে, (দেয়ালের দিকে চাহিয়া) ঐখানে ঠিক কাউণ্টারের সামনে—

বিজয় টেবিলের কাছে ফিরিয়া গিয়া একটি খাতায় ঘড়ির কথাটা নোট করিয়া রাখিল।

কালই সে দেওয়ালে ঘড়ি টাঙাইবে, যেন ভুল না হয়। বেশ বড় গোছের—

কাউণ্টারের ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনিয়া বিজয় খাতা ফেলিয়া ছুটিয়া গেল। আবার নূতন খদ্দের আসিয়াছে।

বিজয়ঃ এই আসছি—

আসিয়া দেখিল একটি মহিলা কাউণ্টারের ওপারে দাঁড়াইয়া অধীরভাবে একটি আনি কাউণ্টারের উপর ঠুকিতেছেন। মহিলাটি নিশ্চয় মোটরে আসিয়াছেন, কারণ তাঁহার মুখখানি একটি কালো জালের motor veilয়ে ঢাকা। বিজয় আসিলে তিনি চোখ না তুলিয়াই আনিটা কাউণ্টারের উপর ফেলিয়া দিয়া নৈর্ব্যক্তিক কণ্ঠে বলিলেন—

মহিলাঃ একটা পেন্সিল—

বিজয়ঃ পেন্সিল, এই যে দিচ্ছি—

বিজয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া মহিলা সচকিতে চোখ তুলিলেন, তারপর মুখের পর্দা মাথার উপর তুলিয়া দিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে বিজয়ের পানে চাহিলেন।

মহিলাঃ একি আপনি!

এবার বিজয়ও মহিলাকে চিনিতে পারিল, এ সেই তরুণী অর্থাৎ রায় বাহাদুর ধনেশ রায়ের কন্যা। বিজয়ও উত্তেজনা-বিহ্বল কণ্ঠে তরুণীর প্রতিধ্বনি করিল—

বিজয়ঃ একি আপনি!

দু'জনেব মুখেই বিস্ময় পুলকিত হাসি, যেন অভাবনীয় কিছু একটা ঘটিয়াছে। তরুণী মহা কৌতূহলভরে দোকানের ভিতর উঁকি ঝুঁকি মারিয়া বলিয়া উঠিলেন—

তরুণীঃ আপনি সত্যিই দোকান করেছেন! এত শীগ্‌গির—উঃ আমার যে কী আশ্চর্য লাগছে—

বিজয়ঃ (কৃতজ্ঞ-স্মিত মুখে) আপনার জন্যেই তো হ'ল। গল্প বলেছিলেন মনে নেই? আপনার দাদুর গল্প।

তরুণীঃ সেই গল্প মনে করে রেখেছিলেন? আমি তো ভেবেছিলুম পরদিনই ভুলে গেছেন। আচ্ছা আমি যদি আপনার দোকানের ভেতরে আসতে চাই তাহলে কি আপনার খুব আপত্তি হবে? ভেতরটা বড় দেখতে ইচ্ছে করছে।

বিজয়ঃ (মহা আগ্রহে) আসবেন—দেখবেন? আসুন—আসুন—ঐ যে বাঁ দিকে দরজা।

বিজয় তাড়াতাড়ি গিয়া পাশের একটি সরু দরজা খুলিয়া দিল, তরুণী ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

নূতন দোকানের নূতন জিনিসপত্র তরুণী সহর্ষে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন; খেলাঘর পাতিয়া বালিকাদের বুঝি এমনিই আনন্দ হয়।

তরুণীঃ বাঃ! কী সুন্দর! কী চমৎকার—

বিজয়ঃ (কুণ্ঠিত বিনয়ে) এ আর কী দোকান। অতি ছোট—অতি সামান্য—

তরুণীঃ শিশু যখন জন্মায় তখন ছোটই থাকে; তাই বলে তাকে কেউ কম ভালবাসে না। সেই ছোট শিশুই ক্রমে বড় হয়। আপনার দোকানও বড় হবে।

বিজয়ঃ আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

তরুণী বিজয়ের পানে চাহিয়া হাসিলেন।

তরুণীঃ আপাতত অন্য কিছু পড়লে ভাল হয়। চকোলেট আছে?

বিজয় অপ্রতিভ হইয়া জিভ কাটিল।

বিজয়ঃ চকোলেট তো আনা হয়নি।—ভুল হয়ে গেছে।

তরুণীঃ আনিয়ে রাখবেন। মহিলা খদ্দের যদি চান, চকোলেট রাখা নিতান্ত দরকার।

বিজয়ঃ নিশ্চয় রাখব। কালই আমি—

শো-কেসের উপর তরুণীর দৃষ্টি পড়িল। ভীনাসের অর্ধনগ্ন মূর্তি তাহার উপর দাঁড়াইয়া আছে, তাহার প্রতি একটা চকিত ভর্ৎসনার কটাক্ষ হানিয়া তরুণী শো-কেসের ভিতরের জিনিসগুলো পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তরুণীঃ ঐ এসেন্সের বড় শিশিটা দেখি।

বিজয় এসেন্সের শিশি বাহির করিয়া দিল; শিশিটি নাড়িয়া চাড়িয়া তাহার ঘ্রাণ লইয়া তরুণী বলিলেন—

তরুণীঃ এটা আমি নিলুম। কত দাম?

দাম এখনও বিজয়ের কণ্ঠস্থ হয় নাই, সে একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—

বিজয়ঃ দাম? এঁ—দেখি একবার শিশিটা—

শিশির নীচে সাঙ্কেতিক চিহ্ন লেখা ছিল, তা দেখিয়া বিজয় মনে মনে হিসাব করিল।

বিজয়ঃ ইয়ে—দাম সাড়ে পাঁচ টাকা।

বিজয়ের হাত হইতে শিশি লইয়া তরুণী নিজের হ্যাণ্ডব্যাগে রাখিলেন, টাকা বাহির করিতে করিতে বলিলেন—

তরুণীঃ দর তো বেশ সস্তা আপনার—ওমা!

ব্যাগ হইতে টাকা বাহির করিতে গিয়া তরুণী দেখিলেন মাত্র তিন টাকা কয়েক আনা আছে।

তরুণীঃ (ঈষৎ লজ্জিতভাবে) টাকা তো নেই। আচ্ছা, আমি পরে এসে নিয়ে যাব।

তিনি এসেন্সের শিশি ব্যাগ হইতে বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; বিজয় তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল—

বিজয়ঃ না না, আপনি নিয়ে যান, দাম পরে দেবেন।

তরুণী চোখ তুলিয়া সকৌতুকে হাসিলেন।

তরুণীঃ ধারে জিনিস দেবেন? কিন্তু অচেনা লোককে ধারে জিনিস দেওয়া ভাল নয়।

বিজয়ঃ কি যে বলেন, আপনি আবার অচেনা কিসের?

তরুণীঃ অচেনা নয়? বলুন দেখি আমার নাম কি?

প্যাঁচে পড়িয়া গিয়া বিজয় আম্‌তা-আম্‌তা করিল।

বিজয়ঃ নাম অবশ্য জানি না—কিন্তু—

তরুণী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

তরুণীঃ আপনি দেখছি এখনও দোকানদারী কিছু শেখেন নি। আসুন, কি করতে হবে আমি বলে দিচ্ছি। বকেয়া খাতা করেছেন তো—Credit Account Book?

বকেয়া খাতা যে রাখা দরকার তাহা বিজয়ের খেয়াল হয় নাই কিন্তু সে বুদ্ধি করিয়া কয়েকটা মোটা মোটা খাতা কিনিয়া রাখিয়াছিল, এখন তরুণীর কাছে অপদস্থ হইবার ভয়ে সে বলিয়া উঠিল—

বিজয়ঃ বকেয়া খাতা! হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে বৈকি! এই যে—দেখুন না—

টেবিলের কাছে গিয়া সে একটা মোটা খাতা দেখাইল। তরুণীর চক্ষু চাপা কৌতুকে নৃত্য করিতেছিল, কিন্তু তিনি মুখে গাম্ভীর্য আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—

তরুণীঃ বেশ। লিখুন—আজকের তারিখ দিন—(বিজয় খাতায় লিখিতে লাগিল) হ্যাঁ, এক শিশি এসেন্স...দাম সাড়ে পাঁচ টাকা...খাতকের নাম কুমারী লক্ষ্মী দেবী—

নাম শুনিয়া বিজয় কতক হতবুদ্ধি কতক বিস্ময় বিহ্বলভাবে মুখ তুলিল; তাহার হাতের পেন্সিল পড়িয়া গেল।

বিজয়ঃ কী—কী বললেন আপনার নাম! লক্ষ্মী দেবী!

লক্ষ্মীঃ হ্যাঁ। কেন পছন্দ নয় নামটা?

বিজয়ঃ না না, তা নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য! আমি যে আমার দোকানের নাম রেখেছি লক্ষ্মী ভাণ্ডার!

লক্ষ্মীঃ তা বেশ তো। অত ভয় কিসের? আমি আপনার দোকানের মালিকানা স্বত্ব দাবী করব না।

বিজয়ঃ তারপর দেখুন, আপনিই আমার দোকানের প্রথম খরিদ্দার—আশ্চর্য যোগাযোগ নয়?

লক্ষ্মীঃ ভারি আশ্চর্য। আচ্ছা, চললুম আজ; নামটা আশা করি ভুলবেন না, খাতায় টুকে রাখবেন। যদি ভোলেন আপনারই ক্ষতি।

বিজয়ঃ দোকানদার হয়ে খদ্দেরের নাম ভুলে যাব—কখনই না! আপনিও আশা করি আপনার নামের দোকানটি ভুলবেন না। কালই আমি চকোলেট আনিয়ে রাখব।

লক্ষ্মীঃ (হাসিয়া) আচ্ছা, তাহলে নমস্কার।

বিজয়ঃ নমস্কার। ওঃ একটু দাঁড়ান।

বিজয় ছুটিয়া গিয়া আবার তখনি ফিরিয়া আসিল।

বিজয়ঃ এই নিন আপনার পেন্সিল—

লক্ষ্মীঃ ধন্যবাদ, আমি ভুলেই গিয়েছিলুম।

বিজয়ঃ কিছু যদি মনে না করেন একটি কথা জিগ্যেস করি। আপনার নিজের অত বড় দোকান থাকতে এই ছোট দোকানে পেন্সিল কিনতে এসেছিলেন যে!

লক্ষ্মীর মুখ একটু ম্লান হইল।

লক্ষ্মীঃ আমাদের দোকানে আজকাল আর কম দামের জিনিস বিক্রি হয় না। আচ্ছা, আজ আসি।

অনতিদূরে মোড়ের কাছে লক্ষ্মীর মোটর দাঁড়াইয়া ছিল, সে তাহাতে গিয়া উঠিল। বিজয় কাউন্টারের উপর ঝুঁকিয়া হাত নাড়িল; মোটর চলিয়া গেল।

বিদায়ের পালা শেষ করিয়া বিজয় দেখিল একটি বৃদ্ধ কখন অলক্ষিতে কাউন্টারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইনি আমাদের সেই পূর্ব পরিচিত বৃদ্ধ, সাজ-পোশাকও ঠিক তেমনিই আছে। তিনি চকিতের ন্যায় একবার চশমা তুলিয়া বিজয়কে দেখিয়া লইলেন, তারপর সদর্পে কাউন্টারের উপর একটি পয়সা ফেলিয়া দিয়া কড়া সুরে বলিলেন—

বৃদ্ধঃ এক পয়সার নস্যি।

বিজয়ঃ (সসম্ভ্রমে) আজ্ঞে নস্যি? এই যে দিচ্ছি—

বৃদ্ধঃ মাদ্রাজী নস্যি—এক নম্বর।

বিজয়ঃ আজ্ঞে তাই দিচ্ছি।

তাক হইতে টিনের কৌটা নামাইয়া বিজয় আন্দাজমত এক পয়সার নস্য কাগজে মুড়িয়া বৃদ্ধকে দিল।

বৃদ্ধঃ আসল মাদ্রাজী বটে তো?

টিনের কৌটাটি বৃদ্ধের সম্মুখে আগাইয়া দিয়া বিজয় সবিনয়ে বলিল—

বিজয়ঃ আজ্ঞে, এক টিপ নিয়ে দেখুন, যদি আসল না হয় বদলে দেব।

বৃদ্ধ এক টিপ নস্য লইয়া অত্যন্ত তরিবতের সহিত নাকে দিলেন; বিজয় উদ্বেগ ভরে প্রতীক্ষায় রহিল।

বৃদ্ধঃ হুঁ—ঠিক আছে।

বিজয় সহর্ষে হাত ঘষিল। বৃদ্ধ আর একবার চশমা তুলিয়া চকিতে তাহাকে দেখিয়া লইলেন।

বৃদ্ধঃ নতুন দোকান করেছ?

বিজয়ঃ (বিনীত হাস্যে) আজ্ঞে হ্যাঁ, আজই প্রথম দিন।

বৃদ্ধের অধরোষ্ঠ নিঃশব্দে নড়িতে লাগিল, যেন তিনি কিছু স্বগতোক্তি করিতেছেন; তারপর হঠাৎ কোনও কথা না বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

একটি বছর চারেকের শিশু হাতে পয়সা লইয়া আসিল, কাউন্টার পর্যন্ত তাহার হাত পৌঁছায় না, পয়সাটি উঁচু করিয়া ধরিয়া সে বলিল—

শিশুঃ এক পয়সার লবঞ্চুস্ দাও না।

বিজয় হাত বাড়াইয়া পয়সা লইয়া হাসিমুখে বলিল—

বিজয়ঃ কিসের লবঞ্চুস্ নেবে খোকা? নেবুর না কলার?

ক্ষণেক বিবেচনা করিয়া বালক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইল।

শিশু: কলা—কলা—

ডিজল্‌ভ্‌।

রিমঝিম বর্ষণ রোমাঞ্চিত রাত্রি। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়া জানালার কাচ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে। কলিকাতা নগরী তাড়াতাড়ি কাজকর্ম শেষ করিয়া এই মধুর রাত্রিটি উপভোগ করিবার জন্য ঘরে ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়াছে।

লক্ষ্মীর শয়ন ঘরের দ্বার এখনও খোলা আছে। ঘরটি মাঝারি আয়তনের; আরাম ও বিলাসের কয়েকটি মহার্ঘ উপকরণে শিল্পীজনোচিত রুচির সহিত সজ্জিত। এক পাশে মেহগ্নির খাটের উপর যূথীশুভ্র শয্যা, অন্য পাশে বহু আয়নায় ঝল্‌মলু একটি ড্রেসিং টেবিল। টেবিলের উপর বিবিধ আকৃতির শিশি বোতল কাচপাত্রে প্রসাধনের নানা উপকরণ—

লক্ষ্মী শিথিল শয়ন-বস্ত্র পরিধান করিয়া শিঙার মেজ্‌'এর সম্মুখে বসিয়া আছে; বড় বড় দু'টো বৈদ্যুতিক গোলকের আলো তাহার মুখে পড়িয়াছে। তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া প্রাচীনা দাসী আহ্লাদী তাহার চুলে বিনুনি খুলিয়া চুল আঁচড়াইয়া দিতেছে। ইহা আহ্লাদীর প্রাত্যহিক কার্য; লক্ষ্মীর চুলের পরিচর্যা করিয়া তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া তবে সেদিনের মত বুড়ির ছুটি। লক্ষ্মীর মা ঠাকুরমা বাঁচিয়া নাই।

আহ্লাদীকে কেবল দাসী বলিলে তাহার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। মনোহর ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠাতা মনোহর রায়ের যৌবনকালে সে দাসীরূপে এই সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল: তারপর অর্ধশতাব্দী ধরিয়া সে এই পরিবারেই ভিৎ গাড়িয়া বসিয়াছে। ধনেশ রায়কে সে স্তন্য দান করিয়া মানুষ করিয়াছে, ধনেশের মা-মরা মেয়ে লক্ষ্মীও তাহার হাতেই বড় হইয়াছে। বুড়ি এই সংসারটিকে বুক দিয়া আগলাইয়া রাখে। কিন্তু তাহার মুখের দাপটের সম্মুখে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য। তাহাকে একাধারে দাসী ও গৃহিণী বলা চলে। লক্ষ্মীকে সে প্রাণের অধিক ভালবাসে; লক্ষ্মীও তাহাকে দিদি বলিয়া ডাকে এবং সুবিধা পাইলেই খুনসুড়ি করে।

আহ্লাদী চুল আঁচড়াইতেছে; লক্ষ্মী সকাল বেলার কেনা এসেন্সের শিশিটা পরম যত্ন সহকারে খুলিতেছে এবং নিজের মনে গুন গুন করিয়া গান গাহিতেছে। গানের সুরটি দেশ রাগিণীকে আশ্রয় করিয়া আছে, মাঝে মাঝে মিঞা-মল্লার তাহাকে ছুঁইয়া যাইতেছে—

লক্ষ্মী: বাদল এল রাতে ঘুম-চোরা,
শিহর ভরা—তনু শীতল করা—

শিশি খুলিয়া লক্ষ্মী শিশির মুখে একটি স্প্রে-সিরিঞ্জ আঁটিয়া দিল, নিজের গায়ে মুখে এসেন্সের শীকরকণা ছড়াইল। তাহার চোখ দুটি স্বপ্নালু; আজ বর্ষার রাত্রে তাহার মনে কিসের ঘোর লাগিয়াছে।

লক্ষ্মী: উতল বায়ু গেল দুয়ারে কর হানি'
বিজলি-বধূরা দিল যে হাতছানি।
হাসিয়া বলে গেল চোখের ইশারায়,
'সখি লো অভিসারে চলেছি মোরা'—
বাদল এল রাতে ঘুম-চোরা।

কেশ প্রসাধন শেষ করিয়া আহ্লাদী বলিল—

আহ্লাদী: নে আর গান গাইতে হবে না। বিষ্টি বাদলের রাত, এবার শুয়ে পড়, আমায় ছুটি দে।

লক্ষ্মী: বিষ্টি বাদলের রাত বলেই তো গান গাইছি। কেমন গন্ধ বল্‌তো দিদি?

লক্ষ্মী আচমকা বুড়ির মুখে এসেন্সের স্প্রে দিল। বুড়ি রাগিয়া আঁচলে মুখ মুছিতে মুছিতে ঝঙ্কার দিল—

আহ্লাদী: আঃ গেল ছুঁড়ি, রাত্তির বেলা কী না কী দিয়ে আমার মুখ ভিজিয়ে দিলি!

লক্ষ্মী: কেমন গন্ধ বল্ না? আজ নতুন দোকান থেকে নতুন সেণ্ট কিনেছি।

আহ্লাদী: ছাই গন্ধ! এ নাকি আবার গন্ধ? মাখতে না মাখতে উপে যায়।—সেকালে আতর গোলাপ ছিল, তাকে বলি গন্ধ! একদিন মাখলে সাতদিন খোস্‌বো থাকত। তোর ঠাকুরমা মাখতো—সে কি আজকের কথা।

লক্ষ্মী: ঠাকুমাকে তোর মনে আছে?

আহ্লাদী: ওমা, মনে থাকবে না! বিয়ে হয়ে তিনি ঘর করতে এলেন, আর আমিও তাঁর ঝি হয়ে এ বাড়িতে ঢুকলুম। তা তিনি তো আর বেশী দিন রইলেন না, ধনেশকে জন্ম দিয়েই স্বর্গে গেলেন। আমি পোড়া কপালীই পড়ে রইলুম!

লক্ষ্মী: তা তুইও ঠাকুমার সঙ্গে স্বর্গে গেলেই পারতিস্!

আহ্লাদী: (মুখ নাড়া দিয়া) আমি স্বর্গে গেলে তোর ঠাকুর্দার সেবা করত কে, ধনুকে মানুষ করত কে? তোকে এত বড়টা করত কে?

লক্ষ্মী: তুই বুঝি ঠাকুমা মারা যাবার পর দাদুর খুব সেবা করতিস?

আহ্লাদী: হ্যাঁ, করতুমই তো—আমি ছাড়া তাঁর সেবা করবার আর ছিলই বা কে?—নে এবার উঠ্‌বি, না সারা রাত রহলা করবি আমার সঙ্গে?

লক্ষ্মী: তুই ছাড়া আর যে কেউ নেই, কার সঙ্গে রহলা করি? দিদি, বিদ্যাপতির গান শুনেছিস—

ই ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর?

আহ্লাদী: (চোখ পাকাইয়া) আবার গান? আজ তোর কী হয়েছে বল্ দেখি?

লক্ষ্মী: আজ আমাকে গানে পেয়েছে—

লক্ষ্মী আবার গাহিয়া উঠিল। এবার গানের ছন্দ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে—চপল নৃত্য চটুল ছন্দ—কিন্তু সুর তাহাই আছে—

লক্ষ্মী: বাদল এল রাতে ঘুম-চোরা,
বিজন ঘরে কুহু রাতে
মোর কাজল ধুয়ে গেল আঁখিপাতে—
মরম কাঁদে বঁধু-পিয়াসাতে।

আহ্লাদী কোমরে হাত রাখিয়া মুখের বিরক্ত ভঙ্গী করিয়া শুনিতে লাগিল। শুনিতে তাহার ভাল লাগিতেছে, কিন্তু তাহা মুখভঙ্গী দ্বারাও স্বীকার করিবে না।

লক্ষ্মী: বিরহিণী আমি, ও পূরবী,
কেন আমার বুকে—ভরে দিলে
কদম বনের, বকুল বনের, কেয়ার বনের ঐ সুরভি?
কেন কেড়ে নিলে নয়নের ঘুম!
কেন ঢেলে দিলে অঝোর-ঝোরা!
বাদল এল রাতে ঘুম-চোরা।

গান শেষ হইলে আহ্লাদী নাক সিঁটকাইয়া বলিল—

আহ্লাদী: আ মরে যাই, কী গানের ছিরি! বিরহিণী—বিরহিণী! আইবুড়ো মেয়ে, তুই আবার বিরহিণী কিসের লা?

লক্ষ্মী: কেন, আইবুড়ো মেয়েকে বিরহিণী হতে নেই?

আহ্লাদী: মাথা নেই মাথা ব্যথা। ওঠ্ শুবি চল্।

লক্ষ্মীর চোখে দুষ্টামি নৃত্য করিয়া উঠিল।

লক্ষ্মী: আচ্ছা দিদি, আজ এমন বাদলার রাত, তোর কারুর জন্যেও মন কেমন করছে না?

আহ্লাদী: পোড়া কপাল, আমার কে আছে যার জন্যে মন কেমন করবে?

লক্ষ্মী: (নিরীহভাবে) কেন, দাদুর জন্যে! দাদু কদ্দিন হ'ল কাশী চলে গেছেন, তোকে সঙ্গে নিয়েও গেলেন না—তা তোর একটু মন কেমন করা উচিত।

আহ্লাদী চোখ বড় বড় করিয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তারপর একটা হাতলযুক্ত চুলের বুরুশ তুলিয়া লইয়া লক্ষ্মীকে মারিতে আসিল।

আহ্লাদীঃ তবেরে ফাজিল ছুঁড়ি—

লক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে পলাইয়া গিয়া খাটের কিনারায় বসিল, আহ্লাদী হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল—

আহ্লাদীঃ তোর যা মুখে আসবে বলবি আমাকে? কেন? কিসের জন্যে? তোর দাদুর সঙ্গে আমার কী লা?

লক্ষ্মীঃ তা কি করে জানব! কিন্তু দাদু কাশী গিয়ে অবধি তোর মেজাজ বড্ড খারাপ হয়েছে দিদি—টিকে ধরিয়ে নেওয়া যায়।

আহ্লাদীঃ অ্যাঁ—আবার! ওমা একি আতংতরে পড়লুম গা—বুড়ো বয়সে আমার এই কলঙ্ক! মুখে একটু আট্‌কালো না তোর? আমি না তোর বাপ্‌কে বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করেছি?

লক্ষ্মীঃ সেই জন্যেই তো মনে হয় দিদি, তুই যেন ঠিক আমার আপন ঠাকুমা।

আহ্লাদী এবার মেঝের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল, কপালে করাঘাত করিয়া বলিল—

আহ্লাদীঃ ওরে, তেমন কপাল কি আমি করেছিলুম! তোর ঠাকুর্দা যে সাধু নোক, দেব-তুল্যি মানিষ্যি; দাসীবাঁদীর পানে কি কখনও চোখ তুলে চেয়েছেন—?

বুড়ির বিলাপ শুনিয়া লক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে বিছানায় গড়াইয়া পড়িল! বুড়ি দেখিল, বেফাঁস কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে; সে উঠিয়া লক্ষ্মীর মশারি ফেলিতে ফেলিতে গজ্‌ গজ্‌ করিতে লাগিল—

আহ্লাদীঃ বাপঠাকুর্দাকে নিয়ে ঠাট্টা। আজকালকার মেয়েদের কি লজ্জা আছে? ইস্কুলে পড়া—ইস্কুলের ছোঁড়াদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করা,—এই তো হয়েছে আজকাল!

নেটের মশারির ভিতর দিয়া লক্ষ্মীকে দেখা যাইতেছিল, সে মুখ টিপিয়া বলিল—

লক্ষ্মীঃ সত্যি দিদি।

আহ্লাদী মশারির ধার গুঁজিতে গুঁজিতে নিজ মনে বকিয়া চলিল—

আহ্লাদীঃ সত্যি না তো কি মিথ্যে বলছি! রসে যে ফেটে পড়ছেন একালের মেয়েরা! কোন্‌দিন তুই-ই হয়তো ইস্কুল থেকে এসে বল্‌বি, দিদি আমি পেমে পড়েছি!

লক্ষ্মীঃ সত্যি দিদি।

বুড়ি থামিয়া গেল; সন্দিগ্ধভাবে মশারির মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—

আহ্লাদীঃ 'সত্যি দিদি' কি লা?

লক্ষ্মীঃ এই, কোন্‌দিন হয়তো ইস্কুল থেকে এসে বল্‌ব—দিদি, আমি প্রেমে পড়েছি।

মশারি তুলিয়া বুড়ি কট্‌মট্‌ করিয়া লক্ষ্মীর পানে তাকাইল।

আহ্লাদীঃ গলা টিপে দেব একেবারে। খবরদার ইস্কুলের ছোঁড়াদের কাছে ঘেঁষতে দিবিনে। ওদের সব পেটে-পেটে বজ্জাতি!

লক্ষ্মীঃ কিন্তু দিদি—মনে কর, একটি ছেলে—মানে একটি ছোঁড়া, যদি দেখতে বেশ ভাল হয়, আর তার স্বভাবটি খুব মিষ্টি হয়—? তবু তুই তাকে আমার কাছে ঘেঁষতে দিবিনে?

বুড়ির সন্দেহ-কঠোর মুখের ভাব মুহূর্তে বিগলিত হইয়া গেল, সে বিছানার উপর এক হাত রাখিয়া লক্ষ্মীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল—

আহ্লাদীঃ হ্যাঁরে সত্যি লক্ষী, সত্যি ভাল ছেলে? তোর মনে ধরেছে? কী নাম রে তার?

লক্ষ্মী বাহু তুলিয়া তাহার গলা জড়াইয়া লইল।

লক্ষ্মীঃ নাম? ঐ যা, নামটাই জানা হয়নি দিদি!

বুড়ি রাগ করিয়া গলা ছাড়াইয়া লইল; মশারি গুঁজিয়া কলহ-রুক্ষ কণ্ঠে বলিল—

আহ্লাদীঃ বুঝেছি লো বুঝেছি—ঠাট্টা হচ্ছে। সব তা'তেই ঠাট্টা। আমারই মরণ হয়

তাই তোর কথায় বিশ্বাস করতে যাই। এই আমি আলো নিভিয়ে দিয়ে চললুম, ঘুমোতে হয় ঘুমো, নয়তো জেগে জেগে কড়িকাট গোন্—

বুড়ি বড় আলো নিভাইয়া দিয়া দ্বার ভেজাইয়া চলিয়া গেল। বেড্ সুইচ্ টিপিয়া লক্ষ্মী নৈশ দীপ জ্বালিল: ঘরটি স্বপ্নময় হইয়া উঠিল।

বাহিরে রিম্‌ঝিম্ বৃষ্টি ঝরিতেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আভায় জানালার কাচ আলোকিত হইয়া উঠিতেছে। লক্ষ্মী একাকিনী শয্যায় শুইয়া ঊর্ধ্বে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। অবশেষে সে চুপি চুপি বলিল—

লক্ষ্মীঃ সত্যিই এখনও নাম জানি না—

ওয়াইপ্।

আর একটি কক্ষ; প্রায় নিরাভরণ। ঘরের কোণে মৃদু প্রদীপ জ্বলিতেছে। তক্তপোষের উপর বিজয় শুইয়া, তাহার মা শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছেন। বিজয়ের চক্ষু ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছে কিন্তু মুখে অভিনব বিস্ময়ের আনন্দ এখনও লাগিয়া আছে!

বিজয়ঃ ......মা, তার নাম লক্ষ্মী......যখন তার নাম জানতুম না তখন সেই-ই আমায় দোকান করার বুদ্ধি দিয়েছিল......না জেনেই দোকানের নাম রাখলুম লক্ষ্মী-ভাণ্ডার...... আর আজ সেই লক্ষ্মী প্রথম আমার দোকানে জিনিস কিনতে এল। কী আশ্চর্য বল তো?

মা একটু হাসিলেন।

মাঃ হ্যাঁ বাবা, আশ্চর্য বৈ কি! এবার তুই ঘুমো।

মা মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন, বিজয়ের চক্ষু ধীরে ধীরে মুদিত হইল।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন।

কিছুদিন পরের কথা। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। প্রাতঃকাল। মনোহর ভাণ্ডারের সম্মুখে ফুটপাথের উপর কার্তিক ও তাহার দল মার্‌বেল খেলিতেছে।

দোকানের ভিতর হইতে নীলাম্বর বাহির হইয়া আসিলেন। হাতে ছড়ি, গলায় চাদর; বোধ হয় কোনও কাজে বাহির হইতেছেন।

নীলাম্বর অন্যমনস্ক ছিলেন; ফুটপাথে নামিয়াই কার্তিকের মার্‌বেলের উপর পা দিলেন। অমনি সড়াৎ।

দলের ছেলেরা যে যার মার্‌বেল কুড়াইয়া লইয়া চম্পট দিল; নির্ভীক কার্তিক নীলাম্বরকে ধরিয়া তুলিতে গেল।

কার্তিকঃ আহাহা স্যার, পড়ে গেলেন! চিকা চিকা বুম্! উঠে পড়ুন—উঠে পড়ুন, কিছু লাগেনি—

ক্রুদ্ধ নীলাম্বর ফুটপাথে উপবিষ্ট থাকিয়াই কার্তিকের গালে একটি চপেটাঘাত করিলেন, তারপর লাঠিতে ভর দিয়া বিকৃতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—

নীলাম্বরঃ হতভাগা নচ্ছার। চালাকি পেয়েছিস! হাজারবার বলিনি আমার দোকানের সামনে গুলি খেলবিনে। আজ তোর হাড় একঠাঁই মাস একঠাঁই করব।

নীলাম্বর কার্তিকের নিতম্ব লক্ষ্য করিয়া ছড়ি চালাইলেন, কার্তিক লাফাইয়া পিছু হটিয়া গেল। আচম্বিতে চড় খাইয়া সে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল, কেবল আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিটুকু জাগ্রত ছিল: নীলাম্বর যে এই সামান্য কারণে এমন সংহারমূর্তি ধারণ করিবেন, তাহা সে ভাবিতে পারে নাই।

নীলাম্বর হিংস্রভাবে লাঠি উঁচাইয়া কার্তিকের দিকে অগ্রসর হইলেন: কার্তিক পিছু

হটিয়া ফুটপাথ হইতে নামিয়া রাস্তায় পড়িল।

নীলাম্বরঃ ছাল তুলে নেব তোর পিঠের, শুয়োরকা বাচ্ছা। ছোটলোকের ছেলের আস্পর্ধা বেড়ে গেছে!—

আবার তিনি ছড়ি চালাইলেন; এবারও কার্তিক পিছু হটিয়া আত্মরক্ষা করিল। এইভাবে, কার্তিক পিছু হটিতে হটিতে এবং নীলাম্বর ছড়ি চালাইতে চালাইতে রাস্তা পার হইলেন। রাস্তায় লোক দাঁড়াইয়া গেল।

রাস্তার পরপারে পৌঁছিয়া, ফুটপাথের কিনারায় কার্তিক ধোঁকা খাইল। পিছু দিকে হটিবার বিপদ আছে, ফুটপাথের কিনারায় পা আটকাইয়া সে পড়িয়া গেল। অমনি নীলাম্বর সপাং করিয়া তাহাকে এক ঘা ছড়ি মারিলেন।

নীলাম্বরঃ উল্লুক—হতভাগা—বজ্জাৎ—

হাঁচোড় পাঁচোড় করিয়া কার্তিক উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পালাইবে কোন্ দিকে? সম্মুখেই বিজয়ের দোকান চোখে পড়িল; আর দ্বিধা না করিয়া সে এক লাফে কাউণ্টার ডিঙাইয়া একেবারে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

বিজয় দোকানের মধ্যেই ছিল, সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—

বিজয়ঃ আরে একি! কী হয়েছে?

কার্তিক সভয়ে বিজয়ের কোমর জড়াইয়া ধরিল।

কার্তিকঃ ঐ দেখুন স্যার, আমাকে মারতে আসছে—

নীলাম্বর ততক্ষণে কাউণ্টারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; লাঠি ঠুকিয়া বলিলেন—

নীলাম্বরঃ বেরিয়ে আয় ছুঁচো কোথাকার। আজ তোর বাপের নাম ভুলিয়ে না দিই তো—

বিজয় নীলাম্বরকে চিনিতে পারিল; ক্ষণেকের জন্য তাহার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। তারপর সে কার্তিকের বাহুমুক্ত হইয়া কাউণ্টারে আসিয়া দাঁড়াইল, দোকানদার-সুলভ বিনয়ের সহিত একটু ঝুঁকিয়া বলিল—

বিজয়ঃ নমস্কার!—কি চাই আপনার?

নীলাম্বর উদ্ধতভাবে বিজয়ের মুখের পানে চাহিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন; মুখখানা যেন চেনা-চেনা, কোথায় দেখিয়াছেন। তাঁহার চক্ষু স্পন্দিত হইল।

বিজয়ঃ (শুষ্ক হাসিয়া) চিনি-চিনি মনে হচ্ছে অথচ চিনতে পারছেন না, কেমন? না চেনারই কথা—আমার মত কত লোক চাকরির জন্যে আপনার কাছে যায়—

নীলাম্বরঃ (চিনিতে পারিয়া) তুমি—সেই তুমি!

বিজয়ঃ হ্যাঁ, সেই আমি, সেই অপদার্থ worthless আমি। কিছু দরকার আছে কি? কী চাই বলুন, আমার দোকানের দর খুব সস্তা।

কঠিন বিদ্রূপে নীলাম্বরের মুখ বক্র হইয়া গেল।

নীলাম্বরঃ তাই তো বলি, কার এত আস্পর্ধা, মনোহর ভাণ্ডারের সামনে দোকান খুলেছে—তুমি! চাকরির উমেদারী ছেড়ে এখন ব্যবসা আরম্ভ করেছ—?

বিজয়ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, শাস্ত্রেই তো আছে—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।

নীলাম্বরের দৃষ্টি সাপের মত বিষাক্ত হইয়া উঠিল।

নীলাম্বরঃ খুব যে বুলি কপ্‌চাচ্ছ ছোক্‌রা! দোকানদারী ভারি মজা—না? মনোহর ভাণ্ডারের সঙ্গে টেক্কা দিতে এসেছ? আচ্ছা দেখা যাবে কত ধানে কত চাল।

নীলাম্বর চলিয়া গেলেন। কার্তিক বিজয়ের পিছনে লুকাইয়া ছিল, উঁকি মারিয়া বলিল—

কার্তিকঃ চলে গেছে?

বিজয় তাহার দিকে ফিরিল।

বিজয়ঃ হ্যাঁ। কি হয়েছিল রে?

কার্তিক বাহির হইয়া আসিল, বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া হস্ত আস্ফালন করিয়া

বলিল—

কার্তিকঃ কিচ্ছু হয়নি স্যার, মিছিমিছি আমাকে থাবড়া মেরেছে, লাঠি মেরেছে। আপনিও তো স্যার গলিতে পা পিছলে পড়ে গিছলেন, আপনি তো থাবড়া মারেননি, আর ঐ যাচ্ছেতাই বুড়োটা—

বিজয় তাহার পিঠ চাপড়াইল।

বিজয়ঃ যাক্‌গে, যেতে দে, বুড়ো হলে মানুষের মেজাজ একটু তিরিক্ষি হয়। তোর নাম কি?

কার্তিক কিন্তু শান্ত হইল না, মুষ্টি পাকাইয়া বলিল—

কার্তিকঃ আমার নাম কার্তিক স্যার, চাঁপাতলার ছেলে আমি। চড় মেরেছে আমাকে, আমিও দেখে নেব। এর শোধ না তুলতে পারি তো—চিকা চিকা বুম্!

এই সময় একটি খদ্দের আসিল।

খদ্দেরঃ কাপড় কাচা সাবান।

বিজয় হাসিয়া কাউন্টারের দিকে ফিরিল।

বিজয়ঃ এই যে। কাটা সাবান না আস্ত—?

ডিজল্‌ভ্।

দিন দুই তিন পরে। অপরাহ্ণ।

মনোহর ভাণ্ডারের অভ্যন্তর। পণ্যে ভরা বিশাল ঘরটিতে কোথাও শব্দ নাই, চাঞ্চল্য নাই—সমস্ত নিঝুম হইয়া আছে। কর্মচারীরা স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে তুড়ি দিয়া হাই তুলিতেছে। খরিদ্দার দোকানে একটিও নাই।

কাট্।

মনোহর ভাণ্ডারের সম্মুখ। পথ দিয়া লোকজন গাড়ি ঘোড়া যাতায়াত করিতেছে।

মনোহর ভাণ্ডারের সদর দরজার পাশে একটা থামের আড়ালে কার্তিক দেয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে একটি টিনের কৌটায় খানিকটা সাবান গোলা জল, অন্য হাতে একটি খড়; কার্তিক অলস ভঙ্গীতে খড়ে ফুৎকার দিয়া বুদ্বুদ উড়াইতেছে, কিন্তু তাহার সতর্ক চক্ষু পথচারীদের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছে।

দোকানের সামনে একটি গাড়ি আসিয়া থামিল, একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও একটি মধ্য-বয়স্কা মহিলা অবতরণ করিলেন। কার্তিক টিন ও খড় রাখিয়া তাঁহাদের কাছে আসিল, মিলিটারী কায়দায় স্যালুট করিয়া বলিল—

কার্তিকঃ নমস্কার স্যার। বাজার করতে এসেছেন? সস্তায় ভাল জিনিস কিনতে চান তো ঐ দোকানে চলে যান। ঐ যে লক্ষ্মী ভাণ্ডার—নতুন দোকান স্যার; আনকোরা নতুন জিনিস পাবেন।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক উদ্বিগ্নভাবে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দিকে তাকাইলেন।

প্রৌঢ়ঃ ঐ দোকান! ওতে কি ভাল জিনিস পাওয়া যাবে—

মহিলাটি কার্তিককে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—

মহিলাঃ ও দোকানে ভাল চায়ের সেট পাওয়া যায়?

কার্তিকঃ আজ্ঞে একেবারে নতুন চালান, হরেক রকম ডিজাইন—একবার গিয়েই দেখুন না।

প্রৌঢ় ব্যক্তি মহিলার দিকে চাহিলেন; মহিলা ঘাড় নাড়িলেন; তারপর দুজনে রাস্তা পার হইয়া লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দিকে গেলেন। কার্তিকের মুখে ক্ষণিক বিজয়োল্লাস খেলিয়া গেল; সে ফিরিয়া গিয়া আবার নির্লিপ্তভাবে বুদ্বুদ উড়াইতে লাগিল।

কাট্।

ধনেশের অফিস ঘর।

ধনেশ মুখ ভারি করিয়া টেবিলে বসিয়া আছেন এবং একটি আল্‌পিন-কণ্টকিত পিন-কুশন লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন। আজ তাঁহার আপেলেও রুচি নাই। নীলাম্বর অত্যন্ত বিব্রতভাবে তাঁহার পিছনে পায়চারি করিতেছেন। জানালা বন্ধ আছে।

নীলাম্বরঃ কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছিনে! দু'দিন থেকে দোকানে খরিদ্দার নেই! আমাদের রোজকার ক্যাশ বিক্রি প্রায় ছ'শো টাকা, কিন্তু কাল-পরশু একশো টাকাও পোরেনি!

ধনেশঃ কেন এমন হবে! নিশ্চয় কোথাও গলদ আছে!

নীলাম্বরঃ সেই কথাই তো ভাবছি—কোথায় গলদ। (চক্ষু নাচাইলেন) ঐ ব্যাটা লক্ষ্মী ভাণ্ডার কোনও প্যাঁচ মারছে না তো? বলা যায় না। হয়তো মণ্টে মণ্টে খদ্দের ভাঙাচ্ছে।

ধনেশ একেবারে আগুন হইয়া উঠিলেন।

ধনেশঃ কী, এতবড় বুকের পাটা! আমার সামনে দোকান করে আমার খদ্দের ভাঙাবে। জুতিয়ে লাশ করে দেব না! নীলাম্বর, ডেকে পাঠাও হনুমান সিংকে।

হনুমান সিং দোকানের মাহিনা করা গুণ্ডা; কর্তার আমলের লোক। দোকান করিতে হইলে বোধ করি এইরূপ বলবান প্রহরী দরকার হয়। নীলাম্বর কিন্তু ধূর্ত সাবধানী লোক, সহসা ফৌজদারী করিতে রাজি নন; বলিলেন—

নীলাম্বরঃ না না, অত ব্যস্ত হলে চলবে না। আগে খোঁজ তল্লাস করে দেখা যাক, যদি ও ব্যাটা কিছু করে থাকে, তখন তো হনুমান সিং আছেই।

ধনেশ: আমি ওসব বুঝি না। আমার দোকানের আয় কমে যাবে কেন? কৈফিয়ৎ চাই।

বলিয়া ধনেশ টেবিলের উপর কিল মারিলেন—কিল পড়িল পিনকুশনের উপর। 'উহুহু' বলিয়া ধনেশ হাত ঝাড়িতে লাগিলেন।

কাট্।

ফুটপাথে একটি লোক বিলাতী কুকুরের গলায় দড়ি বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছেন। মনোহর ভাণ্ডারের সম্মুখে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে কার্তিক তাঁহাকে গিয়া ধরিল।

কার্তিকঃ একি স্যার, এমন কুকুর দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছেন? ও—বুঝেছি, বগ্‌লস্ আর ছেকল কিনতে বেরিয়েছেন? ব্যস্ সোজা ঐ দোকানে চলে যান—ভাল জিনিস পাবেন—আপনার যেমন তেজী কুকুর, তেমনি মজবুত ছেকল পাবেন—

ব্যক্তিঃ কিন্তু মনোহর ভাণ্ডারে—

কার্তিকঃ মনোহর ভাণ্ডারে কি কম দামের জিনিস পাওয়া যায় স্যার? চলে যান লক্ষ্মী ভাণ্ডারে, যা চাই তাই পাবেন জলের দরে।

লোকটি একটু ইতস্তত করিয়া লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দিকেই অগ্রসর হইলেন। কার্তিকের মুখে একটি কুটিল হাসি দেখা দিল, সে নীলাম্বরের অনুকরণে চক্ষু নাচাইয়া হ্রস্বস্বরে বলিল—

কার্তিকঃ চিকা চিকা বুম্!

এই সময় লক্ষ্মী কলেজ হইতে ফিরিল; তাহার মোটর তাহাকে দ্বারের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। লক্ষ্মীর মুখে মোটর গুণ্ঠন; সে বাড়ির দিকেই পা বাড়াইতেই কার্তিক তাহাকে স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল।

কার্তিকঃ নমস্কার মিস্!—

এখন, কার্তিক লক্ষ্মীকে পূর্বে কয়েকবার দেখিয়াছে কিন্তু সে যে মনোহর ভাণ্ডারের সহিত সম্পর্কিত তাহা অনুমান করিতে পারে নাই; তাছাড়া মুখের মোটরগুণ্ঠনও কিছু ভ্রান্তি ঘটাইয়াছিল। তাই কার্তিক তাহাকে শাঁসালো খরিদ্দার মনে করিয়া বেশ ভাল করিয়া

ধরিল।

কার্তিক: কেন মিস্ আপনি এখানে জিনিস কিনতে এসেছেন? এখানে ভাল জিনিস কিস্সু পাওয়া যায় না—সব পুরোনো লজ্ঝড় মাল।

লক্ষ্মী পর্দার ভিতর দিয়া কার্তিককে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করিল; তাহার ভ্রূ একটু উত্থিত হইল।

লক্ষ্মী: তাই নাকি! তুমি তো সব জান দেখছি।

কার্তিক: আমি সব জানি মিস্—কোন দোকানে কী ভাল জিনিস পাওয়া যায় সব আমার নখের ডগায়! কী চাই আপনার বলুন— পমেটম ক্রীম স্নো—চা কোকো—মোজা গেঞ্জি—

লক্ষ্মী: মনে কর আমি চকোলেট চাই—

কার্তিক: (মহোৎসাহে) চকোলেট্! এতক্ষণ বলেননি কেন মিস্? ভাল তাজা চকোলেট—ঐ যে লক্ষ্মী ভাণ্ডার দেখছেন—স্রেফ ঐখানেই পাওয়া যায়। মনোহর ভাণ্ডারে যদি কিনতে যান, পঞ্চাশ বছরের পুরোনো চকোলেট পাবেন।

লক্ষ্মীর অধরোষ্ঠ একটু শক্ত হইল, কিন্তু সে মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া সহজ ভাবে বলিল—

লক্ষ্মী: ও—তা ঐ লক্ষ্মী ভাণ্ডারের মালিকের সঙ্গে তোমার জানাশোনা আছে বুঝি?

কার্তিক: আছে বৈকি মিস্, উনি আমাকে খুব ভালবাসেন। আর ওঁর দোকানের দরও খুব সস্তা।

লক্ষ্মী ক্ষণেক চিন্তা করিল।

লক্ষ্মী: হুঁ—তোমার কথা শুনে ইচ্ছে হচ্ছে ও দোকানে যাই, তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে?

কার্তিক: আল্বৎ নিয়ে যেতে পারব মিস্। আসুন আমার সঙ্গে—এখুনি বিজয়-বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

কার্তিক অগ্রগামী হইয়া লক্ষ্মীকে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দিকে লইয়া চলিল।

কাট্।

দোকানে কাজের ভিড় ছিল না; এই অবকাশে বিজয় তাহার ভীনাস ও ফুলদানী লইয়া পড়িয়াছিল। শো-কেসের মাথায় উপর ঐ দুটিকেই সাজাইতে হইবে, কারণ অন্য কোথাও সাজাইবার স্থান নাই; অথচ ঐ দু'টা বিসদৃশ জিনিস কিছুতেই মানানসই ভাবে সাজানো যাইতেছে না। ফুলদানী ভীনাসের বাঁ দিকে রাখিলে ডান দিকটা ফাঁকা-ফাঁকা মনে হয়, ডান দিকে রাখিলে বাঁ দিক শূন্য হইয়া যায়, সম্মুখে রাখিলে ভীনাসের মুখটি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। শেষে বিরক্ত হইয়া বিজয় ফুলদানীটা ভীনাসের পিছনে বসাইয়া দিল। দেখা গেল, এ বরং মন্দ হয় নাই, ফুলদানীর রঙিন ফুলের পশ্চাৎপটে ভীনাসের শুভ্ররূপ আরও ভাল দেখাইতেছে।

ইতিমধ্যে লক্ষ্মীকে লইয়া কার্তিক দোকানের মধ্যে উপস্থিত। সে একটু ভঙ্গী সহকারে একটি হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল—

কার্তিক: এই যে মিস্, ইনি বিজয়বাবু! স্যার, ইনি চকোলেট কিনতে এসেছেন।

বিজয় লক্ষ্মীকে দেখিয়া সহাস্যে আগাইয়া আসিল, পকেটে হাত দিয়া বলিল—

বিজয়: লক্ষ্মী দেবি, আপনার চকোলেট আমার পকেটেই রয়েছে।—কতদিন আসেননি বলুন তো!

মুখের পর্দা তুলিয়া লক্ষ্মী বিজয়ের পানে তাকাইল। অধরে হাসি নাই; মুখ একটু গম্ভীর, একটু বিষণ্ণ।

লক্ষ্মীঃ বিজয়বাবু—

কার্তিক একটু থতমত খাইয়া গেল,—ইহারা যেন পূর্ব হইতেই পরস্পরকে চেনে! লক্ষ্মীর উন্মুক্ত মুখ দেখিয়া তাহার অস্বস্তি আরও বাড়িয়া গেল, কোথায় যেন একটা হিসাবের ভুল হইয়াছে! কার্তিক আস্তে আস্তে পিছু হটিল। লক্ষ্মী বিজয়ের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—

লক্ষ্মীঃ এই ছেলেটিকে কবে থেকে চাকর রেখেছেন?

বিজয়ঃ (সবিস্ময়ে) চাকর রেখেছি! কার্তিককে—?

বিজয় কার্তিকের পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, কার্তিক দেয়ালী পোকার মত তেরছা-ভাবে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছে: সে ডাকিল—

বিজয়ঃ কার্তিক, যাস্‌নে—দাঁড়া!

কার্তিকের মুখ দেখিয়া মনে হইল সে বড়ই অসুখী হইয়াছে; কিন্তু বিজয়ের আদেশ সে অবজ্ঞা করিতে পারিল না, ন যযৌ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিজয়ঃ (লক্ষ্মীকে) কি হয়েছে বলুন দেখি?

লক্ষ্মীঃ ও আমাদের দোকান পিকেট্ করছিল—আর ও-দোকানের খদ্দের ভুলিয়ে এ-দোকানে পাঠাচ্ছিল। আমাকেও খদ্দের মনে করেই এখানে নিয়ে এসেছে।

প্রথমে খানিকক্ষণ অভিভূত থাকিয়া বিজয় এক লাফে গিয়া কার্তিকের ঘাড় ধরিয়া টানিয়া আনিল।

বিজয়ঃ (সক্রোধে) কার্তিক, হতভাগা, এ তুই কি করেছিস্? এ-কাজ করতে গেলি কেন? কে বলেছিল তোকে?

কার্তিক গোঁজ হইয়া রহিল উত্তর দিল না। লক্ষ্মীর মুখের মেঘ অনেকটা পরিষ্কার হইল।

লক্ষ্মীঃ তাহলে—আপনার হুকুমে করেনি?

বিজয় ভর্ৎসনাভরা চোখে তাহার পানে চাহিল।

বিজয়ঃ আমার হুকুমে? আমাকে এত ছোট মনে করেন আপনি?

লক্ষ্মী লজ্জিত হইল; বাস্তবিক এমন অভদ্র সন্দেহ কেন সে করিতে গেল? লজ্জা-বিব্রতকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—

লক্ষ্মীঃ না না—কিন্তু ও তাহলে অমন করতে গেল কেন? অম্‌নি অম্‌নি?

দুজনেই কার্তিকের দিকে তাকাইল; কার্তিক ঘাড় বাঁকাইয়া বিদ্রোহ ভরা কণ্ঠে বলিল—

কার্তিকঃ অম্‌নি-অম্‌নি নয় মিস্। আমাকে চড় মেরেছিল কেন—লাঠি মেরেছিল কেন?

লক্ষ্মী অবাক হইয়া বিজয়ের মুখের পানে তাকাইল, তারপর কার্তিককে প্রশ্ন করিল—

লক্ষ্মীঃ কে চড় মেরেছিল—লাঠি মেরেছিল?

কার্তিকঃ ঐ দোকানের বুড়োটা—ঐ যে—

কার্তিক নীলাম্বরের অনুকরণে চক্ষু স্ফুরিত করিল।

বুঝিতে পারিয়া লক্ষ্মী কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল; বিজয়ও মৃদু হাসিয়া কার্তিকের ঘাড় ছাড়িয়া দিল।

লক্ষ্মীঃ ও—নীলাম্বরবাবু তোমায় মেরেছিলেন তাই তুমি শোধ নিচ্ছিলে? কিন্তু দোকান তো নীলাম্বরবাবুর নয়, দোকান আমার বাবার।

কার্তিকের মুখ-গোঁজ-করা বিদ্রোহের ভাব আর রহিল না, তাহার অধরে একটু অনুতাপ মিশ্রিত হাসি দেখা দিল—

কার্তিকঃ ভুল হয়ে গেছে মিস্—আর করব না।

লক্ষ্মী প্রসন্নভাবে ঘাড় নাড়িল। এই সময় কাউণ্টারে খদ্দেরের গলা শোনা গেল—

খরিদ্দারঃ এক প্যাকেট কাঁচি—

বিজয় সেদিক যাইবার উপক্রম করিতেই কার্তিক চট্ করিয়া বলিল—

কার্তিকঃ আমি দিচ্ছি স্যার, কিছু ভাববেন না—আপনারা কথা বলুন।

কার্তিক ত্বরান্বিত হইয়া কাউণ্টারের দিকে চলিয়া গেল। বিজয় সেই দিকে তাকাইয়া রহিল—কার্তিক চালাক-চতুর ছেলে বটে, কিন্তু ভুল না করিয়া ফেলে।

লক্ষ্মী সরিয়া গিয়া শো-কেসের সম্মুখে দাঁড়াইল।

মিলোর চিরযৌবনা ভীনাস অচঞ্চল যৌবনশ্রী লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, অঙ্গহীনতার গ্লানি তাহার মদোদ্ধত দেহলাবণ্যকে তিলমাত্র ক্ষুন্ন করিতে পারে নাই। এই অলজ্জিত মূর্তির দিকে তাকাইয়া লক্ষ্মী ভ্রূকুটি করিল, বোধ হয় মনে মনে তাহাকে গালি দিল। তারপর বিজয়ের দিকে একটি চকিত দৃষ্টি হানিয়া চুপি চুপি ফুলদানীটি ভীনাসের সম্মুখে আনিয়া রাখিয়া দিল; ভীনাসের নগ্ন দেহ-সুষমা ঢাকা পড়িল।

ওদিকে কার্তিক নিপুণ তৎপরতার সহিত কাউণ্টারের কাজ চালাইতেছে দেখিয়া বিজয় ফিরিয়া লক্ষ্মীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পকেট হইতে চকোলেটের রূপালি পাতা-মোড়া তক্তা বাহির করিয়া বলিল—

বিজয়ঃ এই নিন আপনার চকোলেট—

লক্ষ্মী লক্ষ্য করিল বিজয়ের মুখ হইতে আহত অভিমানের চিহ্ন সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। বিগলিত অনুতাপের কণ্ঠে সে বলিল—

লক্ষ্মীঃ দোষ করেছি, আমায় মাপ্ করুন।

উদাসভাবে বিজয় চক্ষু ঊর্ধ্বে তুলিল।

বিজয়ঃ না, দোষ আর কি? এরকম অবস্থায় সন্দেহ হওয়াই তো স্বাভাবিক। আমাকে আপনি কতটুকুই বা জানেন—মাত্র চারবার দেখা হয়েছে বৈ তো নয়।

লক্ষ্মী ধনী কন্যা, কাহারও নিকট মাথা নোয়াইতে অভ্যস্ত নয়; কিন্তু এই দরিদ্র দোকানদারটির নিকট সবিনয়ে নতি-স্বীকার করিতে তাহার একটুও বাধিল না। সে নম্রস্বরে বলিল—

লক্ষ্মীঃ রাগ করবার অধিকার আপনার আছে; কিন্তু মানুষের কি ভুল হয় না? ক্ষমা চাইছি, তবু যদি আপনি রাগ করে থাকেন তাহলে—

লক্ষ্মীর গলা কাঁপিয়া গেল। বিজয়ের কানে তাহার কাঁপা-গলার রেশ পোঁছিতেই সে বুঝিতে পারিল, কী ছেলেমানুষী সে করিতেছে। সে ঊর্ধ্ব হইতে চক্ষু নামাইয়া তাড়াতাড়ি বলিল—

বিজয়ঃ ও কথা বলবেন না, লক্ষ্মী দেবী। রাগ আপনার ওপর আমি করতেই পারি না। জেনে রাখুন, আপনার প্রতি আমার মনে অসীম কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুরই স্থান নেই।

লক্ষ্মী কিন্তু মনে মনে খুশি হইতে পারিল না; বিমনা হইয়া ভাবিল অসীম কৃতজ্ঞতা কি এতই বড় জিনিস? তাহার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, অসীম কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই তুমি অনুভব কর না? কিন্তু সে হাল্কা হাসিয়া বলিল—

লক্ষ্মীঃ যাক নিশ্চিন্ত হলুম। আপনাকে যতই কম চিনি না কেন, আপনি যে রাগী মানুষ সেটা জানতে বাকি নেই। কিন্তু আপনাকেও একটা কথা জানিয়ে রাখি, দরকার হলে আমিও রাগ করতে জানি।

বিজয় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

বিজয়ঃ না না, কি মুশকিল—আপনি রাগ করতে যাবেন কেন? আমি তো কোনও অপরাধ করিনি? করেছি—বলুন?

লক্ষ্মীঃ করেছেন বৈকি। চকোলেট দেবেন বলে সেটি নিজের হাতেই রেখেছেন, প্রাণ ধ'রে দিতে পারছেন না।

সত্যই ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে চকোলেট বিজয়ের হাতেই রহিয়া গিয়াছিল, সে সলজ্জে উহা লক্ষ্মীর হাতে দিল। লক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে চকোলেটের প্রান্তে একটু কামড় দিয়া বলিল—

লক্ষ্মীঃ এবার বলুন দোকান চলছে কেমন। তিন দিন আসতে পারিনি, নতুন খবর কিছুই জানি না।

বিজয় পরিতৃপ্ত মুখে হাসিল। তারপর তাহার মুখ একটু গম্ভীর হইল, সে সংযত

স্বরে বলিল—

বিজয়ঃ আশাতীত ভাল চলছে। এত ভাল চলছে যে আমি একটু বিব্রত হয়ে পড়েছি—

লক্ষ্মীঃ (অবাক হইয়া) সে কি রকম?

বিজয় ভীনাসের দিকে অন্যমনস্ক চোখে চাহিল। তাহার অবচেতনায় বোধ হয় একটা অসঙ্গতির ছায়া পড়িল, সে ফুলদানীটা ভীনাসের পিছন দিকে সরাইয়া দিয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিল—

বিজয়ঃ বোধ হয় পুজো আসছে তাই...জিনিসের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে, অথচ এইটুকু দোকানে অত জিনিস রাখ্‌বার জায়গা নেই—তাই ভাবছি—

লক্ষ্মীঃ কী ভাবছেন? .

বিজয়ঃ ভাবছি, পাশের ঘরটা খালি আছে, ওটাও ভাড়া নিয়ে দোকানটাকে বড় করব কি না।

লক্ষ্মীঃ (সোৎসাহে) তাই করুন বিজয়বাবু—দুটো ঘর নিলে অনেকখানি জায়গা পাবেন; মাঝে দরজা আছে, কোনও অসুবিধা হবে না।

বিজয়ঃ অসুবিধা একটু আছে। দুটো কাউণ্টার হ'লে একজন লোক রাখতে হবে—আমি তো দুদিক দেখতে পারব না।

কাউণ্টারে খরিদ্দার ছিল না; কার্তিক কান পাতিয়া ইহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিল। তাহার চক্ষুযুগল উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

লক্ষ্মীঃ দরকার হলে লোক নিশ্চয় রাখবেন। কাজ বাড়লে লোক তো রাখতেই হবে—

এবার লক্ষ্মী অন্যমনস্কভাবে ভীনাসকে ফুলদানী আড়াল করিল, বিজয় তাহা লক্ষ্য করিল না।

বিজয়ঃ বেশ, আপনিও যখন সায় দিচ্ছেন তখন আর কথা নেই। কিন্তু একজন বিশ্বাসী কাজের লোক চাই—

আলাদীনের প্রদীপের জিনের মত কার্তিক সহসা তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া স্যালুট করিল; তাহার দুই চক্ষু উত্তেজনায় জ্বলিতেছে।

কার্তিকঃ বিশ্বাসী কাজের লোক চান স্যার?—এই যে হাজির আছে।

কার্তিক নিজের বুকের উপর হাত রাখিল।

বিজয় ও লক্ষ্মী নবজাগ্রত কৌতূহল লইয়া কার্তিককে নিরীক্ষণ করিল, তারপর পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া হাসিল।

বিজয়ঃ তুই পারবি? দোকানের কাজ জানিস?

কার্তিকঃ চিকা চিকা বুম্—সব জানি স্যার! পগেয়াপটিতে আমার মামার মণিহারীর দোকান আছে। আমাকে একটিবার কাজ দিয়ে দেখুন।

বিজয়ঃ আচ্ছা ভেবে দেখি। তুই কাউণ্টারে যা।

কার্তিক আবার স্যালুট করিয়া চলিয়া গেল। বিজয় তখন হ্রস্বকণ্ঠে লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিল—

বিজয়ঃ কি বলেন? রাখব ওকে? ছেলেটা চালাকচতুর আছে।

লক্ষ্মী স্মিতমুখে নেপথ্যে কার্তিকের পানে তাকাইয়া মৃদুস্বরে কহিল—

লক্ষ্মীঃ মন্দ কি! একটা সত্যিকারের কাজ পেলে ওর দুষ্টুবুদ্ধিও কমবে। ওকেই রাখুন বিজয়বাবু।

ওদিকে কার্তিক কাউণ্টারে মহা-উৎসাহে জিনিস বিক্রি করিতেছে—

কার্তিকঃ ...দেশলাই এক পয়সা, এই যে আসুন...আপনার কি চাই?...রুলকাটা খাতা—দু'পয়সার না চার পয়সার? এই যে আসুন......শেলেট্ পেন্সিল্ পয়সায় দুটো......গেঞ্জি? আজ্ঞে আছে, কালীঘাটের গেঞ্জি—

তাহার কর্মতৎপরতা দেখিয়া লক্ষ্মী ও বিজয় হাসিল। তারপর হঠাৎ বিজয়ের চোখ পড়িল ভীনাসের উপর। ফুলদানীতে ঢাকা লজ্জাবতী ভীনাস! বিজয় অবাক হইয়া চাহিয়া

রহিল। সে তো ফুলদানী ভীনাসের পিছনে রাখিয়াছিল, কে সামনে আনিল? তাহার অবচেতনা ধীরে ধীরে সজাগ হইয়া উঠিতে লাগিল।

লক্ষ্মী আড়চোখে তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিল।

লক্ষ্মীঃ আচ্ছা, আজ চললুম। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া লক্ষ্মী চলিয়া গেল। বিজয় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার পিছনে চাহিয়া রহিল, তারপর তাহার চোখ ভীনাসের দিকে ফিরিল। রহস্যটা যেন পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। ক্রমে তাহার মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। আরে ছি ছি, ভীনাসের নগ্নতা এতই সহজ ও স্বাভাবিক যে সে তাহা লক্ষ্যই করে নাই। আর লক্ষ্মী—।

বিজয় অনেকক্ষণ মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

ডিজল্ভ্।

মহা বাদ্যোদ্যমের শব্দ হইতেছে।

বিজয়ের দোকান দুইটি ঘরে বিস্তারলাভ করিয়াছে; সাইনবোর্ডটাও লম্বা হইয়া দুইটি দরজার উপর প্রসারিত হইয়াছে।

দোকানের সম্মুখে ফুটপাথের উপর ভিড় জমিয়াছে। কার্তিক ও তাহার দল অদ্ভুত ধরনের সাজ-পোশাক পরিয়া দোকানের সামনে কুচকাওয়াজ করিতেছে এবং নানা বিচিত্র বাদ্য বাজাইয়া গান করিতেছে। ফুল পাতা কলার থাম প্রভৃতি সময়োচিত মঙ্গল উপকরণ দ্বারা দোকান যথাযোগ্যভাবে সাজানো হইয়াছে—লক্ষ্মী ভাণ্ডার বড় হইয়াছে এই সংবাদটি এই অভিনব উপায়ে সাধারণের নিকট ঘোষিত হইতেছে।

গান চলিতেছে, বিলাতিমিশ্রিত কুচকাওয়াজী সুর—

চিকা চিকা বুম্।
আজ মরসুম—আজ মরসুম—
চিকা চিকা বুম্।

ধনেশের অফিস ঘরের জানালা বাহির হইতে দেখা যাইতেছে। ধনেশ ও নীলাম্বর দাঁড়াইয়া আছেন। নীলাম্বরের ললাটে কুটিল ভ্রূভঙ্গ; ধনেশ হিংস্রভাবে একটা আপেল কামড়াইতেছেন।

—এল পুজো—এল মা দশভূজা।
ঘরে ঘরে ধুম—
নতুন কাপড় জামা গয়নার ধুম—
চিকা চিকা বুম্।

মনোহর ভাণ্ডারের দ্বিতলে একটি জানালায় লক্ষ্মী দাঁড়াইয়া হাসিমুখে নীচের দিকে চাহিয়া আছে।

—ঘরে ঘরে বৌ-ঝিরা এস লক্ষ্মী
বাংলার মৌচাকে মধু-লক্ষ্মী
এস লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে রুমঝুমঝুম—
চিকা চিকা বুম্।
রুজ পাউডার—আতর গোলাপ—
আলতা সিঁদুর—মনভরপুর
পাবে মনের মতন—পাবে হরেক রকম—
চিকা চিকা বুম্।

আমাদের পূর্বপরিচিত বৃদ্ধটি ভিড়ের কিনারায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। হঠাৎ লক্ষ্মীর জানালার দিকে তাঁহার নজর পড়িল। চট করিয়া চশমা তুলিয়া তিনি স্থিরদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

কলিকাতার একটি বড় চৌমাথায় প্রকাণ্ড পোস্টার লাগানো হইয়াছে—

পূজার সময়—

রয়াল আফ্রিকান সার্কাস দেখুন।

হাতী, বাঘ, গণ্ডার, সিংহ প্রভৃতি বন্য জন্তুর সমাবেশে বিজ্ঞাপনটি বড়ই নয়নরঞ্জক হইয়াছে।

কাট্।

একটি বাড়ির দেয়ালে অপেক্ষাকৃত ছোট বিজ্ঞাপন—

ই, বি, আর—

পূজার ছুটিতে অর্ধমূল্যে ভ্রমণ করুন।

কাট্।

লক্ষ্মী ভাণ্ডারের সম্মুখে হাতে লেখা বিজ্ঞাপন ঝুলিতেছে—

পূজার বাজার—

নরম দরে গরম জিনিস!

আসুন! দেখুন! কিনুন!

কাট্।

মনোহর ভাণ্ডারের প্রবেশ দ্বারের কবাট বন্ধ। তবু ক্যামেরা ভিতরে প্রবেশ করিল।

ডিজল্ভ্।

মনোহর ভাণ্ডারের অভ্যন্তর; দেয়ালে একটি বড় ক্যালেণ্ডার ঘোষণা করিতেছে—

রবিবার ১৮ই সেপ্টেম্বর—

সুতরাং দোকানে কেহ নাই। দিনের বেলাও অন্ধকার; মাথার উপর একটি মাত্র বাল্ব জ্বলিতেছে, তাহার নিঃসঙ্গ আলোকে বিশাল ঘরটির মধ্যে আলো-আঁধারির খেলা।

ঘরের যে প্রান্তে উপরের সিঁড়ি তেরছাভাবে উঠিয়া দ্বিতলের দিকে গিয়াছে, সেই কোণে সিঁড়ির পাশের দিকে নীলাম্বর দাঁড়াইয়া একটি লোকের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। নীলাম্বরের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় না যে, তিনি সৎকার্যে ব্যাপৃত আছেন; তিনি খুব গলা খাটো করিয়া কথা কহিতেছেন এবং তাঁহার তীক্ষ্ম চক্ষুদুটি সতর্কভাবে চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাঁহার সঙ্গীটি পশ্চিমী লোক; ইয়া ষণ্ডা চেহারা, ঝাঁক্ড়া গোঁফ, মাথায় পাগড়ি, গলায় কালো সুতার কণ্ঠি। ইহার উল্লেখ পূর্বে আমরা শুনিয়াছি—মাহিনা করা গুণ্ডা হনুমান সিং।

নীলাম্বর: খুব সাবধানে কাজ করতে হবে হনুমান সিং, যেন কোনও রকম গণ্ডগোল না হয়—

হনুমান সিংয়ের গলাটি গাঁজার প্রসাদে ধরাধরা, খুব শ্রুতিমধুর নয়; সেও গলা নামাইয়া বলিল—

হনুমানঃ আরে বাবুজি, হামি পন্দ্র বরষ্ ই কাম কোরছে, আজতক্ হামার নাম পুলিশের বহিতে চঢ়েনি। বুঢ়া মালিকের মালুম ছিল। কী কাজ আছে বোলেন, তারপোরে দেখিয়ে লিবেন কেমন সিল্‌সিলাসে কাম হোয়। হামি দুকানের নৌকর আছে, মালিকের বদ্‌নাম কোভি হোতে দিবে না—

নীলাম্বরঃ বেশ বাবা হনুমান, ঐদিকে নজর রেখো; ধরি মাছ না ছুঁই পানি। এখন কি করতে হবে বলি—

এই সময় ক্যামেরা ঊর্ধ্বমুখ হইয়া উপর দিকে তাকাইল। দেখা গেল, লক্ষ্মী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে। তাহার পায়ে ফেল্টের বেড্-রুম-শ্লিপার, কোনও শব্দ হইল না। নীলাম্বর বা হনুমান কেহই ওদিক হইতে মানুষ সমাগম আশঙ্কা করেন নাই, তাই লক্ষ্মীর প্রতি কাহারও নজর পড়িল না।

লক্ষ্মীর হাতে একখানা বই ছিল, বোধ করি সে বইখানা পিতার অফিসে রাখিতে যাইতেছিল। কিন্তু নীচে মনুষ্য কণ্ঠের ফিস্ ফিস্ শব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিল—অল্প আলোতেও চিনিতে কষ্ট হইল না—নীলাম্বর ও হনুমান সিং। আজ রবিবার, দোকান বন্ধ—এ সময় ইহারা কি করিতেছে! ইহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া লক্ষ্মীর সন্দেহ হইল; সে নীরবে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

নীলাম্বর হনুমানের আরও কাছে সরিয়া আসিলেন।

নীলাম্বরঃ আমাদের সামনে একটা নতুন দোকান হয়েছে দেখেছ—লক্ষ্মী ভাণ্ডার? ঐ লোকটা আমাদের পেছনে লেগেছে: ওকে সায়েস্তা করা দরকার। লোকটাকে তুমি দেখেছ তো?

হনুমানঃ হাঁ হাঁ, দেখিয়েছে—নৌযবান ছোকরা আছে। ওহি তো?

নীলাম্বরঃ হ্যাঁ, ওই। ভারি শয়তান লোকটা। দেখছ না বুকের পাটা, আমাদের নাকের সামনে এসে দোকান খুলেছে; তার ওপর আমাদের খদ্দের ভাঙিয়ে নিচ্ছে। ওকে তুমি ভাল করে জব্দ করে দাও দেখি, হনুমান। তুমি মাইনে তো পাচ্ছই, তার ওপর সাহেব তোমাকে মোটা বক্‌শিশ করবেন।

উপরে দাঁড়াইয়া লক্ষ্মীর মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে, সে বিহ্বল ব্যাকুল নেত্রে চাহিয়া আছে—

হনুমানঃ তো ই কোন্ ভারি কাম আছে! হুকুম হো তো উস্‌কো মুর্দা বানিয়ে দিবে।

নীলাম্বরঃ শোনো, সাহেব বলেছেন, একেবারে শেষ করে দেবার দরকার নেই। প্রথমটা ওকে একটা বড় রকম হুম্‌কি দাও; ওকে ভাল করে বুঝিয়ে দাও যে, এ-পাড়ায় ওর দোকান করা চল্‌বে না।

হনুমানঃ আচ্ছা, হাম খুব আচ্ছি তরহসে সম্‌ঝিয়া দিবে—হে হে হে—

নীলাম্বরঃ আস্তে—যদি ভালয় ভালয় পাড়া ছেড়ে চলে যায় তো ভালই—নইলে—

হনুমানঃ নহি তো পিছে একদম দুনিয়াসে নিকাল-বাহার করিয়ে দিবে—

এই পর্যন্ত শুনিয়া লক্ষ্মী আর দাঁড়াইল না, পা টিপিয়া টিপিয়া নিঃশব্দে উপরে ফিরিয়া গেল।

নীলাম্বরঃ কিন্তু মনে থাকে যেন বাবা হনুমান, যাই কর, আমাদের জড়িও না। এমন ভাবে কাজ করবে যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে।

হনুমানঃ আরে বাবুজি, সে আপনি হামাকে কি বোলছেন? হনুমান সিং যার নিমক খাইয়েছে তার ইজ্জৎ বাঁচানেকে লিয়ে জান দিবে। আপনি কুচ্ছু ফিকির কোরেন না—

অতঃপর দুইজনে অতি সন্তর্পণে সদর দরজার দিকে চলিলেন।

কাট্।

নিজের শয়নঘরে শয্যার পাশে লক্ষ্মী স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া আছে; তার মনটা যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে। আজ একী শুনিল সে! বিজয়কে ইহারা গুণ্ডা লাগাইয়া তাড়াইতে

চায়! প্রয়োজন হইলে খুন করিতেও ইহারা পিছপাও নয়। তাহার বাবা—! না, না, সে কখনই ইহা ঘটিতে দিবে না।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া লক্ষ্মী জানালার কাছে ছুটিয়া গেল। জানালা খুলিয়া দেখিল, বিজয়ের দোকান খোলা আছে।

জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া সে ক্ষণকাল চিন্তা করিল, তারপর তাড়াতাড়ি ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে গিয়া বেশ-বাস পরিবর্তন করিতে লাগিল।

কাট্।

লক্ষ্মী ভাণ্ডার। দুইটি কাউণ্টারে যথাক্রমে কার্তিক ও বিজয় রহিয়াছে।

আমাদের পূর্ব পরিচিত বৃদ্ধ বিজয়ের কাউণ্টারের বাহিরে দাঁড়াইয়া 'নরম-গরম' বিজ্ঞাপনটি পড়িতেছেন, তাঁহার অধরোষ্ঠ ব্যঙ্গভরে একটু একটু নড়িতেছে। ভিতরে বিজয় তাঁহার জন্য এক মোড়ক নস্য লইয়া হাসিমুখে তাঁহার পানে বাড়াইয়া ধরিল।

বিজয়ঃ আসুন—আপনার নস্যি। আর তো পুজো এসে গেল, বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্যে পুজোর উপহার কিছু কিনবেন না?

বৃদ্ধ মোড়ক লইয়া গলার মধ্যে একপ্রকার শব্দ করিলেন।

বৃদ্ধঃ বাড়ির ছেলেমেয়ে—!

বিজয়ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, এই সব ছোট ছোট নাতি নাতনী—

বৃদ্ধঃ একটি নাতনী আছে, তার জন্যে কিছু কিনতে হবে—

বিজয়ঃ আজ্ঞে আমি অনেক রকম ছেলেমেয়েদের খেল্না আনিয়ে রেখেছি—দেখবেন একবার? ভেতরে আসুন না—যদি কিছু পছন্দ হয়—

বৃদ্ধ চশমা তুলিয়া ক্ষণেক বিজয়কে দেখিলেন, তাঁহার গলায় আবার শব্দ হইল।

বৃদ্ধঃ খেল্না! আমার নাতনীর বয়স উনিশ বছর—

বিজয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

বিজয়ঃ ওঃ—মাপ্ করবেন, আমি ভেবেছিলুম—তা মহিলাদের উপহার দেবার মত জিনিসও আমার দোকানে আছে। ভেতরে এসে দেখুন না।

বৃদ্ধ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বিজয় সোৎসাহে তাঁহাকে উপহারের উপযোগী শৌখিন সামগ্রী দেখাইতে লাগিল।

বাহিরে ফুটপাথের উপর দিয়া হনুমান সিং বিড়ি টানিতে টানিতে অলসমন্থর পদে আসিতেছিল, সে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে চলিয়া গেল। দোকানের ভিতর বিজয় বৃদ্ধকে বলিতেছে—

বিজয়ঃ যদি কাচের বাসন উপহার দিতে চান, তাও আছে। ও-ঘরে চলুন। চায়ের সেট্, ডিনার সেট্—আরও নানারকম জিনিস আছে—

মধ্যবর্তী দরজা দিয়া বিজয় বৃদ্ধকে পাশের ঘরে লইয়া গেল; এ-ঘরে কার্তিক কাউণ্টারে বসিয়াছে। একটা দেয়াল ছাদ পর্যন্ত কেবল কাচের বাসনে ঠাসা। বৃদ্ধ সেগুলি মনোনিবেশ সহকারে দেখিতে লাগিলেন।

বিজয়ঃ কম দামের জিনিসও আছে আবার বেশী দামের জিনিসও আছে, আপনার যেমন ইচ্ছে—

এই সময় বিজয়ের মনোযোগ অন্য ঘরের দিকে আকৃষ্ট হইল; সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, বাহিরের সরু দরজা দিয়া লক্ষ্মী প্রবেশ করিতেছে! সে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধকে বলিল—

বিজয়ঃ আপনি ততক্ষণ দেখুন, আমি আসছি—

বৃদ্ধ গলার মধ্যে শব্দ করিলেন, কিন্তু পিছু ফিরিয়া দেখিলেন না, যেমন দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন তেমনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিজয় হাস্যবিস্মিত মুখে লক্ষ্মীর কাছে গেল—

কিন্তু লক্ষ্মীর মুখে হাসি নাই, চোখে একটা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি; বিজয় কাছে আসিতেই সে তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া ব্যাকুলস্বরে বলিয়া উঠিল—

লক্ষ্মী: বিজয়বাবু—!

বিজয় তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল, উৎকণ্ঠিতস্বরে বলিল—

বিজয়: কী—কি হয়েছে লক্ষ্মী দেবী?

ও-ঘরে লক্ষ্মীর আর্তস্বর বৃদ্ধের কানে যাইতেই তিনি তীরবিদ্ধবৎ ফিরিলেন। মাঝের দরজা দিয়া লক্ষ্মী ও বিজয়কে দেখা গেল; বৃদ্ধ একবার চশমা তুলিয়া তাহাদের দেখিলেন, তারপর ত্বরিতে আবার চশমা নামাইয়া পিছু ফিরিয়া কাচের বাসন পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মী বৃদ্ধকে দেখিতে পায় নাই, তাহার চক্ষু বিজয়ের মুখের উপর নিবদ্ধ ছিল: নিটোল সুন্দর চিবুকটি অল্প অল্প কাঁপিতেছিল। অবশেষে সে ভাঙা ভাঙা গলায় বলিল—

লক্ষ্মী: বিজয়বাবু, আমি—আপনাকে সাবধান করে দিতে এসেছি—

বিজয়: সাবধান—?

লক্ষ্মী: আমি জানতে পেরেছি, কেউ আপনার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করছে—

বিজয়: (মহাবিস্ময়ে) অনিষ্ট করবার চেষ্টা করছে! কিন্তু কেন? আমি তো কারুর অনিষ্ট করিনি—!

লক্ষ্মী: তা না করুন, তারা আপনার ক্ষতি করতে চায়—তারা আপনাকে—

বিজয়:—কিন্তু তারা কারা?

লক্ষ্মী ক্ষণেকের জন্য মাথা নীচু করিল।

লক্ষ্মী: ও কথা জানতে চাইবেন না। তারা চায় আপনি এ পাড়া থেকে দোকান তুলে চলে যান; তারা আপনার পেছনে গুণ্ডা লাগিয়েছে—

বিজয়ের মুখ গম্ভীর হইল। সে একবার বাহিরে মনোহর ভাণ্ডারের পানে তাকাইল, তারপর লক্ষ্মীর হাত ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

বিজয়: বুঝেছি। আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি গুণ্ডার ভয়ে পালাব না।

লক্ষ্মী: পালাতে আমি বলি না। আমি শুধু আপনাকে জানিয়ে দিলুম। আপনি সাবধানে থাকবেন। বলুন, সাবধানে থাকবেন?

ব্যগ্রভাবে লক্ষ্মী বিজয়ের বাহুর উপর হাত রাখিল: বিজয় পরম সম্ভ্রমের সহিত বলিল—

বিজয়: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি যথাসাধ্য সাবধান হব। আর—আর—আপনি দুঃখ করবেন না। দোষ কারুর নয়, দোষ আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার: ধনতন্ত্রের আমলে পরের গলা না কাটলে নিজের উন্নতি হয় না—এটা সেই অর্থনৈতিক নিয়মের একটা সামান্য উদাহরণ, আর কিছু নয়।

বিজয়ের কণ্ঠস্বর নিজের অজ্ঞাতসারেই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল: লক্ষ্মীর চোখে, জল আসিয়া পড়িল। সে তাহা ঢাকা দিবার জন্য অধর দংশন করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

লক্ষ্মী: আমি যাই—

লক্ষ্মী চলিয়া গেল। বিজয় কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বিষণ্ণ মুখে বৃদ্ধের কাছে ফিরিয়া গেল; ক্লান্তস্বরে কহিল—

বিজয়: মাপ করবেন একটু আটকে পড়েছিলুম।—কিছু পছন্দ করলেন নাকি?

বৃদ্ধ তাহার দিকে ফিরিয়া চোখের চশমা তুলিলেন, পাশের ঘরের দিকে উঁকি মারিলেন, তারপর বলিলেন—

বৃদ্ধ: তোমার মুখ শুকনো দেখাচ্ছে কেন? ও মেয়েটা কে?

বিজয় মুখ গম্ভীর করিল, লক্ষ্মী সম্বন্ধে এইরূপ অবজ্ঞাসূচক উক্তি তাহার ভাল লাগিল না।

বিজয়: উনি একজন মহিলা।—আপনার যদি কিছু—

বৃদ্ধঃ পরে কিনব। ও মেয়েটা—মানে মহিলাটি কী বলে গেলেন তোমাকে? মুষড়ে পড়েছ যে!

বিজয় ক্ষণেক নীরব থাকিয়া তিক্ত কণ্ঠে কহিল—

বিজয়ঃ মুষড়ে পড়িনি, ছোটর ওপর বড়র অত্যাচার দেখে মনটা তেতো হয়ে গেছে। —ঐ যে মনোহর ভাণ্ডার দেখছেন ওঁরা আমার পেছনে গুণ্ডা লাগিয়েছেন।

বৃদ্ধঃ তাই নাকি? তা—সেই খবর বুঝি মেয়েটা—মহিলাটি দিয়ে গেলেন?

বিজয় ও প্রশ্নের জবাব দিল না, বলিল—

বিজয়ঃ আমি এখানে দোকান করেছি ওঁদের সহ্য হচ্ছে না; ওঁরা আমাকে তাড়াতে চান।

বৃদ্ধঃ হুঁ—তুমি এখন কি করবে?

বিজয়ঃ করবার কী আছে—কিছুই না। আমি পালাব না।

বৃদ্ধ চশমা তুলিয়া তাহার পানে চাহিলেন।

রাত্রি হইয়াছে। কার্তিক ও বিজয় দোকান বন্ধ করিতেছে। কার্তিকের চক্ষু ঘুমে ঢুলুঢুলু।

আলো নিভাইয়া দুজনে বাহিরে আসিল; বিজয় দরজায় তালা লাগাইল।

বিজয়ঃ আচ্ছা।—কাল সকাল সকাল আসিস্।

নিদ্রালুভাবে স্যালুট করিয়া কার্তিক চলিয়া গেল।

বিজয় ফায়ার ব্রিগেডের স্তম্ভটার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ঊর্ধ্বে চাহিয়া দেখিল লক্ষ্মীর জানালা দিয়া আলো আসিতেছে। খানিকক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া বিজয় একটা নিশ্বাস ফেলিল, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির পানে চলিল।

পরদিন প্রভাত। বেলা আন্দাজ ন'টা।

কার্তিক দোকানে উপস্থিত হইয়া দেখিল দোকান এখনও খোলে নাই। এমন প্রায় রোজই হয়, বিজয় পরে আসে। কার্তিক বন্ধ দরজার সম্মুখে ধাপের উপর বসিল।

রাস্তা দিয়া নানা জাতীয় লোক যাতায়াত করিতেছে। মেসের একটি ঝি এক ঝুড়ি তরি-তরকারী লইয়া যাইতেছিল, তাহার ঝুড়ি হইতে একটি মুলা খসিয়া ফুটপাথে ঠিক কার্তিকের সামনে পড়িল; ঝি লক্ষ্য করিল না, তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কার্তিক টপ্ করিয়া মুলাটি তুলিয়া লইয়া হৃষ্টচিত্তে প্রাতরাশ শুরু করিল।

ওদিকে মনোহর ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়াছে। ধনেশের অফিস ঘরের জানালাও খুলিয়া গেল। নীলাম্বর জানালা দিয়া লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার দুষ্ট চক্ষুটি নাচিয়া উঠিল।

বিজয় আসিয়া দেখিল, কার্তিক মুলা শেষ করিয়াছে। সে তালা খুলিয়া দোকানে প্রবেশ করিল, কার্তিক তাহার পিছন পিছন গেল।

দোকানের ভিতর অন্ধকার। কার্তিক তাড়াতাড়ি গিয়া কাউণ্টার খুলিতে প্রবৃত্ত হইল, বিজয় পাশের ঘরে গেল। কাউণ্টার খুলিতেই একঝলক রৌদ্র ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল; বিজয় চীৎকার করিয়া উঠিল—

বিজয়ঃ অ্যাঁ! কার্তিক, একি!

দোকানের ভিতর দিয়া যেন একটা সর্বনাশা ঝড় বহিয়া গিয়াছে; ভাঙা-ছেঁড়া জিনিসপত্র বিশৃঙ্খলভাবে চারিদিকে ছড়ানো, কাচের বাসনগুলি সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া মেঝেয় পড়িয়া আছে।

কার্তিক ছুটিয়া আসিয়া বিজয়ের পাশে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বিজয়ের মুখ শীর্ণ ও সাদা হইয়া গিয়াছিল, পায়ের জোর যেন আর ছিল না; সে কার্তিকের কাঁধে ভর দিয়া দাঁড়াইল। প্রায় দেড় হাজার টাকার জিনিস খোলামকুচি হইয়া মেঝেয় ছড়াইয়া আছে! আক্রমণ যে এই দিক দিয়া আসিবে, তাহা বিজয় কল্পনা করে নাই। তাহার বুকের ভিতর হইতে একটা বাষ্পোচ্ছ্বাস কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল।

বিজয়ঃ কার্তিক, সব গেছে রে! আমাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে ওরা!

এই বিপুল ধ্বংসের সম্মুখে কার্তিক কাঁদো-কাঁদো মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, বিজয়ের কথায় সচকিতে মুখ তুলিল।

কার্তিকঃ অ্যাঁ—! কে—কারা করেছে?

কাউণ্টার হইতে খট্ খট্ শব্দ আসিল, ভারী গলায় আওয়াজ হইল—

আওয়াজঃ এ বাবু দোকানদার!

দুজনে একসঙ্গে ঘাড় ফিরাইল। হনুমান সিং কাউণ্টারে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মুখে অবজ্ঞামিশ্রিত বিদ্রূপের হাসি। তাহাকে দেখিয়া বিজয়ের মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল; কাল বৈকালে এই দুশমনের মত লোকটাকে সে কয়েকবার দোকানের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতে দেখিয়াছে। হয়তো এই গুণ্ডাটাই রাত্রে তালা খুলিয়া তাহার দোকানে ঢুকিয়া সমস্ত তচনচ করিয়াছে, আর আজ সকালে তাহার সর্বনাশ দেখিয়া পরিহাস করিতে আসিয়াছে। বিজয় কাউণ্টারের কাছে গিয়া যথাসম্ভব সংযতকণ্ঠে বলিল—

বিজয়ঃ কি চাও?

হনুমান সিং দোকানের এদিক-ওদিক সকৌতুক নেত্রে দেখিয়া হে হে করিয়া হাসিল।

হনুমানঃ আরে, তুমহার দুকান তো বিলকুল পস্ত্ হৈয়ে গিয়েছে! রাতকো বিল্লি ঘুষেছিল কি?

বিজয়ের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, সে কাউণ্টারের উপর দুই হাত রাখিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া অবরুদ্ধ ক্রোধের কণ্ঠে বলিল—

বিজয়ঃ তুমি ঢুকেছিলে! তুমি আমার দোকান তচনচ করেছ!

ইতিমধ্যে আমাদের পরিচিত বৃদ্ধটি কখন্ ফুটপাথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং আড়ালে দাঁড়াইয়া এই বিতর্ক শুনিতেছিলেন। হনুমান সিং বিজয়ের কথায় যেন অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছে, এমনি ভাবে চক্ষু পাকাইয়া বলিল—

হনুমানঃ হামি? আরে দুকানদার, ই তুম্ বড়া বুরা বাৎ বোলছে। হামি শরীফ আদমি আছে—ভদ্দরলোক। হামারা ঝুটা বদনামি করেগা তো আচ্ছা নেহি হোগা।

গুণ্ডার ধমকে বিজয় ভয় পাইল না।

বিজয়ঃ কী—তুমি আমার দোকান নষ্ট করবে, আবার আমাকেই চোখ রাঙাবে?

ধমকে ফল হইল না দেখিয়া হনুমান সিংয়ের ভাবভঙ্গী বদলাইয়া গেল; সে মুরুব্বি বন্ধুর মত সদয় কণ্ঠস্বর বাহির করিল—

হনুমানঃ আরে বাবু, শুনো হামারা বাৎ। তুম্ নৌযবান হ্যায়, নয়া দুকান কিয়া হায়, তুম্‌কো হুঁসিয়ারীসে চল্‌না চাহিয়ে। বড়াসে মোকাবিলা করনা তুম্‌হারা ফর্জ নহি হ্যায় —বোঝলেন হামারা বাৎ—তুম্‌হার দুকান লোকসান হৈয়েছে, বড়ী আফসোসকি বাৎ আছে; মালুম হোচ্ছে কি ঈ মহল্লার হাওয়া তোমার লিয়ে আচ্ছা নহি আছে। সম্‌ঝা? কল্‌কাতা শহরমে কেৎনা যায়গা আছে তুমি ঔর কঁহি যাকে দুকান করো, কোই কুচ্ছু বোলবে না! সম্‌ঝা?

বিজয়ঃ বুঝেছি। তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ! বাঙলা দেশের বুকের ওপর বসে তুমি বাঙালীকে চোখ রাঙাচ্ছ! কিন্তু তুমিও একটা কথা শুনে রাখো। তুমি গুণ্ডা হতে পার, কিন্তু তোমাকে আমি ভয় করি না। এ-পাড়া থেকে আমি এক-পা নড়ব না, তোমার যা ক্ষমতা থাকে তুমি কোরো।

হনুমান কিছুক্ষণ বিজয়ের আরক্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল, বোধ করি মনে-মনে একটু

সম্ভ্রম অনুভব করিল। শেষে তাচ্ছিল্যভরে হাত উল্টাইয়া বলিল—

হনুমানঃ আপকা হিস্থা। লেকেন ই কাম আচ্ছা হৈল না।

হনুমান সিং হেলিতে দুলিতে চলিয়া গেল। আমাদের বৃদ্ধটি ইতিমধ্যেই অন্তর্হিত হইয়াছেন।

বিজয় ক্লান্ত ম্রিয়মাণভাবে গিয়া টেবিলের সম্মুখে বসিল, দুই হাতে মুখ ঢাকা দিয়া ক্ষণকাল নিশ্চল হইয়া রহিল। লক্ষ্মী কখন নীরবে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সে জানিতে পারে নাই, তাহার ক্ষীণ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে সে চক্ষু খুলিয়া চাহিল।

লক্ষ্মীঃ বিজয়বাবু—

বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিবার চেষ্টা করিল; লক্ষ্মীর চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল। কেহই আর কাহারও পানে তাকাইতে পারিল না. মুখ নীচু করিয়া মেঝের উপর চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া রাখিল।

শো-কেসটার কাচগুলো ফাটিয়া গিয়াছিল; তাহার পাশে মেঝের উপর ভীনাসের মূর্তিটা দুই খণ্ড হইয়া পড়িয়া ছিল। দুই হাজার বছরের অবহেলা যে-ক্ষতি করিতে পারে নাই, এক রাত্রির বর্বরতা যেন তাহা সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

ডিজল্‌ভ্‌।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। শহরের অপেক্ষাকৃত একটি নির্জন অংশে আমাদের পরিচিত বৃদ্ধ ফুটপাথের ধারে একটি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া ছিলেন; হনুমান সিং দৈহিক শক্তির দর্পে বুক ফুলাইয়া একটা বিড়ি টানিতে টানিতে সেই দিকে আসিতেছিল।

সে গাছের কাছাকাছি আসিতেই বৃদ্ধ এক-পা অগ্রসর হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন; হনুমান সিং ভূত দেখার মত চমকিয়া হাতের বিড়ি ফেলিয়া দিল। বৃদ্ধ চশমা তুলিয়া কটমট করিয়া তাহার পানে চাহিতেই সে যেন একেবারে কেঁচো হইয়া গেল; আভূমি মাথা নোয়াইয়া সেলাম করিয়া সম্ভ্রম-বিস্ময়মিশ্রিত কণ্ঠে বলিল—

হনুমানঃ মালিক! সরকার!—

বৃদ্ধ ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিলেন; হনুমান তৎক্ষণাৎ কথা বন্ধ করিল। বৃদ্ধ একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া কড়া সুরে বলিলেন—

বৃদ্ধঃ আমার সঙ্গে এস—তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বৃদ্ধ বৃক্ষতল ছাড়িয়া দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিলেন; হনুমান পোষা কুকুরের মত তাঁহার পিছু পিছু চলিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

অপরাহ্ণ। ধনেশের অফিস ঘর।

চায়ের ট্রে টেবিলের উপর লইয়া ধনেশ বসিয়া আছেন; টেবিলের পাশে নীলাম্বর দাঁড়াইয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তভাবে হাত ঘষিতেছেন। দুজনের চোখাচোখি হইল; নীলাম্বর অর্থপূর্ণভাবে চক্ষু নাচাইলেন।

ধনেশঃ নীলাম্বর, চা খাও।

নীলাম্বরঃ না না, তুমি খাও। পেয়ালা তো একটাই দেখছি—

পেয়ালা একটাই বটে। ধনেশ ভ্রূ-কুঞ্চন করিয়া তাকাইলেন, তারপর টেলিফোন তুলিয়া লইলেন। প্রত্যহ বৈকালে উপর হইতে তাঁহার চা আসে; একটি পেয়ালা ও তদনুযায়ী দুধ চিনি কেক প্রভৃতি। অন্য দিন তিনি একাই চা পান করেন; কিন্তু আজ তিনি নীলাম্বরের উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাকে প্রসাদ বিতরণ করা প্রয়োজন।

ধনেশঃ দাঁড়াও পেয়ালা আনাচ্ছি ওপর থেকে—

তিনি টেলিফোনে একটা নম্বর দিলেন।

কাট্।

আজ লক্ষ্মী কলেজে যায় নাই; অসুস্থ-মনে সে নিজের শয়নঘরে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল। টেলিফোনের ঘণ্টির শব্দ শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইল।

ঘরের বাহিরে একটা লম্বা বারান্দা—তাহার দুই পাশে দুই সারি ঘর। এই বারান্দার একপ্রান্তে সিঁড়ি নীচে দোকানের দিকে গিয়াছে, অন্য প্রান্তে চাকর-বাকরের ব্যবহারের জন্য আর একটি লোহার ঘোরানো সিঁড়ি। বারান্দায় আসবাব-পত্র বিশেষ কিছু নাই, দু-তিনটা কাঠের কাবার্ড ও উঁচু টুলের উপর একটি টেলিফোন আছে।

লক্ষ্মী আসিয়া টেলিফোন ধরিল।

লক্ষ্মীঃ হ্যালো!—ও, বাবা......! চাকর-বাকর কেউ বাড়ি নেই...তাদের এই মাত্র ছুটি দিয়েছি, তারা সার্কাস দেখতে গেছে...বাঃ, চাকর বলে কি তাদের আমোদ-আহ্লাদ নেই! ......কী দরকার তোমার বল না...চায়ের পেয়ালা চাই আর একটা? বেশ তো, আমি নিয়ে যাচ্ছি—

ফোন রাখিয়া লক্ষ্মী একটা কাবার্ডের দিকে গেল।

কাট্।

ফোন রাখিয়া ধনেশ অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া মুখের একটা ভঙ্গী করিলেন; তারপর একখণ্ড কেক লইয়া তাহাতে কামড় দিলেন, নীলাম্বরকে বলিলেন—

ধনেশঃ খাও। পেয়ালা আসছে!

নীলাম্বর কেকের দিকে হাত বাড়াইলেন!

কাট্।

মনোহর ভাণ্ডারের অভ্যন্তর। দোকানের কাজ চলিতেছে; খরিদ্দার আসিতেছে যাইতেছে। কাউণ্টারে কর্মব্যস্ততা।

পেয়ালা হাতে লক্ষ্মী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে। আধাআধি নামিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সদর দরজা দিয়া হনুমান সিং প্রবেশ করিয়া সটান ধনেশের অফিস ঘরের দিকে যাইতেছে। লক্ষ্মী দোকানের পুরাতন ভৃত্য হনুমান সিংকে চিনিত এবং সে-ই যে বিজয়ের দোকান ভাঙিয়াছে, সে বিষয়েও তাহার মনে কোনও সংশয় ছিল না। সে বিস্ফারিত নেত্রে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। হনুমান সিং অফিস ঘরের দরজার কাছে গিয়া চাপরাশিটাকে হাত নাড়িয়া ইশারা করিতেই সে ত্রস্তভাবে সরিয়া গেল। হনুমান সিং তখন পর্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

আরও কিছুক্ষণ স্পন্দিতবক্ষে দাঁড়াইয়া থাকিয়া লক্ষ্মী দ্রুতপদে নীচে নামিতে লাগিল।

কাট্।

অফিস ঘরে হনুমান সিংয়ের আকস্মিক আবির্ভাবে ধনেশ ও নীলাম্বরের কেক-ভক্ষণে বাধা পড়িয়াছিল, তাঁহারা অর্ধভুক্ত কেক হাতে লইয়া বিমূঢ়ভাবে হনুমানের পানে তাকাইয়া ছিলেন। হনুমান বেশ গরম হইয়া ধনেশকে বলিতেছিল—

হনুমানঃ সাব্, হামি দুকানের নৌকর্ আছে। মালিকের নিমক খাইয়াছে, লেকেন বে-

ইনসাফ কাম কভি নহি করেগা—

লক্ষ্মী ইতিমধ্যে দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে একবার ক্ষিপ্রচক্ষে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে কিনা; তারপর মাথা হেঁট করিয়া ঘরের ভিতরের কথাবার্তা শুনিতে লাগিল।

হনুমানঃ—হামি পহলমান আছে, লেকেন লুচ্চা-লফসা নহি—

ধনেশ অসহায়ভাবে নীলাম্বরের পানে চাহিলেন।

নীলাম্বরঃ আহাহা, হঠাৎ তোমার হল কি হনুমান! কাল একরকম ছিলে আজ আবার একরকম—!

আরও উত্তেজিত হইয়া হনুমান নীলাম্বরের দিকে তর্জনী নাড়িয়া বলিয়া উঠিল—

হনুমানঃ এহি বাবুঠো পাক্কা হারামি আছে। সাব্, আপকোভি এহি বদমাসটা বুরা রাস্তামে নিয়ে যাচ্ছে। আপ সিধা-সাধা আদমি, এই শয়তানের ফান্দায় পড়ে বরবাদ হৈয়ে যাবেন। হামারা বাৎ শুনেন, ইসকো লাৎ মারিয়ে নিকাল-বাহার করিয়ে দেন।

নীলাম্বর থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ধনেশ এই গুন্ডার স্পর্ধা দেখিয়া মনে-মনে খুবই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু শাঁখের করাত যেমন যাইতে কাটে তেমনি আসিতেও কাটে; গুন্ডার ধর্মহীন দুঃসাহস যাহারা নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে, তাহারা নিজেরাও ঐ দুঃসাহসিকতার ভয়ে সর্বদা কাঁটা হইয়া থাকে। ধনেশ বাহিরে নিজের মর্যাদা যথাসাধ্য বজায় রাখিবার চেষ্টায় কণ্ঠস্বর গম্ভীর করিয়া বলিলেন—

ধনেশঃ কী বলতে চাও তুমি?

বাহিরে লক্ষ্মী আগ্রহ সহকারে শুনিতেছে; তাহার মুখের অবসাদগ্রস্ত ভাব অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে।

হনুমানঃ সাব্, হম সাফ সাফ বাৎ বোলবে! হামি দুকানের সিপাহী আছে, অগর কোই বদমাশ দুকানে হুজ্জুৎ করনা চাহে, হম উস্কো নরেটি দাবকে নিকাল দিবে—লেকেন বে-গুনাহ আদমির উপর জুলুম করনা হামারা কাম নহি। লছ্মী ভান্ডারকা বাবু সাচ্চা আদমি আছে, ইমানদার আদমি আছে—উসকো হম কাহে মারেগা! ইস্ মহল্লেমে দুকান করনা কিসিকা মানা হ্যায়?

নীলাম্বরঃ আহা, চেঁচাচ্ছ কেন হনুমান—আস্তে!

হনুমানঃ (উদ্ধতস্বরে) নহি আস্তে বোলেগা! তুম খুন করনা চাহেগা ঔর হম চুপ রহেগা? কভি নহি।

নীলাম্বরঃ ওরে হনুমান, তোর গুষ্টির পায়ে পড়ি আস্তে বল্—বাইরে কে শুনতে পাবে!

বাহিরে লক্ষ্মী শুনিতেছিল; তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

হনুমানঃ (ধনেশকে) বাবুজি, হম বেইমানী নহি করেগা, লেকেন আপ য়ে সব ধন্ধা ছোড় দিজিয়ে। (নীলাম্বরকে) ঔর তুমকা ভি সাতা দেতা হ্যায়, লছ্মী ভান্ডারকা বাবুকো কুছভি খৎরা পোঁছেগা তো—হাম তুমহারা কচুম্বা নিকাল দেগা। নমস্তে।

ধনেশকে সেলাম করিয়া হনুমান বাহির হইয়া গেল। তৎপূর্বেই লক্ষ্মী দ্রুত-চঞ্চল পদে দ্বার হইতে সরিয়া গিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে।

ঘরের মধ্যে নীলাম্বর ও ধনেশ কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন, তারপর নীলাম্বর সাপের মত ফোঁস করিয়া উঠিলেন—

নীলাম্বরঃ কেউটে সাপের ড্যাঁপ্! হনুমানকে টাকা খাইয়ে বশ করেছে। আচ্ছা—আমিও যদি কায়েতের বাচ্ছা হই—

ধনেশের মুখে কালোপযোগী কোনও গরম কথা যোগাইল না, তিনি দুই মুষ্টি তুলিয়া টেবিলের উপর প্রচণ্ড জোড়া-কিল মারিলেন। চায়ের ট্রে সত্রাসে নাচিয়া উঠিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

পরদিন প্রভাত।

লক্ষ্মীর শয়নঘরে শয্যার পাশে ছোট একটি টেবিলের উপর প্রাতরাশের সরঞ্জাম সাজানো রহিয়াছে। লক্ষ্মী শয্যায় নাই, পাশেই স্নানের ঘরে গিয়াছে। আহ্লাদী একটি ময়ূরপাখার ঝাঁটা দিয়া ঘর ঝাঁট দিতেছে। ঝাঁট দিবার মত জঞ্জাল কোনও দিনই ঘরে জমা হয় না, তবু লক্ষ্মীর ঘুম ভাঙানোর মত এটা আহ্লাদীর দৈনন্দিন কার্য।

স্নানঘরের বন্ধ দরজার ভিতর দিয়া লক্ষ্মীর গান শোনা যাইতেছে। পল্লীগীতির সুর, ভাষা ও ভাব তথৈবচ। মনের কথা যখন সরল পথে অভিব্যক্তি পায় না, তখন এমনি বিচিত্র প্রচ্ছন্ন পথে চলে।

লক্ষ্মী: গায়ে তোর দাগ লেগেছে রাইলো।
সোনার গায়ে শ্যাম কাজলের
দাগ লেগেছে রাইলো।

ক্যামেরা লুব্ধভাবে স্নানঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, লক্ষ্মী স্নানের টবে আকণ্ঠ ডুবাইয়া বসিয়া স্নান করিতেছে; টবের সাবান গোলা জল দুধের মত শুভ্র ও ফেনিল! মনের আনন্দে জলকেলি করিতে করিতে সে গাহিতেছে—

লক্ষ্মী: জল আনিতে যমুনায় গেলি,
গাগরি রৈল পড়ে, নয়ন ভরে
শ্যামের কালো রূপ নিয়ে এলি!
মনে অনুরাগ জেগেছে রাইলো—
ভোমরা ছোঁয়া হেম কমলে
দাগ লেগেছে রাইলো।

জলের ভিতর হইতে একটি মৃণালবাহু তুলিয়া লক্ষ্মী কলের কক্‌ ঘুরাইয়া দিল, অমনি তাহার উপর জলের বৃষ্টিধারা নামিয়া তাহার মাথার উপর পড়িতে লাগিল।

শয়নকক্ষে সম্মার্জনীর কাজ শেষ করিয়া আহ্লাদী দেখিল লক্ষ্মীর স্নান ও গান তখনও শেষ হয় নাই। সে স্নানঘরের দ্বারে গিয়া টোকা মারিল।

আহ্লাদী: ওলো, হ'ল তোর? চা যে জুড়িয়ে গেল—আর কত নাইবি!

ভিতর হইতে লক্ষ্মীর গলা আসিল—

লক্ষ্মী: এই যে হল দিদি—

কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মী বাহির হইয়া আসিল—সদ্যফোটা শিশিরস্নাত একটি ফুলের মত। সে শয্যার পাশে বসিয়া আহারে মন দিল। আহ্লাদী অসন্তোষপূর্ণ নেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—

আহ্লাদী: এতক্ষণে মেয়ের নাওয়া হল। ক'টা বেজেছে তার হিসেব আছে? ইস্কুল যাবি কখন শুনি?

লক্ষ্মী পরম তৃপ্তির সহিত নতুন গুড়ের মুড়ির চাকতি চিবাইতে চিবাইতে বলিল—

লক্ষ্মী: আজ কলেজে যাব না দিদি। আর তো দু'দিন কলেজ খোলা আছে, তারপরই পুজোর ছুটি।

আহ্লাদী গালে হাত দিয়া তাকাইয়া রহিল।

আহ্লাদী: ইস্কুলে যাবি না! দিন দিন তুই হচ্ছিস কি লক্ষ্মী? দাদু কাশী গিয়ে অবধি তোর বড় আস্কারা বেড়েছে—না?

লক্ষ্মী: হুঁ, ঠিক তোর মতন। কাশী থেকে চিঠি এসেছে দাদু তীর্থ করতে বেরিয়েছেন, বোধ হয় পুজোর পর এখানে আসবেন।

আহ্লাদীঃ আসুন না তিনি, সব ব'লে দেব তাঁকে। বলব নিজের নাতনী নিজে সামলাও, পারব না আমি সামলাতে।

লক্ষ্মীঃ (হাসিয়া) তা বলে দিস; লাগানো ভাঙানো তোর অভ্যেস সে কি আমি জানি না?—এখন দ্যাখ দেখি জান্‌লা দিয়ে আমার দোকান খুলেছে কিনা।

বুড়ি 'আমার দোকান' অর্থে মনোহর ভাণ্ডার বুঝিল।

আহ্লাদীঃ দোকান খুলেছে কিনা জানলা দিয়ে দেখব কি করে লা? আমার কি চিংড়ি মাছের চোখ?

লক্ষ্মীঃ মরণ বুড়ির। সামনে ছোট দোকান দেখতে পাচ্ছিস না—লক্ষ্মী ভাণ্ডার?

আহ্লাদীঃ (জানালা দিয়া দেখিয়া) ওমা ঐ দোকান! তা ও তো অন্য লোকের দোকান, তোর দোকান হতে গেল কোন দুঃখে?

লক্ষ্মীঃ পারি না তোকে নিয়ে দিদি। পোড়া চক্ষে দেখতে পাচ্ছিস না, বড় বড় অক্ষরে কী লেখা রয়েছে? লক্ষ্মী ভাণ্ডার—মানে আমার ভাণ্ডার। বুঝলি?

আহ্লাদীঃ অ মা! লক্ষ্মী ভাণ্ডার নাম হলেই তোর দোকান হল? কত রঙ্গই জানিস।

লক্ষ্মীঃ বিশ্বাস হ'ল না? আচ্ছা, পরে বুঝবি। এখন দ্যাখ খুলেছে কিনা।

আহ্লাদীঃ এই খুলল।

লক্ষ্মী আহার শেষ করিয়া উঠিয়া আলস্য ভাঙিল।

লক্ষ্মীঃ আমাকেও তাহলে উঠতে হল। একবার দোকানে যেতে হবে।

আহ্লাদীঃ ও দোকানে তোর কি দরকার?

লক্ষ্মীঃ দরকার? আমার যে চকোলেট ফুরিয়ে গেছে দিদি।

লক্ষ্মী ফিক্‌ করিয়া হাসিল, ভিজা চুলগুলি বুকের দিকে টানিয়া আনিয়া ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে গিয়া বসিল।

কাট্‌

লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দু'নম্বর কাউণ্টারে কার্তিক বেসাতি করিতেছে, অন্য কাউণ্টার সাময়িক-ভাবে বন্ধ আছে। দোকানের ভিতরে বিজয় নিজের টেবিলে বসিয়া আছে, তাহার সম্মুখে গরুড় পক্ষীর মত জোড়হস্তে হনুমান সিং দণ্ডায়মান। হনুমানের আর সে বিক্রম নাই, গোঁফ ঝুলিয়া পড়িয়াছে; মুখের ভাব দেখিলে বোধ করি কণ্ঠীধারী বৈষ্ণবেরও হিংসা হয়।

হনুমানঃ বাবুজি, হামাকে ছমা কোরেন—হামি কসুর করিয়েছে।

বিজয় অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

বিজয়ঃ কী—কি বলছ?

হনুমানঃ হামি না বুঝিয়ে কসুর করিয়েছে—ঔর কভি অ্যাসা কাম নহি করে গা। বাবুজি, আপনে বেফিকির থাকেন, ঔর আপনার উপর কোই জুলুম হোবে না। হাম খুদ আপনার দুকান পাহারা দিবে।

বিজয়ঃ (বিভ্রান্তভাবে) কিন্তু—কিন্তু—তুমি হঠাৎ—

হনুমান কোমর হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া হাত বাড়াইয়া বিজয়ের সম্মুখে রাখিল।

হনুমানঃ জি পানশো রুপা হামার কসুরের জুরমানা লিয়ে হামাকে ছমা কোরেন—

বিজয়ঃ (চমকিয়া) কি—টাকা! না না, তোমার টাকা আমি নেব না। আমার যা ক্ষতি করবার তা করেছ, এখন গরু মেরে জুতো দান করতে চাও! ও হবে না নিয়ে যাও তোমার টাকা। কার সর্বনাশ করা টাকা তা কে জানে!

হনুমান একটু একটু করিয়া পিছু হটিতে লাগিল।

হনুমানঃ হুজুর আমার বাপের কসম, ওস্তাদের কসম, ই টাকা ধরমকা টাকা আছে। আপনে মেহেরবানি করকে ই টাকা লিয়ে হামাকে ছুটকারা দেন, নেঁহি তো হামার বড়া মুস্কিল

হোবে। আদাব বাবুজি, আদাব—

আর বেশী তর্কবিতর্কের অবকাশ না দিয়া হনুমান সিং আদাব করিতে করিতে ও পিছু হটিতে হটিতে অন্তর্ধান করিল। বিজয় কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর নোটগুলি তুলিয়া নাড়াচাড়া করিয়া শেষে দেরাজে রাখিয়া দিল। তাহার মুখে একটু ম্লান হাসি খেলিয়া গেল। গুন্ডার মনেও ধর্মজ্ঞান জাগিয়াছে। যাক ভবিষ্যতে হয়তো আর কোনও গন্ডগোল হইবে না, কিন্তু পাঁচশো টাকায় তাহার কতটুকু ক্ষতিপূরণ হইবে? যেসব মাল নষ্ট হইয়াছিল তাহা সমস্ত তাহার নিজের নয়, কতক বাজার হইতে ধারে আনিয়াছিল—বিক্রয় করিয়া মূল্য দিবে এই শর্তে। সেসব টাকা শোধ না করিলে বাজারে আর ধারে মাল পাওয়া যাইবে না। এদিকে পূজা আসিয়া পড়িল, মালের চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাহার যোগান দিবার ক্ষমতা নাই। টাকা চাই অন্তত আরও দু'হাজার। কিন্তু কোথায় পাইবে সে টাক? কে দিবে?

বিজয় দুই হাতে মাথা চাপিয়া টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া ভাবিতে লাগিল।

বাহিরে লক্ষ্মী কার্তিকের কাউণ্টারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কার্তিক আকর্ণ হাসিয়া তাহাকে স্যালুট করিল এবং ফরমাস করিবার পূর্বেই এক তক্তা চকোলেট বাড়াইয়া ধরিল। হাসিমুখে চকোলেট লইয়া লক্ষ্মী বলিল—

লক্ষ্মীঃ চিকা চিকা বুম্। বিজয়বাবু কৈ?

কার্তিক একবার ভিতর দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিয়া গম্ভীরমুখে বলিল—

কার্তিকঃ ভেতরে আছেন; টেবিলে বসে ভাবছেন।

বলিয়া মাথায় হাত দিয়া বিজয়ের ভাবনার ভঙ্গীটা দেখাইয়া দিল।

লক্ষ্মী ভিতরে গিয়া দেখিল, বিজয় সত্যই চিন্তায় মগ্ন হইয়া আছে; এমন কি লক্ষ্মী গিয়া যখন তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল তখনও সে তাহাকে দেখিতে পাইল না। কিছুক্ষণ গূঢ় কৌতুকে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া লক্ষ্মী মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

লক্ষ্মীঃ ভারি ভাবনায় পড়েছেন দেখছি! কিসের এত ভাবনা? মেয়ের বিয়ের?

বিজয় চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার চিন্তাচ্ছন্ন বিষণ্ণ মুখ মুহূর্তে প্রফুল্ল হাসিতে ভরিয়া উঠিল। এই মেয়েটির মধ্যে জানি না কি আছে, তাহার কণ্ঠস্বর—এমন কি কেবলমাত্র তাহার আবির্ভাব—বিজয়ের মনকে অতিবড় দুঃসময়েও সতেজ প্রফুল্ল করিয়া তোলে, বর্ষণ-শঙ্কিত মেঘলা আকাশে অকস্মাৎ আলোর হাসি ঝিল্‌মিল্ করিয়া ওঠে।

বিজয় তাড়াতাড়ি নিজের টুলটি লক্ষ্মীকে দিয়া নিজে একটি প্যাকিং বাক্স টানিয়া বসিল, হাসিয়া বলিল—

বিজয়ঃ তা ছাড়া আর কি! বাঙ্গালীর জীবনে কন্যাদায় ছাড়া আর কি কোনও দুর্ভাবনা আছে?

লক্ষ্মী মুখখানি উদ্বিগ্ন করিয়া বলিল—

লক্ষ্মীঃ তা, মেয়ে কি একেবারে অরক্ষণীয়া হয়ে পড়েছে?

বিজয়ও ছদ্ম বিষণ্ণতার সহিত বলিল—

বিজয়ঃ তা অরক্ষণীয়া বৈকি। গরীব বাপ—মেয়ের বিয়ের টাকা কোথায় পাবে বলুন।

লক্ষ্মীঃ (নিশ্বাস ফেলিয়া) আহা—! তাই বুঝি মেয়ের ভাল পাত্র পাচ্ছেন না?

বিজয়ঃ হুঁ। এখন আপনিই আমার একমাত্র ভরসা।

লক্ষ্মীঃ আমি!

বিজয়ঃ হ্যাঁ। আপনি যদি আপনার ছেলের বিয়ে দেন আমার মেয়ের সঙ্গে তবেই মেয়েটি সুপাত্রে পড়ে, নইলে হাত-পা বেঁধে মেয়ে জলে ফেলে দিতে হবে—

গম্ভীর হইতে গিয়া লক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল।

বিজয়ঃ না না, হেসে ওড়ালে চলবে না। বরপণ আমি দিতে পারব না বটে, কিন্তু আমার মেয়েটি কুলে শীলে সব দিক দিয়েই ভাল। ফুলের বন্দিঘাটি আমরা। আর আপনারা?

লক্ষ্মীঃ দাদুর মুখে শুনেছি আমরা ফুলের মুখুটি।

বিজয়ঃ ব্যাস! তবে তো পালটি ঘরও হয়েছে—আর ভাবনা কি?

লক্ষ্মী একবার বিজয়ের দিকে তাকাইয়া চক্ষু নত করিল; তাহার গালে একটু রক্তিমাভা দেখা দিল। সে চকোলেটের রূপালী তবক ছাড়াইয়া তাহাতে একটু কামড় দিল।

লক্ষ্মীঃ না, আর ভাবনা নেই!

লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যে বিজয়ের কান দুটা সহসা লাল হইয়া ঝাঁঝাঁ করিয়া উঠিল; তাহার মনে হইল কাল্পনিক ছেলেমেয়ের বিবাহের ছুতা করিয়া সে যেন নিজেদেরই ঘটকালি করিতেছে। প্রসঙ্গটাকে কোনও মতে চাপা দিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—

বিজয়ঃ আর শুনেছেন, একটা সুখবর আছে। সেই যে গুণ্ডাটা দোকান নষ্ট করেছিল, সে আজ এসে পাঁচশো টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে গেল।

লক্ষ্মীর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

লক্ষ্মীঃ ওমা, গুণ্ডার এত সুবুদ্ধি? তবে আর আপনি মাথায় হাত দিয়ে এত কী ভাবছিলেন?

বিজয় ম্লান হাসিয়া মাথা নাড়িল।

বিজয়ঃ পাঁচশো টাকায় কী হবে, লক্ষ্মী দেবী, সমুদ্রে পাদ্যঅর্ঘ্য। চীনে মাটির আর কাচের বাসন যা নষ্ট হয়েছে তারই দাম হবে হাজার দেড়েক। তাছাড়া চেয়ে দেখুন, (চারিদিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া) দোকান প্রায় খালি। নতুন করে মাল কেনবার পয়সা নেই, আর বাজারে ধারও পাবনা।

লক্ষ্মী চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইল। ধ্বংসের চিহ্নগুলি সরাইয়া ফেলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ধ্বংসজনিত শূন্যতার পরিপূরণ হয় নাই। বিজয় একটু ফিকা হাসিল।

বিজয়ঃ কোথায় ভেবেছিলুম পুজোর সময় লাভ করব। দোকানকে নিজের পায়ে দাঁড় করাব—তা—

লক্ষ্মীঃ কত টাকা আপনার দরকার?

বিজয় চকিয়া মুখ তুলিল, লক্ষ্মীর পানে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল।

বিজয়ঃ না লক্ষ্মী দেবী, তা হয় না। আপনার অনেক অনুগ্রহ আমি নিয়েছি—কিন্তু টাকা নিতে পারব না। যদি শোধ করতে না পারি!

লক্ষ্মীঃ আমার কথার উত্তর দিন না। কত টাকা পেলে আপনি দোকান আবার আগের মত করতে পারেন?

বিজয়ঃ (ইতস্তত করিয়া) তা—হাজার দুই তো বটেই। প্রথমে বাজার-দেনা শোধ করতে হবে—। কিন্তু ওকথা যাক। আপনার শাড়ির পাড়টি তো ভারি চমৎকার—।

লক্ষ্মীঃ পাড়ের কথা পরে শুনব। এখন আমার কথা শুনুন। আপনি ভাববেন না যে আমি আপনাকে দান-খয়রাৎ করতে চাই। আমি যদি আপনাকে টাকা দিই তাহলে নিজের স্বার্থেই দেব—

বিজয়ঃ কিন্তু—

লক্ষ্মীঃ আবার কিন্তু! আপনি আগে টেবিলের সামনে ভাল ক'রে বসুন তো দেখি—

বিজয় প্যাকিং কেস্ সরাইয়া টেবিলের সম্মুখে বসিল; লক্ষ্মী নিজের টুল টানিয়া তাহার সহিত মুখোমুখি হইয়া বসিল।

লক্ষ্মীঃ (একটু হাসিয়া) হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। এখন আমার প্রস্তাব শুনুন, নিতান্তই ব্যবসা-ঘটিত প্রস্তাব—দয়া মায়া বা অনুগ্রহ নয়।

বিজয়ঃ (ক্ষীণকণ্ঠে) বলুন—

লক্ষ্মী সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া বলিতে আরম্ভ করিল।

লক্ষ্মীঃ দেখুন, আপনার দু'হাজার টাকা দরকার; না পেলে এমন জিনিসটি নষ্ট হয়ে যাবে। আমি যদি পারি তাকে বাঁচাতে, আমার উচিত নয় কি বাঁচানো? আমার হাতে অবশ্য দু'হাজার টাকা নেই—কিন্তু চেষ্টা করলে হয়তো যোগাড় করতে পারি—

বিজয়ঃ কিন্তু—

লক্ষ্মীঃ আমার কথাটা শেষ করতে দিন। শুনুন—

অধীরভাবে বিজয়ের মুখ বন্ধ করিয়া লক্ষ্মী আবার বলিতে আরম্ভ করিল। বিজয় নীরবে শুনিতে লাগিল।

ডিজল্ভ্।

আধ ঘণ্টা পরে। লক্ষ্মী দুই কেতা দলিলের মত কাগজ হাতে লইয়া পড়িতেছে। পড়া শেষ হইলে সে সন্তোষসূচক ঘাড় নাড়িল, কাগজে দস্তখৎ করিয়া বিজয়ের দিয়ে আগাইয়া দিল। বিজয়ও দুইটি কাগজে সহি করিয়া একটি লক্ষ্মীকে ফিরাইয়া দিল, অপরটি ভাঁজ করিয়া নিজের পকেটে রাখিল। লক্ষ্মী নিজের দলিলটি সযত্নে ব্লাউজের মধ্যে লুকাইল। দু'জনে পরস্পর মুখের পানে চাহিয়া হাসিল; লক্ষ্মীর হাত দুটি ধীরে ধীরে টেবিলের উপর দিয়া বিজয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল, বিজয়ের হাতদুটিও সমধিক আগ্রহে টেবিলের মাঝখান পর্যন্ত গিয়া তাহাদের গ্রহণ করিল। গোপনে গোপনে এই দুইটি তরুণ-তরুণীর মধ্যে যে-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে এই নীরব করাশ্লেষ যেন তার উপর নিবিড় আন্তরিকতার শিলমোহর মুদ্রিত করিয়া দিল।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

ধনেশের অফিস ঘর। সকালবেলা ধনেশ এবং নীলাম্বর টেবিলের দুই পাশে বসিয়া সদ্য-আগত ডাকের চিঠিপত্র দেখিতেছেন। চিঠির অধিকাংশই ব্যবসায়ীদের টাকার তাগাদা; পড়িতে পড়িতে ধনেশের মুখ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি অপ্রসন্ন মন্তব্য করিতে করিতে চিঠিগুলি একে একে চোথা কাগজের বাস্কেটে ফেলিতেছেন।

ধনেশঃ (একটি চিঠি খুলিয়া) হুঃ—স্টিফেন অ্যান্ড কো—মাত্র ১২০০ টাকা পাওনা হয়েছে তাই তাগাদার ওপর তাগাদা—(বাস্কেটে ফেলিলেন) একটা চিঠি লিখে দাও নীলাম্বর; এমন অভদ্রভাবে তাগাদা করলে ওদের মাল আমরা নেব না—

নীলাম্বর শান্তভাবে নিজের চিঠিপত্র দেখিতে দেখিতে চোখ না তুলিয়াই বলিলেন—

নীলাম্বরঃ আজই লিখে দিচ্ছি।

ধনেশঃ (অন্য চিঠি খুলিয়া) এন বোস—পারফিউমার। এ'রও টাকা চাই—৬৭০০ টাকা। দেব না টাকা—কাউকে পুজোর আগে টাকা দেব না। কেন, আমি কি টাকা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি!

নীলাম্বরঃ ছোটলোক—ছোটলোক—

ধনেশঃ (তৃতীয় চিঠি খুলিয়া) এই আবার এক ফ্যাচাং বাবা জুটিয়ে গেছেন—ফায়ার ইন্সিওর। তিন মাস অন্তর এ'দের টেক্সো গুজতে হবে! বাবার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ ছিল না, দোকান ফায়ার ইন্সিওর করেছেন। যত সব—! নীলাম্বর, ইন্সিওরেন্সের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দাও, মিছে কতকগুলো টাকা নষ্ট করবার দরকার নেই। দু'লাখ টাকায় দোকান ইন্সিওর—ননসেন্স।

ধনেশ চিঠিখানা ছিঁড়িতে উদ্যত হইলে নীলাম্বর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—

নীলাম্বরঃ না না, ছিঁড়ো না। ইন্সিওর একটা থাকা দরকার।

ধনেশ থামিয়া গেলেন।

ধনেশঃ থাকা দরকার! কী দরকার?

নীলাম্বরঃ কিছু বলা তো যায় না, চারিদিকে শত্রু। মনে কর দোকানে যদি আগুন লেগেই

যায়। ওটা থাকা ভাল।

নীলাম্বর চক্ষু নাচাইলেন। ধনেশ দ্বিধাভরে চিঠিখানা পাশে রাখিয়া দিলেন; কথাটা যদিও তাঁহার মনের মত হইল না, তবু নীলাম্বরের বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করার সাহস তাঁহার নাই।

ধনেশ: তুমি বলছ—থাক। কিন্তু—

এই সময় টেলিফোনের ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল; ধনেশ বিরক্তভাবে তাহা তুলিয়া লইলেন।

ধনেশ: হ্যালো......কে, লক্ষ্মী?

উপরের বারান্দায় দেওয়ালে ঠেস দিয়া লক্ষ্মী পিতাকে টেলিফোন করিতেছে. তাহার মুখে একটু আদুরে আদুরে ভাব।

লক্ষ্মী: হ্যাঁ বাবা. আমি—তুমি বুঝি এখন খুব ব্যস্ত আছো?

ধনেশ অভ্রভেদী গাম্ভীর্যের সহিত ফোনের মধ্যে বলিলেন—

ধনেশ: ব্যস্ত নেই তো কি খেলা করছি? কি দরকার তোমার?

লক্ষ্মী: না—কিছু নয়। খুব ব্যস্ত আছ বলেই বোধ হয় কথাটা ভুলে গেছ—

ধনেশ: ভুলে গেছি! কী ভুলে গেছি?

লক্ষ্মী: এই—পুজো এসে পড়েছে তা বোধ হয় তোমার মনে নেই।

ধনেশ একটু গ্রাম্ভারি হাস্য করিলেন।

ধনেশ: পাগলি কোথাকার! পুজো এসেছে যদি মনেই না থাকবে, তবে এতবড় কারবার চালাচ্ছি কি করে?

লক্ষ্মী: (উৎসুকভাবে) মনে আছে! আমার উপহারের কথাটা ভোলনি তাহলে?

ধনেশ: (ভ্রূকুটি করিয়া) উপহার! কিসের উপহার!

লক্ষ্মী: বা—তুমি জান না! দাদু যে ফি বছর পুজোর সময় আমাকে উপহার দেন—

ধনেশ: ও. হো—! তা তোমার যা দরকার তুমি দোকান থেকে নিয়ে যাও। তোমাকে মানা করে কে?

লক্ষ্মী: কিন্তু—দাদু আমাকে চেক্ দিতেন; আমি আমার পছন্দমত কাপড় গয়না কিনতুম—

ধনেশ: চেক্—এ্যাঁ—তাই নাকি? তা—বেশ। কত টাকার চেক্ দিতেন বাবা?

লক্ষ্মী: (মধুর কণ্ঠে) দাদু দু'হাজার টাকার চেক দিতেন!

ধনেশ: অ্যাঁ! কত—দু'হাজার টাকা!

লক্ষ্মী: হ্যাঁ বাবা। দাদু বলতেন, ওর কমে তাঁর নাতনীর মর্যাদা থাকে না—

ধনেশ: কিন্তু—দু'হাজার! নীলাম্বর!

নীলাম্বর কেবল দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িলেন।

লক্ষ্মী: কেন, দু'হাজার কি তোমার বড্ড বেশী মনে হচ্ছে বাবা? দাদু কিন্তু—

ধনেশ: (বিরক্তভাবে) বাবা তোমাকে আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে ইয়ে করে দিয়েছেন! আমি—আমি—৫০০৲ টাকার বেশী দেব না।

লক্ষ্মী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর উদাসকণ্ঠে বলিল—

লক্ষ্মী: তার দরকার কি! তোমার যদি দিতে কষ্ট হয় তাহলে কিছুই দিও না বাবা! দাদু কিন্তু শুনলে দুঃখ করবেন—হয়তো মনে করবেন, দোকান ভাল চলছে না—

ধনেশের এবার আঁতে ঘা লাগিল; উপরন্তু পিতার কানে কথাটা উঠিলে তিনি কি ভাবে উহা গ্রহণ করিবেন, তাহাও বলা শক্ত। ধনেশ আস্ফালন করিয়া উঠিলেন—

ধনেশ: কে বলে দু'হাজার টাকা দিতে আমার কষ্ট হবে। আমি পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক্ কাটতে পারি। নীলাম্বর, আমার চেক্ বুক।

নীলাম্বর মুখ একটু বিকৃত করিয়া চেক্ বুক বাড়াইয়া দিলেন। ধনেশ গরগর করিতে করিতে চেক্ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ডিজল্ভ্।

নিজের ঘরে, দু'হাতে চেক্‌টি উঁচু করিয়া ধরিয়া লক্ষ্মী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখে বিজয়িনীর হাসি।

ডিজল্ভ্।

বিজয়ের দুই কুঠুরীর দোকান তিন কুঠুরিতে প্রসারিত হইয়াছে— মাথার উপর 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার' সাইনবোর্ডও তদনুযায়ী লম্বা হইয়াছে! এখন পাশাপাশি তিনটি কাউণ্টার। নূতন কাউণ্টারে কার্তিকের দলের একটি ছেলে বসিয়াছে।

দোকানের সম্মুখে হনুমান সিং গোঁফে চাড়া দিতে দিতে মুরুব্বির মত পায়চারি করিতেছে, যেন দোকানের তত্ত্বাবধানের ভার তাহারই উপর!

লক্কা পায়রার মত চেহারা একটি যুবক কার্তিকের কাউণ্টারে আসিয়া দাঁড়াইল।

যুবক: এক প্যাকেট কাঁচি।

বিজয় এই সময় ঐ ঘরে কি একটা জিনিস লইতে আসিয়াছিল, যুবককে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—

বিজয়: আরে প্রমোদ—তুমি?

প্রমোদ চশমার ভিতর দিয়া বিজয়কে ঈষৎ বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিল—

প্রমোদ: কে—বিজয় না? তুমি এখানে কি করছ হে?

বিজয় সহাস্যে কাউণ্টারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিজয়: এটা আমারই দোকান ভাই।

কার্তিক এই সময় এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট কাউণ্টারের উপর ফেলিল।

কার্তিক: এক প্যাকেট কাঁচি—দশ পয়সা।

প্রমোদ প্যাকেট তুলিয়া লইয়া খুলিতে খুলিতে বিজয়ের দিকে চক্ষু বাঁকাইয়া চাহিল।

প্রমোদ: তোমার দোকান—বল কি? বি.এ. পাস করে শেষে মুদিখানার কাজ আরম্ভ করলে—অ্যাঁ!

মুখ বাঁকাইয়া প্রমোদ একটা সিগারেট ধরাইল। বিজয়ের মুখের হাসি মলিন হইয়া গেল।

বিজয়: তা কি করব ভাই, যার যেমন ক্ষমতা। তুমি এখন কি করছ বল।

প্রমোদ: পোস্ট গ্রাজুয়েটে জয়েন করেছি। কিন্তু তুমি শেষে দোকান খুললে হে! চাকরি-বাকরি পেলে না বুঝি? হা—হা—মনিহারীর দোকান! মাখন নিখিল এরা শুনলে খুব হাসবে—হ্যা হ্যা! আচ্ছা চললুম।

কার্তিক: সিগারেটের দাম—দশ পয়সা।

প্রমোদ বিরক্তভাবে ফিরিল।

প্রমোদ: দাম আবার কিসের? তোমার দোকানে আবার দাম কিহে বিজয়? একসঙ্গে বি.এ. পর্যন্ত পড়েছ, আবার দাম! আচ্ছা আর একদিন আসতে চেষ্টা করব—

ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে প্রমোদ চলিয়া গেল। কার্তিক লাফাইয়া উঠিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল—

কার্তিক: দাম না দিয়ে চলে গেল স্যার। ধরি গিয়ে রাস্তায়?

বিজয়: ধরে কি করবি?

কার্তিক: গলায় গামছা দিয়ে দাম আদায় করব স্যার। রাস্তায় হনুমান সিং আছে—ও যাবে কোথায়?

বিজয় ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—

বিজয়: না, এবারটা যেতে দে।

বিজয় যাহা লইতে আসিয়াছিল তাহা লইয়া চলিয়া গেল। ব্যর্থ আক্রোশে কার্তিক প্রমোদের

উদ্দেশ্যে একবার মুখ ভ্যাংচাইল।—

রাস্তা দিয়া একটি মেয়ে-কলেজের লম্বা গাড়ি আসিতেছিল; লক্ষ্মী ভাণ্ডারের কাছে আসিয়া গাড়ি থামিল। হনুমান সিং তাড়াতাড়ি করিয়া গাড়ির পিছনের দ্বার খুলিয়া দিল। ছয় সাতটি কলেজের মেয়ে কলহাস্য করিতে করিতে গাড়ি হইতে নামিল—লক্ষ্মীও সঙ্গে আছে। ইহারা সকলেই লক্ষ্মীর সহপাঠিনী ও সখী। লক্ষ্মী তাহাদের পূজার বাজার করিবার জন্য লক্ষ্মী ভাণ্ডারে ধরিয়া আনিয়াছে।

লক্ষ্মী অগ্রবর্তিনী হইয়া সকলকে দোকানের মধ্যে লইয়া গেল। তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিতেই বিজয় তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিল।

লক্ষ্মীঃ বিজয়বাবু, এই নিন, আপনার জন্যে কয়েকটি ক্রেতা এনেছি—

বিজয় সসম্ভ্রমে দুই করতল যুক্ত করিল।

বিজয়ঃ আসুন—আসুন—

লক্ষ্মীর নিকটতম সখী অজিতা তাহার প্রতি একটি অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৃদু হাসিল; লক্ষ্মীর কথাগুলি যে দ্ব্যর্থ-বাচক হইয়াছে তাহা সে নিজে লক্ষ্য করে নাই।

অতঃপর মেয়েরা দোকানের ঘরে ঘরে পণ্য দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল! বিজয় অত্যন্ত নিপুণভাবে নানা শৌখিন দ্রব্যের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সকলকে লুব্ধ করিয়া তুলিল। তাহার মিষ্ট কথা ও মিষ্ট চেহারার অনিবার্য আকর্ষণে মেয়েরা তাহার পিছন পিছন ঘুরিতে লাগিল।

ওঘরে কার্তিক একটি মেয়েকে কাচের বাসন দেখাইতেছে; একটি কাচের সুন্দর ফুলদানী হাতে লইয়া তাহার গুণ বর্ণনায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছে—

কার্তিকঃ এই দেখুন মিস্, কাচের ফুলদানী—ফুলদানী তো নয়, যেন নিজেই একটি পদ্মফুল। আর কী মজবুত। যেন লোহার তৈরি। আছাড় মারলে ভাঙবে না। দেখবেন? এই দেখুন—চিকা চিকা বুম্—

কার্তিক ফুলদানীটি মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া আবার তৎক্ষণাৎ লুফিয়া লইল; ফেলার কৌশলে ফুলদানী অটুট রহিল।

কার্তিকঃ দেখলেন? আসুন, এমন ফুলদানী আর পাবেন না। দাম দশ টাকা পাঁচ আনা হওয়া উচিত, কিন্তু আপনি পাঁচ টাকা দশ আনায় পাবেন। আসুন—

মেয়েটি সম্মোহিতের মত ফুলদানী হাতে লইল।

ওঘরে গুটি চারপাঁচ মেয়ে বিজয়কে ছাঁকিয়া ধরিয়াছিল, কেবল অজিতা ও লক্ষ্মী একটু তফাতে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছিল। অজিতা মেয়েটি বেশী কথা কয় না, ফল্গু নদীর মত তাহার মন অন্তঃপ্রবাহিনী; ক্বচিৎ ভাবে-ইঙ্গিতে বা দু'একটি কথায় তাহার মনের রস ধরা পড়ে। লক্ষ্মীকে কনুই দিয়া স্পর্শ করিয়া সে হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—

অজিতাঃ ওদের রকম দেখেছিস! মনে হচ্ছে যেন দোকানদারটিকেই কিনে নিয়ে যাবে।

লক্ষ্মী অজিতার প্রতি চকিত কটাক্ষপাত করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল, লঘুস্বরে কহিল—

লক্ষ্মীঃ আর তা হয় না।

অজিতার চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

অজিতাঃ কেন, বিক্রি হয়ে গেছে বুঝি?

দু'জনের চোখে চোখে কথা হইয়া গেল; লক্ষ্মী একটু ঘাড় নাড়িল।

ডিজল্‌ভ্।

বিজয়া দশমীর রাত্রি।

কলিকাতার পথে পথে প্রতিমা বাহির হইয়াছে। লোকারণ্য। দীপমালায় মহানগরী উজ্জ্বল। ঢাকিরা প্রতিমার সম্মুখে নাচিয়া নাচিয়া আস্ফালন করিয়া ঢাক বাজাইতেছে—

কাট্।

বিজয়ের বাসা। বিজয় তক্তপোষের উপর এস্রাজ লইয়া বসিয়াছে, আপনার মনে একটি ভীমপলাশীর গৎ বাজাইয়া চলিয়াছে। দূরাগত ঢাকের শব্দ তাহার বাজনার সংগে যেন তাল রাখিতেছে। সকল উৎসবের তালে তালে করুণরসের যে ক্ষীণস্রোত প্রবাহিত হয়, বিজয়ের এস্রাজ যেন সেই নিগূঢ় সুরটি ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

ঢাকের শব্দ দূরে মিলাইয়া গেল; পূজার আনন্দ বিসর্জনের জলে বোধ করি নিমজ্জিত হইতেছে। বিজয় বাজনা শেষ করিয়া যন্ত্র সরাইয়া রাখিল।

মা পাশের ঘর হইতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

মাঃ হ্যাঁরে, আজ বিজয়া, তোর বন্ধুরা কেউ এল না!

বিজয় একটু ম্রিয়মাণ হাসিল।

বিজয়ঃ তারা বোধহয় এবার কেউ আসবে না মা।

মাঃ কেন, ফি বছরই তো আসে!

বিজয়ঃ এ বছর অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। আগে আমি ছাত্র ছিলুম সুতরাং ভদ্রলোক ছিলুম, এখন যে আমি দোকানদার মা!

মাঃ দোকানদার তো কী! ব্যবসাদার কি ভদ্রলোক হয় না? এই যে কত বড় বড় ব্যবসাদার রয়েছেন—দেশের মাথা—তা এ'রা কি ভদ্রলোক নয়?

বিজয়ঃ ঐ তো ভুল করলে মা। দোকানদার যতদিন গরীব থাকে ততদিন সে ছোটলোক; কিন্তু একবার বড়লোক হয়ে বসতে পারলে আর তাকে ঠেকায় কে? কাঞ্চন-কৌলিন্যের জোরে আবার সে ভদ্রলোক হয়ে বসে। কিন্তু আমি একে গরীব তায় দোকানদার, আমায় তো ত্যাগ করবেই—(নিশ্বাস ফেলিয়া) দাদা তো আগেই ত্যাগ করেছেন, একে একে আর সবাই ত্যাগ করছে। মা, শেষ পর্যন্ত কেবল তুমি আর আমি! আজ বিজয়ার রাত্রেও কেউ আমাদের মনে রাখল না!

ছেলের অন্তরগ্লানি মা নিজ অন্তরে অনুভব করিলেন। তিনি বিজয়ের কাছে বসিয়া একটা কিছু সান্ত্বনার কথা বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময় বাহিরের দরজায় খুট্‌খুট্ করিয়া কড়া নড়িল। বিজয় চমকিয়া তাকাইল।

মাঃ (সানন্দে) এত কথা বল্লি, ঐ দ্যাখ কে বুঝি এসেছে।

বিজয় উঠিয়া দ্বারের দিকে গেল। হয়তো বাহিরের লোক হইতে পারে মনে করিয়া মা পাশের ঘরের দরজার দিকে সরিয়া গেলেন।

দ্বার খুলিয়া বিজয় ক্ষণকাল স্তম্ভিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল; এ যেন তাহার কল্পনারও অতীত! যে আসিয়াছিল সে মৃদুকণ্ঠে বলিল—

আগন্তুকঃ আসতে পারি কি?

বিজয় চীৎকার করিয়া উঠিল—

বিজয়ঃ মা! দ্যাখো কে এসেছে!

লক্ষ্মী সলজ্জভাবে ঘরে প্রবেশ করিল। মা ফিরিয়া আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইলেন। বিজয় উত্তেজনাবিহ্বল কণ্ঠে আরম্ভ করিল—

বিজয়ঃ মা, জানো ইনি কে? ইনি হচ্চেন—

মাঃ (সহাস্যে) জানি বাবা, তোমাকে আর পরিচয় দিতে হবে না। (লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া) এস মা লক্ষ্মী! তোমার কথা এত শুনেছি যে একশো মেয়ের মধ্যেও তোমাকে চিনে নিতে পারতুম—

লক্ষ্মী বিজয়ের দিকে একটি চকিতগোপন কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মায়ের পানে সলজ্জ চোখ তুলিল। মায়ের মুখখানি শান্ত প্রসন্ন, লক্ষ্মীর বড় ভাল লাগিল; সে ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে বলিল—

লক্ষ্মীঃ আমি আপনাকে বিজয়ার প্রণাম করতে এসেছি।

সে নত হইয়া মায়ের পদধূলি লইল। মা তাহাকে বাঁ হাতে জড়াইয়া লইয়া দক্ষিণহস্তের করাঙ্গুলি তাহার চিবুকে স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন।

মাঃ বেঁচে থাকো, রাজরানী হও। এস—বসবে এস।—(তক্তপোষে বসাইয়া) বিজয়, তুই এ'র সঙ্গে কথা ক, আমি মিষ্টি নিয়ে আসি।

বিজয় এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল, হাসিয়া বলিল—

বিজয়ঃ মিষ্টির দরকার কি মা, আমার পকেটে বোধহয় চকোলেট আছে—

লক্ষ্মী তাহার প্রতি ভ্রূভঙ্গ করিল; মা একটু হাসিলেন।

মাঃ নে, আর চালাকি করতে হবে না। ওঁর সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বল, আমি এখুনি আসছি।

মা পাশের ঘরে গেলেন। বিজয় তক্তপোষের এক প্রান্তে বসিল।

বিজয়ঃ মা বলে গেলেন ভদ্রভাবে কথা কইতে। তা—শরীর গতিক বেশ ভাল?—কাজ-কর্ম—?

লক্ষ্মীঃ সব ভাল।

এস্রাজটা তক্তপোষের উপর পড়িয়াছিল তাহার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া লক্ষ্মী বলিল—

লক্ষ্মীঃ আপনি এস্রাজও বাজাতে পারেন!

বিজয় এবার অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, ঘাড় চুলকাইয়া বলিল—

বিজয়ঃ বাজাতে পারি না—কিন্তু বাজাই।

লক্ষ্মীঃ আপনার পেটে অনেক বিদ্যে আছে কিন্তু লুকিয়ে রাখতেই ভালবাসেন।

বিজয়ঃ আপনার পেটেও তো অনেক বিদ্যে আছে—আজ যে দীনের কুটিরে পদধূলি দেবেন, তার ইশারাও তো আগে দেননি।

লক্ষ্মীঃ কোথায় পদধূলি দেব তা কি আগে বল্‌তে আছে! লোকে ভয় পেয়ে যাবে যে।

বিজয় হাসিল, দু'জনের কৌতুক-বোধ প্রায় একই ধরনের, তাই পরস্পরের কথার রসগ্রহণ করিতে তাহাদের তিলমাত্র বিলম্ব হয় না। বিজয় কহিল—

বিজয়ঃ পদধূলির কথায় মনে পড়ল। মা'কে তো খুব বিজয়ার প্রণাম করলেন। কিন্তু আমিও তো আপনার বয়সে বড়, আমি কি একটা বিজয়ার নমস্কারও প্রত্যাশা করতে পারি না?

অতঃপর লক্ষ্মী যাহা করিল তাহার জন্য সে নিজেও প্রস্তুত হইয়া আসে নাই। হঠাৎ হেঁট হইয়া সে বিজয়ের পা ছুঁইয়া হাত নিজের কপালে ঠেকাইল। তাহার গায়ে একটু কাঁটা দিল। কিছুই তো নয়, বিজয়ার রাত্রে একজনের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করা, কিন্তু লক্ষ্মীর মনে হইল—'আজু মঝু দেহ দেহ করি মাননু—'

বিজয় মহা বিব্রত হইয়া বলিয়া উঠিল—

বিজয়ঃ ছি ছি, ও কী করলেন! আমি ঠাট্টা করে বলেছিলুম—

লক্ষ্মী বিজয়ের পানে একবার চোখ তুলিল, তারপর চোখ নামাইয়া অর্ধস্ফুট স্বরে কহিল—

লক্ষ্মীঃ আমি ঠাট্টা করিনি।—

মা মিষ্টান্নের রেকাবি ও জলের গেলাস হাতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, দু'জনে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া আছে! তিনি রেকাবি লক্ষ্মীর পাশে রাখিয়া বলিলেন—

মাঃ নাও মা, আজ একটু মুখে দিতে হয়।—বিজয়, তোর বাজনা সরা। মা, তুমি আজ আমার ঘরে এসেছ, মনে হচ্ছে যেন ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো এসেছে। এই খানিক আগে বিজয় দুঃখ করছিল—ও গরীব দোকানদার, তাই ওকে সবাই ত্যাগ করেছে। ভগবান তাই তোমাকে পাঠিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, সবাই ওকে ত্যাগ করেনি।—তুমিই বল তো মা, যে সৎপথে চলে—গরীব দোকানদার বলে তাকে কি কেউ ঘেন্না করতে পারে?

লক্ষ্মী মুখ তুলিল: মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

লক্ষ্মীঃ আমি পারি না। আমি যে নিজে দোকানদারের মেয়ে—দোকানদারের নাতনী—

মা কিছুক্ষণ উৎফুল্ল নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন; বুঝি তাহার মনটিও স্পষ্ট

দেখিতে পাইলেন। তিনি আসিয়া তাহার দুই কাঁধে হাত রাখিয়া নত হইয়া কপালে একটি চুম্বন করিলেন।

লক্ষ্মীর একটি হাত পিছন দিকে সরিয়া গিয়া এস্রাজটার উপর পড়িল। বাঁধা এস্রাজ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

পূজার পর হপ্তাখানেক গত হইয়া গিয়াছে। অপরাহ্ণ, বেলা আন্দাজ তিনটা। ধনেশ নিজের অফিস ঘরে বসিয়া আছেন, তাঁহার হাতে একটি ভিজিটিং কার্ড। কার্ডে লেখা আছে—

লালা হংসরাজ—লাহোর

নীলাম্বর ধনেশের কাঁধের উপর দিয়া কার্ডটা দেখিয়া চক্ষু নাচাইলেন।

নীলাম্বরঃ হুঃ—লালা হংসরাজ। এমন উদ্ভুটে নামও শুনিনি কখনও।

ধনেশঃ কে লোকটা?

নীলাম্বরঃ কে জানে—খোট্টা-মোট্টা কেউ হবে।

চাপরাশি দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল, ধনেশ তাহাকে বলিলেন—

ধনেশঃ অপেক্ষা করতে বল।

চাপরাশি 'জি হুজুর' বলিয়া বাহির হইয়া গেল। ধনেশ কার্ডটি তাচ্ছিল্যভরে টেবিলের উপর ফেলিয়া একটি আপেল তুলিয়া লইলেন।

অফিস ঘরের বাহিরে লালা হংসরাজ দাঁড়াইয়া আছেন। লম্বা চওড়া গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় আঁট-সাঁট পাগড়ি, বয়স অনুমান পঞ্চান্ন; কাঁচা-পাকা গোঁফ তাঁহার জোরালো মুখে একটা তেজস্বিতা আনিয়া দিয়াছে! তিনি একটু অধীরভাবে হাতের লাঠি মেঝেয় ঠুকিতেছেন; ললাট বিরক্তির রেখায় কুঞ্চিত হইয়াছে; কারণ কাহারও দর্শনপ্রার্থী হইয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া থাকা তাঁহার অভ্যাস নাই। চাপরাশি আসিয়া হাত উল্টাইয়া বলিল—

চাপরাশিঃ সবুর করনা হোগা।

হংসরাজের বিরক্তি বিস্মিত ক্রোধে পরিণত হইল।

হংসরাজঃ ক্যা—সবুর! তুম হামারা কারড্ দিয়াথা?

চাপরাশিঃ দিয়াথা—লেকেন—

হংসরাজ আর বাক্যব্যয় করিলেন না, দরজায় লাঠির টোকা মারিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

ধনেশ চমকিয়া মুখ তুলিলেন।

ধনেশঃ এ কি! এ আবার কে? কে তুমি?

হংসরাজ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ধনেশকে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর টেবিলের কাছে আসিতে আসিতে বলিলেন—

হংসরাজঃ আমার কার্ড আপনার সম্মুখেই আছে। কিন্তু আমি জানিতে ইচ্ছা করি যে আপনি কে?—মনোহরবাবু কোথায়?

হংসরাজ বাংলা ভালই বলিতেন; দোষের মধ্যে ভাষাটা একটু কেতাবী হইয়া পড়িত। পাঞ্জাবের অধিবাসী হইলেও ব্যবসায় সম্পর্কে তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালীর সংসর্গে আসিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। কিন্তু চলিত বাংলা ভাষার বিচিত্র ও মধুর জটিলতা তিনি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই!

ধনেশ হংসরাজের কথায় উত্তরে বক্ত্র ঈষৎ বিভক্ত করিয়া চাহিয়া রহিলেন; নীলাম্বর বলিলেন—

নীলাম্বরঃ ইনি হলেন মনোহরবাবুর সুযোগ্য পুত্র রায় বাহাদুর ধনেশ রায়—দোকানের

মালিক।

হংসরাজঃ (চমকিয়া) আঁ! মনোহরবাবু তবে কি স্বর্গে গিয়েছেন?

নীলাম্বরঃ স্বর্গে নয়—আপাতত কাশী গিয়েছেন। আপনার কি দরকার বলুন।

উত্তর না দিয়া হংসরাজ আবার কিছুক্ষণ ধনেশকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন; সমীক্ষণ বোধ হয় সন্তোষজনক হইল না, তিনি একটু অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন—

হংসরাজঃ মনোহরবাবুর পুত্র! ইহা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হইতেছি। আমার প্রিয় বন্ধু মনোহরবাবু নিশ্চয় অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন—নহিলে এত বড় কারবারের ভার—

ধনেশ ধৈর্য হারাইয়া রুক্ষ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—

ধনেশঃ আপনার বক্তৃতা শোনবার আমার সময় নেই। আমি কাজের লোক। যদি কিছু বলবার থাকে বলুন, নয়তো বিদেয় হোন—

হংসরাজের মুখ লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি সংযত স্বরেই বলিলেন—

হংসরাজঃ আপনার পিতা ওরূপভাবে আমার সহিত কথা কহিতেন না। যাহা হোক, আমার প্রয়োজনের কথা বলিতেছি। আমি কিছু সাবান ও জুতার কালি চাই।

ধনেশঃ (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া) সাবান! জুতোর কালি! কি রকম লোক আপনি? এই জন্যে আমার সময় নষ্ট করতে এসেছেন!

হংসরাজঃ আপনি তবে দিতে পারিবেন না?

নীলাম্বরঃ (অপেক্ষাকৃত নরম সুরে) ওসব সামান্য জিনিস আমাদের দোকানে পাওয়া যায় না; আপনি বরং সামনের ঐ ছোট দোকানটাতে যান, ওখানে দু'চার পয়সার সওদা পাবেন।

হংসরাজঃ উত্তম—তাহাই করিব, ধন্যবাদ।

দরজা পর্যন্ত গিয়া তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

হংসরাজঃ একটি সামান্য কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমি পাঁচ টন সাবান ও পঞ্চাশ হাজার কৌটা জুতার কালি কিনিতে আসিয়াছিলাম। আমি অর্ডার—নমস্কার।

হংসরাজ বাহির হইয়া গেলেন। ধনেশ খানিক জবুথবু হইয়া বসিয়া থাকিয়া সহসা আর্তনাদ করিলেন—

ধনেশঃ অ্যাঁ—নীলাম্বর!

কাট্।

মনোহর ভাণ্ডার হইতে বাহির হইয়া হংসরাজ ফুটপাথে দাঁড়াইলেন। অন্তরে ক্ষোভপূর্ণ উষ্মা সম্পূর্ণ শান্ত হয় নাই; তিনি পকেট হইতে সিগার কেস বাহির করিলেন, কিন্তু খুলিয়া দেখিলেন সিগার ফুরাইয়াছে। এদিক ওদিক চোখ ফিরাইতে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের প্রতি নজর পড়িল! তিনি তখন রাস্তা পার হইয়া লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দিকে চলিলেন, গলার মধ্যে অস্ফুট ক্ষোভের স্বরে কহিলেন—

হংসরাজঃ বৎতমিজ্ব বুদ্ধু।

বিজয় কাউণ্টারে ছিল, হংসরাজ উপস্থিত হইতেই মিষ্ট হাসিয়া সে তাহার স্বল্পসঞ্চয় হিন্দী বুলি খরচ করিয়া ফেলিল—

বিজয়ঃ আইয়ে—ফরমাইয়ে—

হংসরাজ চোখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিলেন; তারপর পর শুদ্ধ বাংলায় বলিলেন—

হংসরাজঃ সিগার চাই—ভাল সিগার আপনার দোকানে আছে কি?

এবার বিজয়ও চোখ তুলিয়া চাহিল।

বিজয়ঃ আজ্ঞে হাঁ, আছে বৈকি। একেবারে নতুন চালান—এই যে।

সে এক বাক্স সিগার খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিল; হংসরাজ দ্বিধাভরে নিরীক্ষণ করিলেন—

হংসরাজঃ এ কি ভাল সিগার? হাভানা গোল্ড লীফ ব্রাণ্ড নাই?

বিজয়ঃ আজ্ঞে না, ও ব্রাণ্ডটা আমার কাছে নেই। কিন্তু আপনি এই একটা ট্রাই করে দেখুন, আমার বিশ্বাস মন্দ লাগবে না!

হংসরাজ তবু ইতস্তত করিতেছেন দেখিয়া বিজয় বলিল—

বিজয়ঃ আপনি একটা নিন, যদি পছন্দ না হয় দাম দেবেন না।

হংসরাজ আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিজয়কে দেখিলেন, তারপর একটি সিগার তুলিয়া লইতে লইতে বলিলেন—

হংসরাজঃ আপনিই কি এই দোকানের মালিক?

বিজয়ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিজয় দেশলাই জ্বালিয়া হংসরাজের সিগার ধরাইয়া দিল।

হংসরাজঃ হুঁ—কতদিন দোকান করিতেছেন?

বিজয়ঃ এই মাত্র তিন মাস।—কেমন লাগছে সিগারটা?

হংসরাজঃ ভালই। দাম কত?

বিজয়ঃ খুচরো দাম চার আনা। যদি পুরো বাক্স কেনেন দু'টাকা বারো আনা পড়বে।

হংসরাজ একবার বিজয়কে দেখিলেন, একবার পিছু ফিরিয়া মনোহর ভাণ্ডারকে দেখিলেন, তারপর দৃঢ়স্বরে কহিলেন—

হংসরাজঃ আপনার সহিত আমি কিছু কথা বলিতে চাই।

বিজয় একটু অবাক হইল, তারপর সসম্ভ্রমে বলিল—

বিজয়ঃ বেশ তো আসুন না, ভেতরে আসুন।—এই যে বাঁ দিকে দরজা—

কাট্।

ধনেশের অফিস ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া নীলাম্বর এই দৃশ্য দেখিলেন, তারপর অধর দংশন করিয়া সরিয়া গেলেন।

ধনেশ নিজের টেবিলে মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছিলেন, নীলাম্বরের পানে উদ্বিগ্ন মুখে তাকাইতেই তিনি বলিলেন—

নীলাম্বরঃ দেখছ কি, আমাদের বাঁধা খদ্দের ভাঙিয়ে নিলে। উঃ, পঞ্চাশ হাজার কৌটা জুতোর কালি—

ধনেশ হাপরের মত দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ধনেশঃ পাঁচ টন সাবান!

কাট্।

লক্ষ্মী ভাণ্ডারের অভ্যন্তরে লালা হংসরাজ ও বিজয় টেবিলের দুই পাশে বসিয়াছেন; বিজয়ের মুখে বিহ্বল বিস্ময়।

বিজয়ঃ পাঁচ টন সাবান!

হংসরাজ তৃপ্তমুখে সিগারে টান দিলেন।

হংসরাজঃ এবং পঞ্চাশ হাজার কৌটা জুতার কালি। আপনি ঠিকা লইতে প্রস্তুত আছেন?

বিজয়ঃ রাজি! এতবড় সুযোগ আপনি আমায় দিচ্ছেন আর আমি রাজি হব না! কিন্তু —কিন্তু—এতবড় কণ্ট্রাক্ট নেবার মত টাকা তো আমার নেই; আমার যা-কিছু সব এই দোকান।

হংসরাজঃ আপনি যদি ঠিকা লইতে প্রস্তুত থাকেন, আমি আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা অগ্রিম দিব।

অভাবনীয় সৌভাগ্যও মানুষকে স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারে; বিজয় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

বিজয়ঃ পাঁচ—হাজার টাকা আপনি আমায় বিশ্বাস করে দেবেন? যদি আমি জুচ্চুরি

করি? যদি আপনার টাকা ঠকিয়ে নিই। আমাকে তো আপনি চেনেন না।

হংসরাজ ঈষৎ হাস্য করিলেন।

হংসরাজঃ ইয়ংম্যান, আমি চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ব্যবসা করিতেছি, মুখ দেখিয়া মানুষ চিনিতে পারি। আসুন, চুক্তিপত্র লেখা যাক্—

তিনি পকেট হইতে কয়েকটি ছাপা ফর্ম বাহির করিলেন। বিজয় হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল!

বিজয়ঃ আমি নিজে সাবান তৈরি করব; এই পেছনের ঘরগুলো ভাড়া নিয়ে কারখানা করব।—আপনার আপত্তি নেই তো?

হংসরাজঃ (হাসিয়া) আপত্তি কি! আমার specification অনুযায়ী মাল পাইলেই হইল। আপনি নিজে মাল তৈয়ার করিলে আপনারও বেশী লাভ থাকিবে।

অতঃপর উভয়েই চুক্তিপত্র রচনায় মনোনিবেশ করিলেন।

লুভ্।

ধনেশের অফিস ঘরের জানালায় নীলাম্বর আবার আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন এবং লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দিকে তাকাইয়া ছিলেন।

লক্ষ্মী ভাণ্ডারের সম্মুখে একটি ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া। হংসরাজ পরম সমাদরের সহিত বিজয়ের করমর্দন করিয়া ট্যাক্সিতে প্রবেশ করিলেন; ট্যাক্সি চলিয়া গেল। বিজয় হাস্য-বিম্বিত মুখে আবার দোকানে প্রবেশ করিল।

জানালায় দাঁড়াইয়া নীলাম্বর দৃশ্যটি দেখিলেন এবং সক্রোধে চক্ষু নাচাইলেন। তারপরই তাঁহার চক্ষু একেবারে স্থির হইয়া গেল। অতীব বিস্ময়ের সহিত তিনি দেখিলেন, লক্ষ্মী একটু সতর্কভাবে গিয়া লক্ষ্মী ভাণ্ডারে প্রবেশ করিল। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে নীলাম্বর শ্বাপদের মত দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিলেন; তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, এতদিন তাঁহার কাছে যাহা রহস্যে আবৃত ছিল তাহা আজ জলের মত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তিনি ধনেশের দিকে ফিরিলেন।

কাট্।

দোকানের মধ্যে বিজয় চুক্তিপত্রটি দু'হাতে ধরিয়া মহা আগ্রহে পাঠ করিতেছিল; বারংবার পাঠ করিয়াও তাহার তৃপ্তি হইতেছে না। এমন সময় লক্ষ্মীকে আসিতে দেখিয়া সে প্রায় নাচিতে নাচিতে চুক্তিপত্রটি উর্ধ্বে আস্ফালন করিতে করিতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

বিজয়ঃ চিকা চিকা বুম্! দেখছেন কি, পাঁচ টন সাবান! আরও শুনতে চান? পঞ্চাশ হাজার কৌটা জুতোর কালি—চিকা চিকা বুম্!

লক্ষ্মী অবাক; কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লক্ষ্মীঃ হঠাৎ হল কী আপনার! মাথায় পোকা-টোকা কিছু ঢুকেছে নাকি?

বিজয়ঃ পোকা নয়—পোকা নয়, এই দ্যাখো—(চুক্তিপত্র পড়িয়া) লালা হংসরাজ, নিশাৎ রোড, লাহোর। প্রকাণ্ড ব্যবসাদার—আর্মি কণ্ট্রাক্টর—! জয় লালা হংসরাজ জিন্দাবাদ!

বিজয়ের পাগলামি দেখিয়া লক্ষ্মী তাহার হাত হইতে চুক্তিপত্রটি কাড়িয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। বিজয় কিন্তু স্থির থাকিবার পাত্র নয়, সে পকেট হইতে একটা চেক্ বাহির করিয়া লক্ষ্মীর মুখের সামনে নাড়িতে নাড়িতে বলিল—

বিজয়ঃ শুধু কি ঐ? এদিকে দ্যাখো—পাঁচ হাজার টাকার চেক্—অগ্রিম! (লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া টানিয়া) এস এস, সব কথা বলি তোমাকে—আশ্চর্য ব্যাপার—রূপকথার মত গল্প—

বিজয় লক্ষ্মীকে নিজের টুলে লইয়া গিয়া বসাইল, নিজে প্যাকিং বাক্স টানিয়া তাহার

মুখোমুখি বসিল। লক্ষ্মীর অধরের কূলে কূলে হাসি উছলিয়া উঠিতেছে, চোখে অপূর্ব দীপ্তি। আজ নিজেরই অজ্ঞাতসারে বিজয়ের সম্বোধন 'আপনি' হইতে 'তুমি'তে নামিয়া আসিয়াছে।

লক্ষ্মী: পাগ্‌লামি কোরো না, আস্তে আস্তে বল।

বিজয় উদ্দীপ্ত চক্ষে লক্ষ্মীর পানে চাহিল। নিজের মুখের যে ঘনিষ্ঠ সম্বোধন তাহার নিজের কানে ধরা পড়ে নাই, লক্ষ্মীর মুখ হইতে তাহাই আনন্দের তীর হইয়া তাহার বুকে বিঁধিল। সে দুই হাত বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল—

বিজয়: লক্ষ্মী—!

বিজয়ের কণ্ঠস্বরে আনন্দের সহিত একটি ব্যগ্র প্রশ্নও নিহিত ছিল। সেই প্রশ্নের উত্তরে, একটু হাসিয়া একটু লাল হইয়া একটু ঘাড় বাঁকাইয়া লক্ষ্মী নিজের হাত দুটি বিজয়ের প্রসারিত হাতের মধ্যে সমর্পণ করিয়া দিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

মনোহর ভাণ্ডারের অভ্যন্তর। কাজকর্ম চলিতেছে। সিঁড়ির পাশে নীলাম্বর রেলিংয়ের উপর কনুই রাখিয়া অন্যমনস্কভাবে আছেন এবং চিবুকে হাত বুলাইতেছেন।

বিজয়ের দোকান হইতে ফিরিয়া লক্ষ্মী সদর দরজা দিয়া মনোহর ভাণ্ডারে প্রবেশ করিল। ইচ্ছা ছিল অলক্ষিতে উপরে উঠিয়া যাইবে, কিন্তু নীলাম্বরকে দেখিয়া সে থমকিয়া গেল। যাহোক, নীলাম্বরের কোনও দিকে দৃষ্টি নাই, তিনি অন্যমনস্ক হইয়া আছেন। লক্ষ্মী চুপি চুপি তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

দু'ধাপ উঠিতে না উঠিতেই নীলাম্বর চমকিয়া যেন সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলেন।

নীলাম্বর: ও—এই যে মা-লক্ষ্মী। তোমার বাবা তোমাকে ডাকছেন—অফিস ঘরে।

বলিয়া তিনি চক্ষু নাচাইলেন। লক্ষ্মী একবার চমকিয়া তাঁহার পানে তাকাইল, তারপর নীরবে নামিয়া অফিস ঘরের দিকে গেল। নীলাম্বর চক্ষু নাচাইতে নাচাইতে তাহার অনুগামী হইলেন।

অফিস ঘরে ধনেশ বিশ্বম্ভর মূর্তি ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন; লক্ষ্মী গিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই তিনি তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর গলার মধ্যে একটি গুরুগম্ভীর শব্দ করিয়া আরম্ভ করিলেন—

ধনেশ: আমি শুনলুম তুমি ঐ দোকানটাতে গিয়েছিলে?

সংবাদটি তিনি কাহার মুখে শুনিয়াছেন তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। লক্ষ্মী নীলাম্বরের প্রতি একটি কবোষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া সংক্ষেপে বলিল—

লক্ষ্মী: হ্যাঁ গিয়েছিলুম।

ধনেশ: এই প্রথম না আগেও গিয়েছ?

লক্ষ্মী: কয়েকবার গিয়েছি।

ধনেশ: হুঁ। ওখানে যাবার তোমার কী দরকার? নিজের দোকানের জিনিস পছন্দ হয় না?

লক্ষ্মী: নিজের দোকানে সব জিনিস পাওয়া যায় না।

ধনেশ ইহার উত্তরে কী বলিবেন খুঁজিয়া না পাইয়া নীলাম্বরের পানে চাহিলেন।—

নীলাম্বর: সে কি কথা মা-লক্ষ্মী! তোমার যে-জিনিস দরকার দোকানে পাওয়া যাক না যাক, আমাকে একটা ফিরিস্তি ক'রে পাঠিয়ে দিলেই আমি যেখান থেকে হোক যোগাড় করে এনে দিতে পারি। তোমাকে পরের দোকানে যেতে হবে কেন?

এ কথার উত্তর নাই। লক্ষ্মী অধর দংশন করিয়া চুপ করিয়া রহিল। ধনেশ গুরু গম্ভীর-ভাবে মাথা নাড়িলেন।

ধনেশ: না না, এসব ভাল কথা নয়। তোমার যেখানে সেখানে যাওয়া আমি পছন্দ করি না।

লক্ষ্মী উত্তর দিবার জন্য মুখ খুলিল, কিন্তু তৎপূর্বে নীলাম্বর তৈল মসৃণ কণ্ঠে

বলিলেন—

নীলাম্বরঃ তা ছাড়া, জিনিস কিনতেই যদি হয়, তা দোকানের বাইরে থেকেও কেনা যেতে পারে—ভেতরে যাবার কী দরকার, মা-লক্ষ্মী?

ধনেশঃ হ্যাঁ, ভেতরে যাবার কী দরকার?

নীলাম্বরঃ তুমি কত বড় বাপের মেয়ে সেটাও তো মনে রাখা দরকার। যার তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা—

ধনেশঃ হ্যাঁ—আমার মেয়ে হয়ে তুমি ঐ একটা—ঐ একটা—অ্যাঁ নীলাম্বর—?

নীলাম্বরঃ ঠিকই তো, ঐ একটা বাজে লোকের সংস্পর্শে আসা কখনই উচিত নয়। কথায় বলে ঘি আর আগুন।

লক্ষ্মী এতক্ষণ পর্যায়ক্রমে ধনেশ ও নীলাম্বরের মুখের পানে চক্ষু ফিরাইতে ছিল, এবার তাহার দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল।

লক্ষ্মীঃ আপনি কার কথা বলছেন?

নীলাম্বরঃ বুঝতেই তো পেরেছ মা-লক্ষ্মী—ঐ চ্যাংড়া দোকানদারটা।—অতি বদ লোক। ওর ছায়া মাড়ানো তোমার উচিত নয়।

ধনেশঃ কখনই না। আমি তোমাকে মানা করে দিলুম—আর ওদিকে যাবে না। পাজি শয়তান লোকটা। যাও—ওপরে যাও। ফের যেন আমাকে একথা বলতে না হয়।

লক্ষ্মী অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষের মত দাঁড়াইয়া শুনিল। একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, ঐ লোকটি পাজি শয়তান বলিয়াই কি উহার পিছনে গুণ্ডা লাগানো হইয়াছিল? কিন্তু ওকথা বলিলে ঐ সূত্রে আরও অনেক কথা উঠিয়া পড়িবে, তাহাতে বিপদ আছে। লক্ষ্মী মুখ টিপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ধনেশ পৈতৃক কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন মনে করিয়া সানন্দে একটি আপেল তুলিয়া লইলেন।

ধনেশঃ কি রকম ধমক দিয়েছি দেখলে তো—মুখে কথাটি নেই। আর ওদিকে পা বাড়াবে না।

নীলাম্বর কিন্তু মুখ ছুঁচালো করিয়া এমন একটি ভাব দেখাইলেন যাহাতে মনে হয় এ বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই।

এই সময় চাপরাশি বৈকালিক ডাকের চিঠি লইয়া প্রবেশ করিল; কয়েকটি বিজ্ঞাপনের বুক-পোস্ট এবং একখানি খামের চিঠি। ধনেশ ভ্রূকুটি করিয়া খাম ছিঁড়িলেন।

ধনেশঃ বাবার চিঠি।

চিঠি পড়িয়া ধনেশের মুখ আরও অন্ধকার হইল।

ধনেশঃ বাবা লিখেছেন, অডিটার ডাকিয়ে দোকানের হিসেবপত্র পরীক্ষা করাতে।

নীলাম্বরের চক্ষু হঠাৎ আশঙ্কায় নাচিয়া উঠিল।

নীলাম্বরঃ অডিটার! আবার এসব হাঙ্গামা কেন? মিছিমিছি কতগুলো টাকা নষ্ট। এতো আর লিমিটেড কোম্পানী নয় যে অডিট করাতেই হবে—

ধনেশঃ সে কি আর আমি জানি না! কিন্তু বাবার এক খেয়াল, চিরকাল হয়ে এসেছে, এবারও হওয়া চাই—

নীলাম্বরঃ তোমার বাবা যদি নিজের হাতেই সব রাখতে চান, তাহলে তোমার হাতে ভার দেবার এই মিথ্যে ভড়ং করবার কি দরকার? আর আমিই বা এমন প্রাণপাত করে খেটে মরছি কেন? তিনি নিজেই এসে নিজের দোকান দেখুন। আমাদের ওপর যখন তাঁর বিশ্বাস নেই—

ধনেশ ফোঁস করিয়া একটি নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

ধনেশঃ তুমি যথার্থ বলেছ নীলাম্বর, বুড়ো হয়ে বাবার মনটা বড় সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে —এই যে চিঠি পড়ে দ্যাখো না—

চিঠি লইয়া নীলাম্বর অসন্তুষ্ট মুখে পড়িতে লাগিলেন; পড়িতে পড়িতে তাঁহার চক্ষু ক্রমাগত নাচিয়া উঠিতে লাগিল।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

কয়েক দিন পরের ঘটনা।

প্রায় মধ্য রাত্রি। বিজয়ের দোকানের পিছনে গুদামের মত একটা বড় ঘর। ঘরের এক পাশে সারিসারি দশ বারোটা উনানের উপর মস্ত বড় বড় লোহার কড়া, কড়ার কানায় কানায় তরল সাবান টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। প্রত্যেক কড়ার কাছে একজন হাফপ্যান্ট পরা যুবক দাঁড়াইয়া আছে; ইহারা বিজয়ের দ্বারা নিযুক্ত বিজ্ঞানবিৎ টেকনিশিয়ান—ইহারাই সাবান ও জুতার কালি প্রস্তুত করিতেছে। বিজয় ও লক্ষ্মী ঘুরিয়া ঘুরিয়া এ কড়া হইতে ও কড়া পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছে। কার্তিকও আছে, সে অনাবশ্যক ব্যস্ততায় চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে।

ঘরের অন্য কোণে এক কড়া জুতার কালি নামিয়াছে, কয়েকজন কর্মী মিলিয়া তাহাই ছোট ছোট কৌটায় ভরিয়া বন্ধ করিতেছে। বিজয় ও লক্ষ্মী সেখানে গিয়া দাঁড়াইল।

বিজয় আঙুল দিয়া কটাহের গাঢ় পদার্থ একটু তুলিয়া লইয়া তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে টিপিয়া দেখিল, তারপর প্রধান কর্মীকে বলিল—

বিজয়ঃ একটু পাৎলা মনে হচ্ছেনা?

প্রধান কর্মীঃ (মাথা নাড়িয়া) আজ্ঞে না, এখনও গরম আছে, ঠাণ্ডা হলেই জমে যাবে।

বিজয়ঃ ও—

সেখান হইতে তাহারা ঘরের অন্যদিকে গেল। এখানে ছাঁচে সাবান ঢালাই করা হইয়াছে—অগণিত লম্বা কাঠের ছাঁচ মেঝেয় সাজানো রহিয়াছে। বিজয় ও লক্ষ্মী সেখানে গিয়া দাঁড়াইতেই একজন কর্মী একটি ছাঁচ খুলিয়া লম্বা চৌকশ একটি সাবানের 'বার' বাহির করিল, সেটি দুহাতে লইয়া হাস্যমুখে বিজয়ের সম্মুখে ধরিল। বিজয় সেটি অঞ্জলিপুটে লইয়া লক্ষ্মীর সম্মুখে ধরিল।

বিজয়ঃ আমাদের প্রথম সৃষ্টি। সাবানের নাম কি রেখেছি জানো? লক্ষ্মী সাবান।

লক্ষ্মী পরম স্নেহভরে সাবানটিকে নিজের হাতে তুলিয়া লইল; যেন এটি তাহার প্রথম শিশু। পরস্পরের পানে চাহিয়া দুজনের মনেই মধুর রসাবেশ ঘনাইয়া উঠিল। এ যেন তুচ্ছ সাবান নয়, তাহাদের মিলিত ভালবাসার প্রথম ফল।

কার্তিক ইতিমধ্যে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল—

কার্তিকঃ কিন্তু স্যার, জুতোর কালির তো কোনও নাম রাখ্লেন না?

বিজয়ঃ না, এখনও ঠিক করতে পারিনি। কী নাম রাখি বল তো লক্ষ্মী।

কার্তিকঃ (সোৎসাহে) আমি বলি স্যার?—বিজয় বুট্ ব্ল্যাক!

লক্ষ্মী হাসিয়া উঠিল। বিজয় কপটক্রোধে নিজের কালিমাখা হাত কার্তিকের গালে মুছিয়া দিয়া বলিল—

বিজয়ঃ পাজি ছেলে। আমি বুট ব্ল্যাক্!

কার্তিক কালিমাখা গাল সবেগে ঘষিতে ঘষিতে বলিল—

কার্তিকঃ ঐ-যা স্যার, আপনি আমার গাল বার্ণিশ করে দিলেন। এ কি আর উঠবে?

লক্ষ্মীঃ ভাবিসনে কার্তিক, লক্ষ্মী সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলিস, তাহলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বলিয়া সাবানটি কার্তিককে দিল।

ঘর্ষণের ফলে কার্তিকের গালের কালি মুখময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার ভিতর হইতে ভাল্লুকের মত সাদা দাঁত বাহির করিয়া সে বলিল—

কার্তিকঃ চিকা চিকা বুম্।

বিজয় তাহার মূর্তি দেখিয়া বলিয়া উঠিল—

বিজয়ঃ ঠিক হয়েছে? কালির নাম রইল—কার্তিক কালি। কেমন, বেশ মানানসই হয়নি?

বাহিরে কোনও গির্জায় ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিল। বিজয় নিজের হাতঘড়ি দেখিয়া লক্ষ্মীর পানে সপ্রশ্ননেত্রে চাহিতেই লক্ষ্মী একটু ঘাড় নাড়িল।

লক্ষ্মীঃ হ্যাঁ, এবার যেতে হবে—যদিও যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না।

বিজয়ঃ আমারও যেতে দিতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু আর বেশী রাত করলে—

লক্ষ্মীঃ ধরা পড়বার ভয়! আচ্ছা চললুম। চুপি চুপি খিড়কির সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে যাব, কেউ জানতে পারবে না।

বিজয়ঃ চল তোমাকে রাস্তা পার করে দিয়ে আসি।—কার্তিক, আমি এখনি আসছি।

দুজনে বাহির হইয়া গেল।

কাট্।

লক্ষ্মীর শয়নঘর। ধনেশ স্থূল শরীরে একটি ডোরাকাটা শ্লীপিং-সুট পরিয়া ঘরে পায়চারি করিতেছেন এবং থাকিয়া থাকিয়া চক্ষু ঘূর্ণিত করিতেছেন। আজ তাঁহার শরীর ভাল ছিল না—মাথা ধরিয়াছিল। মনও খারাপ যাইতেছিল; কারণ তাঁহার স্থূলবুদ্ধিতেও ক্রমশ ধরা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল যে দোকান যেমন চলা উচিত তেমন চলিতেছে না, ভিতরের একটা মস্ত গলদ বাহিরের চাকচিক্যে চাপা পড়িয়া আছে। উপরন্তু আজিকেই তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের হতভাগ্য দোকানদার সাবানের কারখানা করিয়াছে। নিজের ব্যর্থতার সমস্ত আক্রোশ বিজয়ের উপর গিয়া পড়িয়াছিল।

রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া তাঁহার ঘুম আসে নাই—অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিবার পর তিনি উঠিয়া লক্ষ্মীর ঘরে গিয়াছিলেন—ঘুমের বড়ির সন্ধানে। স্বভাবতই তিনি ভাবিয়াছিলেন যে লক্ষ্মী নিজের শয্যায় ঘুমাইতেছে। কিন্তু কন্যাকে শয্যায় না দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। রাত্রি সাড়ে এগারোটার পর অনূঢ়া কন্যা কোথায় গেল? ধনেশ দশ মিনিট অপেক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন কিন্তু লক্ষ্মী ফিরিয়া আসে নাই। তখন তিনি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বামহস্তের করতলে একটি প্রচণ্ড কিল মারিয়াছিলেন। তাঁহার মেঘাচ্ছন্ন বুদ্ধির আকাশে বিদ্যুৎচমকের মত খেলিয়া গিয়াছিল—কন্যা তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া প্রেম করিতেছে এবং কাহার সহিত প্রেম করিতেছে তাহাও তিনি ঐ চকিত বিদ্যুৎ-চমকের আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন।

যত দেরি হইতেছে ধনেশের মাথা ততই আণবিক বোমার মত ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। তিনি একবার রাস্তার দিকের জানালাটা খুলিয়া বাহিরে দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন, তারপর জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বাম করতলে আবার সবেগে মুষ্টিপ্রহার করিলেন।

কাট্।

মনোহর ভাণ্ডারের পিছনকার দরজার কাছে নির্জন ছায়ান্ধকার ফুটপাথের উপর লক্ষ্মী ও বিজয় মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছে, লক্ষ্মীর হাতদুটি বিজয়ের মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ।

লক্ষ্মীঃ হাত ছাড়ো, যাই।

বিজয়ঃ বল, আসি।

লক্ষ্মীঃ আসি।

বিজয়ঃ কাল আবার আসবে?

লক্ষ্মীঃ আসব। সন্ধ্যের পর।

বিজয়ঃ সমস্ত দিন দেখতে পাব না?

লক্ষ্মী হাসিল।

লক্ষ্মীঃ মাঝে মাঝে জানালার দিকে তাকিয়ো হয়তো দেখতে পাবে।

বিজয়ঃ আচ্ছা। মানুষ যেমন আকাশের চাঁদ দ্যাখে, মন্দিরের চূড়া দ্যাখে, তেমনি তোমায়

দেখব।

রাত ভিখারীর মত একটা লোক—গায়ে মলিন রঙের কম্বল জড়ানো—পাশ দিয়া চলিয়া গেল। বিজয় ও লক্ষ্মী তাহাকে লক্ষ্য করিল না।

বিজয়ঃ আচ্ছা লক্ষ্মী, এ কী হল?

লক্ষ্মীঃ কিসের কী হল?

বিজয়ঃ এই যে তোমাতে আমাতে। আমার এখনও বিশ্বাস হয় না। কি করে সম্ভব হল?

লক্ষ্মীঃ অনিবার্য বলেই সম্ভব হল—

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্রসূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে!

বিজয়ঃ কিন্তু এর শেষ কোথায় লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী বিজয়ের একেবারে বুকের কাছে সরিয়া আসিল।

লক্ষ্মীঃ যেখানে আরম্ভ হয়েছিল সেইখানেই এর শেষ।

বিজয়ঃ কোথায়?

লক্ষ্মীঃ তোমার আর আমার বুকের মধ্যে—এইখানে।

লক্ষ্মী ক্ষণেকের জন্য বিজয়ের বুকের উপর মাথা রাখিল, তারপর চকিত প্রজাপতির মত ছায়ান্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। বিজয় কিছুক্ষণ পরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল তারপর ধীরে ধীরে নিজের দোকানে ফিরিয়া গেল।

কাট্।

লক্ষ্মীর শয়নঘরের মধ্যস্থলে ধনেশ বক্ষ বাহুবন্ধ করিয়া গম্বুজের মত দাঁড়াইয়া ছিলেন, বাহিরে লঘু পদশব্দ শুনিয়া সচকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি নিঃশব্দে গিয়া বড় আলোটি নিভাইয়া দিলেন, কেবল নৈশ আলোটি মৃদু জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে লাগিল।

বাহিরের বারান্দাটি প্রায় অন্ধকার, লক্ষ্মী চাকরদের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া অতি সন্তর্পণে নিজের শয়নঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; তারপর ধীরে দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রথমটা ধনেশকে সে দেখিতে পাইল না, ধনেশ সুইচের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি সুইচ টিপিতেই দপ্ করিয়া বড় আলো জ্বলিয়া উঠিল। লক্ষ্মী চমকিয়া দেখিল, সাক্ষাৎ বাবা! তাহার অঙ্গ হঠাৎ হিম হইয়া গেল।

ধনেশ কণ্ঠস্বর চাপিবার চেষ্টায় দর্দুরধ্বনিবৎ একটি আওয়াজ বাহির করিলেন—

ধনেশঃ কোথায় গিছলে এত রাত্রে—অ্যাঁ!

লক্ষ্মীর কোনও কৈফিয়ৎ তৈরি ছিল না, সে স্খলিতকণ্ঠে বলিল—

লক্ষ্মীঃ আমি—আমি—

ধনেশের দর্দুরধ্বনি আরও কর্কশ হইয়া উঠিল।

ধনেশঃ মিথ্যে কথা বলে আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা কোরোনা, আমি সব জানি। —নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে, আমার মুখে চুনকালি দিচ্ছ?

লক্ষ্মীর হঠাৎ ধরা পড়ার কুণ্ঠা কাটিয়া গেল, তাহার মেরুদণ্ড শক্ত হইয়া উঠিল। এরূপ ঘৃণ্য অপবাদ সে পিতার নিকট হইতেও সহ্য করিবে না। ধনেশের মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া সে দৃঢ়স্বরে বলিল—

লক্ষ্মীঃ আমি কারুর মুখে চুনকালি দিইনি।

ধনেশঃ তবে ঐ পাজি বজ্জাতের দোকানে এত রাত্রি পর্যন্ত কী করছিলে, অ্যাঁ?

লক্ষ্মীঃ (আরক্তমুখে) উনি বজ্জাত নয়—ভাল লোক।

ধনেশঃ কী, এতবড় আস্পর্ধা, আমার শত্রুর পক্ষ হয়ে তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে।

লক্ষ্মীঃ উনি তোমার সঙ্গে কোনও শত্রুতা করেননি, তোমরাই ওঁর সঙ্গে শত্রুতা করেছ।

—ওঁর পেছনে গুণ্ডা লাগিয়েছিলে—

ধনেশের চোয়াল ঝুলিয়া পড়িল। তিনি তম্বি হাঁক-ডাক করিতে পটু কিন্তু তর্কের মুখে পড়িলে কণ্ঠরোধ হইয়া যায়। লক্ষ্মীর এই অতি সত্য অভিযোগ তিনি খণ্ডন করিতে পারিলেন না; শেষে আরও গলা চড়াইয়া বলিলেন—

ধনেশঃ আমার কথার ওপর কথা—বাপের মুখের ওপর চোপা—অ্যাঁ! আমি সহ্য করব না। আমার বাড়িতে থেকে কেউ আমার অবাধ্য হতে পাবে না!—

লক্ষ্মীঃ বেশ, কালই আমি কাশীতে দাদুর কাছে চলে যাব।

এতক্ষণ ধনেশ যদি বা নিজেকে একটু সংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবার আর পারিলেন না, আণবিক বোমা একেবারে ফাটিয়া পড়িল। তিনি লক্ষ্মীর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

ধনেশঃ কাশী চলে যাবে? দাদুর কাছে চলে যাবে? বটে! দাদুর কাছে গিয়ে আমার নামে লাগাবে! বজ্জাত মেয়ে, আমার সঙ্গে চালাকি! ঘরে বন্ধ করে রাখব তোমাকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতব, খুন করব—

ধনেশের কথাগুলি বহুলাংশে শব্দালঙ্কার হইলেও তাঁহার কণ্ঠস্বর মধ্যরাত্রির স্তব্ধতায় অনেক দূর সঞ্চারিত হইয়াছিল, দূরের ঘরে আহ্লাদী বুড়ির ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে আলুথালু অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করিয়া কাণ্ড দেখিয়া একেবারে গালে হাত দিয়া দাঁড়াইল।

আহ্লাদীঃ ওমা আমি কোথায় যাব। হ্যাঁরে ধনু, দুপুর রাত্রে তোর একি কাণ্ড! কী হয়েছে?

ধনেশঃ চুপ করে থাক বুড়ি, নইলে তোরও গলা টিপে দেব।

বুড়ি মুহূর্তে রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করিল।

আহ্লাদীঃ কি বল্‌লি র‍্যা—আমার গলা টিপে দিবি! তবে রে হাড়-হাবাতে, তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! দুধ খাইয়ে মানুষ করেছি, তুই আমার গলা টিপে দিবি! দে না দেখি কত বড় তোর ক্ষ্যামতা—

লক্ষ্মী হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

লক্ষ্মীঃ চল্ দিদি, আজ রাত্তিরেই আমরা দাদুর কাছে চলে যাই।

ধনেশের ঠোঁটের কোণে ফেনা দেখা দিল; তিনি লক্ষ্মীর বাঁ হাতখানা ধরিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে দ্বারের দিকে লইয়া চলিলেন—

ধনেশঃ এই যে যাওয়াচ্ছি দাদুর কাছে। সব বজ্জাতি বার করব আজ—

ধনেশ ঘরের বাহির হইয়া লক্ষ্মীকে বারান্দার ওপ্রান্তে আর একটা ঘরের দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। বুড়ি চিল-চীৎকার করিতে করিতে পিছনে চলিল—

আহ্লাদীঃ ওরে ও সব্বনেশে গাড়োল, তোর কি ভিমরতি ধরেছে। মেয়েটাকে কোথায় টেনে নিয়ে চল্‌লি—শেষে কি মেরে ফেল্‌বি নাকি রে—

একটা অন্ধকার ঘরের দরজা ঈষৎ খোলা ছিল; ইহা আহ্লাদীর ঘর। ধনেশ লক্ষ্মীকে ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া দিলেন, তারপর বুড়িকেও ঘাড় ধরিয়া ভিতরে নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইতে শিকল লাগাইয়া দিলেন।

ধনেশঃ যা—এবার কাশী যা।

কাট্।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে কেবল আহ্লাদী বুড়ির মৃদু কুন্থন শুনা যাইতেছে। লক্ষ্মী দেয়াল হাতড়াইয়া সুইচ্ টিপিল; আলো জ্বলিল। দেখা গেল ঘরটিতে আস্‌বাব বিশেষ কিছু নাই, কেবল একটি চৌকির উপর বুড়ির বিছানা রহিয়াছে। ঘরটিকে সিন্দুক বলিলেও চলে, কারণ জানালা নাই, কেবল ঊর্ধ্বে একটি স্কাই লাইট্।

বুড়ি মেঝেয় পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার উঠিবার ক্ষমতা ছিল না, সেইখানেই পড়িয়া কোঁথাইতেছিল। লক্ষ্মী গলদশ্রুনেত্রে তাহার পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে সযত্নে

তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

লক্ষ্মীঃ দিদি—আয়—উঠে বস্।

ডিজল্ভ্।

তিন দিন কাটিয়াছে। ভূত চতুর্দশীর প্রভাত; আগামী কল্য শ্যামাপূজা ও দেয়ালী।

বিজয়ের দোকানের সম্মুখে একটি ঠেলাগাড়ি রহিয়াছে। কয়েকজন মজুর দোকান হইতে সাবানভরা প্যাকিং বাক্স বহিয়া আনিয়া ঠেলাগাড়িতে বোঝাই করিতেছে। বিজয় খাতা পেন্সিল লইয়া ফুটপাথে দাঁড়াইয়া আছে এবং হিসাব লিখিয়া লইতেছে!

হিসাব লেখার ফাঁকে ফাঁকে বিজয় উৎকণ্ঠিতভাবে মনোহর ভাণ্ডারের দ্বিতলে লক্ষ্মীর জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। লক্ষ্মীর জানালা কিন্তু বন্ধ; আজ তিন দিন জানালা বন্ধ আছে, লক্ষ্মীরও দেখা নাই।

আমাদের পরিচিত বৃদ্ধটি কার্তিকের কাউন্টারে নস্য কিনিতেছেন এবং চশমার ভিতর দিয়া বিজয়কে লক্ষ্য করিতেছেন। তাঁহার সাজ-পোশাক পূর্ববৎ আছে, কেবল বর্ষা অপগত হইয়া শীতের আবির্ভাব হওয়ায় তিনি বর্ষাতিটি বর্জন করিয়া একটি অতি প্রাচীন ওভার-কোট্ পরিধান করিয়াছেন।

কার্তিকের হাত হইতে নস্যের পুরিয়া লইয়া তিনি হ্রস্বকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—

বৃদ্ধঃ তোর মনিবের হয়েছে কি? মুখ গোমড়া করে আছে কেন?

কার্তিকও মুখ গম্ভীর করিল।

কার্তিকঃ বিজয়বাবুর মন খারাপ হয়েছে।

বৃদ্ধঃ তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু মন-খারাপটা হল কেন?

কার্তিকঃ (চুপি চুপি) ও বাড়ির লক্ষ্মী দিদি তিন দিন আসেননি কি না, তাই মন খারাপ হয়েছে।

বৃদ্ধ চশমা তুলিয়া একবার কার্তিককে দেখিলেন, তারপর গলার মধ্যে একটা শব্দ করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন।

এই বৃদ্ধটির প্রকৃত পরিচয় বোধ করি এতক্ষণে সকলেই অনুমান করিয়াছেন।

মনোহর রায় বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন; কি করিয়া অতি সামান্য আরম্ভ হইতে এই বৃহৎ ব্যবসায় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস আমরা শুনিয়াছি। অতঃপর তাঁহার বয়স যখন পঁয়ষট্টি বছর হইল তখন তাঁহার মস্তকে পরকালের চিন্তা আসিয়া জুটিল। কিন্তু পরকালের চিন্তাকে মস্তিষ্কে স্থায়ী আসন দান করিতে হইলে সেখান হইতে ইহকালের চিন্তাকে সরাইতে হয়; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার অবর্তমানে দোকান চালাইবে কে? একমাত্র পুত্র ধনেশের বিষয়বুদ্ধি সম্বন্ধে মনোহরের মনে কোন মোহ ছিল না; তাঁহার মৃত্যুর পর দোকানের কী অবস্থা হইবে ভাবিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

শেষে অনেক চিন্তার পর মনোহর স্থির করিলেন, নিজের জীবদ্দশাতেই ধনেশের হাতে দোকানের ভার দিয়া তাহাকে হাতে-কলমে ব্যবসা শিখিবার সুযোগ দিবেন। যদি সে নিতান্তই না চালাইতে পারে তখন অন্য ব্যবস্থা করিবার অবকাশ থাকিবে।

ধনেশের হাতে দোকান পরিচালনার ভার তুলিয়া দিয়া তিনি একটি অনুগত কর্মচারীকে সঙ্গে লইয়া কাশীবাস করিলেন; কিন্তু সেখানে বেশী দিন স্থির থাকিতে পারিলেন না। বুকের রক্ত দিয়া গড়া দোকানের চিন্তা তাঁহার ভগবৎ চিন্তা ভুলাইয়া দিল। মাস দুই পরে তিনি লুকাইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং অলক্ষ্যে থাকিয়া দোকানের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার আগমনবার্তা কেহই জানিতে পারে নাই; কাশীতে কর্ম-চারীটি তাঁহার চিঠিপত্র নিয়মিত তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিত, তিনি সেইসব চিঠিপত্রের জবাব লিখিয়া কাশীতে কর্মচারীর কাছে ফেরত পাঠাইতেন; কর্মচারী চিঠিগুলি নূতন খামে ভরিয়া যথাস্থানে প্রেরণ করিত। এইরূপে মনোহরের অজ্ঞাতবাস কাহারও মনে সন্দেহের উদ্রেক করিতে পারে নাই। কেবল প্রভুভক্ত হনুমান সিং জানিতে পারিয়াছিল। হনুমান সিংয়ের

চরিত্রে আকস্মিক পরিবর্তন এবং বিজয়কে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়ার মূলে যে মনোহর আছেন তাহা বলাই বাহুল্য।

ধনেশের দোকান চালাইবার পদ্ধতি মনোহর বাহির হইতে যতখানি দেখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার উদ্বেগ আরও বাড়িয়া গিয়াছিল; কিন্তু তবু তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া ধনেশের কার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, শেষ পর্যন্ত তাহাকে ভ্রমসংশোধনের সুযোগ দিয়া প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন। কেবল মনের উদ্বেগ দমন করিতে না পারিয়া যখন তখন নিজের দোকানের চারিপাশে যক্ষের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কয়েক রাত্রি পূর্বে বিজয় ও লক্ষ্মীর পাশ দিয়া যে রাত-ভিখারী চলিয়া গিয়াছিল সেও আর কেহই নয়—তিনি।

ডিজল্ভ্।

বেলা আন্দাজ এগারোটা। ধনেশের অফিস ঘরে ধনেশ বসিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখের চেয়ারে অডিটারবাবু। অডিটারবাবুটির একহারা শুষ্ক চেহারা। মুখে একটি নির্লিপ্ত নিরাসক্ত ভাব, হিসাবের কড়ি ছাড়া আর কিছুর প্রতিই তাঁহার আসক্তি নাই। নীলাম্বর জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন; তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হয় তিনি কোণ লইয়াছেন।

কথা চলিতেছে।

ধনেশ: তা—আপনার রিপোর্ট কবে পাওয়া যাবে, অডিটারবাবু?

অডিটার: লেখা রিপোর্ট যথাসময়ে পাবেন। আপাতত মুখে আপনাকে দু'চারটে কথা বলতে চাই।

ধনেশ: বলুন।

অডিটার: গত বিশ বছর ধ'রে আমরা এই দোকানের হিসেব পরীক্ষা করছি—প্রত্যেক-বারই পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হয়েছে। কিন্তু এবার—আপনার খাতাপত্র পরীক্ষা করে মনে হচ্চে দোকানের অবস্থা শোচনীয়।

ধনেশের মুখ শুকাইয়া গেল।

ধনেশ: শোচনীয়!

অডিটার: অত্যন্ত শোচনীয়। আপনার দোকানের asset বলতে গেলে কিছুই নেই, অথচ বাজারের ধার জমা হয়েছে প্রায় লক্ষ টাকা।

ধনেশ চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন।

ধনেশ: Asset কিছুই নেই? অ্যাঁ—নীলাম্বর?

নীলাম্বর জানালার দিক হইতে ফিরিলেন—

নীলাম্বর: বাজে কথা। দোকানের যেমন ধার আছে তেমনি প্রায় দেড় লাখ টাকা বাজারে পাওনাও আছে; অনেক বড় বড় কোম্পানী creditএ মাল নিয়ে গেছে, তারা কালীপুজোর পরই টাকা দেবে।

অডিটার ধনেশের পানে চাহিয়া শুষ্ক স্বরে কহিলেন—

অডিটার: আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হয়, কিন্তু আমি পাওনার হিসেবও খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি। দুঃখের বিষয়, যেসব বড় বড় কোম্পানীকে বেশী টাকার মাল ধার দেওয়া হয়েছে তার বেশীর ভাগই ভুয়ো কোম্পানী—টাকা আদায় করতে গিয়ে দেখবেন তাদের কোনও অস্তিত্ব নেই।

ধনেশ আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

ধনেশ: অ্যাঁ—ভুয়ো কোম্পানী! অসম্ভব—এ হতেই পারে না। নীলাম্বর—!

নীলাম্বর এবার কোনও উত্তর দিলেন না, সুচীতীক্ষ্ণ চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। অডিটার-বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার নির্লিপ্ত চক্ষু একবার নীলাম্বরকে পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিল।

অডিটার: অসম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস আপনার দোকানেরই কোনও লোক এই সব ভুয়ো কোম্পানী খাড়া করে তাদের কাছে মাল বিক্রি করেছে।

ধনেশঃ কিন্তু—কিন্তু—কেন?

অডিটারঃ এই সহজ কথাটা বুঝতে পারলেন না? যে লোক এই কাজ করছে সে আপনার মাল দোকান থেকে বার করে নিয়ে বাজারে আধা-দরে বিক্রি করে দিয়েছে আর টাকাটা নিজের পকেটে পুরেছে। আপনি যখন নিজের টাকা আদায় করতে যাবেন, দেখবেন আপনার খাতক কোম্পানী উধাও হয়েছে, সে-নামের কোনও কোম্পানীই নেই। আপনি তখন কার কাছ থেকে টাকা আদায় করবেন?

ধনেশ কিছুক্ষণ পাংশুমুখে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন তারপর গলার মধ্যে বিষম খাওয়ার মত একটা শব্দ করিয়া দুহাতে মুখ ঢাকিলেন।

অডিটারঃ কর্তব্যের অনুরোধে আমাকে এত কথা বলতে হল। আশা করি ভবিষ্যতে সাবধান হবেন। নমস্কার।

অডিটার বাহির হইয়া গেলেন।

ধনেশ আরও কিছুক্ষণ জবুথবু হইয়া বসিয়া রহিলেন; এই কয়েক মিনিটে তাঁহার যেন দশ বছর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। সহসা তিনি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ধনেশঃ নীলাম্বর—তুমি—তুমি আমাকে এমন করে ঠকালে! আমার সর্বনাশ করলে—!

নীলাম্বর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

নীলাম্বরঃ আমি কিছু করিনি। কিন্তু তুমি যখন আমার ওপর বিশ্বাস হারিয়েছ তখন আর আমার এখানে থেকে কোনও লাভ নেই। আমি চললুম।

নীলাম্বর চাদর গলায় দিয়া ঘরের কোণ হইতে নিজের লাঠিটি তুলিয়া লইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। ধনেশ অক্ষমের নিষ্ফল আস্ফালনে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

ধনেশঃ যাচ্ছ কোথায়? আমার যথাসর্বস্ব চুরি করে পালাচ্ছ! তোমাকে পুলিশে দেব, জেলে পাঠাব—

নীলাম্বর ফিরিয়া আসিয়া ধনেশের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, অবজ্ঞা-মিশ্রিত ঘৃণার চক্ষে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া ধীর স্বরে কহিলেন—

নীলাম্বরঃ মিছে চেঁচামেচি করো না। আমি যে চুরি করেছি তার কোনও প্রমাণ নেই। সব কাজ তুমি নিজের হাতে করেছ, আমি পরামর্শ দিয়েছি মাত্র। আমার পরামর্শ নিলে কেন? না নিলেই পারতে।

ধনেশ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ধনেশঃ উঃ—আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলুম, আর তুমি আমাকে মাথায় পা দিয়ে ডুবিয়ে দিলে! আমি এখন বাবার কাছে মুখ দেখাব কি করে। গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া আর আমার উপায় নেই।—

নীলাম্বরের চক্ষু একবার একটু নাচিয়া উঠিল।

নীলাম্বরঃ আমার কথা যদি শোনো—এখনও উপায় আছে!

ধনেশঃ আবার তোমার কথা শুনবো!

নীলাম্বরঃ (নীরসকণ্ঠে) বেশ, শুনো না, যা ভাল হয় কর, আমি চললুম।

নীলাম্বর আবার দ্বারের দিকে ফিরিলেন।

ধনেশঃ নীলাম্বর—!

নীলাম্বরঃ কী বল?

ধনেশঃ (অনুনয়ের কণ্ঠে) আমাকে অথৈ জলে ফেলে চলে যেও না। আমি তোমার ওপর নির্ভর করেছিলুম; যদি কোনও উপায় থাকে বল, আমাকে বাঁচাও!

নীলাম্বর নিষ্করুণ নেত্রে ধনেশকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখের চেয়ারে উপবেশন করিলেন।

নীলাম্বরঃ শোনো, স্পষ্ট কথা বলি! তুমি এখন আমার মুঠোর মধ্যে, তোমাকে মারলে মারতে পারি, রাখলে রাখতে পারি। যদি বাঁচতে চাও আমার কথা শুনে চলতে হবে; আমি এমন ব্যবস্থা করব, যাতে সব দিক রক্ষে হবে—তোমার লোকসানের টাকা তুমি ফেরত পাবে। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না।

ধনেশঃ কী—কি ব্যবস্থা করবে?

নীলাম্বরঃ বল্‌ব। কিন্তু তার আগে তুমি আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটি হ্যাণ্ডনোট লিখে দাও।

ধনেশঃ অ্যাঁ—আবার পঞ্চাশ হাজার!

নীলাম্বরঃ (চক্ষু নাচাইয়া) নিজের পকেট থেকে দিতে হবে না, ইন্সিওর কোম্পানীর কাছ থেকে যে দু'লাখ টাকা পাবে তাই থেকে দেবে।

ধনেশের দুই চক্ষু কোটর হইতে বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিল।

ধনেশঃ কী—কি বলছ তুমি—?

নীলাম্বরঃ শোনো—তোমার দোকানে আগুন লাগবে, সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। দোকান ফায়ার-ইন্সিওর করা আছে, কাজেই তোমার কোনও ক্ষতি হবে না, বরং দু'লাখ টাকা পাবে। —এখন বুঝতে পারছ?

ধনেশ সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ধনেশঃ অ্যাঁ—না না, এসব কী? আমি—আমি পারব না। শেষে হাতে দড়ি পড়বে—

নীলাম্বরঃ তোমার ভয় নেই—তুমি গিয়ে বিছানায় শুয়ে থেকো। যা করবার আমি করব। সব যোগাযোগ ঠিক হয়েছে—কাল কালীপুজোর রাত্তির। এক ঢিলে দু'পাখি মারব।

ধনেশঃ এক ঢিলে দু'পাখি?

নীলাম্বরঃ (জানালার দিকে ইঙ্গিত করিয়া) ঐ ছোঁড়া শয়তান—আগুন লাগাবার দোষ ওর ঘাড়ে চাপাব। আমাদের কেউই সন্দেহ করবে না, ঐ শত্তুরের হাতে দড়ি পড়বে। সব মতলব ঠিক করে রেখেছি।

ময়াল সাপের সম্মুখে সম্মোহিত খরগোশের মত ধনেশ রুদ্ধশ্বাসে চাহিয়া রহিলেন।

নীলাম্বরঃ কী বল—শুনবে আমার কথা? তোমাকে কিছু করতে হবে না—লোকসানের টাকা ফেরত পাবে—শত্তুর নাশ হবে। রাজি আছ?

ধনেশ ধীরে ধীরে আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

ধনেশঃ আমি—আমি কিছু জানি না—

নীলাম্বরের দন্তপংক্তি মুহূর্তের জন্য দেখা গেল।

নীলাম্বরঃ আমরা কেউ কিছু জানি না—এখন কাগজ নাও, হ্যাণ্ডনোট লেখো—

তিনি ধনেশের দিকে এক তক্তা কাগজ বাড়াইয়া দিলেন। ক্ষণেক ইতস্তত করিয়া ঠোঁট চাটিয়া ধনেশ কলম তুলিয়া লইলেন।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

কালীপুজার রাত্রি। নগরীর অঙ্গে অসংখ্য দীপাবলীর চুমকি জ্বলিতেছে। পথে পথে চৌমাথায় তুবড়ি ফুটিতেছে, রংমশাল জ্বলিতেছে, হাউইয়ের স্ফুলিঙ্গ উড়িতেছে। দীপান্বিতা লক্ষ্মীর যেন আজ বিবাহোৎসব—স্বয়ম্বর রাত্রি।

কোনও দোকানেই কেনা-বেচা বিশেষ নাই—শুধু শোভা। লক্ষ্মী ভাণ্ডারও শোভিত হইয়াছে। মনোহর ভাণ্ডারের শোভা রাত্রি দশটার পর হইতে কিছু ম্লান হইয়া আসিয়াছে—মোমবাতির দীপগুলি অধিকাংশই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; দোকানের দ্বারও বন্ধ।

ধনেশের অফিস ঘরেও দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ। নীলাম্বর ধনেশের চেয়ারে বসিয়া আছেন এবং যত্নসহকারে কাগজে কি লিখিতেছেন; ধনেশ ভয়ার্ত মুখে তাঁহার পিছন দিকে পায়চারি করিতেছেন। আজ তাঁহাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে, এখন নীলাম্বর প্রভু, ধনেশ তাঁহার আজ্ঞাবহ।

লিখিতে লিখিতে নীলাম্বর মুখ তুলিলেন—

নীলাম্বরঃ চাকর-বাকরদের বাড়ি থেকে বিদেয় করেছ?

ধনেশঃ হ্যাঁ, তাদের ছুটি দিয়েছি—নীলাম্বর, আমি এবার যাই—আমাকে তো আর দরকার নেই—

নীলাম্বরঃ (শুষ্ক স্বরে) না, তোমাকে দিয়ে কোনও কাজই হবে না। তুমি গিয়ে বিছানায় শুয়ে থাক গে—কিন্তু ঘুমিও না—

ধনেশঃ না না—

নীলাম্বরঃ ঘড়ির দিকে নজর রাখবে, আমি রাত্রি বারোটার পর এখানকার সব কাজ সেরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাব, তোমার দরজায় টোকা দিয়ে খিড়কির সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাড়ি চলে যাব—তার দশ মিনিট পরে তুমি উঠে চেঁচামেচি যা করবার কোরো, আর লক্ষ্মীকে গারদ ঘর থেকে বার করে নীচে নেমে যেও। এইটুকু তোমার কাজ, বুঝলে? ঘাবড়ে গিয়ে যেন সব ভণ্ডুল করে ফেলো না।

ধনেশঃ (কপালের ঘাম মুছিয়া) না না। আচ্ছা আমি তবে যাই—

ধনেশ চোরের মত প্রস্থান করিলেন। নীলাম্বর কৃপাপূর্ণ নেত্রে তাঁহার কাপুরুষোচিত পলায়ন লক্ষ্য করিয়া আবার লেখায় মন দিলেন। তিনি লিখিতেছেন একটি চিঠি, মেয়েলি ছাঁদে ধরিয়া ধরিয়া লিখিতেছেন—

"আমি বড় বিপদে পড়েছি, তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। আজ রাত্রি ঠিক বারোটার সময় আমাদের দোকানের সদর দরজা খোলা থাকবে। তুমি চুপি চুপি এসো, তখন সব কথা বলব। কেউ যেন জানতে না পারে। এ চিঠি পুড়িয়ে ফেলো।

—লক্ষ্মী"

চিঠিখানা লিখিয়া নীলাম্বর উহা সযত্নে পাঠ করিলেন, তারপর ভাঁজ করিয়া একটি খামের মধ্যে পুরিতে পুরিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কাট্।

এই অবসরে একবার চট্ করিয়া লক্ষ্মীর গারদখানা তদারক করিয়া আসা যাক।

ঘরের দ্বারে তেমনি শিকল চড়ানো আছে। ভিতরে লক্ষ্মী দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে; তাহার মুখ-চোখ শুষ্ক, চুল রুক্ষ। অনড় হইয়া সে একভাবে বসিয়া আছে, চোখের পল্লব পড়িতেছে না। আহ্লাদী তার প্রসারিত পায়ের কাছে গুটিসুটি হইয়া শুইয়া আছে। বুড়ি বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

কাট্।

বিজয়ের দোকানের আলোকোজ্জ্বল অভ্যন্তর। বিজয় টেবিলের সম্মুখে গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে—কী হইল লক্ষ্মীর? সে কি এখানে নাই, হঠাৎ কোথাও চলিয়া গিয়াছে? তিনদিন জানালা খোলে নাই কেন? যদি কোথাও গিয়াই থাকে, একটা খবর দিয়া গেল না কেন? কিম্বা—কিম্বা—লক্ষ্মীর মন কি তাহার নিকট হইতে সরিয়া গিয়াছে, আর কি সে তাহাকে চায় না? এমনি হাজার চিন্তা তাহার মস্তিষ্কে আলোড়িত হইতেছে, অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুকের ভিতর তোলপাড় করিতেছে।

রাস্তার অপর পারে মনোহর ভাণ্ডারের সম্মুখে দেওয়ালীর আলোগুলি প্রায় সব নিভিয়া গিয়াছে। দরজার কাছে অর্ধ স্বচ্ছ অন্ধকার। রাস্তার লোক চলাচল কমিয়া গিয়াছে।

সদর দরজা একটু ফাঁক করিয়া নীলাম্বর বাহির হইয়া আসিলেন; তাঁহার হাতে চিঠি। সম্মুখে দীপোজ্জ্বল লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দিকে একবার চাহিলেন, তারপর সিঁড়ির নিম্নতম ধাপে নামিয়া আসিয়া ফুটপাথের এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ মনোহর ফুটপাথ দিয়া আসিতেছিলেন। পরিধানে সেই দীনহীন বেশ, কম্বল ও মাঙ্কিক্যাপে মুখ এমনভাবে ঢাকা যে তাঁহাকে ভদ্রলোক বলিয়া চেনা অসাধ্য। হাতের লাঠি প্রতি পদক্ষেপে ঠক্ ঠক্ করিয়া ফুটপাথের উপর পড়িতেছে। নীলাম্বর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে

তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন—মনে হইল একটা পাগলাটে বুড়ো ভিক্ষুক যাইতেছে।

মনোহর দরজার সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় নীলাম্বর চাপা গলায় ডাকিলেন—

নীলাম্বরঃ ওরে ঐঃ—স্ স্—

মনোহর থামিয়া নীলাম্বরের দিকে ঘাড় ফিরাইলেন।

নীলাম্বরঃ শোন্, ভিক্ষে নিবি? একটা কাজ করিস তো চারটে পয়সা দেব।

মনোহরের মুখ অন্ধকারে দেখা গেল না, তিনি নীরবে হাত পাতিলেন। নীলাম্বর তাঁহার হাতে একটি একানি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—

নীলাম্বরঃ এই চিঠিখানা সামনের ঐ দোকানে ফেলে আসবি। বুঝতে পেরেছিস তো—সামনের ঐ দোকান। কাউকে কিছু বলতে হবে না, কেবল চিঠিখানা দোকানের কাউণ্টারের ওপর ফেলে দিয়ে চলে যাবি—পারবি তো?

মনোহর ঘাড় নাড়িলেন, নীলাম্বর তখন তাঁহার হাতে চিঠি দিলেন। চিঠি লইয়া মনোহর রাস্তা অতিক্রম করিয়া লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দিকে চলিলেন। নীলাম্বর তাঁহাকে ঠিক পথে যাইতে দেখিয়া নিঃশব্দে মনোহর ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিলেন।

মনোহর মন্থর পদে রাস্তা পার হইলেন; ওপারের ল্যাম্পপোস্টের নীচে পৌঁছিয়া তিনি পিছন দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন নীলাম্বর অন্তর্হিত হইয়াছেন। তখন তিনি চিঠি খুলিয়া ল্যাম্পপোস্টের আলোয় পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কাট্।

লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ঘড়িতে রাত্রি দশটা বাজিয়া দশ মিনিট। বিজয় টেবিলে কনুই রাখিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে—চিন্তা—চিন্তা—কোথায় গেল লক্ষ্মী?

কার্তিক নিজের কাউণ্টারের সম্মুখে মেঝেয় বসিয়া ঢুলিতেছিল। দোকানে খরিদ্দার নাই, রাতও অনেক হইয়াছে; কার্তিক ঢুলিতে ঢুলিতে মাঝে মাঝে চোখ টানিয়া চাহিতেছিল, আবার চক্ষু মুদিতেছিল।

হঠাৎ একখণ্ড কাগজ বাহির হইতে তাহার কোলের উপর আসিয়া পড়িল। চটকা ভাঙিয়া কার্তিক কিছুক্ষণ কাগজখানার দিকে চাহিয়া রহিল, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল একখানা চিঠি। সহসা তন্দ্রাজড়িমা কাটিয়া গিয়া তাহার সমস্ত চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে তড়াক করিয়া উঠিয়া কাউণ্টারের বাহিরে গলা বাড়াইয়া দেখিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পথ শূন্য।

কার্তিক লেখাপড়া জানে না, চিঠিখানা আরও বার দুই উল্টাইয়া পাল্টাইয়া শেষে বিজয়ের কাছে লইয়া গেল।

কার্তিকঃ চিঠি—কে ফেলে দিয়ে গেল।

চিঠি পড়িয়া বিজয় চন্‌মনে হইয়া উঠিল। তাহার উৎকণ্ঠা এতক্ষণ দিশাহারা হইয়াছিল, এখন তাহার যাহোক একটা দিশা মিলিল। লক্ষ্মীর বিপদ! বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা এখনি একটা কিছু করিবার জন্য দাঁড়িছেঁড়া হইয়া উঠিল, ইচ্ছা হইল এই মুহূর্তে ছুটিয়া গিয়া মনোহর ভাণ্ডারে উপস্থিত হয়! কিন্তু এখন সেখানে গিয়া লাভ নাই; বিজয় ঘড়ি দেখিল—সওয়া দশটা। এখনও প্রায় দু'ঘণ্টা বাকী।

কার্তিক দাঁড়াইয়া ক্রমাগত হাই তুলিতেছিল। বিজয় তাহাকে বলিল—

বিজয়ঃ কার্তিক, তুই বাড়ি যা, রাত হয়েছে। আমি দোকান বন্ধ করে পরে যাব।

কার্তিক নিদ্রালুভাবে স্যালুট করিয়া চলিয়া গেল। বিজয় তখন চিঠি খুলিয়া আবার পড়িল, তারপর দেশালাই জ্বালিয়া চিঠিতে আগুন দিল।

কাট্।

কার্তিক বাড়ি ফিরিতেছে। সদর রাস্তা ছাড়িয়া সে একটি গলির মধ্যে প্রবেশ করিল।

তাহার চক্ষু দুটি মুদিত, কিন্তু সেজন্য তাহার পথচলার কোনই অসুবিধা হইতেছে না, অভ্যস্ত পদদ্বয় পরিচিত পথে চলিয়াছে।

গলির অপর দিক হইতে মনোহর আসিতেছিলেন; কার্তিককে দেখিয়া তিনি পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। কার্তিক নিঃশব্দে আসিয়া তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া দিব্য আরামে ঘুমাইবার আয়োজন করিল।

মনোহর তাহাকে ঈষৎ নাড়া দিয়া মৃদুস্বরে ডাকিলেন—

মনোহরঃ কার্তিক, ওরে কার্তিক ওঠ।

সহসা জাগিয়া কার্তিক সতেজে বলিয়া উঠিল—

কার্তিকঃ অ্যাঁ—কে? কি চাও? কে তুমি?

মনোহর একটু হাসিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিলেন।

মনোহরঃ পাগলা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পথ চলিস্?

কার্তিক মনোহরকে চিনিতে পারিল।

কার্তিকঃ ও—বুড়ো বাবু!

মনোহরঃ হ্যাঁ। আজ তোর ঘুমোনো চলবে না, কার্তিক। অনেক কাজ আছে। আয় আমার সঙ্গে—

ডিজল্ভ্।

বিজয়ের দোকানের ঘড়িতে পৌনে বারোটা।

বিজয় একবার ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দোকান বন্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

শহরের পথে দীপালী প্রভা তখন নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। গৃহস্থ বাড়ির প্রদীপ অধিকাংশ নিভিয়া গিয়াছে; দোকানপাটও একে একে বন্ধ হইতেছে।

কাট্।

ধনেশের শয়নকক্ষের শয্যার পাশে টিপাইয়ের উপর একটি এলার্ম ঘড়ি রহিয়াছে। ধনেশ বিছানার পাশে বসিয়া একদৃষ্টে সেই দিকে তাকাইয়া আছেন। ঘড়িতে বারোটা বাজিতে পাঁচ মিনিট।

ধনেশের চোখে অজ্ঞাত আতঙ্কের বিভীষিকা।

কাট্।

আহ্লাদীর অবরুদ্ধ ঘরে চৌকির উপর শুইয়া লক্ষ্মী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার পায়ের দিকে মেঝেয় বসিয়া আহ্লাদী চৌকির কিনারায় মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। বাহিরে একটা গির্জার ঘড়িতে মধ্য রাত্রি বাজিতে আরম্ভ করিল।

কাট্।

গির্জার ঘড়ির মন্দ্রগম্ভীর আওয়াজ শেষ হইল।

বিজয় দোকানের দরজায় তালা লাগাইয়া ফুটপাথে ফায়ার ব্রিগেডের স্তম্ভটার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সুমুখেই মনোহর ভাণ্ডারের বন্ধ দরজা অন্ধকার গহ্বরমুখের মত দেখাইতেছে। পথে কেহ কোথাও নাই। বিজয় সতর্ক দ্রুতপদে রাস্তা পার হইয়া মনোহর ভাণ্ডারের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

কাট্।

মনোহর ভাণ্ডারের অভ্যন্তরে কেহ নাই, অন্তত কাহাকেও দেখা যাইতেছে না। একটা বাল্ব ঊর্ধ্বে থাকিয়া অস্পষ্ট আলো বিকীর্ণ করিতেছে। ধনেশের অফিস ঘরের দরজা ঈষৎ ফাঁক হইয়া আছে, ভিতর হইতে আলো দেখা যাইতেছে।

সদর দরজা একটু ফাঁক করিয়া বিজয় দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল; দরজা আবার ভেজাইয়া দিয়া তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল। অফিস ঘরের আলো চোখে পড়িল; সে সন্তর্পণে সেইদিকে গেল—নিশ্চয় লক্ষ্মী ঐ ঘরেই তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

অফিস ঘরের দ্বারের কাছে গিয়া বিজয় ভিতরে উঁকি মারিল। নীলাম্বর পর্দার আড়ালে লুকাইয়া ছিলেন। তাঁহার হাতে ছিল একটি রবারের খেঁটে; তিনি এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এখন বাহির হইয়া আসিয়া বিদ্যুৎবেগে বিজয়ের ঘাড়ে এক ঘা খেঁটে বসাইয়া দিলেন। বিজয় নিঃশব্দে হুমড়ি খাইয়া অফিস ঘরের মধ্যে পড়িয়া গেল।

অফিস ঘরের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ করিয়া নীলাম্বর ছুটিয়া গিয়া সদর দরজায় হুড়কা লাগাইলেন; উত্তেজনায় তাঁহার চক্ষু শ্বাপদচক্ষুর মত জ্বলিতে লাগিল। তারপর তিনি ক্ষিপ্রবেগে কাজ আরম্ভ করিলেন; পেট্রোলের একটি ক্যানেস্তারা লইয়া দোকানের চারিদিকে পেট্রোল ছড়াইতে আরম্ভ করিলেন। নির্জন প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট আলোতে এই একটি মানুষের নিঃশব্দ ছুটাছুটি যেন ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

অফিস ঘরের মেঝেয় বিজয় মুখ থুবড়িয়া পড়িয়াছিল। তাহার সংজ্ঞা ছিল না। ক্রমে সংজ্ঞা পাইয়া সে নড়িয়া চড়িয়া উঠিয়া বসিল—নেশায় আচ্ছন্ন-বুদ্ধি মাতালের মত ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইতে লাগিল। তাহার ঘাড়ের কাছটা টনটন করিতেছিল, অবশভাবে হাত তুলিয়া সে ঘাড়ে হাত বুলাইতে লাগিল; সহসা তাহার নাকে কাঁচা পেট্রোলের তীব্র গন্ধ প্রবেশ করিল। সে ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল!

দ্বারের বাহিরে নীলাম্বর তখন পেট্রোল ঢালিতেছেন, ক্যানেস্তারা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বিজয় উঠিয়া টলিতে টলিতে দ্বারের কাছে গেল, দ্বার টানিয়া দেখিল বাহির হইতে বন্ধ। কয়েকবার নিস্ফল ধাক্কা দিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। জানালার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু জানালার কাঠের কবাট তালা দিয়া শক্তভাবে বন্ধ করা হইয়াছে। সেদিক হইতে হতাশ দৃষ্টি ফিরাইয়া সে দেখিল, টেবিলের উপর টেলিফোন। এতক্ষণে তাহার মোহগ্রস্ত বুদ্ধি অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে, সে ছুটিয়া গিয়া টেলিফোন তুলিয়া লইল, ব্যগ্রভাবে তাহার মধ্যে ডাক দিল—হ্যালো, হ্যালো! কিন্তু টেলিফোনে কোনও সাড়া নাই। তারপর তাহার নজরে পড়িল টেলিফোনের তার কাটা, তারের ক্ষুদ্র প্রান্তটি শূন্যে ঝুলিতেছে।

ওদিকে নীলাম্বর তৈল সিঞ্চন কার্য শেষ করিয়াছেন। তিনি মেঝের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া রবারের খেঁটের মাথায় একটি রুমাল বাঁধিতেছেন। এইরূপে একটি মশাল তৈরি হইল, তখন তিনি তাহা স্বল্পাবশিষ্ট পেট্রোলে সিক্ত করিয়া দেশলাই কাঠি জ্বালিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন। তারপর জ্বলন্ত মশালটি ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া সিঁড়ির কয়েক ধাপ উপরে উঠিলেন, সেখান হইতে মশালটি ঘুরাইয়া দোকানঘরের এক প্রান্তে ফেলিলেন! একসঙ্গে খানিকটা স্থান দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং ক্ষিপ্রবেগে বিস্তারলাভ করিতে লাগিল। নীলাম্বর ক্ষণেক হিংস্রচক্ষে এই অগ্নিকাণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুত ফিরিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন।

কিন্তু সিঁড়ির মোড় পর্যন্ত গিয়া নীলাম্বর সহসা থামিয়া গেলেন; উপরের বারান্দা হইতে বহু কণ্ঠের সম্মিলিত কলকল ধ্বনি আসিতেছে। নীলাম্বরের বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়িল। এ আবার কী!

কার্তিক ও তাহার দল পিছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াছিল; মনোহরের নির্দেশ অনুযায়ী তাহারা প্রত্যেকটি ঘর খুঁজিয়া দেখিতেছিল। আহ্লাদীর ঘর হইতে সদ্য ঘুম-ভাঙা চোখে লক্ষ্মী বাহির হইয়া আসিল—

লক্ষ্মী: একি! কার্তিক, তুই এখানে!

বালকেরা সমস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিল।

কার্তিক: শীগ্‌গির—শীগ্‌গির মিস্—নীচে দোকানে আগুন লেগেছে—

এই সময় ধনেশ নিজের ঘরের দরজা হইতে মুণ্ড বাহির করিলেন। লক্ষ্মী বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং তাহাকে ঘিরিয়া একপাল ছোঁড়া জটলা করিতেছে দেখিয়া তিনি সভয়ে মুণ্ড টানিয়া লইয়া আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন—

কার্তিক ওদিকে বলিতেছিল—

কার্তিক: চলুন—চলুন মিস্, আর দেরি করবেন না—এই পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলুন—

লক্ষ্মীর চক্ষু কিন্তু উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে লুণ্ঠিত আঁচলটা কোমরে জড়াইতে জড়াইতে বলিল—

লক্ষ্মী: কী—দোকানে আগুন লেগেছে আর আমি পালিয়ে যাব। আয় তোরা আমার সঙ্গে, আগুন নেভাতে হবে—

লক্ষ্মী অগ্রবর্তিনী হইয়া সিঁড়ির দিকে চলিল।

ওদিকে সিঁড়ির মধ্যস্থলে নীলাম্বরের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে—পিছনে আগুন, সম্মুখে পালাইবার পথ বন্ধ। তিনি পাকসাট খাইয়া আবার নীচে নামিতে লাগিলেন—হয়তো এখনও সদর দরজা খুলিয়া পালাইবার সময় আছে।

নীচে দোকানঘরে আগুনের লোলশিখা তখন চক্রব্যূহ রচনা করিয়াছে; কিন্তু সদর দরজার কাছে দাহ্যবস্তুর অভাবেই বোধ হয় আগুন অগ্রসর হইতে পারে নাই। নীলাম্বর ছুটিয়া গিয়া দ্বারের লোহার হুড়কা খুলিবার উপক্রম করিলেন।

কিন্তু তিনি দ্বার স্পর্শ করিবার পূর্বেই বাহির হইতে দ্বারের উপর প্রবল ধাক্কা পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু কণ্ঠের গর্জন উঠিল—

বহুকণ্ঠ: খোলো—দোর খোলো—ভেঙে ফেলো—

নীলাম্বর সভয়ে পিছাইয়া আসিলেন। আর পালাইবার পথ নাই, নিজের রচিত বেড়া-জালে তিনি ধরা পড়িয়াছেন। কোথাও লুকাইবার স্থানও নাই, আগুনের আলো চারিদিক দিনের মত করিয়া তুলিয়াছে।

সিঁড়ির উপর দুড়দাড় শব্দ করিয়া লক্ষ্মী ও ছেলের দল নামিয়া আসিতেছে। এদিকে সদর দরজায় ধাক্কার বেগ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে—মড়মড় শব্দ হইতেছে। তারপর হঠাৎ দরজার কবাট ভাঙিয়া সবসুদ্ধ ভিতরদিকে আছড়াইয়া পড়িল। একদল লোক হুড়মুড় করিয়া প্রবেশ করিল—তাহাদের সর্বাগ্রে মনোহর।

মনোহরের আর সে দীন বেশ নাই, তাঁহাকে দেখিয়া শিকরে বাজপক্ষী বলিয়া মনে হয়। তাঁহার সঙ্গে যে লোকগুলি আসিয়াছে তাহারা সকলেই তাঁহার ভূতপূর্ব কর্মচারী। হনুমান সিংও আছে!

কয়েকজনের হাতে লাঠি ছিল, তাহারা ছুটিয়া গিয়া লাঠি পিটাইয়া আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিল। মনোহরের শ্যেনচক্ষু পড়িল গিয়া নীলাম্বরের উপর। নীলাম্বর এক কোণে গুড়ি মারিয়া ছিলেন, মনোহর তাঁহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন—

মনোহর: ধর ঐ লোকটাকে—

হনুমান সিং প্রমুখ কয়েকজন নীলাম্বরকে ধরিতে গেল; নীলাম্বর কিন্তু সহজে ধরা দিতে প্রস্তুত নয়, কুক্কুর-তাড়িত শৃগালের মত আগুনের ফাঁকে ফাঁকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

লক্ষ্মী ইতিমধ্যে সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া সিঁড়ির শেষ ধাপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিছুক্ষণ নিস্পন্দ বিস্ময়ে মনোহরের পানে তাকাইয়া থাকিয়া হরিণীর মত প্লুতগতিতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে দু'হাতে জড়াইয়া ধরিল।

লক্ষ্মী: দাদু—দাদু—দাদু—

মনোহর তাহার দিকে একবার তাকাইলেন, তাঁহার চোখের দৃষ্টি একটু নরম হইল।

মনোহর: লক্ষ্মী! ছাড়, এখন অনেক কাজ। বিজয় কোথায়?

লক্ষ্মী উচ্চকিত হইয়া চাহিল।

লক্ষ্মীঃ কে—? কার কথা বলছ দাদু?

কিন্তু মনোহর তাহার কথার জবাব দিলেন না; কার্তিক আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে বলিলেন—

মনোহরঃ কার্তিক, শীগ্‌গির—ফায়ার ব্রিগেড—

কার্তিকঃ চিকা চিকা বুম্‌।

সে হাউইয়ের মত সাঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

কাট্‌।

রাস্তায় পরপারে ফায়ার ব্রিগেড স্তম্ভের কাচে ঢাকা গোলাকৃতি মুখে কার্তিক ছুটিয়া আসিয়া একটি ঘুষি মারিল। কাচ চুরমার হইয়া গেল; কার্তিক ভিতরে হাত ঢুকাইয়া প্রাণপণে হাতল ঘুরাইতে লাগিল।

কাট্‌।

অফিস ঘরের মধ্যে আবদ্ধ বিজয় পাগলের মত দরজা ভাঙিবার চেষ্টা করিতেছিল, চেয়ার তুলিয়া দরজার গায়ে আছাড় মারিতেছিল, কিন্তু দরজা অটুট দাঁড়াইয়াছিল। বাহিরের গোলমালে আওয়াজও কেহ শুনিতে পাইতেছিল না।

দোকানঘরে নীলাম্বর হনুমান সিংয়ের হাতে ধরা পড়িয়াছিলেন; হনুমান সিং তাঁহাকে বেড়াল ছানার মত প্রায় ঝুলাইতে ঝুলাইতে মনোহরের সম্মুখে লইয়া আসিল। নীলাম্বরের মুখে কালিঝুলি লাগিয়াছে, পরিধেয় বস্ত্র স্থানে স্থানে পুড়িয়া গিয়াছে, কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি। হনুমান তাঁহার ঘাড় ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিল—

হনুমানঃ লিজিয়ে সরকার—এহি আদ্‌মিঠো পাক্কা হারামি হ্যায়। হুকুম হো তো ইসকো আগমে ডাল দেগা।

মনোহরের কিন্তু নীলাম্বরকে শিক-কাবাব করিবার ইচ্ছা ছিল না, তিনি নীলাম্বরের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া প্রশ্ন করিলেন—

মনোহরঃ বিজয় কোথায়?

নীলাম্বর চমকিয়া উঠিলেন।

নীলাম্বরঃ অ্যাঁ—আমি, আমি—

মনোহরঃ তুমি নয়—বিজয় কোথায়?

নীলাম্বরঃ অ্যাঁ—বোধ হয়—ঐ ঘরে আছে।

লক্ষ্মী এতক্ষণ মনোহরের একটা হাত জড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মনোহর তাহাকে বলিলেন—

মনোহরঃ যা—দ্যাখ গিয়ে আছে কিনা—

লক্ষ্মী ছুটিয়া চলিয়া গেল।

বাহিরে দূরে ফায়ার ব্রিগেডের ঘণ্টার আওয়াজ শোনা গেল। নীলাম্বর অধর লেহন করিয়া মনোহরের পানে তাকাইলেন, তাঁহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিল, হয়তো বৃদ্ধের চোখে এখনও ধুলা দিতে পারিবেন।

নীলাম্বরঃ দেখুন—ঐ বিজয়ই দোকানে আগুন লাগিয়েছে—আমি—

মনোহরঃ বটে! তুমি কিছু জান না—

ইতিমধ্যে লক্ষ্মী দ্বারের শিকল খুলিয়া অফিস ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। বিজয় তখন একটা চেয়ার ঊর্ধ্বে তুলিয়া দরজার গায়ে আছড়াইবার উপক্রম করিতেছিল, আর একটু হইলেই চেয়ার লক্ষ্মীর মাথায় পড়িত। চেয়ার ফেলিয়া দিয়া বিজয় লক্ষ্মীকে সবলে জড়াইয়া ধরিল—

বিজয়ঃ লক্ষ্মী—!

লক্ষ্মীঃ তুমি—!

ওদিকে নীলাম্বর তখনও আশা ছাড়েন নাই, মনোহরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

নীলাম্বরঃ আমি জানতে পেরেছিলুম বিজয় আজ দোকানে আগুন দিতে আসবে—তাই—

মনোহরঃ তাই আমার হাতে চিঠি পাঠিয়েছিলে—চিনতে পারো আমাকে—?

চিনিতে পারিয়া নীলাম্বর প্রকাণ্ড হাঁ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা সদর দরজা দিয়া জলের একটা স্থূলধারা আসিয়া তাঁহার মুখে পড়িল। ফায়ার ব্রিগেড আসিয়া পোঁছিয়াছে।

ডিজল্ভ্।

এক ঘণ্টা পরের কথা। দোকানের আগুন নিভিয়াছে; চারিদিক জলে জলময়। মনোহর দোকান হইতে সকলকে বিদায় করিয়াছেন; কেবল তিনি আছেন, আর আছে লক্ষ্মী ও বিজয়।

একই অপরাধে ধৃত যুগ্ম আসামীর মত বিজয় ও লক্ষ্মী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন কঠোর বিচারকের মত রুদ্র গম্ভীর মুখ লইয়া মনোহর।

এক টিপ নস্য লইয়া মনোহর তীব্র সজল নেত্রে আসামীদ্বয়ের পানে চাহিলেন; লক্ষ্মীর বুক দুরদুর করিয়া উঠিল।

মনোহরঃ লক্ষ্মী!

লক্ষ্মীঃ (ভয়ে ভয়ে) দাদু?

মনোহরঃ তোর সঙ্গে এ ছোঁড়ার কী সম্পর্ক?

লক্ষ্মী একবার বিজয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল। বিজয় তখন একবার গলা ঝাড়া দিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল—

বিজয়ঃ আজ্ঞে আমি—

মনোহরঃ হ্যাঁ তুমি। আমার নাতনীর সঙ্গে তোমার এত ঘনিষ্ঠতা কিসের হে, যে রাতদুপুরে তার চিঠি পেয়ে চোরের মত আমার দোকানে ঢুকেছিলে?

লক্ষ্মীঃ (ব্যাকুলকণ্ঠে) দাদু, আমি তো—

মনোহরঃ চুপ। তোমার সাফাই পরে শুনব। আগে ও বলুক।—কী বলবার আছে তোমার? আমার নাতনীর সঙ্গে তোমার কী সম্বন্ধ?

বিজয় ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—

বিজয়ঃ লক্ষ্মী দেবী আমার অংশীদার।

মনোহর একেবারে অবাক হইয়া গেলেন; এ ধরনের উত্তর তিনি আদৌ প্রত্যাশা করেন নাই।

মনোহরঃ অ্যাঁ—অংশীদার! সে আবার কি?

বিজয়ঃ আজ্ঞে উনি দু'হাজার টাকা দিয়ে আমার অংশীদার হয়েছেন—লক্ষ্মী ভাণ্ডারের অর্ধেক মালিক উনি।

মনোহরঃ লক্ষ্মী, সত্যি এ কথা?

লক্ষ্মীঃ (অস্ফুট কণ্ঠে) হ্যাঁ দাদু—

বিজয়ঃ বিশ্বাস না করেন দলিল দেখাতে পারি।

মনোহর কিছুক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে এই অদ্ভুত যুবক যুবতীর পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর হঠাৎ মস্তক উৎক্ষিপ্ত করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মী ও বিজয় শঙ্কিত-মুখে পরস্পরের পানে চাহিয়া একটু ফিকা হাসিল।

হঠাৎ হাসি থামিল; মনোহর দু'পা আগাইয়া আসিয়া লক্ষ্মীকে বাঁ দিকে ও বিজয়কে ডান দিকে টানিয়া লইলেন। সকৌতুক স্নেহদৃষ্টিতে একবার ইহাকে একবার উহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—

মনোহরঃ বটে—তোমরা অংশীদার হয়েছ। তাই বুঝি দুপুর রাত্রে চুপি চুপি দেখা করবার দরকার হয়? তা—শুধুই অংশীদার না আর কোনও গণ্ডগোল আছে? আজকালকার তরুণ তরুণীরা শুনেছি চোখাচোখি হতে না হতেই প্রেমে পড়ে যায়, তোমাদের সেসব হাঙ্গামা নেই তো? যাক, বাঁচা গেল।

লক্ষ্মী দাদুর বুকে মুখ গুঁজিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—

লক্ষ্মীঃ দাদু, আমি—। যাও, তুমি তো বুঝতে পেরেছ।

মনোহরঃ হুঁ হুঁ—তাহলে শুধু ব্যবসার অংশীদার নয়, আরও বড় অংশীদার হবার চেষ্টায় আছ! কি হে ছোকরা, তোমার মতলব কি?

বিজয় হাত জোড় করিল।

বিজয়ঃ আজ্ঞে আপনি অনুমতি দিলেই—

মনোহর দৃঢ় বাহুবন্ধনে তাহাদের আরও কাছে টানিয়া লইলেন। গাঢ়স্বরে কহিলেন—

মনোহরঃ বেঁচে থাক্—সুখে থাক্। আমার বুড়ো বয়সের এতবড় ক্ষতিটা আজ তোরাই পূরণ করে দিলি। আমার আশা হয়েছে তোরা আমার কাজ বজায় রাখতে পারবি। এবার আমি তোদের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে কাশী যেতে পারব।

ফেড্ আউট্।

কানামাছি

ফেড্ ইন্।

রাত্রির কলিকাতা। মহানগরীর পথে পথে বিদ্যুদ্দীপালী। জ্বলন্ত চক্ষু মোটরের ছুটাছুটি। উচ্চাঙ্গের বিলাতী হোটেলে যৌথ-নৃত্য। রেডিও যন্ত্রে গগনভেদী সংগীত। কোনও নবাগত দর্শক দেখিয়া শুনিয়া মনে করিতে পারেন না যে নগরের একটা অন্ধকার দিকও আছে।

আকাশে শুক্লা তিথির চাঁদ; তাহারও অর্ধেক উজ্জ্বল, অর্ধেক অন্ধকার।

কলিকাতার পথে-বিপথে সঞ্চরণ করিয়া শেষে একটি অপেক্ষাকৃত নির্জন অভিজাত পল্লীতে আসিয়া উপনীত হওয়া যায়। এ অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক বাড়ি পাঁচিল দিয়া ঘেরা, আপন আপন ঐশ্বর্যবোধের গর্বে পরস্পর হইতে দূরে দূরে অবস্থিত।

একটি পাঁচিল-ঘেরা বাড়ির ফটক। ফটক না বলিয়া সিংদরজা বলিলেই ভাল হয়। লোহার গরাদযুক্ত উচ্চ দরজার সম্মুখে গুর্খা দরোয়ান গাদা বন্দুক কাঁধে তুলিয়া ধীর গম্ভীর পদে পায়চারি করিতেছে। গরাদের ফাঁক দিয়া অভ্যন্তরের বৃহৎ দ্বিতল বাড়ি দেখা যাইতেছে; বাড়ি ও ফটকের মধ্যবর্তী স্থান নানা জাতীয় ফুলগাছ ও বিলাতী পাতা-বাহারের ঝোপ-ঝাড়ে পরিপূর্ণ। একটি কঙ্করাকীর্ণ পথ ফটক হইতে গাড়িবারান্দা পর্যন্ত গিয়া আবার চক্রাকারে ফিরিয়া আসিয়াছে।

ফটকের একটি স্তম্ভে পিতলের ফলকে খোদিত আছে—

শ্রীযদুনাথ চৌধুরী
জমিদার—হুতুমগঞ্জ

সিংদরজা উত্তীর্ণ হইয়া বাড়ির সম্মুখীন হইলে দেখা যায়, গাড়িবারান্দার নীচে ভারী এবং মজবুত সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ রহিয়াছে।

কাট্।

সদর দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে সম্মুখেই পড়ে একটি আলোকোজ্জ্বল বড় হল-ঘর। ঘরের মধ্যস্থলে একটি গোল টেবিল; তাহার উপর টেলিফোন। টেবিলের চারিদিকে কয়েকটি চেয়ার। সম্মুখের দেয়ালে একটি বৃহৎ 'ঠাকুর্দা-ঘড়ি'। তাছাড়া অন্যান্য আসবাব-পত্রও আছে।

বাঁ দিকের দেয়ালে সারি সারি তিনটি ঘরের দ্বার। প্রথমটি ভোজনকক্ষ, দ্বিতীয়টি গৃহস্বামীর শয়নকক্ষ; তৃতীয়টি ঠাকুর-ঘর। ডান দিকে দুইটি ঘর; লাইব্রেরী ও ড্রয়িংরুম। পিছনের দেয়াল ঘেঁষিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি।

হল-ঘরে কেহ নাই। কিন্তু ভোজনকক্ষ হইতে মানুষের কণ্ঠস্বর আসিতেছে। সুতরাং সেদিকে যাওয়া যাইতে পারে।

ভোজনকক্ষ। দেশী প্রথায় মেঝেয় আসন পাতিয়া ভোজনের ব্যবস্থা। কিন্তু ঘরে একটি বড় ফ্রিজিডেয়ার ও কয়েকটি জালের দ্বারযুক্ত আলমারি আছে। মেঝেয় পাশাপাশি তিনটি আসন পাতা। মাঝের আসনটিতে বসিয়া বাড়ির কর্তা যদুনাথবাবু আহার করিতেছেন। দুই দিকের আসন দুইটি খালি; তবে আসনের সম্মুখে থালায় খাদ্যদ্রব্যাদি সাজানো রহিয়াছে।

যদুনাথের অনূঢ়া নাতিনী নন্দা সম্মুখে বসিয়া আহার পরিদর্শন করিতেছে এবং মাঝে মাঝে কোনও বিশেষ ব্যঞ্জনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। সেই সঙ্গে দুই চারটি কথা হইতেছে। বাড়ির সাবেক ভৃত্য সেবকরাম এক ঝারি জল ও তোয়ালে লইয়া দ্বারের কাছে বসিয়া আছে। সেও কথাবার্তায় যোগ দিতেছে।

যদুনাথবাবুর বয়স অনুমান সত্তর; আকৃতি শীর্ণ এবং কঠোর; সহজ কথাও রূক্ষ ভাবে

বলেন। একদিকে যেমন ঘোর নীতিপরায়ণ অন্যদিকে তেমনি ছেলেমানুষ; তাই তাঁহার ব্যবহার কখনও সম্ভ্রম উৎপাদন করে, আবার কখনও হাস্যরসের উদ্রেক করে। শরীর বাতে পঙ্গু তাই সচরাচর লাঠি ধরিয়া চলাফেরা করেন। বর্তমানে লাঠি তাঁহার আসনের পাশে শয়ান রহিয়াছে।

নন্দার বয়স আঠারো উনিশ। সে একাধারে সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী, স্নেহময়ী ও তেজস্বিনী। বাড়িতে পড়িয়া আই-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এই নাতিনী ও এক নাতি ছাড়া যদুনাথের সংসারে আর কেহ নাই।

সেবক বয়সে বৃদ্ধ; সম্ভবত যদুনাথের সমবয়স্ক। কিন্তু তাহার ছোটখাটো ক্ষীণ দেহটি পঞ্চাশ বছরে আসিয়া আটকাইয়া গিয়াছে, আর অধিক পরিণতি লাভ করে নাই।

ছাড়া ছাড়া কথাবার্তা চলিতেছে।

নন্দাঃ দাদু, অন্য জিনিস খেয়ে পেট ভরিয়ে ফেলো না, আমি নিজের হাতে তোমার জন্যে পুডিং তৈরি করেছি।

যদুনাথ গলার মধ্যে একটা শব্দ করিলেন। নন্দা গিয়া ফ্রিজিডেয়ার হইতে পুডিংএর পাত্রটি আনিয়া আবার বসিল।

সেবকঃ বাবু, ছ্যাকড়াগাড়িবাবুকে তাড়িয়ে দিলে কেন? কী করেছিলেন তিনি?

নন্দাঃ হ্যাঁ, ভুবনবাবুকে ছাড়িয়ে দিলে কেন দাদু? সেক্রেটারির কাজ তো ভালই করছিলেন।

যদুনাথ কিছুক্ষণ নীরবে আহার করিয়া চক্ষুযুগল তুলিলেন।

যদুনাথঃ ভুবন মিছে কথা বলেছিল। আমার কাছে মিথ্যে কথা! হতভাগা! ভেবেছিল আমার চোখে ধুলো দেবে।

যদুনাথ আবার আহারে মন দিলেন। নন্দা ও সেবক একবার চকিত শঙ্কিত দৃষ্টি বিনিময় করিল। সেবকের মুখের ভাব দেখিয়া মনে হয়, সে মনে মনে বলিতেছে—কর্তা যদি আমাদের মিছে কথা জানতে পারেন তাহলে কি করবেন! নন্দা অস্বস্তিপূর্ণ মুখে একটু হাসিবার চেষ্টা করিল।

নন্দাঃ তা একটু-আধটু মিছে কথা কে না বলে? ভুবনবাবু কি—টাকাকড়ি গোলমাল করেছিলেন?

যদুনাথঃ না, কিন্তু করতে কতক্ষণ? যে-লোক মিছে কথা বলতে পারে, সে চুরিও করতে পারে। এরকম লোককে বাড়িতে রাখা যেতে পারে না। যদি আমার সূর্যমণি চুরি করে! তখন আমি কি করব?

নন্দাঃ কী যে বল দাদু! ঠাকুর-ঘরের তালা ভেঙে সূর্যমণি চুরি করবে এত সাহস কারুর নেই।

যদুনাথঃ তবু সাবধানের মার নেই। চুরিই বলো আর মিথ্যে কথাই বলো, সব এক জাতের। যার মিথ্যে কথা একবার ধরা পড়েছে, আমার বাড়িতে তার ঠাঁই নেই।

নন্দাঃ সে যেন হ'ল। কিন্তু তোমার তো একজন সেক্রেটারি না হ'লে চলবে না। তার কী হবে?

যদুনাথঃ এবার খুব দেখে শুনে বাছাই ক'রে সেক্রেটারি রাখব।

নন্দাঃ বাছাই ক'রে—

যদুনাথঃ হ্যাঁ, এবার কাগজে বিজ্ঞাপন দেব—'ঠিকুজি-কোষ্ঠি সহ আবেদন করহ।' যারা দেখা করতে আসবে তাদের ঠিকুজি আন্‌তে হবে। ঠিকুজি পরীক্ষা ক'রে যদি দেখি লোকটা ভাল, চোর-বাটপাড় নয়, মিথ্যেবাদী নয়, তবেই তাকে রাখব। আর চালাকি চলবে না।

নন্দার ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলিয়া গেল। সেবক গলা খাঁকারি দিল।

সেবকঃ ঠিকুজি কোষ্ঠির কথায় মনে পড়ল, আমার দিদিমণির ঠিকুজি কোষ্ঠি কী বলে? আর কতদিন বই পড়বে? ওনার বিয়ে-থা কি হবে না?

নন্দা ঠোঁটের উপর আঁচল চাপা দিল।

যদুনাথঃ নন্দার কোষ্ঠি অনেকদিন দেখিনি, কাল দেখব!—নন্দা, তুই খেতে বসলি না?

নন্দাঃ আমার তাড়া নেই। দাদা আসুক, দু'জনে একসঙ্গে খাব।

যদুনাথ পাশের আসনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুখ তুলিলেন।

যদুনাথঃ মন্মথ এখনও ফেরেনি?

এই সময় পাশের হল-ঘরে ঠং ঠং করিয়া ন'টা বাজিতে আরম্ভ করিল।

নন্দাঃ (হাল্‌কাভাবে) এই তো সবে ন'টা বাজল। দাদা দশটার আগেই ফিরবে।

যদুনাথ কিছুক্ষণ উদ্বিগ্ন চক্ষে নন্দার পানে চাহিয়া রহিলেন।

যদুনাথঃ আমি ন'টার সময় শুয়ে পড়ি, ডাক্তারের হুকুম; মন্মথ কখন বাড়ি ফেরে জানতে পারি না। ঠিক দশটার আগে ফেরে তো? দশটার পর আমার বাড়ির কেউ বাইরে থাকে আমি পছন্দ করি না।

নন্দার সহিত সেবকের আর একবার চকিত দৃষ্টি বিনিময় হইল।

সেবকঃ আজ্ঞে বাবু, কোনও দিন দাদাবাবুর দশটা বেজে এক মিনিট হয় না, ঠিক দশটার আগে এসে হাজির হয়।

যদুনাথঃ হুঁ। কিন্তু এত রাত্রি পর্যন্ত থাকে কোথায়? করে কি?

নন্দাঃ কী আর করবে, বন্ধুদের সঙ্গে ব্রিজ খ্যালে, না হয় ক্লাবে গিয়ে বিলিয়ার্ড খ্যালে—এই আর কি।

যদুনাথঃ তা তাস-পাশা খ্যালে খেলুক। বিয়ের ছ'মাস যেতে না যেতে নাতবৌ মারা গেলেন, ওর মনে খুবই লেগেছে: তাই আমি আর বেশি কড়াকড়ি করি না। খেলাধুলোয় যদি মন ভাল থাকে তো থাক। কিন্তু দশটার পর বাড়ির বাইরে থাকার কোনও ওজুহাতই থাকতে পারে না। যারা বাইরে থাকে তারা বজ্জাৎ দুশ্চরিত্র।

নন্দাঃ না দাদু, দাদা ঠিক সময়ে বাড়ি ফেরে।

সেবকঃ ঘরে বৌ থাকলে আরও সকাল সকাল বাড়ি ফিরত। কথায় বলে ঘর না ঘরণী। বাবু, এবার তাড়াতাড়ি দাদাবাবুর নতুন বিয়ে দাও: দেখবে ঘর ছেড়ে আর বেরুবে না।

যদুনাথঃ আমার কি অনিচ্ছে! কিন্তু একটা বছর না কাটলে লোকে বলবে কি!—দে, হাতে জল দে।

সেবক হাতে জল ঢালিয়া দিল, যদুনাথ ভোজন পাত্রের উপরেই মুখ প্রক্ষালন করিয়া লাঠি হাতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

যদুনাথঃ সেবক, বাড়ির দোর-জানলা সব বন্ধ হয়েছে কি না ভাল ক'রে দেখে নিবি।

সেবকঃ আজ্ঞে—

ভোজনকক্ষ হইতে হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া যদুনাথ ঠাকুর-ঘরের দিকে চলিলেন; নন্দা ও সেবক তাঁহার পিছনে চলিল। ঠাকুর-ঘরের দ্বারে একটি বড় তালা ঝুলিতেছিল, যদুনাথ কোমর হইতে চাবির থোলো লইয়া দ্বার খুলিলেন।

দেখা গেল ঠাকুর-ঘরে দুইটি ঘৃত-প্রদীপ জ্বলিতেছে। ঘরের মধ্যস্থলে রূপার সিংহাসনের উপর একটি সোনার থালা খাড়া ভাবে রাখা রহিয়াছে; থালার মাঝখানে চাকার নাভি-কেন্দ্রের মত একটি প্রকাণ্ড মাণিক্য আরক্ত প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে। ইহাই অমূল্য সূর্যমণি; ইহাই যদুনাথের বংশানুক্রমিক গৃহ-দেবতা।

যদুনাথ দ্বারের সম্মুখে জোড়হাতে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিলেন।

যদুনাথঃ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরম্।

যদুনাথের পশ্চাতে নন্দা ও সেবক যুক্ত কর কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। তারপর যদুনাথ আবার দ্বারে তালা লাগাইলেন।

শয়নকক্ষের দ্বার পর্যন্ত ফিরিয়া আসিয়া যদুনাথ সেবককে বলিলেন—

যদুনাথঃ সেবক, লাইব্রেরীতে 'উড়ুদায় প্রদীপ' বইখানা আছে, এনে দে—বিছানায় শুয়ে পড়ব।

যদুনাথ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেবক নন্দার মুখের পানে চাহিয়া কয়েকবার চক্ষু

মিটিমিটি করিল।

সেবকঃ উড়ু উড়ু পিদ্দিম—সে আবার কি বই দিদিমণি?

নন্দাঃ (হাসিয়া) উড়ুদায় প্রদীপ—একখানা জ্যোতিষের বই। আয় দেখিয়ে দিচ্ছি।

দুইজনে হল-ঘরের অপর প্রান্তে লাইব্রেরীর দিকে চলিল।

লাইব্রেরী ঘর। একটি বড় টেবিল, কয়েকটি গদিমোড়া চেয়ার। অনেকগুলি আলমারিতে অসংখ্য পুস্তক সাজানো। নন্দা টেবিলের উপর হইতে উড়ুদায় প্রদীপ লইয়া সেবককে দিল।

নন্দাঃ এই নে।—আর দ্যাখ সেবক, দাদার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে দে, বাবু যে কখন ফিরবেন তার তো কিছু ঠিক নেই, এগারোটাও হ'তে পারে—বারোটাও হ'তে পারে।

সেবকঃ হুঁ। এদিকে কর্তার কাছে মিছে কথা ব'লে ব'লে আমাদের জিভ তেউড়ে গেল। কোথায় যায় বল দিকি? কি করে এত রাত অব্দি?

নন্দাঃ জানিনে বাপু। ভাবতেও ভাল লাগে না। দাদু যদি জানতে পারেন অনর্থ হবে। কিন্তু সে হুঁশ কি দাদার আছে?—যাক গে ও কথা, সেবক—তোকে আর একটা কাজ করতে হবে। তুই নিজের খাওয়া দাওয়া সেরে আমার খাবার ওপরে আমার ঘরে দিয়ে আসিস, লক্ষ্মীটি। এখন খেলে ঘুম পাবে, পড়াশুনা হবে না। এদিকে শিরে সংক্রান্তি, এক্‌জামিন এসে পড়েছে।

সেবকঃ ঐ তো! রাত জেগে জেগে বই পড়ছ, এদিকে বিয়ের নামটি নেই। থুবড়ো মেয়ে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

নন্দাঃ (মুখ টিপিয়া হাসিয়া) আচ্ছা—হয়েছে—

দু'জনে লাইব্রেরী হইতে বাহির হইল। নন্দা সিঁড়ি দিয়া উপরে গেল; সেবক বই লইয়া যদুনাথের ঘরের দিকে গেল।

কাট্‌।

বাড়ির দ্বিতল। একটি লম্বা বারান্দার দুই পাশে দুই সারি ঘর। একটি ঘর নন্দার; তাহার সম্মুখেরটি মন্মথর। অন্য ঘরগুলি প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহৃত হয়।

নন্দা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল এবং নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার ঘরটি বেশ বড়, একটু লম্বাটে ধরনের। এক দিকে খাট বিছানা; অন্যদিকে পড়ার টেবিল, বই রাখার চর্কি আলমারি ইত্যাদি। মাঝখানে একটি আয়নার কবাটযুক্ত বড় ওয়ার্ডরোব। ঘরটি মেয়েলি হাতের নিপুণতার সহিত পরিপাটি ভাবে সাজানো।

নন্দা প্রথমে গিয়া বাহিরের দিকের জানালা খুলিয়া দিল। দ্বিতলের জানালা, তাই গরাদ নাই। বাহিরের অস্ফুট জ্যোৎস্না ঘরে প্রবেশ করিল। নন্দা জানালায় দাঁড়াইয়া অলস হস্তে কানের দুল খুলিতে লাগিল। তারপর দুল দুটি ওয়ার্ডরোবে রাখিয়া দিয়া সে পড়ার টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; টেবিলের উপর একটি পড়ার আলো ছিল, তাহা জ্বালিয়া দিল।

টেবিলে একটি বই খোলা অবস্থায় উপুড় করা ছিল; মলাটের উপর তাহার নাম দেখা গেল—রঘুবংশম্‌। নন্দা চেয়ারে বসিল; ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বইটি তুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

হল-ঘরের ঘড়িতে দশটা বাজিতে পাঁচ মিনিট। ঘরের আলো নিষ্প্রভ; মাত্র একটা বাল্‌ব জ্বলিতেছে।

যদুনাথ শয্যায় শয়ন করিয়া বই পড়িতেছিলেন, আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িলেন। চাবির গোছা তাঁহার বালিশের পাশে ছিল, তাঁহার একটা হাত তাহার উপর ন্যস্ত হইল।

কাট্‌।

নন্দা নিজের ঘরে বসিয়া রঘুবংশ পড়িতেছে।
নন্দাঃ সা দুষ্প্রধর্ষা মনসাপি হিংস্রৈঃ—
ভেজানো দরজার বাহির হইতে সেবকের কণ্ঠস্বর আসিল—
সেবকঃ দিদিমণি, তোমার খাবার এনেছি—
নন্দাঃ নিয়ে আয়।
সেবক দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং চরকি আলমারির উপর খাবারের থালা রাখিল।
সেবকঃ দশটা বাজল, এখনও ছোট কর্তার দেখা নেই! আচ্ছা, রোজ রোজ এ কি ব্যাপার দিদিমণি? তুমি কিছু বলতে পার না?
নন্দাঃ হাজার বার বলেছি। রোজই বলে—আজ আর দেরি হবে না। কি করব বল?
সেবকঃ হুঁ। যাই, দোরের কাছে বসে থাকিগে। দোর খুলে দিতে হবে তো। কিন্তু এসব ভাল কথা নয়, মোটেই ভাল কথা নয়—
দ্বার ভেজাইয়া দিয়া সেবক চলিয়া গেল। নন্দা কিছুক্ষণ উদ্বিগ্ন চক্ষে শূন্যে তাকাইয়া রহিল, তারপর বই টানিয়া লইয়া আবার পড়ায় মন দিল।

কাট্‌।

সেবক নীচে নামিয়া আসিয়া ভোজনকক্ষে গেল। আসনের সম্মুখে থালায় খাবার সাজানো ছিল, সেবক একটা জালের ঢাক্‌নি দিয়া তাহা ঢাকা দিয়া রাখিল। হল-ঘরে ফিরিয়া সদর দরজা সন্তর্পণে খুলিয়া একবার বাহিরে উঁকি মারিল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া দরজা ভেজাইয়া দরজায় পিঠ দিয়া বসিল।

ওয়াইপ্‌।

লিলি নাম্নী এক নর্তকীর ড্রয়িংরুম।
লিলি আধুনিকা নর্তকী। বয়স আন্দাজ ত্রিশ, কিন্তু ঠাটঠমক ও প্রসাধনের চাকচিক্যে নবযৌবনের বিভ্রম এখনও বজায় রাখিয়াছে। আজ রাত্রি দশটার সময় সে পিয়ানোতে বসিয়া গান গাহিতেছে এবং মন্মথ গদগদ মুখে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছে। মন্মথর বয়স ছাব্বিশ, বুদ্ধি-সুদ্ধি বেশি নাই, সে বিলাতী পোশাক পরিতে এবং বড়মানুষী দেখাইতে ভালবাসে।
লিলি ও মন্মথ ছাড়া ঘরে আরও দুইটি লোক রহিয়াছে—দাশু এবং ফটিক। ইহারা লিলির দলের লোক। দাশু মোটা লম্বা, ফটিক রোগা বেঁটে; দুজনেরই সাজপোশাক বাবুয়ানির পরিচায়ক, যেন তাহারাও বড়লোকের ছেলে। আসলে তাহারা ভদ্রবেশী জুয়াচোর; লিলির সাহায্যে বড়মানুষের ছেলে ফাঁসাইয়া শোষণ করা তাহাদের পেশা। বর্তমানে তাহারা যেন লিলির প্রণয়াকাঙ্ক্ষী এবং মন্মথর প্রতিদ্বন্দ্বী—এইরূপ অভিনয় করিতেছে।
লিলি গাহিতেছে—
লিলিঃ কেন পোহায় বলো সুখ-ফাগুন-নিশা
বঁধু না মিটিতে বুকে প্রেমতৃষা।
নব-যৌবন টলমল গো
চল চঞ্চল গো
চ'লে যায়—রহে না—
তার ত্বর্‌ সহে না—
চোখে বিজলী হানে কালো-কাজল-দৃশা।
ফুলের বুকে আছে এখনও মধু,

আছে অরুণ হাসি অধরে, বঁধু,—
এস ধরিয়া রাখি—তারে ধরিয়া রাখি।
যেন পোহায় না গো সুখ-ফাগুন-নিশা।

গান শেষ হইলে মন্মথ সানন্দে করতালি দিয়া উঠিল।

মন্মথঃ ওয়াণ্ডারফুল! ওয়াণ্ডারফুল!

লিলিঃ ধন্যবাদ মন্মথবাবু। এই গানটা আমার নতুন নাচের সঙ্গে গাইব। ভলে হবে না?

মন্মথঃ চমৎকার হবে। নাচও তৈরি করেছেন নাকি?

লিলিঃ হ্যাঁ। দেখবেন?

লিলি উঠিয়া দাঁড়াইল। মন্মথ বক্রচক্ষে দাশু ও ফটিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

মন্মথঃ আজ থাক। আর একদিন দেখব।

দাশু মুখ হইতে সিগার হাতে লইয়া হাসিল।

দাশুঃ হে হে—আমি আগেই দেখেছি।

ফটিকঃ আমিও—হে হে।

মন্মথ ভর্ৎসনা-ভরা চোখে লিলির পানে তাকাইল।

মন্মথঃ ওঁদের আগেই দেখিয়েছেন! তা—বেশ। আমার দেখার কী দরকার? আমি নাচের কী বা বুঝি?

প্রস্থানোদ্যত মন্মথকে হাত ধরিয়া লিলি থামাইল।

লিলিঃ রাগ করছেন কেন, মন্মথবাবু? ওঁরা সেদিন জোর ক'রে ধরলেন, না দেখে ছাড়লেন না। নইলে আপনাকেই তো আগে দেখাবার ইচ্ছে ছিল। বসুন, আজই আপনাকে নাচ দেখাব।

লিলি মন্মথকে ধরিয়া বসাইল। দাশু ফটিকের পানে চাহিয়া চোখ টিপিল। মন্মথ সন্তুষ্ট হইল বটে কিন্তু নিজের হাত-ঘড়ির দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠিত হইল।

মন্মথঃ আজ! কিন্তু আজ বড় দেরি হয়ে গেছে—

লিলিঃ কোথায় দেরি, এই তো সবে দশটা। ফটিকবাবু, ঘরের মাঝখান থেকে টেবিল চেয়ারগুলো সরিয়ে নিন দেখি।

কিন্তু মন্মথ তথাপি ইতস্তত করিতে লাগিল।

মন্মথঃ আজ থাক, মিস লিলি। কাল আমি সকাল সকাল আসব। কাল হবে।

দাশু হাসিয়া উঠিল।

দাশুঃ ওঁকে আজ ছেড়েই দিন, মিস লিলি। বাড়ি ফিরতে দেরি হ'লে হয়তো ঠাকুর্দার কাছে বকুনি খাবেন।

মন্মথ ক্রুদ্ধ চোখে তাহার পানে চাহিল।

মন্মথঃ মোটেই না—আসুন মিস লিলি, আজ আপনার নাচ দেখে বাড়ি যাব।

তখন দাশু ও ফটিক উঠিয়া আসবাবপত্র দেয়ালের দিকে সরাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল, লিলি শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া নাচিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

লিলিঃ আপনাকে কিন্তু বাজাতে হবে, মন্মথবাবু। সুরটা তো শুনলেন, ফলো করতে পারবেন?

মন্মথঃ নিশ্চয়।

সে মিউজিক টুলে বসিল।

যদুনাথের হল-ঘর। ঘড়িতে সওয়া এগারোটা বাজিয়াছে।

সেবক পূর্ববৎ দরজায় ঠেস দিয়া বসিয়া আছে, তাহার মাথাটি হাঁটুর উপর নত হইয়া আছে।

কাট্।

উপরের ঘরে নন্দা পড়িতেছে। তাহার চক্ষু ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছে। সে একটা হাই তুলিল; তারপর ঈষৎ সজাগ হইয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

নন্দাঃ অমুং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুম্‌—

কাট্।

বাড়ির ফটকের সম্মুখ। গুর্খা দরোয়ান এখন আর পায়চারি করিতেছে না, ফটকের পাশে একটি টুলের উপর খাড়া বসিয়া আছে, দুই হাঁটুর মধ্যে বন্দুক। কিন্তু তাহার চক্ষুদুটি মুদিত।

কাট্।

বাগানের অভ্যন্তর; অপরিস্ফুট জ্যোৎস্নায় ঈষদালোকিত।

একটি মানুষ বাহিরের দিক হইতে পাঁচিলের উপর উঠিয়া বসিল; সতর্কভাবে এদিক ওদিক তাকাইয়া বাগানের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। লোকটির চেহারা শীর্ণ, মুখে কয়েক দিনের গোঁফ-দাড়ি, গায়ে ছিন্ন-মলিন কামিজ। চেহারা ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহাকে ছিঁচকে চোর বলিয়া মনে হয়।

লঘু ক্ষিপ্রপদে চোর বাড়ির দিকে চলিল; আঁকাবাঁকা ভাবে এক ঝোপ হইতে অন্য ঝোপে গিয়া ছায়ামূর্তির মত সদর দরজার দিকে অগ্রসর হইল। শেষে বাড়ির গাড়িবারান্দার পাশে একটা জুঁই ফুলের ঝাড়ের পিছনে গিয়া লুকাইল।

কাট্।

হল-ঘরের ভিতরে সেবক দরজায় ঠেস দিয়া ঘুমাইতেছে।

ঘড়িটা ঠং করিয়া বাজিয়া উঠিতেই সেবক চমকিয়া মাথা তুলিল। সাড়ে এগারোটা! সে উদ্বিগ্ন মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কাট্।

দ্বারের বাহিরে চোর জুঁই ঝোপের আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছিল, দ্বার খোলার শব্দে সে আবার লুকাইয়া পড়িল।

অর্ধ-উন্মুক্ত দ্বারপথে সেবকের মুণ্ড দেখা গেল। সে ফটকের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর মুণ্ড টানিয়া লইয়া আবার দ্বার ভেজাইয়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে চোর ঝোপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল; নিঃশব্দে দ্বারের কাছে গিয়া কবাটে কান লাগাইয়া শুনিতে লাগিল।

কাট্।

দ্বারের অপর পারে সেবক চিন্তিতমুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে—এখনও বাবুর ইয়ার্কি দেওয়া শেষ হইল না! গলার মধ্যে একটা শব্দ করিয়া সে দ্বারের হুড়কা লাগাইবার উদ্যোগ করিল, তারপর কি ভাবিয়া হুড়কা না লাগাইয়াই পা টানিয়া টানিয়া আবার সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

সেবকের পদশব্দ উপরে মিলাইয়া গেলে, সদর দরজা বাহিরের চাপে একটু খুলিয়া

গেল। চোরের মাথা সেই ফাঁক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া ক্ষিপ্র চকিত দৃষ্টিতে একবার চারিদিক দেখিয়া লইল, তারপর চোরের শরীরও ভিতরে প্রবেশ করিল। পিছনে দরজা ভেজাইয়া দিয়া চোর ক্ষণকাল সমস্ত শরীর শক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর বিড়াল-পদক্ষেপে যদুনাথের শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হইল।

যদুনাথের দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া চোর উৎকর্ণভাবে শুনিল; ভিতর হইতে যদুনাথের মন্দ্রগভীর নাসিকাধ্বনি আসিতেছে। চোর তখন আরও কয়েক পা আগাইয়া গিয়া ঠাকুর-ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল; ঝুঁকিয়া দেখিল দ্বারে ভারী তালা ঝুলিতেছে।

কাট্।

উপরে নন্দার দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া সেবক নন্দাকে বলিতেছে—

সেবক: তুমি আর কতক্ষণ জেগে থাকবে? খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়।

নন্দা: এত দেরি তো দাদা কোনও দিন করে না! কী হ'ল আজ? না, আমি জেগে থাকব। আজ ফিরুক না, খুব ব'কবো।

সেবক: ব'কে আর কি হবে দিদিমণি, চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। ও জানে আমরা তো আর ওকে কর্তার কাছে ধরিয়ে দিতে পারব না, তাই ওর অত বুকের পাটা।

সেবক আবার নীচে নামিয়া আসিল।

কাট্।

নীচে চোর ঠাকুর-ঘরের তালাটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া চমকিয়া খাড়া হইল। সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছিবার আর সময় নাই, চোর ভোজন-কক্ষের দ্বার খুলিয়া সুট করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

সেবক নীচে নামিয়া আসিয়া চোরকে দেখিতে পাইল না, কেবল দেখিল ভোজনকক্ষের দরজা একটু ফাঁক হইয়া আছে। সে ভাবিল, হয়তো বিড়াল ঢুকিয়াছে, কিম্বা মন্মথ তাহার অবর্তমানে ফিরিয়া আসিয়া আহারে বসিয়াছে। সে গিয়া দ্বারের নিকট হইতে ভিতরে উঁকি মারিল কিন্তু বিড়াল কিম্বা মন্মথকে দেখিতে পাইল না; মন্মথর খাবার যেমন ঢাকা ছিল তেমনি ঢাকা আছে। সেবক তখন দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল লাগাইয়া দিল, তারপর আবার সদর দরজার সম্মুখে গিয়া বসিল।

ভোজনকক্ষে চোর একটা আলমারির পাশে লুকাইয়াছিল। শিকল লাগানোর শব্দ তাহার কানে গিয়াছিল, সে সশঙ্ক মুখে বাহির হইয়া আসিল; সন্তর্পণে দ্বার টানিয়া দেখিল নির্গমনের পথ বন্ধ, খাঁচার মধ্যে ইঁদুরের মত সে ধরা পড়িয়াছে। চোরের চক্ষু ভয়ে বিস্ফারিত হইল; সে ছুটিয়া গিয়া জানালা খুলিল। কিন্তু জানালায় মোটা মোটা লোহার গরাদ লাগানো; উপরন্তু ঘরের উজ্জ্বল আলো জানালা পথে বাহিরে যাইতেছে, কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। চোর তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া দিল; তারপর হতাশ-ভাবে দেয়ালে ঠেস দিয়া ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে আঙুল চালাইতে লাগিল।

কাট্।

আপন শয়নকক্ষে নন্দা পড়িতে পড়িতে বইয়ের উপর ঢুলিয়া পড়িতেছিল। একবার বইয়ের উপর মাথা ঠুকিয়া যাইতে তাহার ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল। সে উঠিয়া দ্বারের কাছে গেল, দ্বার খুলিয়া কিছুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিল। নীচে সাড়াশব্দ নাই। নন্দা তখন বইখানা তুলিয়া লইয়া পায়চারি করিতে করিতে পড়া মুখস্থ করিতে লাগিল।

নন্দা: একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বম্—

কাট্।

ভোজনকক্ষে চোর পূর্ব্ববৎ দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার হতাশ বিভ্রান্ত চক্ষু ইতস্তত ঘুরিতে ঘুরিতে মন্মথর খাবারের উপর গিয়া স্থির হইল। সে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর গিয়া ঢাকা খুলিয়া দেখিল।

খাবার দেখিয়া চোরের মুখে ক্লিষ্ট হাসির মতন একটা ভঙ্গিমা ফুটিয়া উঠিল। সে আসনে বসিল, গেলাস চল্‌কাইয়া হাত ধুইল, তারপর থালার দিকে হাত বাড়াইল। তাহার মনের ভাব, যদি ধরা পড়িতেই হয় শূন্য উদরে ধরা পড়িয়া লাভ কি?

কাট্।

ফটকের সম্মুখ। গুর্খা দরোয়ান টুলের উপর খাড়া বসিয়া ঘুমাইতেছে। মন্মথ রাস্তার দিক হইতে আসিয়া তাহার কাঁধে টোকা মারিল। গুর্খা সটান উঠিয়া স্যালুট করিল, তারপর চাবি বাহির করিয়া ফটক খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

গুর্খা: ক' ঘড়ি ব্যজা হ্যায় সরকার?

মন্মথ হাতের ঘড়ি দেখিবার ভান করিল।

মন্মথ: পৌনে দশটা।

গুর্খা: জি সরকার।

মন্মথ ভিতরে প্রবেশ করিল। গুর্খা আবার ফটকে তালা লাগাইল।

কাট্।

হল-ঘরে সেবক হাঁটুতে মাথা রাখিয়া বসিয়া আছে। সদর দরজায় মৃদু টোকা পড়িতেই সে উঠিয়া দ্বার অল্প খুলিল। মন্মথ পাশ কাটাইয়া প্রবেশ করিল।

সেবক কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া মন্মথর একটা হাত চাপিয়া ধরিল, চাপা গলায় বলিল—

সেবক: চল কর্তার কাছে। তিনি জেগে ব'সে আছেন।

মন্মথ ভয়ে পিছু হটিল।

মন্মথ: অ্যাঁ।—দাদু জেগে!—

সেবকের মুখে একটু হাসির আভাস দেখিয়া সে থামিয়া গেল; বুঝিতে পারিল সেবক মিথ্যা ভয় দেখাইতেছে। সে বিরক্ত হইয়া বলিল—

মন্মথ: দ্যাখ সেবক, এত রাত্রে ইয়ার্কি ভাল লাগে না।—নে জুতো খোল—

সেবক নত হইয়া তাহার জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল; মন্মথ ইতিমধ্যে কোট ও গলার টাই খুলিয়া ফেলিল।

সেবক: এবারটা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ফের যদি দেরি করেছ—

সেবক উঠিয়া কোট ও টাই মন্মথর হাত হইতে লইল।

সেবক: যাও, খেয়ে নাও গে। শুধু ইয়ার্কিতে পেট ভরে না।

ঘরের এক কোণে একটা আলনা ছিল, সেবক জুতা কোট প্রভৃতি লইয়া সেই দিকে রাখিতে গেল। মন্মথ পা টিপিয়া টিপিয়া ভোজনকক্ষের দিকে চলিল।

ভোজনকক্ষে চোর আসনে বসিয়া আহার আরম্ভ করিয়াছে এমন সময় হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল। চোর চমকিয়া দেখিল এক ব্যক্তি দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া!

মন্মথ একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে তাহার খাদ্য আত্মসাৎ করিতে দেখিয়া ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তারপর চীৎকার করিয়া উঠিল—

মন্মথ: অ্যাঁ—কে! চোর—চোর—!

চোর তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া এক দিকে ছুটিল, মন্মথ 'চোর চোর' বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। ঘরের মধ্যে এক পাক ঘুরিয়া চোর সাঁ

করিয়া দ্বার দিয়া বাহির হইল; মন্মথও তাহার পিছনে বাহির হইল।

হল-ঘরে সেবক মন্মথর চীৎকার শুনিয়া তাড়াতাড়ি ভোজনকক্ষের দিকে আসিতেছিল, চোর বিদ্যুদ্বেগে তাহাকে পাশ কাটাইয়া ঘরের অন্য দিকে পলায়ন করিল। কিন্তু মন্মথ সেবককে এড়াইতে পারিল না; সবেগে ঠোকাঠুকি হইয়া দু'জনেই ভূমিসাৎ হইল এবং তারস্বরে 'চোর চোর' বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল।

যদুনাথবাবুর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। তিনি ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া প্রথমেই চাবির গোছাটা মুঠিতে চাপিয়া ধরিলেন, তারপর খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হল-ঘরে বাহির হইয়া আসিলেন।

ওদিকে নন্দাও অপ্রত্যাশিত সোরগোল শুনিয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিল।

চোর এতক্ষণ ড্রয়িংরুমের দ্বারের কাছে পর্দার আড়ালে লুকাইয়া ছিল; নন্দা নামিয়া আসিবার পর সে সরীসৃপের মত নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া উপরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

যদুনাথ ও নন্দা যখন ভূপতিত মন্মথ ও সেবকের কাছে উপস্থিত হইলেন তখন তাহারা পরস্পর ধরাধরি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

যদুনাথঃ কি হয়েছে, এত চেঁচামেচি কিসের?

মন্মথ ও সেবকঃ চোর চোর—

নন্দাঃ কই—কোথায় চোর?

নন্দা চারিদিকে তাকাইল। যদুনাথ আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

যদুনাথঃ অ্যাঁ—চোর! আমার সূর্যমণি—

তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিয়া ঠাকুর-ঘরের দ্বার খুলিলেন। দেখিলেন সূর্যমণি যথাস্থানে আছে। চুরি যায় নাই।

যদুনাথঃ যাক্, আছে—

তিনি আবার ঠাকুর-ঘরে তালা লাগাইলেন। ইতিমধ্যে বাড়ির ভিতর দিক হইতে আরও তিন-চার জন ভৃত্য উপস্থিত হইয়াছিল।

মন্মথঃ বাড়িতে চোর ঢুকেছে। খোঁজো তোমরা—ওপরে নীচে চারিদিকে খুঁজে দ্যাখো —যাও—

চাকরেরা ইতি-উতি চাহিতে লাগিল, তারপর ভয়ে ভয়ে এদিকে ওদিকে প্রস্থান করিল।

যদুনাথঃ (মন্মথকে) কোথায় ছিল চোর? কে দেখলে তাকে?

মন্মথ থতমত খাইয়া বলিল--

মন্মথঃ আমি খাবার জন্যে নীচে নেমে এসে দেখি—

যদুনাথঃ (সন্দিগ্ধভাবে) খাবার জন্যে? এত রাত্রে?

মন্মথঃ আমি—পৌনে দশটার সময় বাড়ি ফিরেছি—কিন্তু ক্ষিদে ছিল না তাই নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম। তারপর এই মিনিট পাঁচেক আগে নেমে এসে খাবার ঘরে ঢুকে দেখি—

যদুনাথঃ ও—কি দেখলে?

মন্মথঃ দেখি একটা লোক আমার আসনে ব'সে ব'সে খাচ্ছে—

যদুনাথঃ খাচ্ছে—!

মন্মথঃ হ্যাঁ, টপাটপ খাচ্ছে।

নন্দাঃ আহা বেচারা! হয়তো পেটের জ্বালাতেই চুরি করতে ঢুকেছিল—হয়তো কতদিন খেতে পায়নি!

মন্মথঃ তা জানি না। কিন্তু এদিকে আমার নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে।

নন্দাঃ এস তোমাকে খেতে দিই। আলমারিতে খাবার আছে।

তাহারা ভোজনকক্ষে গেল; যদুনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। চাকরেরা বিভিন্ন দিক হইতে ফিরিয়া আসিল।

জনৈক ভৃত্যঃ বাড়িতে চোর নেই বাবু, ওপরে নীচে আতিপাতি ক'রে খুঁজেছি।

যদুনাথঃ নেই তো গেল কোথায়? এই ছিল এই নেই—একি ভেল্‌কি বাজি নাকি!—

সদর দরজা খোলা রয়েছে, সেবক কই?

এই সময় একজোড়া ছেঁড়া জুতা দুই হাতে আস্ফালন করিতে করিতে সেবক দরজা দিয়া প্রবেশ করিল।

সেবকঃ পেয়েছি! পেয়েছি!—এই দ্যাখো—

সেবক দুর্গন্ধ জুতাজোড়া যদুনাথের নাকের সম্মুখে ধরিল। যদুনাথ দ্রুত নাক সরাইয়া লইলেন।

যদুনাথঃ আ গেল যা! কি পেয়েছিস?

সেবকঃ জুতো গো বাবু—জুতো। জুঁই ঝাড়ের পেছনে জুতো খুলে রেখে চোর বাড়িতে ঢুকেছিল—

যদুনাথ জুতার ছিন্ন গলিত অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেন।

যদুনাথঃ হুঁ, সত্যিই ছিঁচকে চোর, খাবার লোভে বাড়িতে ঢুকেছিল।—যা, রাস্তায় ফেলে দিগে যা।

সেবকঃ এঁঃ! ফেলে দেব! পুলিসকে দিতে হবে না?

যদুনাথঃ পুলিস! (চিন্তা করিয়া) হ্যাঁ, পুলিসকে খবর দেওয়া দরকার। কিছু বলা যায় না।

ওদিকে ভোজনকক্ষে মন্মথ ও নন্দা মুখোমুখি দাঁড়াইয়া ছিল; মন্মথ একটা রেকাবি হাতে লইয়া আহার করিতেছিল। নন্দা ভর্ৎসনাপূর্ণ চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া ছিল।

মন্মথঃ চোরে খাবার খেয়ে গেল—হুঁ!

নন্দাঃ যেমন কর্ম তেমনি ফল। খাবেই তো চোর। আরও দেরি ক'রে এসো!

মন্মথঃ হুঁঃ।

হল-ঘরে যদুনাথ চাকরদের বলিতেছেন—

যদুনাথঃ চোরটা পালিয়েছে যখন তখন আর কি হবে। তোরা যা, সাবধানে ঘুমোবি। আর সেবক, তুই ঠাকুর-ঘরের সামনে শুয়ে থাক। আজ অনেক রাত হয়েছে, কাল সকালে পুলিস ডাকব।—

অন্য ভৃত্যেরা চলিয়া গেল। সেবক চোরের জুতাজোড়া বগলে করিয়া বলিল—

সেবকঃ ঠাকুর-ঘরের সামনেই শোব। কিন্তু জুতো ছাড়ছি না। কাল সকালে পুলিস এলেই বলব, এই ন্যাও জুতো!

ইতিমধ্যে মন্মথ ও নন্দা ফিরিয়া আসিয়াছে।

নন্দাঃ জুতো! কি হবে জুতো?

সেবকঃ কী আর হবে? চোরের জুতো পেয়েছি, আজ রাত্তিরে মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকব। তারপর কাল সকালে দেখো।

মন্মথঃ মাথা খারাপ।

যদুনাথঃ (নন্দা ও মন্মথকে) তোমরা শুয়ে পড় গিয়ে। রাত হয়েছে।

যদুনাথ নিজ কক্ষে ফিরিয়া গেলেন। নন্দা ও মন্মথ সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিল। সেবক জুতাজোড়া বালিশের মত মাথায় দিয়া ঠাকুর-ঘরের সম্মুখে শয়নের উদ্যোগ করিল।

কাট্।

নন্দা ও মন্মথ উপরে আসিয়া নিজেদের ঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। নন্দার দরজা খোলা রহিয়াছে, ভিতরে আলো জ্বলিতেছে। মন্মথ নিজের ঘরের বন্ধ দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে যাইবে এমন সময় নন্দা মিনতির সুরে বলিয়া উঠিল—

নন্দাঃ দাদা, কেন রোজ রোজ এত দেরি করো বল দেখি? আজ তো আর একটু হ'লেই ধরা পড়ে গিয়েছিলে!

অবরুদ্ধ অসন্তোষ মুখে লইয়া মন্মথ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

মন্মথঃ আমি কি ছেলেমানুষ? কচি খোকা?

নন্দাঃ না। কিন্তু সে কথা দাদুকে বললেই পারো। আমরা কেন রোজ রোজ তোমার

জন্যে দাদুর কাছে মিছে কথা বলব? জানো একটা মিছে কথা বলার জন্যে দাদু আজ ভুবনবাবুকে বিদেয় ক'রে দিয়েছেন?

মন্মথ: যথেষ্ট হয়েছে, আমাকে আর লেকচার দিও না। আমি তোমার দাদা, তুমি আমার দিদি নও।

মন্মথ নিজের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। নন্দা কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া নীরবে অধর দংশন করিল, তারপর ফিরিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল এবং বেশ একটু জোরের সঙ্গে দ্বারের ছিটকিনি লাগাইয়া দিল। তারপর বিরক্ত আহত মুখে ওয়ার্ডরোবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুলের বিনুনি খুলিতে লাগিল।

ওদিকে মন্মথ নিজের ঘরে গিয়া আলো জ্বালিয়াছিল। ঘরটি নন্দার ঘরের জোড়া; ওয়ার্ডরোবের স্থানে একটি ড্রেসিং টেবিল আছে। মন্মথ ইতিমধ্যে পায়জামার উপর ড্রেসিং গাউন পরিয়াছে, সিগারেট ধরাইয়াছে। এখন সে টেবিলের সম্মুখে বসিয়া একটি দেরাজ খুলিল: দেরাজ হইতে লিলির একটি ছোট ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিল এবং ঘন ঘন সিগারেট টানিতে লাগিল।

নন্দা নিজের ঘরে চুল আঁচড়ানো শেষ করিয়াছে; আলনা হইতে কোঁচানো আটপৌরে শাড়ি লইয়া রাত্রির জন্য বেশ পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। নন্দা সত্রাসে দেখিল, ওয়ার্ডরোবের দ্বার ধীরে ধীরে খুলিয়া যাইতেছে, যেন ভিতর হইতে কেহ দ্বার ঠেলিয়া খুলিতেছে।

নন্দার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাহার বস্ত্র পরিবর্তন ক্রিয়া তখন মধ্যপথে। সে ভয় ও লজ্জায় জড়সড় হইয়া চাপা গলায় বলিয়া উঠিল—

নন্দা: কে—?

অমনি ওয়ার্ডরোবের ঈষন্মুক্ত দ্বারপথে একজোড়া যুক্ত-কর বাহির হইয়া আসিল, সেই সঙ্গে কাতর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—

স্বর: আমাকে মাফ করুন—

কণ্ঠস্বর পুরুষের, কিন্তু অতিশয় করুণ। তার উপর জোড়-করা হাত দুটি বিনীতভাবে বাহির হইয়া আছে। নন্দা প্রথম ত্রাসের ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া ক্ষিপ্র হস্তে বস্ত্র পরিবর্তন করিতে লাগিল।

নন্দা: তুমি কে?

স্বর: আমি—আমি চোর।

নন্দা: চোর!!

চোর: ভয় পাবেন না। আমি আপনার কোনও অনিষ্ট করব না।—যদি অনুমতি করেন, বেরিয়ে আসব কি?

নন্দা: না না, এখন বেরিও না—

চোর: আচ্ছা—। দেখুন, আমার কোনও কু-মতলব নেই, আমি ধরা পড়বার ভয়ে লুকিয়ে আছি। আমাকে ক্ষমা করুন।

নন্দা এতক্ষণে বস্ত্র পরিবর্তন সম্পন্ন করিয়াছে। চোরের দীনতা দেখিয়া সে অনেকখানি সাহস ফিরিয়া পাইল। সঙ্গে সঙ্গে এই অদ্ভুত পরিস্থিতির নূতনত্ব তাহকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। চেঁচামেচি করিয়া লোক ডাকিলে চোরকে সহজেই ধরা যায়; কিন্তু নন্দা তাহা করিল না। সে স্বভাবতই সাহসিনী। কোমরে আঁচল জড়াইয়া সে নিজের পড়ার টেবিলের কাছে গেল; টেবিলের উপর একটি রুল ছিল, দৃঢ় মুষ্টিতে সেটি ধরিয়া সে চোরের দিকে ফিরিল।

নন্দা: এবার বেরিয়ে এস।

চোর যুক্তকরে ওয়ার্ডরোব হইতে বাহির হইয়া আসিল।

নন্দা: দাঁড়াও—আর এগিও না।

চোর অমনি দাঁড়াইয়া পড়িল। নন্দা ইতিপূর্বে কখনও চোর দেখে নাই; চোর সম্বন্ধে একটা প্রেত-পিশাচ জাতীয় ধারণা তাহার মনে ছিল। কিন্তু এই চোরের মূর্তি দেখিয়া তাহার

সমস্ত ভয় দূর হইল। চোর নিতান্ত নির্জীব প্রাণী।

নন্দাঃ তুমি আমার ঘরে ঢুকলে কি ক'রে?

চোরঃ আমাকে তাড়া করেছিল, তাই পালাবার রাস্তা না পেয়ে ওপরে পালিয়ে এসেছিলাম—দোহাই আপনার, আমাকে পুলিসে দেবেন না।

চোর দীন নেত্রে নন্দার মুখের পানে চাহিল।

নন্দাঃ তুমি চুরি করবার জন্যে এ বাড়িতে ঢুকেছিলে?

চোর উত্তর দিল না, লজ্জাহত চক্ষু নত করিল। নন্দার মনে দয়া হইল; কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গী নরম হইল না। রুলের দ্বারা চেয়ার দেখাইয়া সে কড়া সুরে বলিল—

নন্দাঃ বোসো ঐ চেয়ারে।

চোর সঙ্কুচিতভাবে চেয়ারের কানায় বসিল।

নন্দাঃ তোমার নাম কি?

চোরঃ দিবাকর—দিবাকর রায়।

নন্দাঃ (সবিস্ময়ে) দিবাকর রায়!—ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে তুমি চুরি কর!

দিবাকরঃ (কাতরভাবে) আমি বড় গরীব—কাজকর্ম পাইনি—

নন্দাঃ কাজকর্ম পাওনি কেন? লেখাপড়া করেছ?

চোর ছাড়া-ছাড়া ভাবে উত্তর দিল—

দিবাকরঃ ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছিলাম—পাস করতে পারিনি। আমার বাবা ভদ্রলোক ছিলেন, কিন্তু তিনি হঠাৎ মারা গেলেন—কিছু রেখে যেতে পারেননি।—মা অনাহারে মারা গেলেন—তারপর—তারপর—কাজ জোগাড় করবার অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু কেউ কাজ দিলে না। তাই শেষ পর্যন্ত পেটের জ্বালায়—

নন্দার মুখ এবার করুণায় কোমল হইল।

নন্দাঃ পেটের জ্বালায়—! তাই বুঝি তুমি খাবার ঘরে ঢুতে খেতে বসেছিলে?

দিবাকরঃ হ্যাঁ। সবে একটি গ্রাস মুখে তুলেছি এমন সময়—

নন্দাঃ আহা বেচারা! এখনও বোধ হয় তোমার পেট জ্বলছে?

দিবাকরঃ (ক্লান্তভাবে) ও কিছু নয়। আমার অভ্যেস আছে।

নন্দা টেবিলের উপর রুল রাখিয়া দিল, সদয় কণ্ঠে বলিল—

নন্দাঃ তুমি খাবে? আমার ঘরে খাবার আছে।

দিবাকর চেয়ার হইতে উঠিয়া উচ্চকিতভাবে চাহিল।

দিবাকরঃ খাবার!!

নন্দাঃ হ্যাঁ—এই যে। এস।

নন্দার অনুবর্তী হইয়া দিবাকর চর্কি আলমারির কাছে গিয়া দাঁড়াইল, সাগ্রহে খাদ্য-দ্রব্যগুলি দেখিয়া নন্দার পানে চোখ তুলিল।

দিবাকরঃ আমাকে এই সব খেতে বলছেন?

নন্দাঃ হ্যাঁ—খাও না।

দিবাকরঃ আপনার দয়া জীবনে ভুলতে পারব না—

এক টুকরা খাদ্য তুলিয়া মুখে দিতে গিয়া দিবাকর সহসা থামিয়া গেল।

দিবাকরঃ কিন্তু—এ তো আপনার খাবার!

নন্দাঃ তাতে কি! তুমি খাও।

দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া দিবাকর খাদ্য থালায় রাখিয়া দিল।

দিবাকরঃ না, আপনার মুখের খাবার খেতে পারব না।—আপনার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।

নন্দাঃ না, আমার খিদে নেই। তুমি খাও না—

দিবাকরঃ মাফ করবেন, আমি পারব না। আপনার কষ্ট হবে।

নন্দাঃ (হাসিয়া) আচ্ছা, আমিও খাচ্ছি। এবার খাবে তো?

নন্দা থালা হইতে একটা চিংড়ি মাছের কাট্‌লেট তুলিয়া লইয়া তাহাতে একটু কামড় দিল। দিবাকরের মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল। সে একটা লুচি লইয়া মুখে পুরিল।

চরকি আলমারির দুই পাশে দাঁড়াইয়া চোর ও গৃহকন্যার যৌথ ভোজন আরম্ভ হইল।

মন্মথ এখনও শয়ন করে নাই, সিগারেট টানিতে টানিতে নিজের ঘরে পায়চারি করিতেছিল। বন্ধ দরজার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিবার সময় বাহির হইতে অস্পষ্ট বাক্যালাপ তাহার কানে আসিতেছিল; কিন্তু এতক্ষণ সেদিকে সে মন দেয় নাই। এখন সে হেঁট মুখে দাঁড়াইয়া শুনিবার চেষ্টা করিল, তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দ্বারের দিকে চলিল।

নন্দার ঘরে দুজনের আহার তখন প্রায় শেষ হইয়াছে, দ্বারে ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ শুনিয়া উভয়ে চমকিয়া উঠিল। নন্দা চকিতে নিজের ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া দিবাকরকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিল, তারপর দ্বারের দিকে ফিরিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিল—

নন্দাঃ কে?

দ্বারের অপর পার হইতে মন্মথর কণ্ঠস্বর আসিল।

মন্মথঃ আমি। দোর খোলো।

নন্দাঃ দাদা! কি দরকার?

মন্মথঃ দোর খোলো—কার সঙ্গে কথা কইছ?

নন্দা নীরবে দিবাকরকে ইশারা করিল, দিবাকর আলমারির পিছনে বসিয়া পড়িল। তখন নন্দা রঘুবংশ বইখানা তুলিয়া লইয়া দ্বারের ছিটকিনি খুলিয়া দাঁড়াইল, ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বলিল—

নন্দাঃ এত রাত্রে তোমার আবার কি হ'ল!

মন্মথ সন্দিগ্ধভাবে ঘরের এদিক ওদিক উঁকি মারিল।

মন্মথঃ তুমি এখনও ঘুমোও নি?

নন্দাঃ না। কিছু দরকার আছে?

মন্মথঃ মনে হ'ল তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ।

নন্দাঃ কথা কইছি! সে কি? ওঃ—

নন্দা হাসিয়া উঠিল। হাতের খোলা বই দেখাইয়া বলিল—

নন্দাঃ পড়া মুখস্থ করছিলাম।

মন্মথঃ এত রাত্রে পড়া মুখস্থ!

নন্দাঃ হ্যাঁ। শুনবে? শোনো—

অমুং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুম্
পুত্রীকৃতোহসৌ বৃষভধ্বজেন!—

মন্মথঃ (উত্যক্তভাবে) থাক্, দুপুর রাত্রে শ্লোক আওড়াতে হবে না।

মন্মথ নিজের ঘরে চলিয়া গেল। নন্দা আবার দ্বার বন্ধ করিল। যেন মস্ত একটা ফাঁড়া কাটিয়াছে এমনিভাবে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে বইখানা টেবিলের উপর ফেলিল। দিবাকরের মুণ্ড চরকি আলমারির পিছন হইতে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। চোখে চোখে বাক্য বিনিময় হইল।

অতঃপর তাহাদের কথাবার্তা অনুচ্চ ফিস্‌ফিস্ স্বরে হইতে লাগিল।

দিবাকরঃ আপনি দু'বার আমাকে রক্ষা করলেন। এবার আমি যাই।

নন্দাঃ হ্যাঁ, এবার তোমাকে যেতে হবে! কিন্তু যাবে কোন্ দিক দিয়ে?

দিবাকর খোলা জানালার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

দিবাকরঃ বাগানে কেউ আছে কিনা দয়া ক'রে একবার দেখবেন কি?

একটু বিস্মিত হইয়া নন্দা জানালার কাছে গিয়া নীচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। চাঁদ অস্ত গিয়াছে, নীচে বড় কিছু দেখা যায় না।

নন্দাঃ না, কেউ নেই।

দিবাকরঃ তাহলে—আমি জানলা দিয়েই—

নন্দা সরিয়া আসিল; দিবাকর গিয়া জানালা দিয়া উঁকি মারিল।

নন্দাঃ কিন্তু যদি প'ড়ে যাও, হাত-পা ভাঙবে—

দিবাকরঃ না, পড়ব না, একটা জলের পাইপ আছে।—(হাত জোড় করিয়া) আমাকে

আপনি অনেক দয়া করছেন, এবার বিদায় দিন।

নন্দাঃ (আঙুল তুলিয়া) কিন্তু মনে রেখো, আর কখনও চুরি করবে না। তুমি পুরুষ, ভদ্রসন্তান; কাজ করবে।

দিবাকরঃ কাজ করতেই আমি চাই; কিন্তু কাজ পাব কোথায়? যখন কুলি-কাবাড়ীর কাজ পাই তখন করি; আর যখন পাই না—পেটের দায় বড় দায়।

আচমকা একটা কথা নন্দার মনে পড়িয়া গেল; সে বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ শূন্যে তাকাইয়া রহিল। বড় দুঃসাহসের কথা, কিন্তু একটা হতভাগাকে যদি সৎ পথে আনা যায়—! নন্দা দিবাকরের কাছে এক-পা সরিয়া আসিয়া চাপা উত্তেজনার কণ্ঠে বলিল—

নন্দাঃ আমি যদি তোমাকে কাজ দিই, তুমি কাজ করবে?

দিবাকরঃ কাজ! আপনি কাজ দেবেন!

নন্দাঃ দিতে পারি। আমার দাদুর একজন সেক্রেটারি চাই। তুমি হিসেব নিকেশের কাজ জান?

দিবাকরঃ (দ্বিধা ভরে) তা—একটু একটু জানি।

নন্দাঃ তা হলেই হবে। কিন্তু মনে থাকে যেন, যদি এক পয়সা চুরি হয় তাহলে পুলিসে ধরিয়ে দেব।

দিবাকরঃ বিশ্বাস করুন, কাজ পেলে আমি চুরি করব না। চুরি করা আমার স্বভাব নয়; অভাবে প'ড়েই—

নন্দাঃ আচ্ছা বেশ।

নন্দা ওয়ার্ডরোব হইতে একটা দশটাকার নোট লইয়া দিবাকরের হাতে দিল। দিবাকরের মুখ কৃতজ্ঞতায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

নন্দাঃ এই নাও দশটাকা। এখন যা বলি শোন। কাল সকালে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে ভাল কাপড়-চোপড় প'রে দাদুর সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

দিবাকরঃ আপনি যা বলবেন তাই করব। আর কি করব বলুন। চাকরির কথা আপনার দাদুকে বলব কি?

নন্দা গালে আঙুল ঠেকাইয়া ক্ষণেক চিন্তা করিল।

নন্দাঃ না, তাতে গণ্ডগোল হ'তে পারে। শোন, আমার দাদু জ্যোতিষ চর্চা করেন। তুমি বলবে, তাঁর নাম শুনে এসেছ; তোমার কাজ কর্ম নেই—কবে কাজ কর্ম হবে তাই জানতে এসেছ!—বুঝলে?

দিবাকরঃ আজ্ঞে বুঝেছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কাল সকালে আমি আসব।

আবার জোড়হস্তে নন্দাকে নমস্কার করিয়া দিবাকর জানালা পার হইল: তারপর তাহার মস্তক জানালার নীচে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

নন্দা আসিয়া কিছুক্ষণ জানালার নীচে চাহিয়া রহিল; পরে জানালা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার মুখে ভয় সংশয় এবং উত্তেজনা মিশিয়া এক অপূর্ব ভাব-ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিল। গত একঘণ্টা ধরিয়া এই ঘরে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা স্বপ্ন না সত্য? নিজের দুঃসাহসের কথা ভাবিয়া সে নিজেই স্তম্ভিত হইয়া গেল।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

পরদিন প্রভাত। বেলা আন্দাজ ন'টা।

যদুনাথের হল-ঘরে টেবিল ঘিরিয়া বসিয়া আছেনঃ স্বয়ং যদুনাথ, ইউনিফর্ম-পরা একজন পুলিস ইন্সপেকটর এবং ড্রেসিং-গাউন-পরা মন্মথ। যদুনাথের চেয়ারের পিছনে নন্দা পিতামহের কাঁধে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে; ইন্সপেকটরের পিছনে দাঁড়াইয়া একজন নিম্নতর পুলিস কর্মচারী খাতা-পেন্সিল হাতে নোট লিখিতেছে; সেবক একটা খালি চেয়ারের পিঠ

ধরিয়া দণ্ডায়মান আছে এবং সতর্কভাবে সওয়াল জবাব শুনিতেছে।

খোলা দরজা দিয়া ফটক পর্যন্ত দেখা যাইতেছে।

ইন্সপেক্টরঃ তাহলে চুরি কিছুই যায়নি?

যদুনাথঃ না, কিন্তু চোর বাড়িতে ঢুকেছিল।

ইন্সপেকটরঃ তা বটে। চোরকে আপনারা কে কে দেখেছেন?

মন্মথঃ আমি দেখেছি। কিন্তু এক নজর, ভাল ক'রে দেখিনি।

সেবকঃ আমিও দেখেছি—

ইন্সপেকটরঃ দাঁড়াও, তোমার কথা পরে শুনব। মন্মথবাবু আপনি চোরের চেহারা কি রকম দেখেছেন বলুন দেখি।

মন্মথ চিবুক চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে চোরের চেহারা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল। এই সময় নন্দা চক্ষু তুলিয়া দেখিল, একটি অপরিচিত যুবক সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছে। যুবকের গোঁফ দাড়ি কামানো, ধারালো মুখ, শরীর ঈষৎ কৃশ, কিন্তু হাড় বাহির করা নয়। পরিধানে খদ্দরের পাঞ্জাবি ও ধোপদস্ত ধুতি। নন্দার বুকের ভিতর ধ্বক্‌ করিয়া উঠিল। এই কি গতরাত্রির চোর—?

দিবাকর টেবিলের কাছাকাছি আসিয়া কুণ্ঠিতভাবে একটু কাশিল। সকলে একবার তাহার দিকে চাহিলেন; যদুনাথ চশমা খুলিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিলেন।

যদুনাথঃ কে তুমি বাপু? কি চাও?

দিবাকরঃ আজ্ঞে, শ্রীযুক্ত যদুনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

কণ্ঠস্বর শুনিয়া নন্দা দিবাকরকে নিশ্চয়ভাবে চিনিল; সে দাদুর শুভ্র মস্তকের উপর চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া হৃদ্‌যন্ত্রের দ্রুত স্পন্দন চাপিবার চেষ্টা করিল।

যদুনাথঃ ও—কি নাম তোমার?

দিবাকরঃ আজ্ঞে, দিবাকর রায়।

যদুনাথঃ আচ্ছা, তুমি একটু বোসো, তোমার কথা শুনব—সেবক!

সেবক শূন্য চেয়ারটা টেবিল হইতে একটু দূরে টানিয়া দিবাকরকে বসিতে ইঙ্গিত করিল; দিবাকর বসিল। কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বিনীত ভাবলেশহীন মুখ লইয়া বসিয়া রহিল। বড় মানুষের বাড়িতে এমন কৃপাপ্রার্থী উমেদার কত আসে; কেহ আর তাহাকে লক্ষ্য করিল না।

ইন্সপেকটর তাঁহার প্রশ্নোত্তরের ছিন্নসূত্র তুলিয়া লইলেন।

ইন্সপেকটরঃ হ্যাঁ চোরের চেহারার কথা হচ্ছিল, (মন্মথকে) কি রকম চেহারা দেখেছিলেন?

মন্মথঃ মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি গোঁফ ছিল—রোগা-পটকা চেহারা—

সেবক অমনি হাত নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল।

সেবকঃ না না, রোগা-পটকা হবে কেন? চোর কখনও রোগা-পটকা হয়?—কালো—মুষ্কো—ইয়া জোয়ান—

দিবাকর নির্লিপ্তভাবে একবার সেবকের মুখের পানে তাকাইল। মন্মথ বিরক্ত হইয়া বলিল—

মন্মথঃ তুই কি জানিস? আমি বলছি রোগা-পটকা!

সেবক আবার প্রতিবাদ করিবার জন্য মুখ খুলিয়াছিল, ইন্সপেকটর হাত তুলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলেন।

ইন্সপেকটরঃ মন্মথবাবু, চোরের চেহারা যেমনই হোক, বলুন দেখি, চোরকে দেখলে সনাক্ত করতে পারবেন?

মন্মথ চিন্তিতভাবে এদিক ওদিক চাহিল। নন্দার মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল; দিবাকর কিন্তু নির্বিকার।

মন্মথঃ তা ঠিক বলতে পারি না। বোধ হয় না।

ইন্সপেকটরঃ (সেবককে) আর তুমি? চোরকে দেখলে চিন্‌তে পারবে?

সেবকঃ আপনি নিয়ে আসুন, আলবৎ চিনব। আমি দেখেছি, ইয়া মুষ্কো জোয়ান—ভুষকুণ্ডি কালো—

ইন্সপেকটর হাসিয়া যদুনাথকে সম্বোধন করিলেন।

ইন্সপেকটরঃ দেখছেন তো, ইনি বলছেন রোগা-পটকা, আর ও বলছে ইয়া মুষ্কো জোয়ান। এ রকম অবস্থায় চোরকে সনাক্ত করার তো কোনও উপায় নেই।

সেবকঃ উপায় আছে দারোগাবাবু। এই যে উপায়।

মেঝে হইতে টপ্ করিয়া চোরের জুতাজোড়া তুলিয়া লইয়া সেবক ইন্সপেকটরের সামনের টেবিলের উপর রাখিল এবং সহর্ষে হাত ঘষিতে লাগিল।

ইন্সপেকটরঃ (চমকিয়া) এ কি! বদ গন্ধ বেরুচ্ছে। কার জুতো?

সেবকঃ চোরের জুতো। জুঁই ঝাড়ের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল, আমি খুঁজে বার করেছি।

ইন্সপেকটর রুমাল বাহির করিয়া নাকের উপর ধরিলেন। মন্মথ মুখ বিকৃত করিয়া উঠিয়া গেল এবং ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিল।

ইন্সপেকটরঃ হুঁ—চোরের জুতো। কম্বল সিং, জুতা লে চলো।...যদি দাগী চোর হয়, হয়তো সনাক্ত করা যাবে।

কম্বল সিং নাক সিট্‌কাইয়া আলগোছে জুতাজোড়া তুলিয়া লইল।

যদুনাথঃ দেখুন ইন্সপেকটরবাবু, কাল রাত্রে যে চোর ঢুকেছিল তার জন্যে আমি বেশি ভাবিনে, আমার মনে হয় ছিঁচকে চোর, ঘটিটা বাটিটা সরাবার মতলবে ঢুকেছিল।—

ইন্সপেকটরঃ জুতোর অবস্থা দেখে তো তাই মনে হয়।

যদুনাথঃ হ্যাঁ। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, আমার বাড়িতে এক অমূল্য জহরৎ আছে—আমার গৃহদেবতা। আপনি বোধ হয় সূর্যমণির নাম শোনেননি—

ইন্সপেকটরঃ বিলক্ষণ! সূর্যমণির নাম কে না শুনেছে। এমন রুবি বাংলা দেশে আর নেই—

যদুনাথঃ হ্যাঁ। আমার ভয় সূর্যমণি নিয়ে। কে জানে, হয়তো কলকাতা শহরে যত পাকা চোর আছে সকলের নজর পড়েছে সূর্যমণির ওপর। এখন পুলিস যদি আমার সম্পত্তি রক্ষা না করে...

ইন্সপেকটরঃ সকলের সম্পত্তি রক্ষা করাই পুলিসের কাজ। আমরা চেষ্টার ত্রুটি করব না। কিন্তু আপনি যদি special protection চান তাহলে কমিশনার সাহেবকে দরখাস্ত করতে হবে।—আজ তাহলে উঠি। চলো কম্বল সিং—

ইন্সপেকটর নমস্কার করিয়া দ্বারের দিকে চলিলেন। কম্বল সিং জুতাজোড়া নাক হইতে যতদূর সম্ভব দূরে টাঙাইয়া লইয়া চলিল। সেবক তাহাদের ফটক পর্যন্ত আগাইয়া দিতে গেল। হল-ঘরে যদুনাথ, নন্দা ও দিবাকর ছাড়া আর কেহ রহিল না।

যদুনাথ অন্যমনস্কভাবে বসিয়া বোধ করি সূর্যমণির বিপদ আপদের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। নন্দা ও দিবাকর গোপনে একবার দৃষ্টি বিনিময় করিল। তারপর দিবাকর উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু রকম গলা ঝাড়া দিল। কিন্তু বিমনা যদুনাথ লক্ষ্য করিলেন না।

নন্দা তখন তাঁহার কানের কাছে নত হইয়া বলিল—

নন্দাঃ দাদু, ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

যদুনাথঃ ও—হ্যাঁ হ্যাঁ। তা—কি দরকার তোমার বাপু?

দিবাকরঃ (জোড়হস্তে) আজ্ঞে, আপনার নাম শুনে এসেছি—আমাকে একটু অনুগ্রহ করতে হবে—

যদুনাথঃ অনুগ্রহ! কি অনুগ্রহ?

দিবাকরঃ আমি শুনেছি জ্যোতিষ শাস্ত্রে আপনার অগাধ পাণ্ডিত্য। তাই এসেছিলাম ...যদি আপনি—

যদুনাথ খুশি হইলেন।

যদুনাথঃ অ্যাঁ—তা—বোসো বোসো—কি নাম বললে? দিবাকর রায়—ব্রাহ্মণ সন্তান

নাকি?

দিবাকর: আজ্ঞে হ্যাঁ।

যদুনাথ: বেশ বেশ। তা জ্যোতিষ নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি বটে। তুমি কোত্থেকে খবর পেলে?

দিবাকর: আজ্ঞে এ কথা কি চাপা থাকে। আমি আপনাকে একটু কষ্ট দিতে এসেছি। আমি বড় গরীব, কাজকর্ম কিছু নেই—আপনি যদি দয়া ক'রে দেখে দেন— আর কতদিন কষ্ট ভোগ আছে। সময়টা বড় খারাপ যাচ্ছে—

যদুনাথ: সময় খারাপ যাচ্ছে? বেশ বেশ। তা ঠিকুজি কুষ্ঠি এনেছ?

দিবাকর: আজ্ঞে এনেছি।

সে পকেট হইতে কুণ্ডলিত ঠিকুজি বাহির করিয়া দিল। যদুনাথ চশমা পরিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত জাতচক্র পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দিবাকর ভয়ে ভয়ে একবার নন্দার পানে চোখ তুলিল। যেন নীরবে প্রশ্ন করিল—ঠিক হচ্ছে তো? নন্দা একটু ঘাড় নাড়িল।

যদুনাথ: (হঠাৎ) বা বা! এ যে দেখছি মেষ!

দিবাকর: আজ্ঞে মেষ!

যদুনাথ: হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার মেষ রাশি মেষ লগ্ন—একেবারে খাঁটি মেষ।

দিবাকর: (ঘাড় চুলকাইয়া) আজ্ঞে আপনি যখন বলছেন তখন তাই। কিন্তু আমার ভাল সময় কবে পড়বে?

যদুনাথ: (কোষ্ঠি দেখিতে দেখিতে) ভাল সময়? হুঁ—বৃহস্পতি গোচরে তোমার ভাগ্যস্থানে প্রবেশ করেছেন: শনি ষষ্ঠে; রাহু একাদশে। বা বা! তোমার তো ভাল সময় এসে পড়েছে হে!

দিবাকর: আজ্ঞে তাই নাকি? কিন্তু কই কিছু তো দেখছি না। বরং খুবই দুঃসময় যাচ্ছে, চাকরি-বাকরি নেই—

যদুনাথ: ও কিছু নয়, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

দিবাকর: চাকরি পাব?

যদুনাথ: নিশ্চয় পাবে। মেষ রাশি, নবমে বৃহস্পতি, একাদশে রাহু—এ কখনো মিথ্যে হয়। দেখে নিও, শিগ্গিরই তোমার বরাত ফিরে যাবে।

যদুনাথ জন্মকুণ্ডলী দিবাকরকে ফেরত দিলেন; চশমা খুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাহার কাচ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। দিবাকর কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিল, কিন্তু যদুনাথ আর কিছু বলিলেন না। দিবাকর তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দিবাকর: আচ্ছা, আজ তাহলে আসি। নমস্কার।

অনিচ্ছা মন্থর পদে দিবাকর দ্বারের দিকে চলিল। নন্দা অমনি যদুনাথের কানে কানে বলিল—

নন্দা: দাদু, ওঁকে যেতে দিচ্ছ?

যদুনাথ: অ্যাঁ—কী?

নন্দা: উনি যদি চাকরি না পান, ভাববেন তুমি জ্যোতিষের কিছু জান না!

যদুনাথ: অ্যাঁ—তা—?

নন্দা: তোমার তো একজন সেক্রেটারি দরকার, ওঁকেই রেখে নাও না কেন?

যদুনাথ: ওঃ? আরে তাই তো!..ওহে... কি বলে— দিবাকর! শোনো শোনো—

দিবাকর এতক্ষণে দ্বার পর্যন্ত গিয়াছিল, এক লাফে ফিরিয়া আসিল।

দিবাকর: আজ্ঞে?

যদুনাথ: হ্যাঁ—দ্যাখো, আমার একজন সেক্রেটারি দরকার। তুমি পারবে?

দিবাকর: আজ্ঞে পারব।

যদুনাথ: ত্রিশ টাকা মাইনে পাবে, আর খাওয়া-পরা—রাজি?

দিবাকর: আজ্ঞে রাজি।

যদুনাথ: রোজকার হিসেব রাখতে হবে, খুচরো খরচ নিজের হাতে করবে; বাড়ির

সব কাজ দেখাশুনো করতে হবে—দরকার হ'লে বাজার যেতে হবে, ফাই-ফরমাস খাটতে হবে—বুঝলে?

দিবাকরঃ আজ্ঞে।

যদুনাথঃ তাহলে আজ থেকেই কাজে লেগে যাও। হ্যাঁ, আর একটা কথা। বাইরে থাকা চলবে না, এই বাড়িতেই থাকতে হবে। ওপরে যে-ঘরে আমার পুরোনো সেক্রেটারি থাকত, সেই ঘরে তুমি থাকবে।

দিবাকরঃ আজ্ঞে থাকব।

সহসা যদুনাথের মনে সংশয়ের উদয় হইল।

যদুনাথঃ কিন্তু—তোমার বিষয় কিছুই জানি না—তুমি লোক ভাল বটে তো হে?

দিবাকরঃ (আহতস্বরে) আজ্ঞে আপনি এখনি আমার ঠিকুজি কোষ্ঠি দেখলেন, আমি ভাল কি মন্দ তা আপনার চেয়ে বেশি আর কে জানে? আপনি তো আমার নাড়ী নক্ষত্র জেনে নিয়েছেন।

যদুনাথঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বটে। তুমি মেষ। মেষ কখনো ঠগ জোচ্চোর মিথ্যাবাদী হতে পারে না। আমিও মেষ কিনা!

দিবাকরঃ (পুলকিত) আপনিও মেষ!

যদুনাথঃ হুঁ। বেশ তুমি থাকো—বলেছিলাম কিনা যে শিগ্‌গিরই বরাত ফিরে যাবে?

দিবাকরঃ (জোড়হস্তে) অদ্ভুত আপনার গণনা; বল্‌তে না বল্‌তে ফলে গেল। সত্যিই আমার বরাত ফিরেছে।

যদুনাথ স্মিতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পিরানের বোতাম খুলিতে লাগিলেন।

যদুনাথঃ নন্দা, দিবাকরকে ওর ঘর দেখিয়ে দে।—আমার স্নানের সময় হ'ল—

নন্দাঃ (দিবাকরকে) আসুন আমার সঙ্গে।

নন্দার অনুগামী হইয়া দিবাকর সিঁড়ির দিকে চলিল। তাহারা সিঁড়ির পাদমূল পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে এমন সময় মন্মথ খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে ড্রয়িংরুম হইতে বাহির হইয়া আসিল। দুই পক্ষের মুখোমুখি হইয়া গেল। নন্দা একটু থতমত হইল।

নন্দাঃ দাদা, ইনি দাদুর নতুন সেক্রেটারি দিবাকরবাবু।

দিবাকর সবিনয়ে নমস্কার করিল। মন্মথ তাচ্ছিল্যভরে তাহার দিকে একবার ঘাড় নাড়িয়া কাগজ পড়িতে পড়িতে চলিয়া গেল। নন্দা ও দিবাকর সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

ওয়াইপ্‌।

উপরের বারান্দায় নন্দা ও দিবাকর। নন্দার চোখে চাপা উত্তেজনা।

নন্দাঃ প্রথমটা আমিও আপনাকে চিনতে পারিনি, গলা শুনে চিনলাম। দাদা আর সেবক তো—

সে মুখে আঁচল দিয়া হাসি চাপা দিল।

দিবাকরঃ ওঁদের সঙ্গে এমন অবস্থায় দেখা হয়েছিল যে—। আমিও ও'দের চিনতে পারিনি।

নন্দাঃ (গম্ভীর হইয়া) এটা আমার ঘর; এটা দাদার। আর এই ঘরে আপনি থাকবেন!

নন্দার দরজার লাগাও আর একটা দরজা ভেজানো ছিল, নন্দা তাহা ঠেলিয়া খুলিয়া দিল। ঘরটি অপেক্ষাকৃত ছোট; আসবাবের মধ্যে একটা উলঙ্গ খাট, টেবিল ও চেয়ার।

নন্দাঃ ঘরটা খালি পড়ে আছে, বিশেষ কিছু নেই। আমি আজই সাজিয়ে গুছিয়ে দেব।

দিবাকরঃ আর কিছু দরকার নেই; এই আমার পক্ষে স্বর্গ।

নন্দাঃ কিন্তু দাদু চান আমরা যে ভাবে থাকি তাঁর সেক্রেটারিও সেইভাবে থাকবে, ঠিক বাড়ির ছেলের মতন।

দিবাকরঃ দেবতুল্য মানুষ আপনার দাদু। ওঁর সেবা করবার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।—ওঁর ঘর কোনটা?

নন্দাঃ দাদু ওপরে শোন না। একে তো বাতের ব্যথার জন্যে ওপর-নীচে করতে কষ্ট হয়, তাছাড়া ঠাকুর-ঘর নীচে। ঠাকুর-ঘরে সূর্যমণি আছে।

দিবাকরঃ সূর্যমণির নাম শুনলাম নীচে, কি জিনিস বুঝতে পারলাম না।

নন্দাঃ (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) সূর্যমণি আমাদের গৃহদেবতা।—দেখুন, আমি দাদুর কাছে আপনার সত্যিকার পরিচয় লুকিয়ে আপনাকে ভাল হবার সুযোগ দিয়েছি, একথা যেন ভুলে যাবেন না।

হাত জোড় করিয়া দীনকণ্ঠে দিবাকর বলিল—

দিবাকরঃ আপনার দয়া কখনো ভুলব না।

সেইদিন অপরাহ্ণ। খোলা ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া সেবক ও গুর্খা দরোয়ান বাক্যালাপ করিতেছে।

গুর্খাঃ আজ সুবেরকো পুলিস আয়ি থি। ফির্ ক্যা হুয়া, সেবকরামজি?

সেবকঃ অনেক ব্যাপার হুয়া। দাদাবাবু তো সব ভেস্তে দিয়েছিল, আমি শেষ রক্ষে করলুম।

গুর্খাঃ ক্যাসা? ক্যাসা?

সেবকঃ দাদাবাবু পুলিসকে বললে, চোরটা ছিল রোগা-পটকা। আচ্ছা তুমিই বল তো গুরুঘণ্টাল সিং, তুমি তো দশ বছর ধ'রে দরোয়ানগিরি করছ, চোর কখনও রোগা-পটকা হয়?

গুর্খাঃ চোর হাম্ কভি দেখা নেই, সেবকরামজি। হামকো দেখনে সে হি চোর ভাগ্‌তা হ্যায়।

এই সময় বিলাতী বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মন্মথ বাহির হইয়া আসিল।

গুর্খা স্যালুট করিল। সেবক মন্মথর কাছে ঘেঁষিয়া নিম্নস্বরে বলিল—

সেবকঃ মনে আছে তো? আজ ফিরতে দেরি করেছ—

মন্মথঃ আচ্ছা আচ্ছা—

রাস্তা দিয়া একটা খালি ট্যাক্সি যাইতেছিল, মন্মথ তাহাতে চড়িয়া চলিয়া গেল। সেবক গুর্খার দিকে ফিরিল।

সেবকঃ কি বলছিলে, চোর তোমাকে দেখেই পালিয়ে যায়? ভারি মন্দ তুমি। কাল তবে বাড়িতে চোর ঢুকলো কি ক'রে? তুমি যে বন্দুক ঘাড়ে ক'রে পাহারা দিচ্ছিলে, কই, ধরতে পারলে না?

গুর্খাঃ আরে হাম্ কৈসে পাক্‌ড়েগা? চোর ফাটকসে ঘুসাথা থোড়ই।

সেবকঃ নাই বা ঘুসা থা ফাটক দিয়ে। চোর ধরা তোমার কাজ, তুমি দরোয়ান। ধরনি কেন? তার বেলা এই সেবকরাম।

গুর্খাঃ ক্যা তুম্ চোর পাকড়াথা?

সেবকঃ পাক্‌ড়া থা নেই, কিন্তু দেখা থা। আর চোরের জুতো খুঁজে বার কিয়া থা।

গুর্খাঃ চোর কা জুতা?

সেবকঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, জুতো।

গুর্খাঃ তো জুতা লেকে তুম্ কা করেগা, চবায় গা? চোর তো ভাগ গয়া।

সেবকঃ (চোখ পাকাইয়া) দ্যাখ গুরুঘণ্টাল সিং, তুমি আমার সঙ্গে বুঝে সমঝে কথা বলবে। চোরের জুতো আমি চিবোব কেন? চিবোতে হয় পুলিস চিবোক্।

সেবক রুষ্ট মুখে বাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

ডিজল্‌ভ্।

রাত্রি। লিলির ড্রয়িংরুম।

দাশু, ফটিক ও লিলি বসিয়া সরবৎ খাইতেছে। লিলির পরিধানে নৃত্য-বেশ; দাশু ও ফটিকের সাহেবী পোশাক।

দাশু গেলাস হাতে লইয়া রাস্তার দিকের জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

দাশুঃ খোকার আসবার সময় হ'ল। রাস্তার ওপর নজর রাখ। আচমকা এসে না পড়ে।

ফটিকঃ লিলি, আর দেরি নয়। অনেক খেলিয়েছ। এবার মাছ ডাঙায় তোলো।

লিলিঃ উহুঃ, আরও খেলবে।

ফটিকঃ খেলালে খেলবে না কেন? কিন্তু আর খেলাবার দরকার আছে কি? আমার তো মনে হয়, এবার টান দিলেই মাছ ডাঙায় উঠবে।

লিলিঃ উহুঃ, আরও সময় চাই। তুমি ওদের ধাত জান না, ফটিক, ওরা বড়মানুষের ছেলে; চুনোপুঁটি নয়, রুই-কাতলা, হঠাৎ টান মারলে সুতো ছিঁড়ে যাবে।

ফটিকঃ বেশ, তোমার কাজ তুমি জানো। কিন্তু মনে রেখো, চোরাবাজারেও সূর্যমণির দাম দু'লাখ টাকা। শেষে ফস্কে না যায়।

লিলিঃ ফস্কাবে না।

জানালা দিয়া মোটর হর্ণের আওয়াজ আসিল।

দাশুঃ এসেছে—

লিলিঃ এবার তাহলে অভিনয় আরম্ভ হোক।—দাশুবাবু, আর এক পেয়ালা সরবৎ—

মন্মথ প্রবেশ করিল। দাশু ও ফটিককে দেখিয়া তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল; সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

লিলিঃ এই যে মন্মথবাবু! আসুন।

মন্মথ লিলির পাশে গিয়া দাঁড়াইল, ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—

মন্মথঃ ভেবেছিলাম আজ আপনি একলা থাকবেন—

দাশু একটা মুখভঙ্গী করিল; ফটিক যেন শুনিতে পায় নাই এমনিভাবে সিগারেট ধরাইল। লিলি মিষ্ট হাসিয়া বলিল—

লিলিঃ একলা থাকবার কি যো আছে, মন্মথবাবু! এই দেখুন না, ফটিকবাবু নেমন্তন্ন করেছেন, গ্র্যান্ড হোটেলে যেতে হবে। সেখানে আজ বল্ ডান্স্ আছে।

মন্মথঃ (নিরাশকণ্ঠে) বল্ ডান্স্!

লিলিঃ বসুন না, এখনো আমাদের বেরুতে দেরি আছে। এক গ্লাস ঘোলের সরবৎ আনতে বলব?

মন্মথঃ না, থাক—

মন্মথ একটা চেয়ারে উপবেশন করিল। এই সময় লিলির গলায় একটি সুন্দর জড়োয়া কণ্ঠি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া লিলি নিজের গলায় হাত দিল।

লিলিঃ কী সুন্দর পেন্ডেন্ট্ দেখেছেন, মন্মথবাবু? আজ ফটিকবাবু উপহার দিলেন।

মন্মথ এ পর্যন্ত লিলিকে কোনও দামী জিনিস উপহার দিতে পারে নাই; তাহার মুখে ঈর্ষামিশ্রিত লজ্জা ফুটিয়া উঠিল। ফটিক সবিনয় তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল—

ফটিকঃ তুচ্ছ জিনিস, তুচ্ছ জিনিস, লিলি দেবী। আপনার মরাল-গ্রীবার যোগ্য নয়।

দাশু আসিয়া টেবিলের উপর শূন্য গেলাস রাখিল।

দাশুঃ আমার কথাটা ভুলবেন না, লিলি দেবী। আসছে হপ্তায় আমার পার্টিতে যেতেই হবে, না গেলে ছাড়ব না। আপনার জন্যই এত আয়োজন করছি।

লিলিঃ তা যাবার চেষ্টা করব। জানেন মন্মথবাবু, দাশুবাবু এত ভাল পার্টি দেন যে কী বলব। চার পাঁচ হাজার টাকা খরচ করেন।

দাশুঃ চার পাঁচ হাজার টাকা আর এমন কি বেশী! আমার সমস্ত জমিদারীটাই আপনার পায়ে তুলে দিতে রাজি আছি, লিলি দেবী। কিন্তু আপনি নিচ্ছেন কই?

লিলিঃ তা কি আমি নিতে পারি? মন্মথবাবু, আপনি বলুন তো, এ রকম উপহার কি কোনও ভদ্রমহিলার নেওয়া উচিত? তাতে কি নিন্দে হয় না?

ফটিকঃ ও আলোচনা এখন থাক। দেরি হয়ে যাচ্ছে। মন্মথবাবু, আপনি যদি আসতে চান তো আসুন না। নাচতে জানেন নিশ্চয়?

মন্মথঃ (অপ্রতিভ ও মর্মাহত) আমি—আমি—নাচতে জানি না—

ফটিকঃ তাতে কি? আমরা আপনাকে নাচাব অখন—মানে, আমাদের নাচ দেখতে দেখতেই শিখে যাবেন।

মন্মথঃ (শুষ্কস্বরে) না, আজ আমাকে সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে হবে। কাল রাত্রে বাড়িতে চোর ঢুকেছিল।

দাশুঃ (চমকিয়া) চোর!

ফটিকঃ চোর!!

লিলিঃ কিছু চুরি গেছে নাকি?

মন্মথঃ না, চুরি যায়নি। কিন্তু সাবধান থাকা দরকার। আচ্ছা আজ আমি চল্লাম, আর একদিন আসব।

লিলিঃ নিশ্চয় আসবেন, ভুলবেন না যেন।

মন্মথ প্রস্থান করিলে তিনজনে উদ্বিগ্নভাবে পরস্পর মুখের পানে চাহিল।

ফটিকঃ এ আবার এক নতুন ফ্যাসাদ। চোর! হয়তো সূর্যমণির ওপর আর কারু নজর পড়েছে—

দাশুঃ আমরা তোড়জোড় করে কাজটা বেশ গুছিয়ে এনেছি, এখন যদি আর কেউ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়ে যায়—

ফটিকঃ লিলি, আর নয়, চট্‌পট্ জাল গুটিয়ে ফ্যালো। নইলে জেলের মাছ চিলে ছোঁ মারবে। কলকাতা শহরে আমাদের মতন অনেক ঘাগী জাল পেতে ব'সে আছে।

লিলিঃ হুঁ। আমি ভাবছি সূর্যমণির দিকে হাত বাড়াবে এত বুকের পাটা কার?—কানামাছি নয় তো?

দাশুঃ কানামাছি—!

তিনজনের মুখেই আশঙ্কার ছায়া ঘনীভূত হইল।

ডিজল্‌ভ্।

পরদিন প্রাতঃকাল। যদুনাথের লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া দিবাকর এক তাড়া নোট গুনিতেছে; তাহার সম্মুখে একটি বাঁধানো হিসাবের খাতা। নোট গোনা শেষ হইলে সে নোটগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া হিসাবের খাতা টানিয়া লইল। কিন্তু কি করিয়া সংসারের হিসাব লিখিতে হয় তাহা তাহার জানা নাই; সে খাতাটা কয়েকবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া শেষে তাহার প্রথম পৃষ্ঠায় পেন্সিল দিয়া লিখিতে আরম্ভ করিল।

এই সময় ঠাকুর-ঘর হইতে পূজারতির ঘণ্টা ও নন্দার গানের আওয়াজ ভাসিয়া আসিল। দিবাকর কয়েক মুহূর্ত স্থির হইয়া শুনিল, তারপর নোটগুলি পকেটে পুরিয়া এবং হিসাবের খাতাটি বগলে লইয়া লাইব্রেরী হইতে বাহির হইল।

ঠাকুর-ঘরে তখন সূর্য-দেবতার পূজা আরম্ভ হইয়াছে। যদুনাথ এক হাতে ঘণ্টা নাড়িয়া পূজা করিতেছেন; নন্দা সূর্যের স্তব গাহিতেছে।

নন্দাঃ নমো নমো হে সূর্য,
তুমি জীবন জয়-তূর্য।
জবাকুসুম সঙ্কাশম্
সকল কলুষ-তম নাশম্,
নমো নমো হে সূর্য।
চির-জ্যোতির্ময়, অন্তর-পঙ্ক
বহ্নিপ্রবাহে কর অকলঙ্ক।
তব কাঞ্চন লাবণ্য

যুগে যুগে ধন্য হে ধন্য,
সুন্দর, ত্রিভুবন পূজ্য
নমো নমো হে সূর্য ॥

দিবাকর দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। যদুনাথ তাহাকে দেখিতে পাইয়া হস্ত সংকেতে তাহাকে ভিতরে আসিয়া বসিতে বলিলেন। দিবাকর এক কোণে আসিয়া বসিল এবং দেবতাটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

গান শেষ হইলে যদুনাথ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিলেন। নন্দা গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল. দিবাকর অবনত হইয়া যুক্ত কর কপালে ঠেকাইল। যদুনাথ উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিলেন—

যদুনাথঃ দিবাকর. আমার ঠাকুরকে চিনতে পারলে?

দিবাকরঃ আজ্ঞে না. এমন ঠাকুর আমি কখনো দেখিনি। কে ইনি?

যদুনাথঃ (ঈষৎ হাসিয়া) ইনিও দিবাকর।

দিবাকরঃ আজ্ঞে!!

যদুনাথঃ দিবাকর. সূর্য. হিরণ্ময় পুরুষ, জগতের প্রাণ, জীবের জীবন। সোনার মণ্ডলের মধ্যে পদ্মরাগমণি; বিগ্রহ দেখে চিনতে পারলে না! ইনিই আমার কুলদেবতা।

দিবাকরঃ পদ্মরাগমণি! এতবড় পদ্মরাগমণির তো অনেক দাম!

যদুনাথঃ দাম! টাকা দিয়ে এর দাম হয় না, দিবাকর। এই সূর্যমণি আমার বংশে সাত-পুরুষ ধ'রে আছেন। ইনি যতদিন আছেন. ততদিন কোনও অনিষ্ট আমার বংশকে স্পর্শ করতে পারবে না।

সকলে ঠাকুর-ঘরের বাহিরে আসিলেন। যদুনাথ দরজায় তালা লাগাইয়া চাবির গোছা কোমরে গুঁজিলেন।

যদুনাথঃ তোমাকে সকালে খরচের টাকা দিয়েছি। যেমন যেমন খরচ হচ্ছে, হিসেব রাখছো তো?

দিবাকরঃ আজ্ঞে রাখছি। কিন্তু হিসেবটা ঠিক রাখা হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না। যদি একবার দেখিয়ে দেন—

যদুনাকঃ সংসারের খুঁটিনাটি হিসেব রাখা শক্ত বটে।—আমার চশমা—(চশমা খুঁজিলেন) কোথায় রেখেছি। নন্দা. তুমি দেখিয়ে দাও কি করে হিসেব রাখতে হবে।

নন্দাঃ আচ্ছা, আসুন আমার সঙ্গে—

নন্দার পিছু পিছু দিবাকর ড্রয়িংরুমে গেল। নন্দা একটা সোফায় বসিয়া বলিল—

নন্দাঃ কই দেখি. কি হিসেব লিখেছেন।

দিবাকর সোফার পাশে দাঁড়াইয়া হিসাবের খাতা নন্দাকে দিল।

নন্দাঃ দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না। এইখানে বসুন।

নন্দা নিজের পাশে নির্দেশ করিল। দিবাকর বিহ্বল হইয়া পড়িল!

দিবাকরঃ আমি—না না—আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই—

নন্দাঃ কি মুশকিল! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন? এত সংকোচ কিসের?

দিবাকরঃ না না. সংকোচ নয়। কিন্তু আপনার পাশে—

নন্দাঃ আমার পাশে বসলে কোনও ক্ষতি হবে না. আমার সংক্রামক রোগ নেই। আপনি দেখছি ভারি সেকেলে।

দিবাকরঃ মোটেই না। তবে—

নন্দাঃ তবে আপনার মনে নিজের সম্বন্ধে ক্ষুদ্রতা-বোধ আছে।—দিবাকরবাবু, নিজেকে ছোটো মনে করবেন না. অতীতের কথা ভুলে যান। ভাবতে শিখুন, আপনি কারুর চেয়ে হীন নয়। তবেই অতীতকে কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

দিবাকরঃ তাহলে বসি—? (সঙ্কুচিতভাবে বসিল)

নন্দাঃ (হাসিয়া) হ্যাঁ. অনেকটা হয়েছে। এবার দেখি খাতা।

নন্দা খাতা খুলিল।

কাট্।

উপরে নিজের ঘরে মন্মথ সাজগোজ করিতেছিল। কোট পরিয়া ড্রেসিং টেবিল হইতে মণি-ব্যাগ লইয়া খুলিয়া দেখিল তাহাতে মাত্র দুই-তিনটি টাকা আছে। মন্মথর কপালে উদ্বেগ-রেখা পড়িল। সে অধর দংশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

কাট্।

নীচে ড্রয়িংরুমে নন্দা দিবাকরের হিসাব দেখিয়া কলকণ্ঠে হাসিতেছে।

নন্দাঃ এ কী লিখেছেন! এ-রকম ক'রে বুঝি হিসেব লেখে?

দিবাকঃ (লজ্জাবিমূঢ়) আমি জানি না; আপনি শিখিয়ে দিন।

নন্দাঃ (সদয় কণ্ঠে) আপনি কখনো লেখেননি তাই ভুল করেছেন। নইলে হিসেব লেখা খুব সহজ; তার জন্যে বি-এ এম-এ পাস করতে হয় না। এই দেখুন।— যে খাতায় হিসেব লিখবেন তাকে দু'ভাঁজ করুন। এই ভাবে—কেমন? এটা হ'ল জমার দিক, আর এটা খরচের দিক। বুঝলেন? এখন পাতার মাথায় আজকের তারিখ দিন। (নিজেই তারিখ লিখিল)—হয়েছে? আচ্ছা, আজ দাদু আপনাকে কত টাকা দিয়েছেন?

দিবাকরঃ পঞ্চাশ টাকা। তার মধ্যে খরচ হয়েছে—

নন্দাঃ খরচের কথা পরে হবে। এখন জমার পঞ্চাশ টাকা এই দিকে লিখুন— (নিজেই লিখিল)—আজ যদি দাদু আপনাকে আরও টাকা দেন তাহলে এই দিকে জমা করবেন—

দিবাকরঃ এইবার বুঝেছি। খরচের হিসেব এই দিকে থাকবে। আমায় খাতা দিন, এবার আমি লিখতে পারব।

নন্দা হাসিতে হাসিতে তাহাকে খাতা ফিরাইয়া দিল।

এই সময় মন্মথ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছিল। সে অর্ধেক সিঁড়ি নামিবার পর নন্দা হাসিমুখে ড্রয়িংরুম হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং উপরে উঠিতে লাগিল। মন্মথকে সকালবেলা সাজ-গোজ করিয়া বাহির হইতে দেখিয়া সে একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করিল না।

মন্মথ হল-ঘরে নামিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল, যেন কাহাকেও খুঁজিতেছে। তারপর ড্রয়িংরুমের পর্দা সরাইয়া ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে জানিল না, নন্দা সিঁড়ির অর্ধপথে দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে।

দিবাকরকে ড্রয়িংরুমে দেখিয়া মন্মথ প্রবেশ করিল। দিবাকর মনোযোগের সহিত খাতা লিখিতেছিল, সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মন্মথঃ তুমি নতুন বাজার-সরকার না? কি নাম তোমার?

দিবাকরঃ দিবাকর।

মন্মথঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। দ্যাখো, আমার হঠাৎ কিছু টাকার দরকার হয়েছে। তোমার কাছে টাকা আছে তো?

দিবাকরঃ আছে—

মন্মথঃ আমাকে আপাতত গোটা পঁচিশ দাও তো।

দিবাকরঃ আজ্ঞে—তা—হিসেবে কী খরচ লিখব?

মন্মথঃ হিসেবে কিছু লেখবার দরকার নেই। তুমি নতুন লোক, তাই জানো না। দাও দাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে—

দিবাকরঃ কিন্তু কর্তাবাবু যখন হিসেব চাইবেন, তখন এই পঁচিশ টাকার কী হিসেব দেব?

মন্মথঃ আঃ, তুমি দেখছি একেবারেই গবেট্। দাদুকে এ টাকার কথা বলবে না। হিসেবের খাতা তোমার হাতে, তুমি adjust ক'রে নেবে—বুঝলে? ভুবনবাবুও তাই করত—

দিবাকর ফ্যাল্ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। ইতিমধ্যে নন্দা যে নিঃশব্দে আসিয়া দ্বারের

কাছে দাঁড়াইয়াছে তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া উভয়ে চমকিয়া উঠিল।

নন্দা: দাদা—!

নন্দা কাছে আসিয়া তীক্ষ্ম তিরস্কারের চক্ষে মন্মথর পানে চাহিল। ধরা পড়িয়া গিয়া মন্মথ কাঁচুমাচুভাবে চক্ষু নত করিল।

নন্দা: দাদা, এ তুমি কী করছ, নিজের কর্মচারীকে জুচ্চুরি করতে শেখাচ্ছ?

মন্মথ: আমি—আমার কিছু টাকার দরকার।

নন্দা: টাকার দরকার! মাসের পয়লা হাত-খরচের টাকা তুমি পাওনি?

মন্মথ: এঁ—পেয়েছিলাম। কিন্তু—

নন্দা: এই এগারো দিনে একশ' টাকা খরচ করে ফেলেছ! কিসে খরচ করলে? (মন্মথ নীরব) দাদা, কি করো এত টাকা নিয়ে। দাদু যদি জিগ্যেস করেন, তখন কী জবাব দেবে?

মন্মথ: (ভয় পাইয়া) না না, দাদু জান্‌তে পারবেন কেন? আমার পকেট থেকে টাকা চুরি গিয়েছিল—তাই—

নন্দা: কেন মিছে কথা বলছ দাদা, তুমি খরচ করেছ। কিসে খরচ করেছ তুমিই জানো। কিন্তু এসব ভাল কথা নয়।

নন্দার তিরস্কার মন্মথর অসহ্য বোধ হইতেছিল, কিন্তু এ সময় মেজাজ দেখাইবার সাহস তাহার নাই; সে প্যাঁচার মত মুখ করিয়া দ্বারের দিকে চলিল।

নন্দা: শোনো। বাইরে যাচ্ছ দেখছি। হাতে কি একটিও টাকা নেই?

মন্মথ: না।

নন্দা: দিবাকরবাবু, দাদাকে পাঁচটা টাকা দিন।

দিবাকর: (টাকা দিয়া) হিসেবে কি লিখব?

নন্দা: আমার নামে খরচ লিখুন; আমি এখনও হাত-খরচের টাকা নিইনি।—কিন্তু দাদা, মনে থাকে যেন!

মন্মথ: আচ্ছা আচ্ছা—

মন্মথ একরকম রাগ করিয়াই চলিয়া গেল। ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে এই কলহের সাক্ষী হইয়া দিবাকর বড়ই অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিল এবং হিসাবের খাতার আড়ালে আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছিল! নন্দা তাহার ভাব দেখিয়া একটু হাসিল, বলিল—

নন্দা: দিবাকরবাবু, দাদা টাকাকড়ি সম্বন্ধে বড় আল্‌গা। দাদুকে আজকের কথা যেন বলবেন না।

দিবাকর: না না।

নন্দা: আর একটা কথা। রাত্রি দশটার পর আমরা কেউ বাড়ির বাইরে থাকি দাদু পছন্দ করেন না। কিন্তু দাদা প্রায়ই দেরি ক'রে বাড়ি ফেরে। একথাটাও দাদুর কানে না ওঠে। দাদু সেকেলে মানুষ—

দিবাকর: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কাউকে কোনও কথা আমি বলব না। কিন্তু মন্মথবাবু যদি আবার টাকা চান?

নন্দা: (দৃঢ়স্বরে) আপনি দেবেন না।

ওয়াইপ্।

লিলির ড্রয়িংরুম। লিলি সোফায় অঙ্গ এলাইয়া চকোলেট চিবাইতেছে এবং একটা সচিত্র বিলাতী পত্রিকার ছবি দেখিতেছে। ঘরে আর কেহ নাই।

মন্মথ প্রবেশ করিল। তাহার দুই হাত পিছনে লুক্কায়িত, মুখে হাসি।

মন্মথ: মিস লিলি, আপনার জন্যে একটা জিনিস এনেছি।

লিলি হাস্যোজ্জ্বল মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

লিলি: মন্মথবাবু! কি জিনিস এনেছেন। দেখি দেখি—

একটি গোলাপ ফুলের তোড়া মন্মথ লিলির সম্মুখে ধরিল। লিলির মুখ দেখিয়া বোঝা গেল সে নিরাশ হইয়াছে, কিন্তু সে চকিতে মনোভাব গোপন করিয়া হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল।

লিলিঃ বাঃ! কি সুন্দর ফুল! আমি গোলাপ ফুল বড্ড ভালবাসি।

মন্মথঃ আমি কিন্তু অন্য ফুল ভালবাসি।

লিলিঃ সত্যি? কী ফুল ভালবাসেন?

মন্মথঃ কমল ফুল—যার বিলিতি নাম লিলি।

লিলিঃ (সলজ্জ মুখভঙ্গী করিয়া) কী দুষ্টু আপনি!

মন্মথ গদ্‌গদ-মুখে লিলির একটা হাত চাপিয়া ধরিল।

মন্মথঃ লিলি! সত্যি বলছি, তোমাকে আমি লভ্‌ করি। এত দিন মুখ ফুটে বলতে পারিনি; যখনি বলতে চেয়েছি, হয় দাশুবাবু নয় ফটিকবাবু—

এই সময় যেন তাক্‌ বুঝিয়া দাশু প্রবেশ করিল! লিলি তাড়াতাড়ি হাত ছাড়াইয়া লইল।

লিলিঃ ওঃ! দাশুবাবু—

মন্মথ ক্রোধে মুখ বিশ্বম্ভর করিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দাশু লিলির কাছে আসিয়া ছদ্ম বিরক্তির সহিত বলিল—

দাশুঃ ভেবেছিলাম আপনি একলা থাকবেন,—কিন্তু—। (তোড়া দেখিয়া) ফুল কোথা থেকে এল? মন্মথবাবু এনেছেন নাকি?

লিলিঃ হ্যাঁ, কি সুন্দর ফুল দেখুন, দাশুবাবু!

দাশুঃ (অবজ্ঞাভরে) ফুল আমি অনেক দেখেছি, লিলি দেবী। ফুল মন্দ জিনিস নয়; কিন্তু তার দোষ কি জানেন? শুকিয়ে যায়, বাসি হয়ে যায়; দু'দিন পরে আর কেউ তার পানে ফিরে তাকায় না।—

মন্মথ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গভীর ভ্রূকুটি করিয়া দাশুর পানে তাকাইয়া ছিল; দাশু কিন্তু তাহার ভ্রূকুটি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিয়া বলিয়া চলিল—

দাশুঃ কিন্তু দুনিয়ায় এমন জিনিস আছে যা শুকিয়ে যায় না, বাসি হয় না; যার সৌন্দর্য চিরদিন অম্লান থাকে—এই দেখুন।

দাশু পকেট হইতে একটি মখ্‌মলের ক্ষুদ্র কৌটা লইয়া লিলির চোখের সামনে খুলিয়া ধরিল; সোনার আংটিতে কমলকাট্‌ হীরা ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল। দাশু মন্মথর দিকে মুখ বাঁকাইয়া একটু হাসিল।

দাশুঃ ফুলের চেয়ে এর কদর বেশী, লিলি দেবী।

লিলি আগ্রহাতিশয্যে ফুলের তোড়াটা টেবিল লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিল, তারপর আংটির কৌটা হাতে লইয়া উদ্দীপ্তচক্ষে দেখিতে লাগিল। তোড়াটা টেবিলের কানায় লাগিয়া মেঝেয় পড়িল।

লিলিঃ কি চমৎকার হীরের আংটি। মন্মথবাবু, দেখুন দেখুন—

মন্মথ অন্ধকার মুখে ফুলের তোড়াটা তুলিয়া টেবিলের উপর রাখিল এবং লিলির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

লিলিঃ দেখছেন, হীরেটা জ্বলজ্বল করছে! নতুন কিনলেন বুঝি, দাশুবাবু?

দাশুঃ না, আমার ঠাকুরমার গয়নার বাক্সে ছিল; কত দিন থেকে আমাদের বংশে আছে তার ঠিক নেই। স্যাকরাকে দেখিয়েছিলাম, সে বললে আড়াই হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিতে রাজি আছে। আমি দিলাম না। হাজার হোক বংশের একটা 'এয়ারলুম'—

মন্মথ মনে মনে জ্বলিতেছিল, আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; বিকৃতমুখে বলিয়া উঠিল—

মন্মথঃ কী 'এয়ারলুম' দেখাচ্ছেন আপনি! এ আবার একটা হীরে! আমার বাড়িতে যে-জিনিস আছে তা দেখলে ট্যারা হয়ে যাবেন।

দাশু ভ্রূভঙ্গী করিয়া কিছুক্ষণ মন্মথর পানে চাহিয়া রহিল।

দাশ্ন: বটে? কি জিনিস আছে আপনার বাড়িতে?

মন্মথ: সূর্যমণির নাম শোনেননি কখনো? লিলি দেবি, আপনিও শোনেননি?

লিলি: না। সে কি জিনিস, মন্মথবাবু?

মন্মথ: অ্যাত বড় বিলিতি বেগুনের মতন একটা পদ্মরাগমণি—যাকে রুবি বলে। আমাদের বংশে সাত পুরুষ ধ'রে আছে।

লিলি: অ্যাঁ—সত্যি! টমাটোর মতন রুবি! কত দাম হবে, মন্মথবাবু?

মন্মথ: দাম তার সাত পয়জার। টাকা দিয়ে কিনবে এমন লোক ভারতবর্ষে নেই।

লিলি: উঃ! এত দামী রুবি! আমার যে ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে। মন্মথবাবু, একবারটি দেখাতে পারেন না?

মন্মথ: (থতমত হইয়া) সে—সে আমাদের গৃহদেবতা, ঠাকুর-ঘরে থাকে। দাদু সর্বদা ঠাকুর-ঘরে চাবি দিয়ে রাখেন।

দাশু: (ব্যঙ্গ হাস্য করিয়া) বিলিতি বেগুনের মতন রুবি দেখা আমাদের কপালে নেই। কি আর করবেন, লিলি দেবী, আপাতত এই মটরের মতন হীরেটাই দেখুন।—পছন্দ হয়?

লিলি মুগ্ধভাবে নিরীক্ষণ করিল।

লিলি: খুব পছন্দ হয়। কিন্তু—

দাশু: তাহলে ওটা আপনিই নিন্। আপনাকে উপহার দিলাম।

লিলি: অ্যাঁ—না না, এত দামী জিনিস—

দাশু জোর করিয়া লিলির আঙুলে আংটি পরাইয়া দিল।

দাশু: দামী জিনিসই আপনার হাতে মানায়। আমি আমার দামী জিনিস ঠাকুর-ঘরে বন্ধ করে রাখি না—

লিলি: ধন্যবাদ দাশুবাবু। আপনার মতন উঁচু মেজাজ—

দাশু: থাক থাক, আমাকে লজ্জা দেবেন না। বরং তার বদলে চলুন নদীর ওপর বেড়িয়ে আসা যাক। আমার মোটর লঞ্চটা তৈরি ক'রে রেখেছি। দু'জনে গঙ্গার বুকে—খুব আমোদ হবে।

লিলি: শুধু আমরা দু'জন—আর কেউ নয়?

দাশু: কেন, তাতে দোষ কি? আমি ভদ্রলোক, আপনি ভদ্রমহিলা—এতে আপত্তির কী আছে?

লিলি: না না, আপত্তি নয়, কিন্তু—। মন্মথবাবু, আপনিও চলুন না।

এই সব কথা শুনিতে শুনিতে মন্মথ একেবারে নিভিয়া গিয়াছিল। লিলির প্রস্তাবে তাহার মুখে একটা একগুঁয়ে ভাব ফুটিয়া উঠিল।

মন্মথ: না। আমি চললাম—

সে দ্বারের দিকে চলিল। দাশু ও লিলির মধ্যে একটা চোখের ইশারা খেলিয়া গেল। লিলি দ্রুত গিয়া মন্মথকে দ্বারের কাছে ধরিয়া ফেলিল। '

লিলি: মন্মথবাবু, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, শুনুন।

মন্মথকে হাত ধরিয়া আড়ালে লইয়া গিয়া লিলি চুপি চুপি বলিল—

লিলি: দেখুন, দাশুবাবু খুবই ভদ্রলোক, সচ্চরিত্র সজ্জন ব্যক্তি। তবু, ওঁর সঙ্গে যদি একলা যাই, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে। কিন্তু আপনি সঙ্গে থাকলে কারুর কিছু বলবার থাকবে না। আপনি চলুন, মন্মথবাবু।

মন্মথর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মন্মথ: তুমি যখন বলছ, লিলি, নিশ্চয় যাব।

লিলি তাহার হাত ধরিয়া ভিতরে আনিল।

লিলি: দাশুবাবু, এ'কে রাজি করিয়েছি। আমরা তিনজনেই যাব।

দাশু ক্ষুব্ধতার অভিনয় করিয়া বলিল—

দাশু: তা—আপনার যখন ইচ্ছে—উনিও চলুন। তাহলে আর দেরি নয়, চট্‌পট্ বেরিয়ে

পড়া যাক।

ডিজল্ভ্।

সন্ধ্যার প্রাক্কাল। যদুনাথের লাইব্রেরী ঘরে দিবাকর একাকী বইভরা আলমারিগুলির কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; দু'একটা বই খুলিয়া পাতা উল্টাইতেছে, আবার রাখিয়া দিতেছে। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয়, বইগুলি তাহার পড়িবার ইচ্ছা। কিন্তু সাহস নাই।

এই সময় বাহিরে গাড়ি-বারান্দার সম্মুখে মোটর হর্ণের শব্দ হইল—দিবাকর উৎকর্ণ হইয়া শুনিল—

কাট্।

গাড়ি-বারান্দায় যদুনাথের মিনার্ভা গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে; ইঞ্জিন সচল। যদুনাথ গাড়ির দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া অধীরভাবে সদর দরজার দিকে তাকাইতেছেন। তাঁহার গলায় চাদর, হাতে আবলুশের লাঠি। বাহিরে যাইবার সাজ।

যদুনাথঃ ওরে নন্দা, আয় না। আর কত সাজ-গোজ করবি? দেরি হয়ে যাচ্ছে যে—

নন্দা বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহারও সাজপোশাক বহির্গমনের উপযোগী, কিন্তু মুখ একটু উদ্বেগের ছায়া।

যদুনাথঃ আয় আয়, কত দেরি করলি বল দিকি! সন্ধ্যের পর হয়তো দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। আয়।

নন্দা আমতা আমতা করিয়া বলিল—

নন্দাঃ দাদু, আজ তুমি একাই যাও, আমি আর যাব না—

যদুনাথঃ যাবিনে? কেন? কি হ'ল আবার—

নন্দাঃ হয়নি কিছু। তবে, বাড়িতে কেউ থাকবে না, দাদাও বেরিয়েছে—

যদুনাথঃ তাতে কি হয়েছে? আমরা তো যাব আর আসব; বড় জোর এক ঘণ্টা! তাছাড়া ঠাকুর-ঘরের চাবি আমার পকেটে।

নন্দাঃ তবু—

যদুনাথঃ দিনের বেলা তোর এত ভয় কিসের? চাকর-বাকর রয়েছে, দিবাকর রয়েছে। না না, চল, তুইও না হয় দু'চারখানা বই কিনিস!—(উচ্চকণ্ঠে) ওহে দিবাকর!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দিবাকর ভিতর হইতে আসিয়া দাঁড়াইল।

দিবাকরঃ আজ্ঞে!

যদুনাথঃ হ্যাঁ—দ্যাখো, আমি আর নন্দা একটু বেরুচ্ছি, গোটা কয়েক বই কিনতে হবে। তা—তুমি চারদিকে নজর রেখো।

দিবাকরঃ যে আজ্ঞে—

যদুনাথঃ আয় নন্দা।

নন্দা পলকের জন্য দিবাকরের পানে অনিচ্ছা-সংশয়-ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তারপর গাড়িতে উঠিল। যদুনাথও উঠিলেন।

গাড়ি চলিয়া গেল; দিবাকর দাঁড়াইয়া দূরায়মান গাড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। গাড়ি ফটকের বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেলে, তাহার মুখের ভাব অল্পে অল্পে পরিবর্তিত হইতে লাগিল; একটা কঠিন সতর্ক তীক্ষ্ণতা তাহার চোখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল; নাসাপুট চাপা উত্তেজনায় স্ফুরিত হইতে লাগিল।

পকেট হইতে একটা চকচকে নূতন চাবি বাহির করিয়া সে মুঠি খুলিয়া দেখিল; তাহার মুখে একটা ত্বরিত সঙ্কল্পের অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইল। সে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

হল-ঘরে তখন সন্ধ্যার ম্লানিমা নামিয়াছে। দিবাকর একবার চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইল,

কেহ নাই; তখন সে অলস পদে ঠাকুর-ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

ঠাকুর-ঘরের দ্বারে নিরেট মজবুত তালা ঝুলিতেছে। আর একবার চারিদিকে ক্ষিপ্র-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দিবাকর নিঃশব্দে তালাতে চাবি পরাইল।

হঠাৎ এই সময় অদূরে টেবিলের উপর টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। তাহার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ দিবাকরের কানে বজ্রনাদের ন্যায় মনে হইল। সে ত্বরিতে তালা হইতে চাবি বাহির করিয়া ছুটিয়া গিয়া টেলিফোন ধরিল, বিকৃতস্বরে বলিল—

দিবাকরঃ হ্যালো—

কিছুক্ষণ শুনিয়া তাহার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল।

দিবাকরঃ (দাঁত চাপিয়া) না।

টেলিফোন রাখিয়া ফিরিতেই সে দেখিল সেবক কখন পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সেবকঃ কে টেলিফোন করেছিল, ছ্যাকড়াগাড়িবাবু?

দিবাকরঃ রং নম্বর।

সেবকঃ ও। আচ্ছা ছ্যাকড়াগাড়িবাবু, আপনি টেলিফোন করতে জানেন?

দিবাকরঃ (সন্দিগ্ধভাবে) কেন বল দেখি?

সেবকঃ তাহলে একবার থানায় টেলিফোন ক'রে দেখুন না, চোরের কোনও সুলুক সন্ধান পাওয়া গেল কিনা।

দিবাকর কিছুক্ষণ স্থিরনেত্রে সেবককে নিরীক্ষণ করিল।

দিবাকরঃ চোরের জন্যে তুমি ভারি ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছ দেখছি। কিন্তু মনে কর, চোর যদি হঠাৎ এম্‌নি ক'রে তোমার সামনে হাজির হয়, তখন কি করবে?

দিবাকর এমন মুখভঙ্গী করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল যে সেবক দুই পা পিছাইয়া গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল—

সেবকঃ কি করব? আমাকে চেনেন না, ছ্যাকড়াগাড়িবাবু! চোরকে লেঙ্গি মেরে মাটিতে ফেলে তার বুকে হাঁটু দিয়ে চেপে বস্‌বো, আর চেঁচাব—পুলিস! পুলিস!

দিবাকর সেবকের পিঠ চাপড়াইয়া গম্ভীরমুখে বলিল—

দিবাকরঃ বেশ বেশ। বীর বটে তুমি।

সন্তুষ্ট সেবক কাঁধ হইতে ঝাড়ন লইয়া টেবিল ঝাড়িতে আরম্ভ করিল। দিবাকর ধীরপদে উপরে উঠিয়া গেল।

ডিজল্‌ভ্‌।

ঘণ্টাখানেক গত হইয়াছে। হল-ঘরে আলো জ্বলিয়াছে, কিন্তু ঘরে কেহ নাই।

বাহিরে মোটরের শব্দ হইল; তারপর সদর দরজা ঠেলিয়া নন্দা প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে কয়েকটা নূতন বই হাতে লইয়া যদুনাথ।

যদুনাথ লাইব্রেরী ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন; নন্দা কিন্তু হল-ঘরে দাঁড়াইয়া চারিদিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়িল। ঘরে কেহ নাই কেন? সব গেল কোথায়?

একটি ভৃত্য কয়েকটা থালা গেলাস হাতে লইয়া ভিতরের দিক হইতে ভোজনকক্ষে যাইতেছে দেখিয়া নন্দা তাহাকে ডাকিল—

নন্দাঃ বেচু, সেবক কোথায়?

বেচুঃ তা তো জানিনে দিদিমণি। আমি রান্নাঘরে ছিলাম।

নন্দাঃ আর—দিবাকরবাবু?

বেচুঃ তেনাকে তো বিকেল থেকে দেখিনি।

বেচু চলিয়া গেল। নন্দার উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি পাইল। সে গিয়া ড্রয়িংরুমের পর্দা সরাইয়া উঁকি মারিল, কিন্তু সেখানে কাহাকেও না দেখিয়া লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করিল। লাইব্রেরী ঘরে যদুনাথ নূতন বইগুলি সযত্নে আলমারিতে সাজাইতেছিলেন, বলিলেন—

যদুনাথঃ কী রে নন্দা? কিছু খুঁজছিস?

নন্দাঃ না দাদু, অমনি—

আবার বাহিরে আসিয়া নন্দা ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

কাট্।

দ্বিতলে আপন ঘরে দিবাকর টেবিলের সম্মুখে বসিয়া আছে। তাহার সামনে চক্চকে পর-চাবিটি রাখা রহিয়াছে, দিবাকর একদৃষ্টে চাবির পানে তাকাইয়া আছে। তাহার ললাটে সংশয়ের ভ্রূকুটি।

দ্বারে মৃদু টোকা পড়িল। দিবাকর বিদ্যুদ্বেগে চাবি পকেটে পুরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাড়াতাড়ি গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

দ্বারের বাহিরে নন্দা। দিবাকরকে দেখিয়া তাহার চক্ষুদুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তারপর সে একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

দিবাকরঃ আপনারা ফিরে এসেছেন! আমি জান্‌তে পারিনি!

নন্দাঃ কি করছিলেন একলাটি ঘরে ব'সে?

দিবাকরঃ কিছু না। হিসাবের খাতাটায় চোখ বুলোচ্ছিলাম।—কিছু দরকার আছে কি?

নন্দাঃ না, দরকার আর কি? নীচে আপনাকে দেখতে পেলাম না, তাই ভাবলাম—(লজ্জিতভাবে ঢোক গিলিয়া) বাজারে একটা কলম দেখলাম, পছন্দ হল তাই কিনে আনলাম—

নন্দা একটি ফাউন্টেন পেন্ দিবাকরকে দেখাইল। দিবাকর কলম হাতে লইয়া দেখিতে দেখিতে হাসিমুখে বলিল—

দিবাকরঃ সুন্দর কলম। কিন্তু আপনার তো আরও অনেক কলম আছে—।

নন্দাঃ (অপ্রস্তুতভাবে) এটা আপনার জন্যে কিনেছি।

দিবাকরঃ (বিস্ফারিত চক্ষে) আমার জন্যে!

নন্দাঃ হ্যাঁ। (জড়িত স্বরে) আপনাকে হিসেব লিখতে হয়—তাই—। কলমটা পছন্দ হয়েছে তো?

দিবাকর তন্মতমুখে নন্দার পানে চাহিয়া নম্রকণ্ঠে বলিল—

দিবাকরঃ নন্দা দেবী, আপনাকে কী ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব? আমার ঋণ ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে—

নন্দাঃ না না, এই সামান্য জিনিসের জন্যে—

দিবাকরঃ শুধু এই সামান্য জিনিসের জন্যে নয়। আপনার বিশ্বাস, আপনার সমবেদনা—আমাকে আমার অতীত ভুলিয়ে দেবার এই চেষ্টা—এ ঋণ আমি শোধ করব কি করে? পারব না; কিন্তু আমি যেন এর যোগ্য হ'তে পারি।

কলমটি দু'হাতের মধ্যে লইয়া সে মাথা নত করিল।

গভীর রাত্রি। দূরে গির্জার ঘড়িতে বারোটা

দিবাকর নিজের ঘরে টেবিলের সম্মুখে বসিয়া আছে; তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয়, সে যেন জীবনের চৌমাথায় পৌঁছিয়া কোন্ পথে যাইবে ভাবিয়া পাইতেছে না।

নবলব্ধ কলমটা তাহার বুক-পকেটে আটকান ছিল, সে তাহা বাহির করিয়া নিবিষ্ট চক্ষে নিরীক্ষণ করিল। কলমের শিরস্ত্রাণ খুলিয়া হিসাবের খাতার একটা পাতায় ধীরে ধীরে লিখিল—সূর্যমণি।

কিছুক্ষণ লেখার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে লেখাটা কাটিয়া দিল, তাহার নীচে লিখিল—নন্দা। তারপর আবার লিখিল—নন্দা নন্দা—

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

অতঃপর অনুমান তিন হপ্তা কাটিয়া গিয়াছে।

যদুনাথের লাইব্রেরী ঘর। নন্দা বৈকালিক চায়ের সাজসরঞ্জাম লইয়া ব্যস্ত। যদুনাথ চশ্মা পরিয়া দিবাকরের হিসাবের খাতা পরীক্ষা করিতেছেন। দিবাকর তাঁহার চেয়ারের পাশে দণ্ডায়মান। আজ মাসপয়লা।

নন্দা এক পেয়ালা চা ঢালিয়া যদুনাথের দিকে বাড়াইয়া দিল, কিন্তু তিনি তাহা লক্ষ্য করিলেন না; খাতা দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—

যদুনাথঃ হিসেবে গোলমাল আছে!

নন্দা চমকিয়া উঠিল। দিবাকর যদুনাথের দিকে ঝুঁকিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল—

দিবাকরঃ গোলমাল! কিন্তু—

যদুনাথঃ আলবৎ গোলমাল আছে। হয় ঠিকে দিতে ভুল করেছ, নয়তো—। নন্দা, তুই হিসেব দেখেছিস?

নন্দাঃ (শঙ্কিত কণ্ঠে) না দাদু। দিবাকরবাবু কি সব ভণ্ডুল ক'রে ফেলেছেন?

যদুনাথঃ ভণ্ডুল! একেবারে লণ্ডভণ্ড। (দিবাকরকে কড়াসুরে) আজ বাইশ দিন হ'ল তুমি কাজ করছ। তুমি বলতে চাও এই বাইশ দিনে আটশ' টাকা খরচ হয়েছে!

দিবাকরঃ আজ্ঞে আটশ' তিন টাকা ছয় আনা। বড্ড বেশি হয়েছে কি?

যদুনাথ হিসাবের খাতা টেবিলের উপর আছড়াইয়া গর্জন ছাড়িলেন—

যদুনাথঃ চোর! ডাকাত!! ঐ ভুবনটা আস্ত ডাকাত ছিল। তার আমলে দু' হাজার টাকার কমে মাস কাট্‌ত না! উঃ এক বছর ধ'রে পোঁচেয়ে পোঁচিয়ে আমার গলা কেটেছে! হতভাগা! পাজি! রাস্কেল!

নন্দা ও দিবাকর যুগপৎ আরামের নিশ্বাস ফেলিল।

নন্দাঃ তাহলে এবার খরচ কম হয়েছে!

যদুনাথঃ এতক্ষণ তাহলে বলছি কি? কিন্তু এত কম হ'ল কী ক'রে? তুমি কারুর বকেয়া ফেলে রাখোনি তো?

দিবাকরঃ আজ্ঞে এক পয়সা বকেয়া ফেলে রাখিনি।

যদুনাথঃ হুঁ—ভুবনটাকে পেলে জেলে দিতাম। (দিবাকরের দিকে হাত বাড়াইয়া) দেখি তোমার হাত।

দিবাকরঃ হাত!

যদুনাথঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হাত, তোমার করকোষ্ঠি দেখব।

দিবাকরের ডান হাতটা টানিয়া লইয়া যদুনাথ দেখিতে লাগিলেন; নন্দা ও দিবাকর একবার সশঙ্ক দৃষ্টি বিনিময় করিল।

যদুনাথঃ হুঁ খাঁটি মেষ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এগুলো কি? খুব্রি খুব্রি দাগ রয়েছে!

নন্দাঃ ওতে কি হয় দাদু?

যদুনাথঃ কারাগার বাস। তুমি কখনও জেলে গেছ?

দিবাকরঃ জেলে! আজ্ঞে কখ্খনো না।—তবে একবার স্বদেশীর হিড়িকে পুলিস ধ'রে হাজতে রেখেছিল— •

যদুনাথঃ হুঁ—তাই বোধহয়। রেখাগুলো কিন্তু ভাল নয়।

তিনি সন্দিগ্ধভাবে রেখাগুলির দিকে চাহিয়া রহিলেন। নন্দা তাঁহার মন বিষয়ান্তরে সঞ্চারিত করিবার জন্য বলিল—

নন্দাঃ দাদু, তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

দিবাকরের হাত ছাড়িয়া যদুনাথ চায়ের বাটি টানিয়া লইলেন; কতকটা আত্মগতভাবেই

বলিলেন—

যদুনাথ: ও রেখা যার হাতে আছে তাকে কখনও না কখনও কারাবাস করতেই হবে—

নন্দা: (হালকা সুরে) তা রেখাগুলো রবার দিয়ে ঘ'ষে মুছে ফেলা যায় না?

যদুনাথ: পাগলি! রবার দিয়ে কি কপালের লেখা মোছা যায়!

এই সময় মন্মথ প্রবেশ করিল। সামুদ্রিক গবেষণা চাপা পড়িল। নন্দা চা ঢালিয়া মন্মথকে দিল। এই অবকাশে দিবাকর হিসাবের খাতাটি লইয়া দ্বারের দিকে চলিতেছিল, যদুনাথ তাহাকে ডাকিলেন—

যদুনাথ: দিবাকর, তুমি চা খেলে না?

দিবাকর: আজ্ঞে আমি চা খাই না; অভ্যেস নেই।

যদুনাথ: না না, চায়ের অভ্যেস ভাল। একটা ছোট নেশা থাকলে বড় নেশার দিকে মন যায় না। টিকে নিলে যেমন বসন্ত হয় না, চা খেলে তেমনি হুইস্কি ব্রান্ডির খপ্পরে পড়বার ভয় থাকে না। নাও, আজ থেকে দু'বেলা চা খাবে।

নন্দা: আসুন দিবাকরবাবু, সাবধানের মার নেই। এই নিন।

দিবাকর আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নন্দার হাত হইতে চায়ের পেয়ালা লইল—এই সময় মন্মথর দিকে তাহার নজর পড়িল। মন্মথর মুখ বিরক্তিপূর্ণ; ভৃত্যস্থানীয়ের সহিত এরূপ রসালাপ সে পছন্দ করে না। দিবাকর চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল; প্রভু-পরিবারের সম্মুখে চা পান করিবার ধৃষ্টতা তাহার নাই।

মন্মথ বিরাগপূর্ণ নেত্রে নন্দাকে নিরীক্ষণ করিয়া যদুনাথের দিকে ফিরিল।

মন্মথ: দাদু, নন্দার বিয়ের কিছু করছ?

এই প্রশ্নের অন্তরালে যে একটা খোঁচা আছে তাহা অনুভব করিয়া নন্দার মুখ শক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু সে কিছু বলিবার পূর্বেই যদুনাথ বলিলেন—

যদুনাথ: নন্দার এখন বিয়ের যোগ নেই। ওর কোষ্ঠি দেখেছি, শুক্রের দশায় রাহুর অন্তর্দশা আরম্ভ হয়েছে। এখন তিন বছর বিয়ের যোগ নেই।

নন্দা: দাদু, দাদার বিয়ের কি করছ?

মন্মথ: আমি এখন বিয়ে করব না।

যদুনাথ: হ্যাঁ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি কী! আরও ক'টা মাস যাক।

মন্মথ: কিন্তু নন্দার বিয়ে একটু তাড়াতাড়ি হ'লেই ভাল হত।

নন্দা: দাদার বিয়েও তাড়াতাড়ি হ'লে ভাল হত।

এই পরোক্ষ কথা কাটাকাটি বোধকরি আরও কিছুক্ষণ চলিত, কিন্তু এই সময় সেবক দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সেবক: স্যাকরাবাবু এসেছে! পাঠিয়ে দেব?

যদুনাথ: কে—নবীন? হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঠিয়ে দে।

চামড়ার ব্যাগ হাতে নবীন স্যাকরা প্রবেশ করিল। মধ্যবয়স্ক, মধ্যাকৃতি, পৃষ্টমধ্যদেশ; চোখে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চশমা। মাথা ঝুঁকাইয়া প্রণামপূর্বক নবীন ব্যাগটি টেবিলের উপর রাখিল।

নবীন: নন্দা-দিদির লকেট-হার এনেছি।

নন্দা: (সহর্ষে) আমার লকেট-হার!

ব্যাগ হইতে একটা ছোট কৌটা বাহির করিয়া নবীন যদুনাথের চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরিল। নীল মখমলের আসনে একটি সরু সোনার হার, তাহার মধ্যস্থলে হীরামুক্তাখচিত একটি পেন্ডেন্ট্।

নন্দা দাদুর পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল; যদুনাথ গহনাটি দেখিয়া নন্দার হাতে তুলিয়া দিতে দিতে বলিলেন—

যদুনাথ: বাঃ, খাসা গড়েছ হে নবীন। এই নে, নন্দা।

নন্দা কৌটাটি হাতে লইয়া কিছুক্ষণ আনন্দোজ্জ্বল চোখে চাহিয়া রহিল; তারপর মন্মথ যেখানে জানালার পাশে দাঁড়াইয়া চা পান করিতেছিল সেইখানে ছুটিয়া গেল।

ইতিপূর্বে দাদার সহিত যে বেশ একটু কথা-কথান্তর হইয়া গিয়াছে তাহা আর তাহার মনে রহিল না।

নন্দাঃ দাদা, দেখ দেখ, কী সুন্দর!

মন্মথ নূতন গহনাটি দেখিল; তাহার মনের মধ্যে ঈর্ষার মতন একটা দাহ জ্বলিয়া উঠিল। আহা, এমনি একটি গহনা সে যদি লিলিকে দিতে পারিত তাহা হইলে তাহার মান থাকিত। সে শুষ্ক স্বরে বলিল—

মন্মথঃ বেশ, ভাল।

মন্মথ ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। নন্দা তখন ফিরিয়া আসিয়া যদুনাথের পায়ের ধুলো লইল।

যদুনাথঃ বেঁচে থাক্। এখন যা, নিজের ঘরে গিয়ে গলায় প'রে দ্যাখ—

নন্দা চলিয়া গেলে যদুনাথ নবীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

যদুনাথঃ নবীন, তোমার হিসেব এনেছ?

নবীনঃ আজ্ঞে এনেছি—

নবীন আবার ব্যাগ খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

কাট্।

দ্বিতলে মন্মথর ঘর। মন্মথ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিরসমুখে সাজগোজ করিতেছে। নন্দার নূতন অলঙ্কারটি দেখিয়া তাহার মন খারাপ হইয়া গিয়াছে। সে কল্পনায় ঐ অলঙ্কারটি লিলির কণ্ঠে শোভিত দেখিতেছে এবং মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতেছে। দাশু ও ফটিক লিলিকে নিত্য নূতন উপহার দিয়া থাকে আর তাহার সে ক্ষমতা নাই। ছি ছি, লিলি হয়তো মনে করে, মন্মথ কৃপণ, ক্ষুদ্রমনা—

ওদিকে নন্দা নিজের ঘরে আসিয়া আয়নার সম্মুখে নূতন হারটি গলায় পরিয়াছিল এবং উৎফুল্ল মুখে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিল। তৃপ্তির একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া সে হারটি গলা হইতে খুলিয়া আবার কৌটার মধ্যে রাখিল। এই সময় দ্বারের নিকট হইতে সেবকের গলা আসিল—

সেবকঃ দিদিমণি, কর্তা তোমাকে একবার নীচে ডাকছেন।

নন্দাঃ যাই সেবক—

কৌটাটি পড়ার টেবিলের উপর রাখিয়া নন্দা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইল।

মন্মথ নিজের ঘর হইতে সেবকের কথা ও নন্দার উত্তর শুনিয়াছিল। সে টাই বাঁধিতে বাঁধিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া উৎকর্ণভাবে শুনিতে লাগিল; তাহার চোখের দৃষ্টি উত্তেজনায় তীব্র হইয়া উঠিল।

বারান্দায় সেবক ও নন্দার পদশব্দ মিলাইয়া গেলে মন্মথ চোরের মত দরজা খুলিয়া এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিল। কেহ নাই। সে দ্রুত বারান্দা পার হইয়া নন্দার ঘরে প্রবেশ করিল।

ঠিক এই সময় দিবাকর নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সে মন্মথকে নন্দার ঘরে প্রবেশ করিতে দেখে নাই, কিন্তু সিঁড়ির দিকে দু'এক পা অগ্রসর হইতেই সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিল, মন্মথ নন্দার ঘর হইতে বাহির হইয়া বিদ্যুদ্বেগে নিজের ঘরে প্রবেশ করিল এবং দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

দিবাকর সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। মন্মথ সম্ভবত দিবাকরকে দেখিতে পায় নাই; কিন্তু সে নন্দার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল কি জন্য? এবং এমন সন্দেহজনকভাবে বাহির হইয়া আসিল কেন? নন্দা কি নিজের ঘরে আছে? ব্যাপারটা যেন ঠিক স্বাভাবিক নয়। দিবাকর সংশয়িত চিত্তে দাঁড়াইয়া ঘাড় চুল্কাইতে লাগিল।

কাট্।

সিঁড়ির নিম্নতন সোপানে দাঁড়াইয়া নন্দা যদুনাথের সহিত কথা কহিতেছে। যদুনাথ বলিতেছেন—

যদুনাথঃ বলছিলাম, আজ আর নূতন গয়নাটা প'রে কাজ নেই। কাল রবিবার, কাল পরিস। কেমন?

নন্দাঃ আচ্ছা দাদু—

যদুনাথঃ আর দ্যাখ, দিবাকর বোধ হয় ওপরে আছে, তাকে ব'লে দিস্ হিসেবের খাতায় যেন নোট ক'রে রাখে, সোমবার দিন ব্যাঙ্ক থেকে বারো শ' টাকা বের করতে হবে। নবীনকে আসতে বলেছি, যেন ভুল না হয়।

নন্দাঃ আচ্ছা দাদু—

সে আবার উপরে উঠিয়া গেল।

কাট্।

উপরের বারান্দায় পৌঁছিয়া নন্দা দেখিল, দিবাকর অনিশ্চিতভাবে দাঁড়াইয়া মাথা চুল্কাইতেছে।

নন্দাঃ এ কি, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে!

দিবাকরঃ না, কিছু নয়।

নন্দাঃ শুনুন। দাদু বললেন, খাতায় নোট ক'রে রাখুন, সোমবারে ব্যাঙ্ক থেকে বারো শ' টাকা বার করতে হবে। যেন ভুল না হয়।

খাতা দিবাকরের সঙ্গেই ছিল, সে নোট করিয়া লইল।

দিবাকরঃ কি জন্যে টাকা বার করতে হবে তা কিছু বলেননি?

নন্দাঃ স্যাকরাকে দিতে হবে।

দিবাকরঃ ও—(নোট করিয়া) স্যাকরাকে যখন টাকা দিতে হবে তখন নিশ্চয় গয়না এসেছে। এবং বাড়িতে গয়না পরবার লোক যখন আপনি ছাড়া আর কেউ নেই তখন নিশ্চয় আপনার গয়না। কেমন?

নন্দাঃ (হাসিয়া) ঠিক ধরেছেন। আপনার দেখছি ডিটেক্টিভ হ'তে আর দেরি নেই। কী গয়না বলুন দেখি?

দিবাকরঃ তা জানি না।

নন্দাঃ তবে আর কী ডিটেক্টিভ হলেন! আসুন দেখাচ্ছি। ভারি সুন্দর পেণ্ডেন্ট হার!

নন্দা নিজের ঘরে প্রবেশ করিল; দিবাকর পিছন পিছন গেল।

নন্দা টেবিলের সম্মুখীন হইয়া দেখিল হারের বাক্স নাই। সে ক্ষণকাল অবুঝের মত চাহিয়া রহিল।

নন্দাঃ এ কি! কোথায় গেল?

দিবাকরঃ কী কোথায় গেল?

নন্দাঃ হারের কোটো। টেবিলের ওপর রেখে এক মিনিটের জন্যে নীচে গিয়েছিলাম—

দিবাকরের মুখ গম্ভীর হইল। সে বুঝিতে পারিল হারের কৌটা কোথায় গিয়াছে।

দিবাকরঃ অন্য কোথাও রাখেননি তো?

নন্দা দ্রুত গিয়া ওয়ার্ডরোব খুলিয়া দেখিল।

নন্দাঃ না, এখানেও নেই।

সে ফিরিয়া আসিয়া দিবাকরের সম্মুখে দাঁড়াইল; তাহার মুখ এই অল্পকালের মধ্যেই বিবর্ণ ও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

নন্দাঃ কেউ নিয়েছে। নইলে যাবে কোথায়?

দিবাকরঃ আপনি বলছেন—কেউ চুরি করেছে?

নন্দাঃ তা ছাড়া আর কী হতে পারে? কর্পূরের মতন উপে যেতে তো পারে না!

দিবাকর একটু চুপ করিয়া রহিল; তাহার মুখে একটি অস্বচ্ছন্দ হাসি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল।

দিবাকরঃ বাড়িতে জানা চোর এক আমিই আছি। সুতরাং আমাকে সন্দেহ করাই স্বাভাবিক।

নন্দাঃ আমি আপনাকে সন্দেহ করতে চাই না। কিন্তু আর তো কেউ নেই।—উঃ, আমি কত আশা করেছিলাম—! আমার সব আশা মিছে হয়ে গেল—

নন্দা হঠাৎ যেন ভাঙিয়া পড়িল; সে চেয়ারে বসিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিল। দিবাকর ক্ষণকাল করুণচক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

দিবাকরঃ আপনি যে আমাকে সন্দেহ করতে চান না সেজন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু এখন আপনি কি করবেন?

নন্দা মুখ তুলিল।

নন্দাঃ কী করব?—একথা তো আর লুকিয়ে রাখা যায় না; দাদুকে বলতে হবে। সব কথাই এখন দাদুকে বলতে হবে।

দিবাকরঃ সব কথা?

নন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল, একটু ঝোঁক দিয়া বলিল—

নন্দাঃ হ্যাঁ, সব কথা। দাদুকে ঠকিয়েছিলাম তার ফল এখন পাচ্ছি। কোনও কথাই আর চেপে রাখা চলবে না, দিবাকরবাবু।

নন্দা দ্বারের দিকে পা বাড়াইল।

দিবাকরঃ আমার একটা অনুরোধ আপনি রাখবেন?

নন্দাঃ অনুরোধ!

দিবাকরঃ আজ কর্তাকে কিছু বলবেন না। যা হারিয়েছে তা যদি রাত্তিরের মধ্যে না পাওয়া যায় তখন যা হয় করবেন।

নন্দা তীক্ষ্ম চক্ষে দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিল; একটু ইতস্তত করিল।

নন্দাঃ আচ্ছা বেশ। আজ রাত্তিরটা সময় দিলাম।

সে আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িল। দিবাকর একবার মাথা ঝুঁকাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ওয়াইপ্।

কয়েক মিনিট অতীত হইয়াছে।

বাড়ি হইতে ফটকে যাইবার পথের ধারে একটা হাস্নুহেনার ঝোপের আড়ালে দিবাকর লুকাইয়া আছে এবং বাড়ির সদর লক্ষ্য করিতেছে। তাহার চোখে শিকারপ্রতীক্ষ ব্যাধের দৃষ্টি।

সদর দরজা দিয়া মন্মথ বাহির হইয়া আসিল; একবার হাত দিয়া নিজের পকেট অনুভব করিল, তারপর দ্রুতপদে ফটকের দিকে চলিল।

দিবাকরের কাছাকাছি আসিতেই দিবাকর হঠাৎ একটা চীৎকার ছাড়িয়া ঝোপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং ছুটিয়া গিয়া মন্মথকে একেবারে জড়াইয়া ধরিল।

দিবাকরঃ পালান পালান! সাপ! সাপ!!

মন্মথঃ অ্যাঁ! সাপ!

দুজনে জাপ্টাজাপ্টি করিয়া প্রায় পতনোন্মুখ হইল; তারপর একসঙ্গে ফটকের দিকে ছুটিল। ফটকের বাহিরে আসিয়া মন্মথ হাঁপাইতে হাঁপাইতে থামিল।

মন্মথঃ কি সাপ?

দিবাকরঃ হাস্নুহেনার ঝাড়ের মধ্যে ছিল—ইয়া বড় কেউটে সাপ। আর একটু হ'লেই মেরেছিল ছোবল! যাক, আর ওদিকে যাবেন না; আমি সাপ মারার ব্যবস্থা করছি।

মন্মথ: কি আপদ!

মন্মথ আর একবার নিজের পকেট অনুভব করিয়া দেখিল, পকেটের জিনিস পকেটেই আছে। সে তখন আর কোনও কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।

ডিজল্‌ভ্‌।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। লিলির ঘরে নৃত্য গীত চলিতেছে। দাশু পিয়ানো বাজাইতেছে; লিলি নাচিতেছে। ফটিক ঘরের এক কোণে বসিয়া নৃত্যের তালে তালে তুড়ি দিতেছে; অন্য কোণে মন্মথ বসিয়া অপলক নেত্রে চাহিয়া আছে। লিলি নাচিতে নাচিতে গাহিতেছে—

লিলি: আমার কল্পনাতে চল্‌ছে জাল-বোনা
মনের ওপর রঙের আল্‌পনা।
আমরা দু'জন বাঁধব সুখনীড়
অজানা কোন্‌ গিরি-নদীর তীর
রইব দূরে—কারুর কথা মানব না!
কল্পনাতে চল্‌ছে জাল-বোনা।—

মোদের ছোট্ট খেলা-ঘর
খেলব মোরা নতুন বধূ-বর
সোনার স্বপন প্রেমের স্বপন ভাঙব না!
কল্পনাতে চল্‌ছে জাল-বোনা।—

ডাক্‌বে ময়ূর মোদের আঙিনায়
নাচবে হরিণ তরুণ ভঙ্গিমায়
মোরা দেখব শুধু ভুলেও তাদের বাঁধব না!
কল্পনাতে চল্‌ছে জাল-বোনা!

নাচগান সমে আসিয়া থামিলে লিলি মন্মথর সম্মুখে গিয়া হাসিমুখে দাঁড়াইল। মন্মথ উঠিয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিল।

লিলি: কেমন লাগল, মন্মথবাবু?

মন্মথ: কি বলব, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।—আপনার জন্যে সামান্য উপহার এনেছি, তাই দিয়ে মনের ভাব বোঝাবার চেষ্টা করি।—

মন্মথ পকেট হইতে মখমলের কৌটাটি বাহির করিল। দাশু ও ফটিক উপহারের নামে কাছে আসিয়া জুটিল; মন্মথ বেশ একটু আড়ম্বরের সহিত বাক্সটি খুলিয়া লিলির সম্মুখে ধরিতে গিয়া চমকিয়া উঠিল। বাক্স শূন্য, হার নাই! মন্মথ বুদ্ধিভ্রষ্টের মত চাহিয়া রহিল।

মন্মথ: অ্যাঁ—কোথায় গেল!

সে ক্ষিপ্রহস্তে দুই পকেট খুঁজিয়া দেখিল কিন্তু কিছু পাইল না। তাহার মুখ পাংশু হইয়া গেল।

মন্মথ: নিশ্চয় কেউ আমার পকেট মেরেছে—

দাশু ও ফটিক হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। লিলির অধরেও একটা চাপা হাসি খেলিয়া গেল—

লিলি: কি ছিল, মন্মথবাবু?

মন্মথ: জড়োয়া পেন্ডেন্ট্‌ হার। বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছি তখনও ছিল—অ্যাঁ!

দিবাকরের সর্পভীতির কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। তবে কি—তবে কি—? মন্মথ ধীরে ধীরে চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

লিলি: তবে বোধহয় রাস্তায় কোথাও পড়ে গেছে। কী আর হবে? যা গেছে তার জন্যে দুঃখ ক'রে লাভ নেই। আসুন মন্মথবাবু, এক গ্লাস সরবৎ খান।——ওরে কে আছিস!

মন্মথ মোহগ্রস্তের ন্যায় বসিয়া রহিল; দাশু ও ফটিক শিস্ দিতে দিতে ঘরের অন্যদিকে চলিয়া গেল। হঠাৎ মন্মথ লাফাইয়া উঠিল; তাহার মুখ চোখ উত্তেজনায় লাল হইয়া উঠিয়াছে।

মন্মথঃ বুঝেছি কে নিয়েছে! ও ছাড়া আর কেউ নয়। দেখে নেব—আজ দেখে নেব আমি!

সে ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। বাকী তিনজন জিজ্ঞাসুনেত্রে পরস্পরের পানে চাহিল।

ফটিকঃ ব্যাপার কি?

দাশুঃ (হাত উল্টাইয়া) বুঝলাম না।

ডিজল্‌ভ্‌।

নন্দা তাহার ঘরে আলো জ্বালিয়া পড়িতে বসিয়াছিল; কিন্তু পড়ায় তাহার মন বসিতেছিল না। তাহার মুখখানি বিষণ্ণ ও উৎকণ্ঠিত।

কিছুক্ষণ বই নাড়াচাড়া করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। বারান্দায় বাহির হইয়া দেখিল, দিবাকরের ঘরের দরজা ভেজানো রহিয়াছে। সে সন্তর্পণে দরজা ঠেলিয়া দেখিল, ঘর অন্ধকার, ভিতরে কেহ নাই। নন্দার উৎকণ্ঠা আরও বাড়িয়া গেল। কোথায় গেল দিবাকর, তবে কি তাহাকে মিথ্যা স্তোক দিয়া পলায়ন করিয়াছে? নন্দা নীচে নামিয়া চলিল।

কাট্‌।

হল-ঘরের ঘড়িতে রাত্রি সাড়ে আটটা বাজিয়াছে। নন্দা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে নামিতে দেখিল মন্মথ সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছে। মন্মথর মুখ ক্রোধে বিবর্ণ; সে একবার কট্‌মট্‌ চক্ষে চারিদিকে তাকাইয়া লাইব্রেরী ঘরের দিকে চলিল।

লাইব্রেরীতে যদুনাথ বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলেন; মন্মথ বুনো মোষের মত প্রবেশ করিতেই তিনি বই হইতে মুখ তুলিলেন।

যদুনাথঃ মন্মথ! আজ দেখছি ন'টার আগেই ফিরেছ! কি হয়েছে?

মন্মথঃ দাদু, তুমি ঐ দিবাকরটাকে তাড়িয়ে দাও।

যদুনাথ চশমা খুলিয়া বিস্ফারিত চক্ষে চাহিলেন।

যদুনাথঃ দিবাকরকে তাড়িয়ে দেব! কেন, কি করেছে সে?

মন্মথঃ (থমকিয়া) সে—তাকে আমার পছন্দ হয় না।

যদুনাথঃ পছন্দ হয় না! কিন্তু কেন? একটা কারণ থাকা চাই তো! আমি তো দেখেছি সে ভারি ভাল ছেলে, কাজের ছেলে। ভুবনটা ছিল চোর। দিবাকর আসার পর সংসার খরচ অর্ধেক ক'মে গেছে, তা জানো?

মন্মথঃ কিন্তু ও ভাল লোক নয়, ভারি বজ্জাৎ—

যদুনাথঃ বজ্জাৎ! কোনও প্রমাণ পেয়েছ?

মন্মথঃ প্রমাণ আবার কি? আমি জানি ও ভারি বদ্ লোক।

যদুনাথ ভ্রূকুঞ্চন করিয়া সরোষে মাথা নাড়িলেন।

যদুনাথঃ ছি মন্মথ! যার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই তাকে তুমি বজ্জাৎ বলতে পার না, তুমি যদি দেখাতে পারো যে দিবাকর কোনও অন্যায় কাজ করেছে, আমি এই দণ্ডে তাকে বিদেয় ক'রে দেব। কিন্তু বিনা অপরাধে বাড়ির কুকুর বেরালকেও আমি তাড়াব না। এ তোমার কি রকম স্বভাব হচ্ছে? তুমি তাকে পছন্দ কর না ব'লে তার অন্ন মারতে চাও?

মন্মথ মুখ গোঁজ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, উত্তর দিল না।

যদুনাথঃ যাও। আর যেন এরকম কথা আমাকে শুনতে না হয়। ন্যায়বান হবার চেষ্টা কর, মন্মথ। নিজের চাকর-বাকরের প্রতিও কর্তব্য আছে একথা ভুলে যেও না।

মন্মথ মুখ কালীবর্ণ করিয়া চলিয়া গেল। দ্বারের বাহিরে পর্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া নন্দা সমস্তই শুনিয়াছিল; মন্মথ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলে সেও সংশয়-মন্থর পদে

উপরে চলিল।

কাট্।

উপরে মন্মথ নিজের দরজা ধাক্কা দিয়া খুলিয়া সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল; দেখিল দিবাকর পিছনে হাত দিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার শান্ত মুখে একটু মোলায়েম হাসি।

দিবাকরঃ দরজাটা বন্ধ ক'রে দিন।

দরজা বন্ধ করিয়া মন্মথ প্রজ্বলিত চক্ষে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মন্মথঃ ইউ! তুমি আমার ঘরে কি করছ?

দিবাকরঃ কিছু না, এই ছবিখানা দেখছিলাম।

পিছন হইতে হাত বাহির করিয়া দিবাকর লিলির ফটোখানা মন্মথর চোখের সামনে ধরিল। মন্মথ ক্ষণেকের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল, তারপর এক ঝাপটায় ছবিটা কাড়িয়া লইয়া পকেটে পুরিল।

মন্মথঃ ইউ স্কাউণ্ড্রেল্! বেরোও আমার ঘর থেকে। গেট্ আউট্।

দিবাকরঃ বেরুচ্ছি। কিন্তু তার আগে আপনাকে দু' একটা কথা বলতে চাই। মন্মথ-বাবু, আপনি যে স্ত্রীলোকের ফটো যত্ন করে দেরাজে লুকিয়ে রেখেছেন তার আসল পরিচয় বোধহয় জানেন না—

মন্মথঃ চেপ্ রও উল্লুক! চোর কোথাকার!

বাহিরে বারান্দায় এই সময় নন্দা নিজের ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল; মন্মথর উগ্র কণ্ঠস্বর শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

ঘরের মধ্যে দিবাকরের মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল। সে একটু ভ্রূ তুলিয়া বলিল—

দিবাকরঃ চোর! আপনি আমাকে চোর বলছেন! কেন? আমি আপনার পকেট থেকে এই জিনিসটা তুলে নিয়েছিলাম ব'লে?

দিবাকর পকেট হইতে হারটি লইয়া আঙুলের ডগায় তুলিয়া ধরিল। এবারও মন্মথ ঝাপটা মারিয়া হারটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। ঠিক সময়ে দিবাকর হাত সরাইয়া লইল।

মন্মথঃ তুমি—তুমি!—

দিবাকরঃ (হার পকেটে রাখিয়া) হ্যাঁ, এ হার আমি আপনার পকেট থেকে তুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু এ হার আপনার পকেটে গেল কি ক'রে, মন্মথবাবু? নন্দা দেবীর হার পকেটে নিয়ে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?

মন্মথঃ সে খবরে তোমার দরকার নেই, পাজি রাস্কেল কোথাকার! আমি যাচ্ছি দাদুকে বলতে যে তুমি আমার পকেট মেরেছ!

দিবাকরঃ বেশ তো, চলুন না আমিও সঙ্গে যাচ্ছি। আপনার যা বলবার আপনি বলবেন, আমার বক্তব্য আমি বলব। আপনার বোনের নতুন গয়না নিয়ে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন, জানতে পারলে কর্তা খুব খুশি হবেন। চলুন তাহলে, আর দেরি ক'রে কাজ নেই।

মন্মথ একটা চেয়ারে জবুথবু হইয়া বসিয়া পড়িল; তাহার আর যুদ্ধস্পৃহা রহিল না। ক্লান্তকণ্ঠে বলিল—

মন্মথঃ যাও—যাও আমার সামনে থেকে—

দ্বারের বাহিরে নন্দা প্রায় হতজ্ঞান হইয়া শুনিতেছিল। কে চোর তাহা বুঝিতে তাহার বাকী ছিল না।

দিবাকরঃ মন্মথবাবু, আপনি কোন্ পথে চলেছেন তা একবার ভেবে দেখেছেন কি? নিজের বোনের গয়না চুরি ক'রে আজ আপনি এক অপদার্থ স্ত্রীলোককে দিতে যাচ্ছিলেন। আপনি জানেন না, আপনার মত অনেক লোকের সর্বনাশ করেছে লিলি—এই তার পেশা—

মন্মথর ক্ষাত্রতেজ আর একবার চাগাড় দিয়া উঠিল।

মন্মথঃ দ্যাখো, ভাল হবে না বলছি—

দিবাকরঃ আমি কর্তাকে সব কথাই বলে দিতে পারি। শুনে তিনি সম্ভবত আপনাকে বাড়ি থেকে বার ক'রে দেবেন। কিন্তু আমি তা চাই না। এখনও সামলে যান, মন্মথবাবু, নইলে আপনার ইহকাল পরকাল সব যাবে, লোকালয়ে মুখ দেখাতে পারবেন না।

মন্মথঃ যাও তুমি—

দিবাকরঃ যাচ্ছি। কিন্তু মনে রাখবেন।

সে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে আসিয়াই নন্দার সহিত তাহার চোখাচোখি হইয়া গেল। কোনও কথা হইল না; দিবাকর ঘাড় নীচু করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। নন্দা লজ্জা-লাঞ্ছিত মুখে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে দিবাকরের অনুসরণ করিল।

দিবাকর ঘরে গিয়া চেয়ারে বসিয়াছিল, নন্দা আস্তে আস্তে টেবিলের পাশে দাঁড়াইল। দিবাকর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না। তারপর দিবাকর গম্ভীর মুখে হারটি পকেট হইতে বাহির করিয়া নন্দার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল।

নন্দা হারের পানে ফিরিয়াও চাহিল না। কাতর চক্ষু দিবাকরের পানে তুলিয়া ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বলিল—

নন্দাঃ দিবাকরবাবু, কি ব'লে আপনার কাছে ক্ষমা চাইব?

দিবাকরঃ ক্ষমা চাওয়ার কোনও কথাই ওঠে না, নন্দা দেবী। কিন্তু আশা করি, এর পর আপনার দাদুকে আর কিছু বলবার দরকার হবে না।

নন্দাঃ (অবরুদ্ধ স্বরে) দাদুকে কী বলব। দাদা আমার হার চুরি করেছিল এই কথা দাদুকে বলব! উঃ দিবাকরবাবু, সত্যি বলছি আপনাকে, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। শেষে দাদা এই করলে!

দিবাকরঃ মন্মথবাবুকে খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না। উনি বড় অসৎ সঙ্গে পড়েছেন।

নন্দাঃ এখন বুঝতে পারছি দাদা কিসে এত খরচ করে। কিন্তু থাক ও কথা। দিবাকর-বাবু, আপনাকে অন্যায় সন্দেহ করেছিলাম, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

দিবাকরঃ ক্ষমা করবার কিছু নেই, নন্দা দেবী। আমাকে সন্দেহ ক'রে কিছুমাত্র অন্যায় করেননি। কিন্তু এবার আমাকে যেতে হবে।

নন্দাঃ (শঙ্কিত কণ্ঠে) যেতে হবে!

দিবাকরঃ হ্যাঁ, আমি চাকরি ছেড়ে চ'লে যেতে চাই। দেখুন, আমি যতদিন এ বাড়িতে থাকব, আপনার সন্দেহ যাবে না; আমি চোর একথা আপনি ভুলতে পারবেন না। তার চেয়ে চ'লে যাওয়াই ভাল।

নন্দাঃ আর কখনও আমি আপনাকে অবিশ্বাস করব না।

দিবাকরঃ (ম্লান হাসিয়া) এখন তাই মনে হচ্ছে বটে কিন্তু এর পরে যখনই বাড়িতে কিছু ঘটবে, আপনি আমাকে সন্দেহ করবেন। আপনি এক দণ্ড প্রাণে শান্তি পাবেন না। তার কী দরকার? আপনার অশান্তি আর বাড়াবো না।

নন্দার চক্ষু সহসা অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

নন্দাঃ আপনি এখনও আমাকে ক্ষমা করতে পারেননি, তাই চ'লে যেতে চাইছেন।

দিবাকরঃ না, সেজন্যে নয়। আপনার অশান্তির কথা ভেবেই আমি—

নন্দাঃ আমার অশান্তির কথা আপনাকে ভাবতে হবে না।

দিবাকরঃ আপনি আমার জন্যে যা করেছেন—

নন্দাঃ আমি আপনার জন্যে যা করেছি তার জন্যে যদি আপনার এতটুকু কৃতজ্ঞতা থাকে তাহলে আপনি চ'লে যেতে পাবেন না।

দিবাকর ক্ষণেক নীরব রহিল।

দিবাকরঃ এই যদি আপনার হুকুম হয়—

নন্দাঃ হ্যাঁ, এই আমার হুকুম।

নন্দা দ্রুতপদে দ্বারের পানে চলিল। পিছন হইতে দিবাকর ডাকিয়া বলিল—

দিবাকরঃ আপনার হার ফেলে যাচ্ছেন।

নন্দা কিন্তু দাঁড়াইল না।

· ডিজল্‌ভ্‌।

চন্দ্রহীন রাত্রি। নন্দার ঘরে ক্ষীণ নৈশ দীপ জ্বলিতেছে। নন্দা এখনও শয়ন করে নাই, জানালায় দাঁড়াইয়া নক্ষত্র-খচিত অন্ধকারের পানে চাহিয়া আছে। আজ সে নিজের মনের কথা জানিতে পারিয়াছে; দিবাকরের প্রতি তাহার মনের ভাব শুধুই করুণা ও সহানুভূতি নয়।

তাহার চোখদুটি তারায় তারায় সঞ্চরণ করিতেছে। তারপর তাহার কণ্ঠ হইতে মৃদু বিগলিত সঙ্গীত বাহির হইয়া আসিল—

নন্দাঃ দুজনে কইব কথা কানে কানে—কানে কানে—
যেন তা কেউ না জানে কেউ না জানে।
যে কথা যায়না ধরা যায়না ছোঁয়া
তাহারি বেদন রবে গোপন প্রাণে।
দু'জনে কইব কথা—।
যদি রই দূরে দূরে—দূরে দূরে—
তুমি রও পথের পাশে, আমি রই গৃহচূড়ে
তবুও ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যালোকে
দু'জনে কইব কথা চোখে চোখে।
দু'জনে কইব কথা—।
যদি বা দেখা না পাই হারাই দিশা
নয়নে নেমে আসে অন্ধ নিশা
তখনও ক্ষণে ক্ষণে—ক্ষণে ক্ষণে—
দু'জনে কইব কথা মনে মনে।
দু'জনে কইব কথা—।

কোনও অশরীরী যদি জানালার বাহিরে উপস্থিত থাকিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত, নন্দার জানালার পাশে আর একটি জানালায় একজন বিনিদ্র শ্রোতা দাঁড়াইয়া আছে ও তন্ময় হইয়া গান শুনিতেছে।

ডিজল্‌ভ্‌।

রাত্রি আরও গভীর হইয়াছে। দিবাকর আপন শয্যায় শয়ন করিয়া নিষ্পলক নেত্রে শূন্যে চাহিয়া আছে। ভোগবতীর ন্যায় কোন অন্তর্গূঢ় পথে তাহার চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইতেছে তাহা তাহার মুখ দেখিয়া অনুমান করা যায় না।

নীচে হল-ঘরের ঘড়িতে দুইটা বাজিল। রাত্রির স্তব্ধতায় তাহার আওয়াজ উপরে ভাসিয়া আসিল।

দিবাকর বিছানায় উঠিয়া বসিল। বস্ত্রাদি সম্বরণ করিয়া খাট হইতে নামিল এবং নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইল।

বারান্দা পার হইয়া সে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিল। এই সময় নন্দার ঘরের দ্বার অল্প একটু খুলিয়া গেল। নন্দা মুখ বাড়াইয়া ক্ষণেক সিঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার মুখ আবার সংশয়ের ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়াছে।

নন্দা বাহির হইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত গেল, নীচে উঁকি মারিল; তারপর দ্রুত ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল দিবাকর ফিরিয়া আসিতেছে। তাহার হাতে কি একটা রহিয়াছে, অন্ধকারে ভাল দেখা গেল না।

দিবাকর লঘুপদে নন্দার দ্বারের সম্মুখ দিয়া নিজের ঘরের দিকে যাইবে এমন সময় নন্দার দ্বার সহসা খুলিয়া গেল। দিবাকর থতমত খাইয়া হাত পিছনে লুকাইল।

নন্দা ইশারা করিয়া তাহাকে কাছে ডাকিল, খাটো গলায় বলিল—

নন্দাঃ কোথায় গিয়েছিলেন?

দিবাকরঃ নীচে। একটু দরকার ছিল।

নন্দাঃ এত রাত্রে—কী দরকার?

দিবাকর চুপ করিয়া রহিল।

নন্দাঃ আপনার হাতে ও কি? লুকোচ্ছেন কেন?

দিবাকরঃ একখানা বই।

নন্দাঃ বই!! কী বই? দেখি—

একটু ইতস্তত করিয়া দিবাকর বইখানি নন্দার হাতে দিল। নন্দা বই চোখের কাছে আনিয়া শিরোনামা পড়িয়া অবাক হইয়া গেল। মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনী, বাংলা অনুবাদ।

নন্দাঃ মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনী! এ বই—?

নন্দা উৎফুল্ল বিস্ময়ে দিবাকরের পানে চাহিল। দিবাকর একটু নীরব থাকিয়া ধরা ধরা গলায় বলিল—

দিবাকরঃ পড়ব। মহাপুরুষদের জীবনী আমার মতন পথহারাকে পথ দেখাবার জন্যেই তো লেখা হয়েছে।

নন্দার হৃদয় যেন দ্রবীভূত হইয়া টলমল্ করিতে লাগিল। সে বইখানি দিবাকরের হাতে ফিরাইয়া দিল। মহাপুরুষের পূত জীবনচরিতের উপর তাহাদের হাতে হাত মিলিত হইল।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

সোনালী রৌদ্রভরা প্রভাত।

বাড়ির পাশে গোলাপ বাগান; শিশিরে ঝল্‌মল্ করিতেছে। নন্দা একটি গানের কলি মৃদুকণ্ঠে গুঞ্জন করিতে করিতে ফুল তুলিতেছিল। তাহার মুখখানি শিশির-খচিত অর্ধ-বিকচ গোলাপ ফুলের মতই নবোন্মেষিত অনুরাগের বর্ণে রঞ্জিত।

কয়েকটি সবৃন্ত গোলাপ তুলিয়া নন্দা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। ঠাকুর-ঘর হইতে ঠুং ঠুং ঘণ্টির আওয়াজ আসিতেছে। যদুনাথ পূজায় বসিয়াছেন; যুক্ত করে মুদিত চক্ষে মন্ত্র পড়িতেছেন, আর মাঝে মাঝে ঘণ্টি নাড়িতেছেন। নন্দা আসিয়া দুইটি গোলাপ ফুল ঠাকুরের সিংহাসন প্রান্তে রাখিয়া প্রণাম করিল, তারপর নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

ড্রয়িংরুম। দিবাকর খোলা জানালায় পিঠ দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছে, কাগজে তাহার মুখ ঢাকা পড়িয়াছে। নন্দা আসিয়া টেবিলের ফুলদানীতে ফুল রাখিল। দিবাকর কাগজে মগ্ন, নন্দার আগমন জানিতে পারিল না। নন্দা তখন একটু গলা ঝাড়া দিয়া নিজের অস্তিত্ব জানাইয়া দিল। দিবাকর তাড়াতাড়ি কাগজ নামাইয়া দেখিল, নন্দা ঘাড় বাঁকাইয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

কাট্।

উপরে নিজের ঘরে গিয়া নন্দা বাকি ফুলগুলি ফুলদানীতে সাজাইয়া রাখিল। কিন্তু একটি ফুলের স্থানাভাব ঘটিল, ফুলদানীতে ধরিল না। নন্দা ফুলটি হাতে লইয়া এদিক ওদিক তাকাইল, কিন্তু কোথাও ফুলটি রাখিবার উপযুক্ত স্থান পাইল না। তখন সে মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

দিবাকরের ঘরে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়া নন্দা দেখিল সেখানেও ফুল রাখিবার কোনও পাত্র নাই। দিবাকরের সদ্যপরিষ্কৃত বিছানা পাতা রহিয়াছে। নন্দা গিয়া ফুলটি মাথার বালিশের উপর রাখিয়া দিল, তারপর লজ্জারুণ মুখে ঘর হইতে পলাইয়া আসিল।

কাট্।

নীচে ড্রয়িংরুমে দিবাকর তখনও সংবাদপত্র পাঠ শেষ করে নাই, যদুনাথ লাঠি ধরিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার পশ্চাতে সেবক।

যদুনাথ: এই যে দিবাকর—

দিবাকর তাড়াতাড়ি কাগজ মুড়িয়া আগাইয়া আসিল।

দিবাকর: আজ্ঞে—

যদুনাথ চেয়ারে বসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হয় দিবাকরের প্রতি তাঁহার প্রীতির ভাব আরও গভীর হইয়াছে।

যদুনাথ: তারপর, কাগজে নতুন খবর কিছু আছে নাকি?

দিবাকর: কিছু না। তবে জিনিসপত্তরের দাম বেড়েই চলেছে! একে লগন্সা চলছে, তার ওপর দোলও এসে পড়ল—

যদুনাথ: ওঃ তাই তো, দোল এসে পড়ল; এখনও দোলের বাজার করা হয়নি। সেবক, নন্দাকে ডাক—

সেবক: এবার কিন্তু বাবু আমার এক শিশি চামেলির তেল চাই, তা ব'লে দিচ্ছি।

যদুনাথ: তুই চামেলির তেল কি করবি?

সেবক: বৌ চেয়েছে।

বলিয়া সেবক সলজ্জভাবে নন্দাকে ডাকিতে গেল।

দিবাকর: কি কি বাজার করতে হবে?

যদুনাথ: আমি কি ছাই সব জানি? নন্দা জানে। পুজোর সময় আর দোলের সময় অনেক বাজার করতে হয়; নিজেদের জন্যে, চাকর-বাকরদের জন্যে কাপড়-চোপড়, আরো কত কি। এই যে নন্দা!

সেবকের দ্বারা অনুসৃত হইয়া নন্দা প্রবেশ করিল।

নন্দা: দাদু, আজ কি দোলের বাজার করতে যাওয়া হবে?

যদুনাথ: আজ! তা বেশ, আজই যা।

নন্দা: তুমি যাবে না?

যদুনাথ: আমি পারব না, আমার হাঁটুর ব্যথাটা বেড়েছে। মন্মথ কোথায়?

নন্দা: দাদা ঘুমচ্ছে। দাদা কি ন'টার আগে কোনও দিন বিছানা ছেড়ে ওঠে!

যদুনাথ: হুঁ, লগ্নে কেতু কিনা, ও তো আলসে কুঁড়ে হবেই। তমোগুণ—তমোগুণ। তা দিবাকর যাক তোর সঙ্গে।

নন্দা মনে মনে খুশি হইল, কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ করিল না।

নন্দা: বেশ তো। কেউ একজন হ'লেই হ'ল।

দিবাকর: কি কি কিনতে হবে তার একটা ফিরিস্তি—

নন্দা: ফিরিস্তি আমার তৈরি আছে।

সেবক: আমার চামেলির তেল কিন্তু ভুলো না দিদিমণি।

নন্দা: আচ্ছা আচ্ছা। তুই ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বল্। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়া ভাল, বারোটার আগে ফিরতে পারব।

সেবক: ডেলেভর কোথায়? ডেলেভর তো দু'দিনের ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গেছে।

যদুনাথ: সত্যি তো, আমার মনে ছিল না। তা আজ না হয় থাক; কাল যাস নন্দা।

নন্দা ক্ষুণ্ণ হইল। বাজার করিতে যাইবার প্রস্তাবে বিঘ্ন ঘটিলে মেয়েরা স্বভাবতই মনঃপীড়া পান। দিবাকর তাহা দেখিয়া সঙ্কোচভরে বলিল—

দিবাকর: তা যদি হুকুম করেন আমি মোটর চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব।

যদুনাথ ও নন্দা উভয়েরই চক্ষু বিস্ফারিত হইল।

যদুনাথ: অ্যাঁ! তুমি মোটর চালাতেও জান?

দিবাকর: আজ্ঞে কিছুদিন মোটর-ড্রাইভারের চাকরি করেছিলাম—

যদুনাথঃ বা বা! তুমি তো দেখছি ঝালে ঝোলে অম্বলে সব তাতেই আছ! বেশ বেশ। হবেই বা না কেন? হাজার হোক মেষ! তাহলে নন্দা, দুর্গা ব'লে বেরিয়ে পড়—

নন্দাঃ হ্যাঁ দাদু, আমি পাঁচ মিনিটে তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

নন্দা বস্ত্রাদি পরিবর্তনের জন্য দ্রুত চঞ্চল আনন্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ওয়াইপ্‌।

রাজপথ। যদুনাথের মিনার্ভা গাড়ি দিবাকরের দ্বারা চালিত হইয়া একটি বৃহৎ বস্ত্রালয়ের সামনে আসিয়া থামিল। নন্দা চালকের পাশের আসনে বসিয়াছিল, উভয়ে অবতরণ করিয়া দোকানে প্রবেশ করিল।

এইরূপে এক দোকান হইতে অন্য দোকানে, বস্ত্রালয় হইতে জুতার দোকানে, সেখান হইতে মণিহারীর দোকানে গিয়া বাজার করা যখন শেষ হইল তখন গাড়ির পিছনের আসনে পণ্যদ্রব্য স্তূপীকৃত হইয়াছে।

গাড়িতে বসিয়া ফিরিস্তি দেখিতে দেখিতে নন্দা বলিল—

নন্দাঃ মনে তো হচ্ছে সবই কেনা হয়েছে।

দিবাকরঃ সেবকের চামেলির তেল?

নন্দাঃ হ্যাঁ।

দিবাকরঃ তাহলে এবার ফেরা যেতে পারে?

নন্দাঃ আপনি ফেরবার জন্যে ভারি ব্যস্ত যে!

দিবাকরঃ ব্যস্ত নয়। তবে এখনও গোটা পঞ্চাশেক টাকা বাকি আছে, আর একটা দোকানে ঢুকলে কিছু থাকবে না।

নন্দা হাসিয়া উঠিল। দিবাকর গাড়িতে স্টার্ট দিল, গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল।

নন্দাঃ আপনি দেখছি ভারি হিসেবী।

দিবাকরঃ ভয়ঙ্কর। আপনিই তো শিখিয়েছেন।

নন্দাঃ একেই বলে গুরু-মারা চেলা!

এই সময় একটা মোড়ের কাছে আসিয়া দিবাকর মোটর ঘুরাইবার উপক্রম করিল; নন্দা অমনি স্টিয়ারিংয়ের উপর হাত রাখিয়া গাড়ির গতি সোজা পথে চালিত করিল। গাড়ি আঁকাবাঁকা টাল খাইয়া ঋজু পথে চলিল।

দিবাকর সবিস্ময়ে নন্দার পানে তাকাইল।

দিবাকরঃ এ কি! আর একটু হ'লেই অ্যাক্‌সিডেণ্ট হ'ত।

নন্দাঃ হয়নি তো।

দিবাকরঃ কিন্তু ব্যাপার কি? বাড়ির পথ যে ও দিকে!

নন্দাঃ সামনে কিন্তু সোজা পথ। বাঁকা পথের চেয়ে সোজা পথ কি ভাল নয়?

দিবাকরঃ ভাল। তাহলে কি এখন সোজা পথেই যাওয়া হবে, বাড়ি ফেরা হবে না?

নন্দাঃ বাড়ি ফেরার এখনও ঢের সময় আছে, এই তো সবে সাড়ে দশটা। চলুন, শহরের বাইরে একটু ঘুরে আসা যাক। কত দিন যে খোলা হাওয়ায় বেড়াইনি!

দিবাকরঃ বেশ চলুন। এটা কিন্তু হিসেবের মধ্যে ছিল না।

ডিজল্‌ভ্‌।

নির্জন পথের উপর দিয়া মোটর ছুটিয়া চলিয়াছে। দুই পাশে অবারিত মাঠ, মাঝে মাঝে তরু গুল্ম; দূরে ভাগীরথীর রজতরেখা। নন্দা উৎফুল্ল চঞ্চল চোখে চারিদিকে চাহিতেছে, দিবাকর কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে সম্মুখে তাকাইয়া অবিচলিত মুখে গাড়ি চালাইতেছে।

নন্দাঃ কী চমৎকার! রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে প'ড়ে যায়—

নমো নমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।

দিবাকরঃ হুঁ।

নন্দাঃ কিন্তু আপনি তো কিছুই দেখছেন না। চুপ্‌টি ক'রে ব'সে ব'সে কী ভাবছেন?

দিবাকরঃ ভাবছি—

আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
উষা দিশা হারা নিবিড় তিমির ঢাকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

নন্দা চকিত চক্ষে দিবাকরের পানে চাহিল, যেন দিবাকরের মুখে সে রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রত্যাশা করে নাই।

রাস্তা হইতে এক রশি দূরে ঢিপির উপর একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখা যাইতেছে; মন্দিরটি জীর্ণ এবং পুরাতন।

নন্দাঃ দেখুন দেখুন—মন্দির! বোধহয় শিব মন্দির।

দিবাকরঃ উঁহু। শিব মন্দির হ'লে মাথায় ত্রিশূল থাকত।

নন্দাঃ তবে কার মন্দির?

দিবাকরঃ তা জানি না। হনুমানজীর হ'তে পারে।

নন্দাঃ কখনো না। আমি বলছি শিব মন্দির—(দিবাকর মাথা নাড়িল) বেশ, বাজি রাখুন।

দিবাকরঃ (বিবেচনা করিয়া) এক পয়সা বাজি রাখতে পারি। কিন্তু প্রমাণ হবে কি ক'রে?

নন্দাঃ গাড়ি দাঁড় করান, চোখে দেখলেই সন্দেহ ভঞ্জন হবে।

দিবাকর গাড়ি থামাইল; নন্দা নামিয়া পড়িল।

দিবাকরঃ এক পয়সার জন্যে এত পরিশ্রম করতে হবে?

নন্দাঃ হ্যাঁ, নামুন। চলুন মন্দিরে।

দিবাকর নামিয়া গাড়ি লক্ করিল।

দিবাকরঃ চলুন। কিন্তু মিছে ওঠা-নামা হবে। মন্দিরে হয়তো চাম্‌চিকে আর ইঁদুর ছাড়া কোনও দেবতাই নেই।

নন্দাঃ নিশ্চয় আছে। একটু কষ্ট না করলে কি দেবদর্শন হয়!

রাস্তা ছাড়িয়া দু'জনে মাঠ ধরিল। ঢিপির পাদমূল হইতে ভগ্নপ্রায় এক প্রস্থ সিঁড়ি মন্দির পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে।

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে তাহারা শুনিতে পাইল, কেহ একতারা বাজাইয়া মৃদুকণ্ঠে ভজন গাহিতেছে। নন্দা উজ্জ্বল চক্ষে দিবাকরের পানে চাহিল।

নন্দাঃ শুনছেন?

দিবাকরঃ শুনছি। ছুঁচোর কীর্তন নয়, মানুষ ব'লেই মনে হচ্ছে।

তাহারা মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, ভিতর হইতে এক পুরুষ বাহির হইয়া আসিলেন। বৃদ্ধ ব্যক্তি; চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ; মাথার উপর পাকা চুল চূড়া করিয়া বাঁধা; মুখে প্রসন্ন হাসি। হাতে দুইটি ফুলের মালা লইয়া তিনি নন্দা ও দিবাকরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পুরোহিতঃ এস মা! এস বাবা! এত দূরে কেউ আসে না। আজ তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হ'ল।—এই নাও ঠাকুরের নির্মাল্য। চিরসুখী হও তোমরা, ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ কর।

বৃদ্ধ দু'জনের গলায় মালা দুটি পরাইয়া দিলেন। বৃদ্ধের ভুল বুঝিতে পারিয়া দু'জনে

অতিশয় লজ্জিত হইয়া পড়িল। নন্দা তাড়াতাড়ি টাকা বাহির করিতে করিতে আরক্ত মুখে বলিল—

নন্দাঃ মন্দিরে কোন্ ঠাকুর আছেন?

পুরোহিতঃ মা, আমার ঠাকুরের নাম ননী-চোরা। বৃন্দাবনে যিনি গোপিনীদের ননী চুরি ক'রে খেতেন ইনি সেই বাল-গোপাল।

নন্দা মন্দিরের দ্বারে টাকা রাখিয়া প্রণাম করিল; দিবাকরও প্রণাম করিল। পুরোহিত আবার আশীর্বাদ করিলেন।

পুরোহিতঃ আমার প্রেমময় ঠাকুর তোমাদের মঙ্গল করুন। চিরায়ুষ্মতী হও মা, ফলে ফুলে তোমাদের সংসার ভ'রে উঠুক—

দিবাকর ও নন্দা তাড়াতাড়ি নামিয়া চলিল; পুরোহিত স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অনেকগুলি ধাপ নামিয়া নন্দা একটি চত্বরের মত স্থানে বসিল। মুখে লজ্জার সহিত চাপা কৌতুক খেলা করিতেছে। সে এপাশে ওপাশে চাহিয়া নিরীহভাবে বলিল—

নন্দাঃ বেশ জায়গাটি। ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না।

দিবাকরের মুখ গম্ভীর, কিন্তু চোখে দুষ্টামি উঁকিঝুঁকি মারিতেছে।

দিবাকরঃ হুঁ—কিন্তু আমি ভাবছি—

নন্দাঃ কি ভাবছেন?

দিবাকরঃ ভাবছি ঠাকুরেরও চুরি করা অভ্যেস ছিল।

নন্দাঃ ঠাকুর তো খালি ননী চুরি করতেন।

দিবাকরঃ শুধু ননী নয়, শুনেছি আরও অনেক কিছু চুরি করেছিলেন।

নন্দাঃ যেমন—?

দিবাকরঃ যেমন গোপিনীদের মন।

নন্দাঃ তা সত্যি।—

নন্দা যেন চিন্তিত হইয়া গালে হাত দিল।

দিবাকরঃ কি ভাবছেন?

নন্দাঃ ভাবছি সব চোরেরই কি এক রকম স্বভাব!

দিবারঃ তার মানে?

নন্দাঃ মানে সব চোরই কি মেয়েদের মন চুরি করে!

দিবাকরঃ না না, ও সব বাজে গুজব। চোরেদের স্বভাব মোটেই ওরকম নয়। দেখুন, আপনি চোরেদের নামে মিথ্যে দুর্নাম দেবেন না।

নন্দাঃ অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে আপনি কখনও কোনও মেয়ের মন চুরি করেন নি?

দিবাকরঃ না, কখ্খনো না। ও সব আমার ভালই লাগে না।

নন্দা মুখ টিপিয়া হাসিল। এই সময় মন্দির হইতে একতারা সহযোগে ভজনের সুর ভাসিয়া আসিল। দু'জনে শান্ত হইয়া শুনিতে লাগিল।

পুরোহিতঃ নাচ নাচ মন-মোর—
আওল নওল কিশোর।
প্রেম-চন্দনে অঙ্গ রঙ্গাই
নাচত মাখন-চোর—
নাচ নাচ মন-মোর।
চূড়া-পর, পিঞ্ছ নাচত, নাচে গলে বনমাল
মণি-মঞ্জীর চরণপর চঞ্চল, চপল করে করতাল।
নাচ রে শ্যাম কিশোর, বৃন্দাবন চিত-চোর,
গোপবধূ মন প্রীতি-রস-ঘন
পুলকভরে তনু ভোর—নাচ নাচ মন মোর।

ডিজল্‌ভ্‌।

ঘণ্টাখানেক পরে।

যদুনাথের ফটক। দিবাকর গাড়ি চালাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

এদিকে হল-ঘরের টেবিল ঘিরিয়া তিনজন বসিয়া ছিলেনঃ যদুনাথ, মন্মথ ও পুলিস ইন্সপেকটর। সেবক নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। ইন্সপেকটর গম্ভীর মুখে বলিতেছিলেন—

ইন্সপেকটরঃ যখন চোরের জুতো জোড়া নিয়ে গিয়েছিলাম তখন ভাবিনি যে ও থেকে চোরের কোনও হদিস পাওয়া যাবে। রুটিন মত জুতো জোড়া পরীক্ষার জন্য হেড্‌ অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আজ হেড্‌ অফিস থেকে খবর পেয়েছি—

যদুনাথঃ কী খবর পেয়েছেন?

ইন্সপেকটরঃ আমরা ভেবেছিলাম ছিঁচকে চোর। কিন্তু তা নয়। জুতো থেকে সনাক্ত হয়েছে যে চোর—কানামাছি!

এই সময় একটা আকস্মিক শব্দ শুনিয়া সকলে ফিরিয়া দেখিলেন নন্দা ও দিবাকর অদূরে দাঁড়াইয়া আছে। দিবাকরের হাতে একটা জুতার বাক্স ছিল, তাহা তাহার হাত হইতে খসিয়া মাটিতে পড়িয়াছে। নন্দা যেন পাথরে পরিণত হইয়াছে। দিবাকরের মুখ ভাবলেশহীন; সে নত হইয়া জুতার বাক্সটা তুলিয়া লইল।

যদুনাথ ইন্সপেকটরকে অধীর প্রশ্ন করিলেন—

যদুনাথঃ কানামাছি! সে আবার কে?

ইন্সপেকটরঃ কানামাছির নাম শোনেননি? একজন নামজাদা চোর। খবরের কাগজে তার কথা নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হয়—

নন্দা নিঃশব্দে আসিয়া যদুনাথের পিছনে দাঁড়াইয়াছে। সে একবার দিবাকরের দিকে চোখ তুলিল; তাহার চোখে চাপা আগুন।

মন্মথঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ কাগজে পড়েছি বটে। আপনি বলতে চান্‌ সেই কানামাছি আমাদের বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছিল? কিন্তু জুতো থেকে তা বুঝলেন কি ক'রে?

ইন্সপেটরঃ এর একটা ইতিহাস আছে। প্রায় তিন বছর ধ'রে এই চোর অনেক বড় মানুষের বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছে, অনেক টাকা চুরি করেছে। একলা আসে একলা যায়, তার সঙ্গি-সাথী নেই। কিন্তু একবার সে একজনের বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছিল, বাড়ির লোকেরা জেগে উঠে তাকে তাড়া করে। কানামাছি পালালো, কিন্তু তার পুরোনো জুতো জোড়া ফেলে গেল। সেই জুতো পুলিসের কাছে আছে। আপনার বাড়িতে যে-জুতো পাওয়া গেছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেল, অবিকল কানামাছির পায়ের ছাপ। সুতরাং—

সেবক সানন্দে হাত ঘষিতে লাগিল; যদুনাথ কিন্তু বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

যদুনাথঃ এ তো বড় ভয়ানক কথা। সূর্যমণির ওপর যদি কানামাছির নজর প'ড়ে থাকে —অ্যাঁ—। ইন্সপেকটরবাবু, এ চোর তো আপনাদের ধরতেই হবে।

ইন্সপেকটরঃ ধরা কিন্তু সহজ নয়। কানামাছির চেহারা কেমন আমরা দেখিনি; দেখেছি কেবল তার পায়ের ছাপ। ভেবে দেখুন কলকাতা শহরের লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে পায়ের ছাপ মিলিয়ে চোরকে ধরা কি সম্ভব? একমাত্র তাকে যদি হাতে হাতে ধরা যায় তবেই সে ধরা পড়বে। কিন্তু কানামাছি ভারি সেয়ানা চোর। আমার বিশ্বাস সে আমাদেরই মতন ভদ্রলোক সেজে বেড়ায়, তার বন্ধুবান্ধবও তাকে চোর ব'লে চেনে না। এরকম চতুর-চূড়ামণিকে ধরা কি সহজ, যদুনাথবাবু?

নন্দার অধরোষ্ঠ খুলিয়া গেল; সে যেন এখনি দিবাকরের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিয়া দিবে। কিন্তু তাহার দৃষ্টি পড়িল দিবাকরের উপর। দিবাকর শান্তভাবে তাহার পানে চাহিয়া আছে, যেন সব কিছুর জন্যই সে প্রস্তুত। নন্দা অধর দংশন করিয়া উদ্‌গত বাক্য রোধ করিল।

যদুনাথঃ কিন্তু—তাহলে—আমার সূর্যমণি!

ইন্সপেকটরঃ আপনার সূর্যমণি সম্বন্ধে খুবই সাবধান হওয়া দরকার। পুলিসের দিক

থেকে কোনও ত্রুটি হবে না; আপনিও যাতে সাবধানে থাকেন তাই খবর দিয়ে গেলাম!— আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি। যতদূর জানা আছে, কানামাছি রাত্রে ছাড়া চুরি করে না। আপনি রাত্রে বাড়ি পাহারা দেবার ব্যবস্থা করুন।

যদুনাথঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, আজই আমি দু'টো চৌকিদার রাখব।—কানামাছি—কি সর্বনাশ—অ্যাঁ!

ইন্সপেক্টরঃ আচ্ছা নমস্কার!

নন্দা এতক্ষণে কথা কহিল—

নন্দাঃ একটা কথা। চোরের নামই কি কানামাছি?

ইন্সপেক্টরঃ চোরের নাম কেউ জানে না। কানামাছি নামটা খবরের কাগজের দেওয়া। আসল নামের অভাবে ঐ নামই চ'লে গেছে।

নন্দাঃ ও—

ডিজল্‌ভ্‌।

পূর্ব দৃশ্যের পর মিনিট পনরো গত হইয়াছে।

দিবাকর নিজের ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল, দ্বার খোলার শব্দে ফিরিয়া দেখিল নন্দা প্রবেশ করিতেছে। নন্দার চোখ দুটি সূর্যমণির মতই জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে।

নন্দা দরজা ভেজাইয়া দিয়া দিবাকরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বিদ্রূপশাণিত কণ্ঠে বলিল—

নন্দাঃ আপনি কি সুন্দর গল্প বলতে পারেন! কী অদ্ভুত আপনার উদ্ভাবনী শক্তি! ধন্য আপনি!

দিবাকর চক্ষু নত করিল।

নন্দাঃ কানামাছি! খবরের কাগজওয়ালাদের কি স্পর্ধা আপনাকে কানামাছি বলে! আপনি কানাও নয়, মাছিও নয়। আপনি পাকা চোর—নামজাদা চোর—চতুর চূড়ামণি!!

দিবাকরঃ আমার একটা কথা শুনবেন?

নন্দাঃ আপনার কথা আমি ঢের শুনেছি, অভিনয়ও ঢের দেখেছি। কি অপূর্ব অভিনয়! গরীব—অসহায়—পেটের দায়ে চুরি করতে আরম্ভ করেছেন—

দিবাকরঃ অন্তত ও কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যিই আমি পেটের দায়ে চুরি করতে আরম্ভ করেছিলাম।

নন্দাঃ চুপ করুন। আপনার একটা কথাও সত্যি নয়। সত্যি কথা বলতে আপনি জানেন না। আজই আপনি বলেছেন যে মেয়েদের মন চুরি করতে আপনি জানেন না; কিন্তু মেয়েদের চোখে কি ক'রে ধুলো দিতে হয় তা আপনি বেশ জানেন। মেয়েদের কাছে ন্যাকা সেজে কাজ আদায় করতে আপনার জোড়া নেই।

দিবাকরঃ আমাকে দুটো কথা বলতে দেবেন?

নন্দাঃ কী বলবেন আপনি? আমাকে বোধহয় বোঝাবার চেষ্টা করবেন যে আপনি সূর্যমণি চুরি করতে আসেননি!

দিবাকরঃ না, আমি সূর্যমণি চুরি করতেই এসেছিলাম।

নন্দার বিদ্যুৎ শিখার মত আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল।

নন্দাঃ উঃ! অসহ্য! নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে।

সে ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, ক্ষণেক পরে তাহার ঘরের দরজা দমাস্‌ করিয়া বন্ধ হইল। দিবাকর তাহাকে অনুসরণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল, শব্দ শুনিয়া আবার জানালায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে একবার জানালা দিয়া বাহিরে উঁকি মারিল।

নন্দা নিজের ঘরে গিয়া দরজায় ছিট্‌কিনি লাগাইয়া দিয়াছিল। রাগে ফুলিতে ফুলিতে

ওয়ার্ডরোবের সামনে দিয়া যাইবার সময় সে আয়নায় দেখিল, পূজারী প্রদত্ত মালাটি এখনও তাহার গলায় দুলিতেছে। সে একটানে মালা ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিল। দেয়ালে নন্দার একটি ছবি টাঙানো ছিল, ছিন্ন মালা ছবির ফ্রেমে আট্‌কাইয়া ঝুলিতে লাগিল। ঠাকুরের আশীর্বাদী মালাটা যেন কিছুতেই নন্দাকে ছাড়িবে না।

নন্দা গিয়া খাটের কিনারায় বসিল; ক্লান্তিভারাক্রান্ত একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিল। তাহার উত্তপ্ত ক্রোধ এতক্ষণ তাহাকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল, এখন সে যেন ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

ঘরের জানালা খোলা ছিল। এই সময় দিবাকরকে জানালার বাহিরে দেখা গেল। সে নিঃশব্দে জানালা ডিঙাইয়া ঘরের ভিতর আসিল; একবার চকিত চক্ষে নন্দাকে দেখিয়া লইল।

জানালার কাছেই নন্দার পড়ার টেবিল। দিবাকর দেখিল টেবিলের উপর কয়েকটি ফটো পড়িয়া রহিয়াছে; তন্মধ্যে একটি নন্দার। দিবাকর ছবিটি পকেটে পুরিয়া ঠোঁটের উপর হাত রাখিয়া একটু কাশিল। নন্দা চমকিয়া চোখ তুলিল; দিবাকরকে দেখিয়া সূচীবিদ্ধবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

নন্দাঃ এ কি! আমার ঘরে ঢুকলেন কি ক'রে?

নন্দা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দিবাকর শুষ্কস্বরে বলিল—

দিবাকরঃ শুধু দরজা বন্ধ ক'রে নামজাদা চোরকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

নন্দা বুঝিল, একদিন দিবাকর যেমন ঐ জানালা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, আজ তেমনি অবলীলাক্রমে প্রবেশ করিয়াছে। নন্দার মুখের ভাব তিক্ত হইয়া উঠিল।

নন্দাঃ দেখছি আমার জানলাও বন্ধ করা উচিত ছিল। কিন্তু আমাকে এমনভাবে উত্যক্ত করছেন কেন? আর কি চান আপনি?

দিবাকরঃ আমার সত্যিকার পরিচয় আপনি কাউকে বলেছেন কি?

নন্দাঃ না বলিনি এখনও। কিন্তু বলব, শিগ্‌গিরই বলব।

দিবাকরঃ বেশ, বলবেন। কিন্তু তার আগে আমার কথাও আপনাকে শুনতে হবে। ভয় নেই, আমি নিজের সাফাই গাইব না, চোখে ধুলো দেবার চেষ্টাও করব না। নিছক সত্যি কথা বলব। বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছে।

নন্দা কথা কহিল না, ওষ্ঠাধর চাপিয়া দিবাকরের পানে চাহিয়া রহিল। ইহাকেই অনুমতি বলিয়া গ্রহণ করিয়া দিবাকর ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—

দিবাকরঃ চুরি করবার যে একটা নেশা আছে তা বোধহয় আপনি জানেন না; জানবার কথাও নয়। প্রথম যখন আমি চুরি করতে আরম্ভ করি তখন আমার বয়স পনরো-ষোল বছর। বাবা সামান্য চাকরি করতেন, কিছু সঞ্চয় করতে পারেননি। তিনি হঠাৎ মারা গেলেন; সংসারে রইলাম শুধু মা আর আমি। কেউ সাহায্য করল না, কেউ একবার ফিরে তাকাল না। আমার তখনও রোজগার করবার বয়স হয়নি—একদিন মরীয়া হয়ে চুরি করলাম। সেই আরম্ভ—কিন্তু মা'কে বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না, তিনি একরকম অনাহারেই মারা গেলেন।

দিবাকর একটু চুপ করিল। নন্দা তীক্ষ্ম অবিশ্বাস লইয়া শুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু শুনিতে শুনিতে তাহার মুখের ভাব একটু একটু করিয়া পরিবর্তিত হইতে লাগিল। দিবাকর নীরস আবেগহীন কণ্ঠে আবার আরম্ভ করিল—

দিবাকরঃ নিজের বলতে আমার আর কেউ রইল না। পৃথিবীতে আমি একা; কেউ আমাকে চায় না, আমার মরা-বাঁচায় কারুর আসে যায় না। আমার মন কঠিন হ'য়ে উঠতে লাগল। আমার ওপর যখন কারুর মমতা নেই, তখন আমারই বা কারুর ওপর মমতা থাকবে কেন? সংসার যখন আমার শত্রু তখন আমিও সংসারের শত্রু। এইভাবে বড় হ'য়ে উঠলাম। আমি নির্বোধ নই; জানতাম, যদি একবার ধরা পড়ি তাহলে সমাজ আমাকে ছাড়বে না, দাগী করে ছেড়ে দেবে। খুব সাবধানে চুরি করতে শিখলাম। আর শিখলাম ধনীকে ঘৃণা করতে। যাদের টাকা আছে তারাই আমার শত্রু; তারা সম্পত্তি আগ্‌লে নিয়ে ব'সে আছে, যে সেদিকে হাত বাড়াবে তাকেই তারা পায়ের তলায় পিষে ফেলবে। তারা নিষ্ঠুর, তারা পরের সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে নিজেরা বড়মানুষ হ'য়ে বসেছে; তারাই আমার মুখের অন্ন কেড়ে

খাচ্ছে—

নন্দাঃ (তপ্তকণ্ঠে) মিথ্যে কথা। বড়মানুষ মাত্রই গরীবের মুখের অন্ন কেড়ে খায় একথা সত্যি নয়।

দিবাকরঃ পুরোপুরি সত্যি না হলেও একেবারে মিথ্যেও নয়। যাক, আমি নিজের মনের অবস্থা বর্ণনা করছি।—একটা কথা আপনাকে মিথ্যে ব'লেছিলাম, আমার শিক্ষা সম্বন্ধে। চুরির টাকায় আমি এম-এ পাস করেছি, অশিক্ষিত নই। আধুনিক মনীষীদের চিন্তাধারার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। Proudhon বলেছেন, property is theft; যার সম্পত্তি আছে সেই চোর। মনে আছে কথাটা আমাকে খুব উৎসাহ দিয়েছিল। যারা বিত্তবান তারাই যদি চোর তবে আমার চোর হ'তে লজ্জা কি?...ক্রমে আমি কঠিন অপরাধী হয়ে উঠলাম; চুরির নেশা আমাকে চেপে ধরল। সুবিধে পেলেই চুরি করতে আরম্ভ করলাম। এইভাবে গত তিন বছর কেটেছে। এখন আর আমার টাকার দরকার নেই, কিন্তু নেশা ছাড়তে পারি না।

দিবাকর আবার থামিল। নন্দা সম্মোহিত হইয়া শুনিতেছিল, নিজের অজ্ঞাতসারেই বলিয়া উঠিল—

নন্দাঃ তারপর?

দিবাকর নন্দার দিকে না চাহিয়া বলিতে লাগিল—

দিবাকরঃ তারপর—একটা বাড়িতে চুরি করতে গেলাম। আটঘাট বেঁধেই গিয়েছিলাম, কিন্তু ধরা প'ড়ে গেলাম। ভেবেছিলাম তারা আমাকে পুলিসে ধরিয়ে দেবে, কিন্তু তারা ধরিয়ে দিলে না। দয়া মায়া আশা করিনি, দয়া মায়া পেলাম, সমবেদনা পেলাম; সৎপথে চলবার প্রেরণা পেলাম। যে বাড়িতে চোর হ'য়ে ঢুকেছিলাম সেই বাড়িতে আশ্রয় পেলাম—

নন্দাঃ সে কোন্ বাড়ি?

দিবাকর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিয়া চলিল—

দিবাকরঃ কিন্তু তবু আমার চুরির নেশা গেল না। একদিকে লোভ, অন্যদিকে কৃতজ্ঞতা —দুয়ের মধ্যে টানাটানি শুরু হল। এমনি ভাবে কিছুদিন চলল। তারপর সব ভেসে গেল।

নন্দাঃ ভেসে গেল!

দিবাকরঃ আমার মনে স্নেহ মমতা ভালবাসার স্থান ছিল না, শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল না; সব পাথর হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু একদিন কোথা থেকে এক প্রবল বন্যা এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। শুধু র'য়ে গেল ভালবাসা শ্রদ্ধা আর আত্মগ্লানি।

দিবাকরের কথা শুনিতে শুনিতে নন্দা এক পা এক পা করিয়া টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহার মুখে সংশয়ভরা অবিশ্বাস আর ছিল না, চোখে এক নূতন দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দিবাকর পকেট হইতে চক্‌চকে চাবিটি বাহির করিয়া অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

দিবাকরঃ যতদিন আমার প্রাণে ভালবাসা ছিল না, ততদিন আত্মগ্লানিও ছিল না। কিন্তু এখন মনে হ'ল আমি নরকের কীট, আমার সর্বাঙ্গে পাঁক লেগে আছে, যাকে ভালবাসি তার পানে চোখ তুলে চাইবার অধিকার আমার নেই—

নন্দা টেবিলের দিকে দৃষ্টি নত করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—

নন্দাঃ কাকে আপনি ভালবাসেন তা তো বললেন না!

দিবাকরঃ সে কথা বলবার নয়।—এই চাবি তৈরি করেছিলাম চুরি করব ব'লে, যা চুরি করতে এসেছিলাম, ইচ্ছে করলেই তা চুরি করতে পারতাম। কিন্তু আর সে ইচ্ছে নেই। এখন আমাকে কেটে ফেললেও আর চুরি করতে পারব না।

চাবিটি টেবিলে রাখিয়া দিয়া সে ক্লান্তচক্ষে নন্দার পানে চাহিল।

দিবাকরঃ আমার যা বলবার ছিল শেষ হয়েছে। এখন আপনি পুলিসে খবর দিতে পারেন। আমি পাশের ঘরে থাকব।

দিবাকর দ্বার খুলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ডিজল্ভ্।

হল-ঘরের ঘড়িতে তিনটা বাজিতে কয়েক মিনিট বাকি আছে।

মন্মথ টেবিলের সম্মুখে বসিয়া অলসভাবে একটা মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতেছিল। ঘরে আর কেহ নাই। যদুনাথ এখনও তাঁহার চিরাভ্যস্ত দিবানিদ্রা শেষ করিয়া ঘর হইতে বাহির হন নাই।

টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। মন্মথ নিরুৎসুকভাবে যন্ত্র তুলিয়া কানে দিল।

মন্মথ: হ্যালো—

তারের অপর প্রান্ত হইতে যে কণ্ঠস্বরটি ভাসিয়া আসিল তাহাতে মন্মথ তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় খাড়া হইয়া বসিল, তাহার ব্যাজার-ভরা মুখ মুহূর্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে একবার সচকিতে চারিদিকে চাহিল।

মন্মথ: অ্যাঁ—লিলি! হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি মন্মথ। কি বল্‌লে—তুমি একলা আছ?

লিলি নিজের বাসা হইতে টেলিফোন করিতেছে। দাশু ও ফটিক তাহার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। লিলি কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া ফোনের মধ্যে বলিল—

লিলি: হ্যাঁ, কেউ নেই। আমি একলা।

মন্মথ: দাশুবাবু? ফটিকবাবু?

লিলি মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া দাশু ও ফটিকের পানে কটাক্ষপাত করিল।

লিলি: তাঁরা আর আসবেন না। তাঁদের আমি—। তাঁদের কথা দেখা হ'লে বলব; কিন্তু আপনিও কি আমাকে ভুলে গেছেন, মন্মথবাবু?

মন্মথ: ভুলে গেছি! কি বলছ তুমি? আমি এখনি তোমার কাছে যাচ্ছি—

লিলি: শুনুন, এখন আসবেন না। আজ রাত্রে আমার সঙ্গে ডিনার খাবেন, কেমন? শুধু আমি আর আপনি, আর কেউ নয়।

মন্মথ: আচ্ছা, সেই ভাল। তোমাকে যে কত কথা বলবার আছে, লিলি—হেঁ হেঁ—আচ্ছা—আচ্ছা—নিশ্চয়।

মন্মথ টেলিফোন রাখিয়া আহ্লাদে প্রায় লাফাইতে লাফাইতে উপরে চলিয়া গেল।

ওদিকে লিলি টেলিফোন বন্ধ করিয়া সপ্রশ্ন নেত্রে দাশু এবং ফটিকের পানে চাহিল। দাশু উত্তরে সন্তোষসূচক ঘাড় নাড়িল।

দাশু: হ্যাঁ, আজই একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলা চাই, আর দেরি নয়। চল ফটিক, আমাদেরও তৈরি থাকতে হবে।

ডিজল্ভ্।

বেলা আন্দাজ সাড়ে চার। লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া যদুনাথ একটি জ্যোতিষের বই দেখিতে-ছেন; নন্দা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া চা প্রস্তুত করিতেছে। নন্দার মুখখানি গম্ভীর, একটু শঙ্কিত। এক পেয়ালা চা ঢালিয়া সে যদুনাথের সম্মুখে ধরিল।

নন্দা: দাদু, তোমার চা।

যদুনাথ বই সরাইয়া রাখিয়া চা লইলেন, কথাচ্ছলে বলিলেন—

যদুনাথ: আজ একাদশী কিনা, বাতের ব্যথাটা বেড়েছে।—মন্মথ কোথায়?

নন্দা: দাদা কি জানি কোথায় বেরুল।

যদুনাথ: আর দিবাকর?

নন্দা: বোধ হয় নিজের ঘরে আছেন। ডেকে পাঠাব?

যদুনাথ: না, দরকার কিছু নেই। ছেলেটার ওপর আমার ভারি মায়া প'ড়ে গেছে। বড় ভাল ছেলে।

নন্দা: (একটু হাসিয়া) মেষ কিনা, তাই তোমার মায়া পড়েছে।

যদুনাথ: না না, সত্যি ভাল ছেলে। তোর ভাল লাগে না?

নন্দা প্রশ্নটা এড়াইয়া গেল।

নন্দাঃ দাদা ওঁকে পছন্দ করে না।

যদুনাথের মুখ গম্ভীর হইল।

যদুনাথঃ হুঁ, সে আমি জানি। কিন্তু ওর সঙ্গে কোনও রকম অসদ্‌ব্যবহার করে না তো?

নন্দাঃ না। দাদা ওঁকে এড়িয়ে চলেন, উনিও দাদাকে এড়িয়ে চলেন।—দাদু, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

যদুনাথঃ কি কথা?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নন্দা আস্তে আস্তে বলিল—

নন্দাঃ মনে করো, একজন অপরাধ করার পর তার অনুতাপ হয়েছে, আর সে অপরাধ করতে চায় না। তবু কি তাকে শাস্তি দিতে হবে?

যদুনাথ তীক্ষ্ম সন্দেহভরা দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিলেন।

যদুনাথঃ হঠাৎ একথা কেন?

নন্দা হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—

নন্দাঃ অম্‌নি। জানবার কৌতূহল হ'ল, তাই জিগ্যেস করছি।

যদুনাথঃ নন্দা, বড় কঠিন প্রশ্ন করেছ; একেবারে দণ্ডনীতির গোড়ার কথা! দ্যাখ, মানুষ যখন অপরাধ করে তখন তার ফলে কারুর না কারুর অনিষ্ট হয়, সমাজের ক্ষতি হয়। অনুতাপ খুব ভাল জিনিস, কিন্তু অনুতাপে তো ক্ষতিপূরণ হয় না। মানুষ যে-কাজ করেছে তার ফল—ভাল হোক মন্দ হোক—তাকে ভোগ করতে হবে। এটা শুধু মানুষের আইন নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আইন। আগুনে যে হাত দিয়েছে তার হাত পুড়বে, হাজার অনুতাপেও তার জ্বলুনি কমবে না। কেমন, বুঝতে পারেছ?

নন্দাঃ পারছি।

যদুনাথঃ এই হচ্ছে অনাদি নিয়ম। মানুষ তার সমাজ-ব্যবস্থায় এই নিয়ম মেনে নিয়েছে। না মেনে উপায় নেই, না মান্‌লে সমাজ একদিনও চলবে না। পাপ যে করেছে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অপরাধীকে দণ্ডভোগ করতে হবে।

নন্দাঃ কিন্তু অনুতাপ—

যদুনাথঃ অনুতাপ ভাল; যার অনুতাপ হয়েছে তাকে আমরা স্নেহের চক্ষে সহানুভূতির চক্ষে দেখব, কিন্তু তার প্রাপ্য দণ্ড থেকে তাকে নিষ্কৃতি দেবার অধিকার আমাদের নেই। দণ্ড ভোগ ক'রে তবে সে কর্মফলের হাত থেকে মুক্তি পাবে, তার দাঁড়িপাল্লা আবার সমান হবে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নন্দা ভয়ে ভয়ে বলিল—

নন্দাঃ আচ্ছা দাদু, মনে কর—মনে কর দাদা যদি কোনও অপরাধ ক'রে থাকে—

যদুনাথঃ (চমকিয়া) দাদা—মন্মথ!

নন্দাঃ না না, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে কর দাদা যদি কোনও অপরাধ করে, কিন্তু তারপর অনুতপ্ত হয়, তবু কি তুমি তাকে শাস্তি দেবে? জেলে পাঠাবে?

যদুনাথ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

যদুনাথঃ মন্মথ যদি জেলে যাবার মত অপরাধ করে তাহলে আমি তাকে জেলে পাঠাব। আমার বুক ভেঙে যাবে, তবু তাকে জেলে পাঠাব। নন্দা, একটা কথা জেনে রাখো। ন্যায় অন্যায় বোধ যদি না থাকে তাহলে জীবনে কিছুরই কোনও মূল্য থাকে না; জীবনটাই খেলো হ'য়ে যায়। আমি জীবনে অনেক দাগা পেয়েছি, অনেক জিনিস হারিয়েছি। তোমাদের মা বাবা, তোমাদের ঠাকুরমা—সবাই একে একে আমাকে ছেড়ে গেছেন। কিন্তু তবু আমি মনের জোর হারাইনি। শেষ পর্যন্ত সবই যদি যায়, তবু ন্যায়ধর্মকে আঁকড়ে থাকব। ওই আমার শেষ সম্বল।

শুনিতে শুনিতে নন্দার চোখে জল আসিয়াছিল; সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিল।

ডিজল্ভ্।

দ্বিতলে দিবাকরের ঘর। দিবাকর নিজের বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া আছে। নন্দার যে ফটোখানা সে চুরি করিয়াছিল, তাহাই ডান হাতে বুকের উপর ধরিয়া একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া আছে। ক্রমে তাহার ক্লান্ত চক্ষু মুদিয়া আসিল, ছবিখানা হাত হইতে খসিয়া বুকের উপর পড়িয়া রহিল! তন্দ্রার মধ্যে সে একবার অস্ফুট স্বরে বলিল—না না, নন্দা—তা হয় না।

নন্দা আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার শয্যাপাশে দাঁড়াইল, করুণ মধুর নয়নে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। দিবাকরের বুকের উপর উল্টানো ছবিটা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কার ছবি?

নন্দার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে অতি লঘু হস্তে ছবিখানা দিবাকরের বুকের উপর হইতে তুলিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে দিবাকরের চট্‌কা ভাঙিয়া গেল, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

দিবাকর: নন্দা—!

নিজের মুখে নন্দার নাম শুনিয়া সে নিজেই থতমত খাইয়া গেল। নন্দা ছবিটা দেখিয়া হাসি-মুখ তুলিল।

নন্দা: হ্যাঁ, নন্দা। চণ্ডীদাস কি বলেছেন জানো?

দিবাকর শয্যা হইতে নামিয়া দাঁড়াইল।

দিবাকর: চণ্ডীদাস—?

নন্দা: হ্যাঁ গো, কবি চণ্ডীদাস, রজকিনী রামীর চণ্ডীদাস। গান শোনোনি? চণ্ডীদাস কয়, আপন স্বভাব ছাড়িতে না পারে চোরা!

দিবাকর: (অবরুদ্ধ স্বরে) নন্দা, আমি—

নন্দা: কখন ছবিটা চুরি করলে? উঃ, কি সাংঘাতিক চোর তুমি! আমার চোখের সামনে চুরি করলে তবু দেখতে পেলাম না!

দিবাকর: নন্দা, কেন তুমি জান্‌লে? আমি বলতে চাইনি—

নন্দা: কিন্তু এখন তো ধরা প'ড়ে গেছ। এখন কি করবে?

দিবাকর: কি করব! আমি চোর—দাগী আসামী—

মুহূর্তে নন্দার মুখ গম্ভীর হইল; সে দিবাকরের মুখের উপর অপ্রগল্‌ভ চক্ষু রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

নন্দা: তুমি চোর, তুমি দাগী আসামী; আচ্ছা বেশ, কিন্তু আমি তবে কি? চোরের বোন। তফাৎ কতখানি? আমি কোন অধিকারে তোমাকে নীচু নজরে দেখব।

দিবাকর: না না, সে অন্য কথা। মন্মথবাবু প্রকৃতিস্থ নয়, তিনি কি করছেন তা নিজেই জানেন না। কিন্তু আমি যে সাদা চোখে জেনে শুনে অপরাধ করেছি—

নন্দা: কিন্তু এখন তো তুমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছ।

দিবাকর: তা পেরেছি, কিন্তু নিজের অতীতকে ভুলতে পারছি কই? অতীতের দেনা যতক্ষণ না শোধ করছি ততক্ষণ যে আমার নিষ্কৃতি নেই, নন্দা।

নন্দা: অতীতের দেনা?

দিবাকর: যা করেছি তার ফল ভোগ করতে হবে না? পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?

নন্দার মুখ পাণ্ডুর হইল; দাদুও তো ওই কথাই বলিয়াছিলেন। সে স্খলিতস্বরে বলিল—

নন্দা: প্রায়শ্চিত্ত! কী প্রায়শ্চিত্ত! কি করতে চাও তুমি?

দিবাকর একবার কপালের উপর দিয়া করতল সঞ্চালিত করিল।

দিবাকর: তা এখনও ঠিক জানি না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, না করলে শান্তি নেই। নন্দা, আর আমি এখানে থাকব না, চ'লে যাব।

নন্দা: কেন! কেন! তার কি দরকার!

দিবাকর: আমার দরকার আছে। তোমাকে ছেড়ে চ'লে যাওয়া আমার প্রায়শ্চিত্তের প্রথম পর্ব।

নন্দার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া দিবাকর তাহার আরও কাছে আসিয়া মিনতির সুরে বলিল—

দিবাকরঃ কেঁদো না, নন্দা। আমাকে হাসিমুখে যেতে দাও—

নন্দা গিয়া দরজায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইল।

নন্দাঃ না, তুমি যেতে পাবে না।

দিবাকরঃ (কাছে গিয়া) নন্দা, আমার মন বড় দুর্বল, আমাকে প্রলোভন দেখিও না। তুমি আমাকে মানুষ তৈরি করেছ, তুমি আমার পথ আগলে দাঁড়িও না, আমাকে মনুষ্যত্বের পথে হাঁটতে দাও। নন্দা, আমার কথা শোনো।

দিবাকর আঙুল দিয়া নন্দার চিবুক তুলিয়া ধরিল।

নন্দাঃ (অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে) চ'লে যাবে?

দিবাকরঃ আবার আমি ফিরে আসব। যেদিন আমার ঋণ শোধ হ'বে সেইদিন আমি তোমার কাছে ফিরে আসব।

নন্দাঃ আসবে?

দিবাকরঃ আসব, শপথ করছি। কিন্তু তুমিও একটা শপথ কর। তুমি আমাকে সাহায্য করবে, আমার প্রায়শ্চিত্ত যাতে পূর্ণ হয় তার চেষ্টা করবে। তুমি সাহায্য না করলে আমি যে কিছুই পারব না, নন্দা। বল, সাহায্য ক'রবে।

কান্নায় বুজিয়া যাওয়া স্বরে নন্দা বলিল—

নন্দাঃ ক'রব।

দিবাকর তখন নন্দার হাত ধরিয়া পাশে সরাইয়া দিল।

দিবাকরঃ এবার আমি হালকা মনে যেতে পারব না।—চললাম নন্দা, আবার দেখা হবে।

দিবাকর চলিয়া গেল। অশ্রুবাষ্পের ভিতর দিয়া নন্দা যেন দেখিতে পাইল, দিবাকর চলিয়া যাইতেছে; সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিল; হল-ঘর পার হইয়া বাগানের পথ দিয়া চলিয়াছে; ফটক উত্তীর্ণ হইয়া রাস্তায় নামিল; ঘনায়মান সন্ধ্যায় নগরের জনসমুদ্রে মিলাইয়া গেল।

রাত্রি আন্দাজ আটটা। লিলির ড্রয়িংরুম। লিলি সোফায় বসিয়া আছে, আর মন্মথ নতজানু অবস্থায় তাহার দিকে ঝুঁকিয়া তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়াছে। মানুষ যে অবস্থায় কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারাইয়া প্রবৃত্তির খরস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়ে মন্মথর সেই অবস্থা। সে উন্মাদনার ঝোঁকে বলিতেছে—

মন্মথঃ লিলি, আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে চাই—তোমাকে না পেলে আমি পাগল হ'য়ে যাব—

পুরুষকে প্রলুব্ধ করার কলাবিদ্যায় লিলি সুনিপুণা; কতখানি আকর্ষণ করিয়া কখন ঢিলা দিতে হয় তাহা তাহার নখাগ্রে। সে বঙ্কিম ভ্রুভঙ্গী করিয়া ঠোঁটের কাণে হাসিল।

লিলিঃ সবাই ঐ কথা বলে! ও তোমাদের মুখের কথা।

মন্মথঃ মুখের কথা! লিলি, তুমি জানো না, তোমার জন্যে আমি নিজের বোনের গয়না চুরি করেছিলাম। তোমার জন্যে আমি কী না পারি! যদি হৃদয় খুলে দেখাতে পারতাম তাহলে বুঝতে।

লিলিঃ পুরুষদের হৃদয় নেই, শুধু ছলনা।

লিলি হঠাৎ উঠিয়া ব্যাল্‌কনিতে গিয়া দাঁড়াইল। নীচে অন্ধকার বাগান; লিলি রেলিংয়ের উপর কনুই রাখিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। মন্মথ আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। কিন্তু কেহই জানিতে পারিল না যে ঠিক ব্যাল্‌কনির নীচে অন্ধকারে দিবাকর দাঁড়াইয়া আছে।

মন্মথঃ লিলি, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না। তোমার জন্যে আমি আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি, মানুষ খুন করতে পারি—

লিলিঃ ওসব কিছুই করবার দরকার নেই। তুমি আমাকে ভালবাস কিনা খুব সহজে

প্রমাণ করতে পার।

মন্মথ: (সাগ্রহে) কি করব বলো?

লিলি: কিন্তু সে তুমি পারবে না।

মন্মথ: একবার ব'লে দ্যাখো পারি কিনা। একবার মুখ ফুটে বল, লিলি।

লিলি গম্ভীর মুখে মন্মথর দিকে ফিরিল।

লিলি: তুমি একবার ব'লেছিলে তোমার বাড়িতে একটি সুন্দর রুবি আছে; যদি সেই রুবি আমাকে এনে দিতে পারো, তবেই বুঝব তুমি আমায় ভালবাস।

মন্মথর মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল।

মন্মথ: রুবি—সূর্যমণি! কিন্তু সে যে—সে যে আমাদের ঠাকুর, দাদু রোজ তার পুজো করেন—

লিলি: (মুখ বাঁকাইয়া) আমি জানতাম তুমি পারবে না। তুমি কেবল মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলতে পার।—সর, পথ ছাড়ো।

লিলি আবার কক্ষে ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু মন্মথ হাত দিয়া তাহার পথ আগলাইয়া রহিল।

মন্মথ: লিলি, আমার একটা কথা শোনো—

লিলি: আর কি শুনব? তোমার প্রেমের দৌড় বুঝতে পেরেছি। তোমার চেয়ে দাশুবাবু ফটিকবাবু ভাল, তারা অন্তত কৃপণ নয়।

মন্মথর মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল দাশু ফটিকের উল্লেখে তাহা দূর হইল। সে তীব্র জ্বরাক্রান্ত চোখে চাহিয়া লিলির দুই কাঁধের উপর হাত রাখিল।

মন্মথ: লিলি, আমি যদি সূর্যমণি এনে তোমায় দিই, তাহলে তুমি আমার হবে?

লিলি: তাহলে বুঝব তুমি আমায় সত্যিই ভালবাস।

মন্মথ: আর তুমি? তুমি আমায় ভালবাস না?

লিলি: (লজ্জাভিনয় করিয়া) সে কথা মেয়েরা কি মুখ ফুটে বলতে পারে?

মন্মথ: লিলি, চল দু'জনে পালিয়ে যাই। আমি সূর্যমণি চুরি ক'রে আনব, তারপর দু'জনে পালিয়ে গিয়ে নির্জনে বাস করব; কেউ জানবে না, শুধু তুমি আর আমি।—

লিলি: ডার্লিং!

মন্মথ: ডার্লিং! আজ রাত্রে আমি আসব—দুপুর রাত্রে আসব—সূর্যমণি নিয়ে আসব যেমন ক'রে পারি। তুমি আমার জন্যে রাত বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো।

লিলি: আমি সারা রাত তোমার পথ চেয়ে থাকব।

বাহুতে বাহু শৃঙ্খলিত করিয়া দু'জনে আবার ঘরে ফিরিয়া গেল। ব্যাল্‌কনির নীচে দাঁড়াইয়া দিবাকর অবিচলিত মুখে সমস্ত শুনিয়াছিল; আর অধিক শুনিবার প্রয়োজন ছিল না।

ডিজল্‌ভ্‌।

রাত্রি সাড়ে আটটা। যদুনাথের হল-ঘরে কেহ নাই; কেবল নন্দা স্বপ্নাবিষ্টের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। নন্দা কাছেই ছিল, সে ক্ষণেক শব্দায়মান যন্ত্রটার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ছুটিয়া গিয়া যন্ত্রটা তুলিয়া কানে ধরিল। যদি দিবাকর হয়।

নন্দা: হ্যালো—

তারের অপরদিক হইতে কোনও শব্দ আসিল না।

নন্দা: হ্যালো হ্যালো—

কাট্।

কোনও অনির্দিষ্ট স্থানে একটি টেবিলের সম্মুখে দিবাকর টেলিফোন কানে দিয়া বসিয়া আছে; তাহার মুখে স্নেহ-বিধুর হাসি। কিছুক্ষণ শুনিবার পর সে নরম সুরে বলিল—

দিবাকরঃ তুমি কথা বল, নন্দা, আমি শুনি।

ওদিকে নন্দার মুখ উজ্জ্বল হইয়া আবার পাণ্ডুর হইয়া গেল।

নন্দাঃ তুমি—তুমি? কোথা থেকে কথা বলছ?

দিবাকরঃ তা জেনে কোনও লাভ নেই, নন্দা। তার চেয়ে তুমি কথা বল, তোমার গলার আওয়াজ শুনতে ইচ্ছে করছে।

নন্দাঃ (ধরা-ধরা গলায়) শুধু গলার আওয়াজ শুনতে ইচ্ছে করছে? আর—দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না?

দিবাকরঃ ইচ্ছে হচ্ছে না!

নন্দাঃ তবে ফিরে আসছ না কেন?

দিবাকরঃ বলেছি তো, নন্দা, আসবে। কিন্তু এখন নয়। একটা কথা শোনো।—আজ রাত্রে তুমি সজাগ থেকো, ঘুমিও না।

নন্দাঃ (সাগ্রহে) তুমি আসবে?

দিবাকরঃ তা ঠিক জানি না। কিন্তু তুমি জেগে থেকো।

নন্দাঃ আচ্ছা।—ওঃ!

নন্দার দৃষ্টি পড়িল, যদুনাথ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছেন।

নন্দাঃ (নিম্নস্বরে) দাদু আসছেন। দাদু তোমাকে বাড়িময় খুঁজে বেড়াচ্ছেন—

নন্দা টেলিফোনের শ্রবণ-যন্ত্রটি টেবিলের উপর রাখিল, তারের সংযোগ কাটিয়া দিল না। তাহার ইচ্ছা যদুনাথ অন্যত্র চলিয়া গেলে আবার দিবাকরের সহিত কথা কহিবে। যদুনাথ কিন্তু চলিয়া গেলেন না, নন্দার সম্মুখে আসিয়া ক্ষুব্ধ মুখে বলিলেন—

যদুনাথঃ সে নিজের ঘরে নেই, চ'লে গেছে। আমাকে না ব'লে চ'লে গেছে। (লাঠি ঠুকিয়া) আমি জানতে চাই এর জন্যে দায়ী কে? নিশ্চয় কেউ তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে, নইলে সে আমাকে না ব'লে চ'লে যাবে কেন?

টেলিফোনের অপর প্রান্তে দিবাকর যদুনাথের কথাগুলি শুনিতে পাইতেছে; তাহার চক্ষু বাষ্পোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ওদিকে যদুনাথ আরও উত্তপ্ত হইয়া বলিয়া চলিয়াছেন—

যদুনাথঃ আমার কথার উত্তর কেউ দেবে? বাড়ির সবাই যেন বোবা হ'য়ে গেছে। দিবাকর কোনও দিন আমাকে না জানিয়ে বাড়ির বাইরে যায় না, আজ কোথায় চ'লে গেল সে! কেন চ'লে গেল? নিশ্চয় কেউ তাকে চ'লে যেতে ব'লেছে তাই সে চ'লে গেছে। আমি তো কোনও দিন তাকে একটা কটু কথা বলিনি। নন্দা, তুই তাকে কটু কথা বলেছিস্?

নন্দাঃ (নত মুখে) না দাদু।

যদুনাথঃ তবে অমন ভাল ছেলেটা কেন চ'লে গেল। নন্দা। সত্যি বল্, তুই তাকে তাড়িয়ে দিস্‌নি?

নন্দাঃ (অধর দংশন করিয়া) না দাদু।

যদুনাথঃ তবে আর কেউ দিয়েছে। সে তো অমনি অমনি চ'লে যাবার ছেলে নয়—

এই সময় মন্মথ সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া যদুনাথ বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিলেন।

যদুনাথঃ এই—মন্মথ! তুমি—তুমি—দিবাকরকে তাড়িয়েছ! তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।

মন্মথ বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিল।

মন্মথঃ কি হয়েছে? আমি তো কিছু জানি না।

যদুনাথঃ এ বাড়ির কেউ কিচ্ছু জানে না, সবাই ন্যাকা। সব্বাইকে তাড়িয়ে দেব আমি, দূর ক'রে দেব বাড়ি থেকে। যত সব চোর বাট্‌পাড় গাঁটকাটার দল—

যদুনাথ আফসাইতে লাগিলেন। মন্মথ চোরের মত উপরে চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে সেবক

আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়াছিল, সে ভয়ে ভয়ে বলিল—

সেবক: বাবু—

যদুনাথ সিংহ বিক্রমে তাহার দিকে ফিরিলেন।

যদুনাথ: তোমার আবার কী দরকার?

সেবক: খাবার দেওয়া হয়েছে।

যদুনাথ: খাবার! খাব না আমি—ক্ষিদে নেই আমার—

তিনি নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

যদুনাথ: ভাল চাও তো ফিরিয়ে নিয়ে এস তাকে, যেখান থেকে পারো ফিরিয়ে নিয়ে এস। নইলে—

তিনি দড়াম করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। সেবক ফ্যালফ্যাল করিয়া ইতি উতি চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। নন্দা আবার টেলিফোন তুলিয়া লইল।

নন্দা: শুনলে?

দিবাকর: শুনলাম।

নন্দা: তবু আসবে না?

দিবাকর: আসব নন্দা। আমি শপথ করেছি আসব। কিন্তু তুমি তোমার শপথ ভুলে যাওনি তো?

নন্দা: না।

দিবাকর: আজ রাত্রে সতর্ক থেকো, জেগে থেকো।

নন্দা: আচ্ছা। তোমার দেখা পাবার আশায় জেগে থাকব।

কিছুক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া সে টেলিফোন নামাইয়া রাখিল।

ডিজল্ভ্।

রাত্রি বারোটা। যদুনাথের দ্বিতলের বারান্দা।

মন্মথ নিজের ঘর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল। তাহার গায়ে বিলাতী পোশাক, পায়ে রবারের জুতা। সে কান পাতিয়া শুনিল, কোথাও শব্দ নাই। তখন সে সন্তর্পণে নীচে নামিয়া গেল।

নন্দা নিজের ঘরে জাগিয়া ছিল। ক্ষীণ রাত্রি-দীপ জ্বালিয়া সে মুক্ত জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল; আশা করিতেছিল, দিবাকর আসিবে। মন্মথর বহির্গমন সে জানিতে পারল না।

কাট্।

মন্মথ ইতিমধ্যে নীচে নামিয়া যদুনাথের শয়ন-ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছে। সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, যদুনাথ নাসিকাধ্বনি করিয়া ঘুমাইতেছেন। মন্মথ তখন লঘু হস্তে দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

যদুনাথের বালিশের পাশে চাবির গোছা রহিয়াছে, যদুনাথ বিপরীত দিকে ফিরিয়া ঘুমাইতেছেন। মন্মথ হাত বাড়াইয়া দৃঢ়মুষ্টিতে চাবির গোছা ধরিয়া ধীরে ধীরে তুলিয়া লইল। যদুনাথ জাগিলেন না।

বাহিরে আসিয়া মন্মথ চাবি দিয়া ঠাকুর-ঘরের দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

ডিজল্ভ্।

কয়েক মিনিট পরে। যদুনাথের ফটক হইতে কিছু দূরে রাস্তার পাশে একটি ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া আছে; ট্যাক্সির চালক দাড়িওয়ালা শিখ গাড়ির বনেট খুলিয়া খুটখাট করিতেছে।

মন্মথকে দ্রুতপদে বাড়ির দিক হইতে আসিতে দেখা গেল। ট্যাক্সির পাশাপাশি আসিয়া

সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

মন্মথঃ ট্যাক্সি যায়গা?

চালক বনেট বন্ধ করিয়া ভাঙা গলায় বলিল—

চালকঃ যায়গা।

মন্মথ গাড়িতে উঠিয়া বসিল, শিখ চালক গাড়ি চালাইয়া দিল। শিখ চালক যে ছদ্মবেশী দিবাকর, দাড়িগোঁফের ভিতর হইতে মন্মথ তাহা চিনিতে পারিল না।

ওয়াইপ্।

লিলির ড্রয়িংরুমে দাশু ও ফটিক পাশাপাশি সোফায় বসিয়া আছে। লিলি টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া একটি কাচের সোরাই হইতে গেলাসে বরফ-জল ঢালিতেছে। সকলের মুখের ভাব চিন্তাকুল। তাহারা মন্মথর প্রতীক্ষা করিতেছে।

দাশুঃ (হাতঘড়ি দেখিয়া) সাড়ে বারোটা।—লিলি, তোমার পাখি উড়েছে। সব পন্ড হল।

লিলিঃ না, সে আসবে, নিশ্চয় আসবে—ঐ!

বাড়ির সদরে মোটর আসিয়া থামার শব্দ হইল। লিলি ছুটিয়া গিয়া দ্বারের কাছে কান পাতিয়া শুনিল, তারপর হাত নাড়িয়া দাশু ও ফটিককে ইশারা করিল। তাহারা ত্বরিতে পাশের ঘরে লুকাইল।

ক্ষণেক পরে মন্মথ আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চেহারা উস্কখুস্ক, হাত-পা কাঁপিতেছে. চোখে জ্বরগ্রস্তের তীব্র দৃষ্টি। লিলি উদ্ভাসিতমুখে তাহার হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া আনিল এবং দরজা ভেজাইয়া দিল। মন্মথ সভয়ে চারিদিকে চাহিল।

মন্মথঃ এখানে আর কেউ নেই তো!

লিলিঃ না না না, শুধু তুমি আর আমি। তোমার জন্যে একলাটি জেগে ব'সে আছি। জানতাম তুমি আসবে।

মন্মথ সোফার উপর বসিয়া পড়িল।

মন্মথঃ কি ক'রে যে এসেছি।—লিলি, চল, এখনি পালিয়ে যাই। আমি ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

লিলিঃ যাব যাব। কিন্তু কী এনেছ আগে দেখি।

মন্মথ পকেট হইতে সূর্যমণি লইয়া মুঠি খুলিয়া লিলির সম্মুখে ধরিল; ডিম্বাকৃতি সিন্দুরবর্ণ মণি তীব্র আলোক সম্পাতে ঝলমল করিয়া উঠিল। লিলি মণিটি মন্মথর হাত হইতে প্রায় কাড়িয়া লইয়া দুই চক্ষু দিয়া গিলিতে লাগিল।

সোফার পিছন দিকের দরজা দিয়া দাশু ও ফটিক নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল। উভয়ের হাতে পুলিসের রুলের মত একটি করিয়া খেঁটে। .

মন্মথঃ দেখলে তো? এবার চল—

এই সময় দাশুর খেঁটে তাহার মাথায় পড়িল। মন্মথ একটা অব্যক্ত চিৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই ফটিক তাহার মাথায় আর এক ঘা দিল। মন্মথ অজ্ঞান হইয়া সোফার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল।

দাশুঃ ব্যস্, কাম ফতে!

ফটিকঃ চল এবার কেটে পড়া যাক।

লিলিঃ দ্যাখো দ্যাখো—কত বড় রুবি!

লিলি দুই আঙুলে সূর্যমণি তুলিয়া ধরিল; দাশু ও ফটিক সৃক্কণী লেহন করিয়া দেখিতে লাগিল।

ফটিকঃ আর আমাদের খেটে খেতে হবে না।—

দ্বারের নিকট হইতে ব্যঙ্গ-পূর্ণ হাসির শব্দ আসিল। তিনজনে চমকিয়া দেখিল, এক দাড়িওয়ালা শিখ দাঁড়াইয়া হাসিতেছে; তাহার হাতে পিস্তল।

দাশু: কে তুমি? কোন হ্যায়?

দিবাকর: চেহারা দেখে চিনতে পারবে না। তবে নাম শুনেছ বোধ হয়—কানামাছি।

লিলি: কানামাছি!!

তিনজনে দারুভূত মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। দিবাকর দাড়ি গোঁফ টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া উদ্যত পিস্তল হাতে ঘরের মধ্যে অগ্রসর হইল। কড়া সুরে বলিল—

দিবাকর: মাথার ওপর হাত তোলো।

তিনজনে বাক্যব্যয় না করিয়া মাথার উপর হাত তুলিল। দিবাকর লিলির হাত হইতে সূর্যমণি লইয়া পকেটে রাখিল।

দিবাকর: (দাশু ও ফটিককে) তোমরা দু'জনে সোফায় বোসো। হাত নামিও না। চালাকি করতে গেলে বিপদে পড়বে।

দাশু ও ফটিক ঊর্ধ্ববাহু হইয়া সোফায় বসিল। মন্মথ অজ্ঞান অবস্থায় মেঝেয় পড়িয়াছিল, দিবাকর তাহার প্রতি একবার দৃক্পাত করিয়া লিলিকে বলিল—

দিবাকর: তুমি ওর মুখে জলের ছিটে দাও—

জলের গ্লাস দিবাকর লিলিকে দিল; লিলি যন্ত্রচালিতবৎ মন্মথর মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল। দিবাকর তখন তাহাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া কোণাচে ভাবে টেলিফোনের দিকে চলিল।

দিবাকর: তোমাদের দিকে আমার নজর আছে। একটু বেচাল দেখলেই গুলি করব।

দিবাকর বাঁ হাতে টেলিফোন তুলিয়া একটা নম্বর দিল। তাহার চক্ষু কিন্তু তিনজনের উপর নিবন্ধ।

কাট্।

যদুনাথের হল-ঘর। নন্দা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে। দীর্ঘকাল নিজের ঘরে প্রতীক্ষা করিয়া আর মনের অস্থিরতা দমন করিতে না পারিয়া চুপি চুপি নীচে নামিয়া আসিতেছে।

টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। নন্দা ছুটিয়া আসিয়া টেলিফোন তুলিয়া লইল।

নন্দা: হ্যালো—তুমি! কি! কী হয়েছে? দাদার বিপদ!—প্রাণের আশঙ্কা!—কোথায়?

টেলিফোনের শব্দে যদুনাথের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল; তিনি আলুথালু বেশে বাহির হইয়া আসিলেন।

যদুনাথ: নন্দা! তুই এত রাত্রে? কার ফোন?

নন্দা: দাদু, দাদা বিপদে পড়েছে—প্রাণ-সংশয়। (টেলিফোন) অ্যাঁ, কি ঠিকানা?...আচ্ছা, দাদু আর আমি এখনি যাচ্ছি—

যদুনাথ: কে ফোন করেছে?

নন্দা: দিবাকরবাবু।

যদুনাথ: দিবাকর! চল চল, আর দেরি নয়।

কাট্।

লিলির ঘর। দিবাকর টেলিফোন রাখিয়া ফিরিয়া আসিল। মন্মথর এতক্ষণে জ্ঞান হইয়াছে; সে মেঝেয় বসিয়া বুদ্ধিভ্রষ্টের মত মাথাটি দক্ষিণে বামে আন্দোলিত করিতেছে।

দিবাকর: (লিলিকে) তুমিও সোফায় গিয়ে বোসো—ওদের মাঝখানে। হাত তোলো।

লিলি আদেশ পালন করিল। দিবাকর মন্মথর বাহু ধরিয়া টানিয়া দাঁড় করাইল।

মন্মথ: অ্যাঁ—কি?...আমার সূর্যমণি!

দিবাকর: কোথায় সূর্যমণি?

মন্মথ ফ্যাল্‌ফ্যাল করিয়া এদিক ওদিক তাকাইল, লিলির উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল।

মন্মথ: ঐ—লিলি! আমার সূর্যমণি নিয়েছে।

লিলিঃ আমি নিইনি। ঐ যে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে নিয়েছে। ও কে জানেন? —কানামাছি!

ত্রাস-বিকৃতমুখে মন্মথ দিবাকরের পানে তাকাইল।

মন্মথঃ অ্যাঁ—কানামাছি! দিবাকর—কানামাছি! তবে আমার কি হবে! সূর্যমণি—আমার যে দু'কূল গেল!

মন্মথ আর্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দিবাকর মন্মথর বাহু ধরিয়া নাড়া দিল।

দিবাকরঃ কেঁদো না, মন্মথবাবু, তোমার দাদু এখনি আসছেন।

মন্মথঃ দাদু—অ্যাঁ, দাদু আসছেন! তবে এখন আমি কোথায় যাই!

দিবাকরঃ মন্মথবাবু, পাগলামি কোরো না, তোমার দাদু আর নন্দা দেবী এখনি এসে পড়বেন। শোনো, আমি যা বলছি করো।

মন্মথঃ অ্যাঁ—কিন্তু আমি যে—

দিবাকরঃ (প্রচণ্ড ধমক দিয়া) যা বলছি করো।

মন্মথঃ আচ্ছা—কি করব?

দিবাকরঃ এই পিস্তল নাও। (মন্মথকে পিস্তল দিল) এইবার ওদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াও।—বেশ, ওদের ওপর নজর রাখবে, কেউ একটু নড়লেই তাকে গুলি করবে।

ধমক খাইয়া মন্মথ একটু ধাতস্থ হইয়াছে। সে পিস্তল উঁচাইয়া সোফার পিছনে দাঁড়াইল। দিবাকর তখন দ্রুতপদে দ্বারের কাছে গিয়া শুনিল; বাহিরে মোটরের শব্দ হইল।

দিবাকর ঘরের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল; তাহার মুখ কঠিন, চোখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি। ফৌজী কাপ্তেনের মত কড়া সুরে সে বলিল—

দিবাকরঃ ওঁরা এসে পড়েছেন।—যদি প্রাণের মায়া থাকে, তোমরা কেউ একটি কথা বলবে না। যা বলবার আমি বল্‌ব।

তাহার হিংস্র চেহারা দেখিয়া কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না। দিবাকর আসিয়া সোফার পাশে দাঁড়াইল; দুই হাত তুলিয়া এমন ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল যেন সেও দাশুদের দলে, মন্মথ পিস্তল দিয়া সকলকে শাসাইয়া রাখিয়াছে।

যদুনাথ প্রবেশ করিলেন; সঙ্গে নন্দা। ঘরের মধ্যে বিচিত্র পরিস্থিতি দেখিয়া দুজনেই দাঁড়াইয়া পড়িলেন—

যদুনাথঃ এ কি! মন্মথ!—দিবাকর—!

দিবাকর ছুটিয়া আসিয়া যদুনাথের পায়ের কাছে পড়িল! তাঁহার জানু জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল—

দিবাকরঃ ক্ষমা করুন—আমাকে ক্ষমা করুন। আমি অপরাধ করেছি, আপনার সূর্যমণি চুরি করেছি—

যদুনাথ ক্ষণকালের জন্য হতভম্ব হইয়া গেলেন।

যদুনাথঃ আমার সূর্যমণি! চুরি করেছ! কোথায় আমার সূর্যমণি?

দিবাকর সূর্যমণি তাঁহার হাতে দিয়া বলিয়া চলিল—

দিবাকরঃ আমি আর এই তিনজন মিলে (সোফায় উপবিষ্ট তিনজনকে দেখাইয়া) সূর্যমণি চুরি করবার ষড়যন্ত্র করেছিলাম—আজ রাত্রে আমি সূর্যমণি চুরি ক'রে এখানে নিয়ে আসি—কিন্তু মন্মথবাবু কি ক'রে আমাদের মতলব জানতে পেরেছিলেন—তিনি এসে আমাদের ধ'রে ফেলেছেন।

মন্মথ অবাক হইয়া শুনিতেছিল এবং দিবাকরের প্ল্যান বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নন্দাও চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিল, কিন্তু একটা কথাও বিশ্বাস করে নাই। সত্য ঘটনা যে কী তাহা সে কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিল।

যদুনাথ বিহ্বলভাবে গিয়া মন্মথকে জড়াইয়া ধরিলেন।

যদুনাথঃ মন্মথ, তুই আজ বংশের মুখ রক্ষে করেছিস।—

এদিকে নন্দা ও দিবাকরের কাছে কেহ ছিল না। নন্দা দিবাকরকে চাপা গলায় বলিল—

নন্দাঃ কেন মিছে কথা বলছ! তুমি সূর্যমণি চুরি করনি।

দিবাকরঃ নন্দা, আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। তুমি শপথ করেছ আমাকে সাহায্য করবে।

নন্দাঃ (অধর দংশন করিয়া) কিন্তু—

দিবাকরঃ সাহায্য করবার এই সময়। ঐ টেলিফোন রয়েছে, যাও, পুলিসে খবর দাও—

নন্দা দ্বিধান্বিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যদুনাথ মন্মথকে ছাড়িয়া দিবাকরের কাছে ফিরিয়া আসিলেন, ক্ষুব্ধ ব্যথিত ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন—

যদুনাথঃ তুমি যে আমার সূর্যমণি চুরি করবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু যখন অপরাধ করেছ তখন তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। বুঝতে পেরেছি তোমার লজ্জা হয়েছে, অনুশোচনা হয়েছে। কিন্তু তোমাকে ক্ষমা করার অধিকার আমার নেই।—মন্মথ, পুলিসে খবর দিতে হবে।

মন্মথ অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। দিবাকর নন্দাকে চোখের ইশারা করিল। নন্দার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু সে অবরুদ্ধ স্বরে বলিল—

নন্দাঃ দাদু, আমি পুলিসকে টেলিফোন করছি—

নন্দা ঘরের কোণে গিয়া টেলিফোন তুলিয়া লইল।

ডিজল্ভ্।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে।

যদুনাথের গৃহ। নন্দা নিজের ঘরে চেয়ারে বসিয়া আছে; তাহার হাঁটুতে মাথা রাখিয়া মন্মথ মেঝের উপর নতজানু হইয়া আছে। নন্দার মুখ রক্তহীন, চোখের কোলে কালো ছায়া।

মন্মথঃ (সহসা মুখ তুলিয়া) নন্দা, আমি আর পারছি না। আমি যাই, দাদুকে সত্যি কথা বলি।

নন্দার অধর কাঁপিতে লাগিল।

নন্দাঃ তাতে কোনও লাভ হবে না। এর ওপর আবার এতবড় ঘা খেলে দাদু বাঁচবেন না। তুমি বুঝতে পারছ না দাদা, শুধু তোমার জন্যে নয়, দাদুকে বাঁচাবার জন্যেও তিনি এই অপরাধের বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন।

মন্মথঃ কিন্তু কেন? কেন? আমরা তার কে? কি দরকার ছিল আমাদের জন্যে এ কাজ করবার?

নন্দাঃ হয়তো একদিন বুঝতে পারবে।—তুমি যে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছ আপাতত এই যথেষ্ট।

মন্মথঃ হ্যাঁ বোন্, আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি, আর কখনও ও পথে যাব না।

সে আবার নন্দার হাঁটুতে মাথা রাখিল। নন্দা নীরবে তাহার চুলের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

ডিজল্ভ্।

প্রায় একমাস কাটিয়া গিয়াছে।

সকালবেলা হল-ঘরের টেবিলের সম্মুখে বসিয়া যদুনাথ খবরের কাগজ পড়িতেছেন; টেবিলের উপর তাঁহার চা ও প্রাতরাশ রাখা রহিয়াছে, কিন্তু তিনি তাহা স্পর্শ করেন নাই। তাঁহার মুখ বেদনা-পীড়িত।

সংবাদপত্রে স্থূলে শিরোনামায় লেখা রহিয়াছে—

কানামাছির কারাবাস।

তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ইত্যাদি—

যদুনাথ কাগজ পড়িতেছেন, সেবক আসিয়া তাঁহার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইল; কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—

সেবক: বাবু, মোকদ্দমার কিছু খবর আছে নাকি?

যদুনাথ কাগজ মুড়িয়া সরাইয়া রাখিলেন।

যদুনাথ: হ্যাঁ, রায় বেরিয়েছে। দিবাকরকে তিন বছর জেল দিয়েছে।—দিবাকর চোর ছিল সত্যি; কম বয়সে দুরবস্থায় প'ড়ে মন্দ পথে গিয়েছিল। কিন্তু তবু—

সেবক: তবু কি বাবু?

যদুনাথ: কোথায় যেন একটা গলদ আছে। দিবাকর আমার সূর্যমণি চুরি করেছিল এ যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। বড় ভাল ছেলে ছিল রে—। কপাল—সবই কপাল। ওর ভাগ্য তো আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

নিশ্বাস ফেলিয়া যদুনাথ চায়ের পেয়ালা টানিয়া লইলেন। এই সময় দেখা গেল নন্দা ও মন্মথ পাশাপাশি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে। মন্মথর পরিধানে ধুতিচাদর; দেশী পোশাক।

তাহারা আসিয়া যদুনাথের সম্মুখে দাঁড়াইল।

নন্দা: দাদু, আমরা একটু বেরুচ্ছি।

যদুনাথ: ও—তা বেশ তো। কোথায় যাচ্ছ?

নন্দা: একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

যদুনাথ: আচ্ছা, এস।

নন্দা ও মন্মথ দ্বারের দিকে চলিল। যদুনাথ চায়ে চুমুক দিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন; ত্বরিতে চাল্‌শের চশমা খুলিয়া একদৃষ্টে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিলেন; যেন অনুমানে বুঝিতে পারিলেন তাহারা কোন্ বন্ধুর সহিত দেখা করিতে যাইতেছে। তিনি দুই তিনবার আনুকূল্যসূচক ঘাড় নাড়িলেন। তাঁহার মুখ ঈষৎ উৎফুল্ল হইল।

ডিজল্‌ভ্।

জেলখানার ভীম লৌহদ্বার পার হইয়া নন্দা ও মন্মথ পাষাণপুরীতে প্রবেশ করিল।

দিবাকর নিজ প্রকোষ্ঠে ছিল; সেইখানেই সাক্ষাৎ হইল। তিনজনেই কুণ্ঠিত, অপ্রতিভ। নন্দা চোখের জল চাপিবার চেষ্টা করিতেছে।

মন্মথ সহসা দিবাকরের হাত চাপিয়া ধরিয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

মন্মথ: দিবাকরবাবু, আমি আপনার কাছে মাফ চাইতে এসেছি। আমাকে মাফ করুন।

দিবাকর শান্তকণ্ঠে বলিল—

দিবাকর: মাফ করবার কিছু নেই, মন্মথবাবু। আম যা করেছি, নিজের প্রয়োজনেই করেছি। তিন বছর পরে আমি যখন জেল থেকে বেরুব, তখন আমার অপরাধ ধুয়ে যাবে; তখন আমি নতুন মানুষ হ'য়ে জন্মগ্রহণ করব।—মন্মথবাবু, আমি দেখেছি, ভাল মেয়ের ভালবাসা অতি অধম মানুষকেও সৎ পথে টেনে আনে; আর মন্দ মেয়ের মোহ সাধু লোককেও নরকে টেনে নিয়ে যায়। আশা করি আপনি যে শিক্ষা পেয়েছেন তা সহজে ভুলবেন না।

মন্মথ: না, ভুলব না।

নন্দা চোখ মুছিল।

নন্দা: দাদু দাদার বিয়ের ঠিক করেছেন।

মন্মথ সঙ্কুচিতভাবে সরিয়া গেল।

দিবাকর: বাঃ বেশ। (ঈষৎ হাসিয়া) আর তোমার বিয়ে? কর্তা এখনও তোমার বিয়ে ঠিক করেননি, নন্দা?

নন্দা অপলক চক্ষে দিবাকরের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

নন্দা: আমার বিয়েও ঠিক হ'য়ে আছে। কিন্তু দাদু বলেছেন, তিন বছরের মধ্যে আমার বিয়ের যোগ নেই।

দিবাকরের চোখের সহিত নন্দার চোখ নিবিড় আশ্লেষে আবদ্ধ হইয়া গেল।

ফেড্ আউট্।